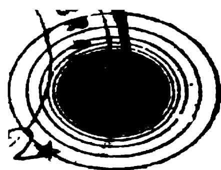
Dhwanir Shilpa Rabindra Sangeet

—a thorough analysis and appreciation
of poetic diction and multifarious
unique features of Tagore-songs

by Dr. Sudhanshu Shekhar Shasmal
M.A., (C. U.), M.A. Music. (R. B. U.), Ph.D. (C. U.)
Lecturer of Bengali Language and Literature.

ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসঙ্গীত

ডক্টর সুধাংশুশেখর শাসমল



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাব্লিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
মুদ্রক : নিশীথকুমার ঘোষ, দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৯/এ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মা ও বাবা

শ্রীচরণেষু

"ভাষা এই স্থর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন। কিন্তু যাঁরা রূপরসিক, তাঁদের মূলধন ধ্বনি।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

এক

ছন্দ অর্থে গতি, সচঞ্চলতা ও তাদের সৌন্দর্যকে বোঝায়। ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন—'গতি ও সৌন্দর্য একত্র মিলিত না হইলে ছন্দ বলা চলে না।···মাছের সাঁতার, ময়ূরের নাচ, রাজহংসের চলন, তরঙ্গায়িত নদীর প্রবাহ, উৎস-জলের উচ্ছ্বাস, ধূপ-ধূমের সঞ্চরণ ইত্যাদির মধ্যে যেমন গতি তেমনি সৌন্দর্য একসঙ্গে বর্তমান দেখা যায়।···চিত্রের ও ভাস্কর্যের নর্তক-নর্তকীর মূর্তিগুলি গতিহীন নিশ্চলমূর্তি বটে, কিন্তু উহাদের লাস্যভঙ্গি নৃত্যের গতিযুক্ত সবল সৌন্দর্যের প্রকাশ করে। সেইজন্য এই মূর্তিগুলিও ছন্দোময়ী। অর্থাৎ চঞ্চল ও অচঞ্চল সকল অবস্থাতেই গতি-সৌন্দর্য হইতেছে ছন্দ।'

কথাও তাই। ছন্দের সৃষ্টি হয় বিশ্ব-বিকাশের প্রথম প্রভাতে। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ বল্লীর দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিসৃতম্'—অর্থাৎ 'যৎকিঞ্চিৎ ইদং জগৎসর্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি কম্পতে, তৎ এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎপ্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে···'। মোটকথা, কম্পন বা vibration-এর ফলশ্রুতি বাস্তব সকল-কিছু পদার্থ। শব্দতরঙ্গের বা বায়ুতরঙ্গের কম্পন থেকে সকল কিছুর সৃষ্টির সার্থকতা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও কাব্যরসিক সকলেই স্বীকার করেছেন। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ, এই গ্রহের সৃষ্টিও চিরঘূর্ণায়মান নীহারিকাপুঞ্জের গতিবেগ থেকে। এই গতিবেগই ছন্দ সৃষ্টি করে প্রথমে; তারপর ছন্দায়িত গতি বা গতিবেগ থেকে সৃষ্টি হয় সকল পদার্থ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। তাই সাহিত্যের ছন্দ ভাষাগত এবং সংগীতের ছন্দ স্বরসমষ্টির সমবায়ে উৎপন্ন স্বর তথা সুরগত। সংগীতে সেজন্য প্রথমেই কারণ-শব্দ নাদের আলোচনা। নাদই সর্ববীজময়ী মহাপ্রকৃতি। এই মহাপ্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দু মহাপ্রাণময় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বৃহৎ বা ব্যাপক চৈতন্য—যে চৈতন্যে বা মহাচৈতন্যে বিধৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা সকল প্রাণী ও সকল পদার্থ। এই চৈতন্য-সমুদ্র স্থির ও অচঞ্চল। কিন্তু যখনই সৃষ্টির ইচ্ছার তরঙ্গ এই চৈতন্য-সমুদ্রের বুকে সৃষ্টি হয়, তখনই জীবনের ও রূপের হয় বিকাশ। এই বিকাশের মূলে বা

কেন্দ্রে ছন্দরূপ গতি-সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশ। মেঘমন্দ্র, জলকল্লোল, পক্ষি-কাকলি, যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত, কাব্যভাষার উচ্চারণ—এইগুলি ধ্বনিগত গতি-সৌন্দর্য বা ছন্দের উদাহরণ।

তবে স্বাভাবিকভাবে সকল কিছুতে ছন্দের সাহচর্য থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুতে ছন্দের আকার বা রূপ, গতি ও মাধুর্যের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ভাষা ও সাহিত্যের ছন্দ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট সংগীতের ছন্দ থেকে কিছুটা ভিন্ন—বিকাশে ও কার্যকারিতায়। তবে একথাও ঠিক যে ভাষাগত সাহিত্যের বা কাব্যের ছন্দের বিকাশে কিছুটা বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের ও কাব্যের ভাষাকে গীতশ্রী মণ্ডিত করাই ছন্দের কার্য ও সার্থকতা। ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন—'সাহিত্যিক ছন্দ সংগীত গোত্রীয়। ভাবের যে আবেগ গানে সুর সৃষ্টি করে, সেই আবেগই কাব্যভাষায় ছন্দ-সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। এইজন্য আদিকবি বাল্মীকির শোকে ছন্দের জন্ম—এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। সংগীতের ন্যায় আবেগজাত বলিয়াই ইহা কাব্যভাষায় বেগ সঞ্চার করিয়া কবিতাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তোলে, ভাষাকে বাচ্যার্থের ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এবং অর্থাতীত একটি নূতন ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করে।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেজন্যই বলেছেন—

মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে বহু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

ছন্দকে এজন্য গতি-সৌন্দর্য বলা যায়। গতি-সৌন্দর্যে প্রাণচাঞ্চল্য-রূপ প্রাণের আবেগ ও আকুতি থাকে—যে আবেগ ও একান্ত আকুতি নৃত্য সৃষ্টি করে, নৃত্যভঙ্গীকে দেয় আবেগ, প্রেরণা ও প্রাণে উচ্ছ্বসিত। ছন্দের মূলতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব। কেননা সুন্দরের সার্থক রূপায়ণে সুসঙ্গত গতিবেগ, অঙ্গসংহতি ও অঙ্গসংগতির উপযোগিতা সমধিক। তাছাড়া ছন্দের সৃষ্টিতে, প্রয়োগে ও সঙ্গতিরক্ষণে ধ্বনি ও ধ্বনিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য।

ধ্বনিবাদের প্রবক্তা আচার্য আনন্দবর্ধন বলেছেন—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরীতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব'—অর্থাৎ ধ্বনিই কাব্যের (এবং সাহিত্যের) আত্মা, এবং এই মতবাদ নূতন নয়, পূর্বেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, ধ্বনিবাদ আনন্দবর্ধনের পূর্বে প্রচলিত থাকলেও নির্দিষ্ট গ্রন্থাকারে প্রচলন ও প্রচার করেছেন আনন্দবর্ধনই প্রথমে। ধ্বনি সাধারণতঃ বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও

রসধ্বনি এই তিন প্রকার হলেও রসধ্বনিতেই বস্তু ও অলংকারধ্বনি দুটির অন্তর্নিবেশ হয় ব'লে রসধ্বনিকেই প্রধানতঃ কাব্য ও সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ-কেন্দ্র বলা হয়। অবশ্য আচার্য আনন্দবর্ধনের এই ধ্বনিবাদ খণ্ডন করেছেন 'হৃদয়-দর্পণ' গ্রন্থ-প্রণেতা ভট্টনায়ক এবং ভট্টনায়কের পরে মহিমভট্ট, বক্রোক্তিকার কুন্তক ও 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'-রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র। 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ ধ্বনির পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে রসকেই কাব্য বা সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ বলেছেন। কিন্তু মুনি ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের 'অভিনবভারতী' ভাষ্যে ও 'ধ্বন্যালোক'-এর 'লোচন'-টীকায় আনন্দবর্ধনেরই মতবাদকে সমর্থন করেছেন অভিনবগুপ্ত। তিনি সমর্থন করেছেন যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের সমর্থক ও প্রচারক হলেও পরিশেষে রসকেই কাব্য ও সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ ব'লে স্বীকার করেছেন। লোচন-টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন—'…কিং তু শব্দ সমর্প্যমানহৃদয়সংবাদসুন্দর-বিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগ-সুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি'। এ প্রসঙ্গে আনন্দ-বর্ধন নিজেও বলেছেন— '…সহৃদয়লোচনামৃতং তত্ত্বাস্তরং তদ্বদেব সোঽর্থঃ'—যা সহৃদয়গণের নয়নামৃত স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়—এই অর্থও সেইরকম! মোট কথা, আচার্য আনন্দবর্ধন মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই করেছেন যে, যদিও ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্তুর আকারে, কখনও রসের আকারে আত্ম-প্রকাশ করে, তথাপি রসধ্বনি প্রধানভাবে প্রতীয়মান এবং এটিই কাব্যের আত্মভূত। আসলে আলংকারিকদের পারিভাষিক 'রস' শব্দ কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনজনিত লোকোত্তর আহ্লাদাত্মক মানসিক ব্যাপার ও অবস্থাকে বোঝায়। মোটকথা কাব্য, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতি আত্মসাক্ষাৎজনিত আনন্দ পরিবেশন করে এবং সেজন্য ভাবতন্ময়চিত্তে আনন্দের প্রকাশই 'রস'-রূপে পরিচিত।

কিন্তু রস কি বস্তু, রস কাকে বলে? রস আস্বাদ্য অর্থাৎ আস্বাদনের বস্তু। আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—'যে রসা ইতি পঠ্যন্তে নাট্যবিচক্ষণৈঃ। রসত্বং কেন বৈ তেষামেতাদাখ্যাতুমর্হসি।' অর্থাৎ রসের রসত্ব কেমন ক'রে হয়, কেনই বা ভাব বলা হয়, এবং ভাবের কার্যকারিতা ও সার্থকতা কি প্রভৃতি। পরে বলেছেন—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে', রস ছাড়া কোন কিছুর কোন অর্থই প্রবর্তিত ও সার্থক হয় না। আসলে 'রস' শব্দটি

পারিভাষিক এবং এর অর্থ আস্বাদন করা। 'রস্যতে ইতি রস', 'রস ইতি কঃ পদার্থঃ ?—আস্বাদ্যত্বাৎ', অর্থাৎ রস বলতে আস্বাদ বা আস্বাদন ও আস্বাদ্য দুইই বোঝায়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত আটটি রস এবং রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই আটটি ভাব অর্থে স্থায়ী ভাব বা lasting sentiments। ভাব অর্থে চিত্তবৃত্তি। ভাবের মতো বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবেরও বিকাশ ও সার্থকতা আছে কাব্যে, সাহিত্যে, নাট্যে ও সংগীতে। বিভাবও পারিভাষিক শব্দ। 'রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ'—লোকজগতে যা রতি প্রভৃতির উদ্বোধক তাই কাব্য ও নাটকের বিভাব। বিভাব দুরকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। যে বস্তুকে সহায় বা অবলম্বন ক'রে ভাবের সৃষ্টি হয় তারই নাম আলম্বন বিভাব এবং স্থান-কাল পাত্রগত পরিবেশ ও আলম্বনের অঙ্গভঙ্গিই উদ্দীপন বিভাব। বিভাবের মতো অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব চিত্তবৃত্তিরই নামান্তর। মোটকথা স্থায়ী রস ও স্থায়ী ভাবের সঙ্গেই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগ বোঝাতে চেয়েছেন ভরত নাট্যশাস্ত্রে। সেজন্য তিনি রসনিষ্পত্তির জন্য বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সম্পর্ক বা সংযোগ বোঝাতে চেয়েছেন—'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। সংযোগ ও নিষ্পত্তি শব্দ দুটির ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও আচার্য অভিনবগুপ্তের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বিশ্বনাথ ও পণ্ডিত জগন্নাথ ভরত ও অভিনবগুপ্তকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন এবং কিছু কিছু পৃথক মতবাদেরও উল্লেখ করেছেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রচিত 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে ভরত-সূত্রের (রসসূত্রের) আট রকম ব্যাখ্যা পাই। রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত এই চারজন আচার্য কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এ'কথার উল্লেখ করেছেন অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে এবং মম্মটাচার্য কাব্যপ্রকাশে। ঐ চারজন আচার্যদের মধ্যে ভট্টলোল্লট উৎপত্তিবাদ, ভট্টশংকুক অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়ক ভুক্তিবাদ ও অভিনবগুপ্ত অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করেন। উক্ত চারজন আচার্যদের মধ্যে ভট্টলোল্লট ও ভট্টশংকুকের দৃষ্টি নাট্যশিল্প অর্থাৎ বস্তুর প্রতি অধিকতর অভিনিবিষ্ট, এবং ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত emotion বা ভাবকে লক্ষ্য ক'রে রসাস্বাদের কথা বলেছেন। আচার্য কুন্তকের অভিমত ভিন্ন রসতত্ত্ব ও রসনিষ্পত্তি ব্যাপারে।

কেননা কুন্তক শব্দ, অর্থ, রীতি, গুণ, অলংকার, ধ্বনি ও রস প্রভৃতিকে বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। আচার্য ভামহের কথাও তাই। সুতরাং কাব্যে ও সাহিত্যে ধ্বনি ও রস ব্যাপারে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে, আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের পক্ষপাতী এবং ধ্বনিবাদ পরিশেষে রসবাদের সার্থকতাকেই গ্রহণ করেছে। এজন্য কাব্যের বা সাহিত্যের প্রাণ বা আত্মা রস—একথা বলতেও আনন্দবর্ধনের কোন আপত্তি নেই। এইক্ষেত্রে অলংকারেরও স্থান ও সার্থকতা আছে। অনেক আলংকারিক ধ্বনিকে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করতে চান, কিন্তু আনন্দবর্ধনের অভিমত ভিন্ন। তিনি বলেন যে—ধ্বনি ও অলংকার উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক। সেজন্য যাঁরা বলেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ'—তাঁদের মতবাদ আনন্দবর্ধন অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। আনন্দবর্ধন বলেন যে, অলংকারের বাহুল্য আছে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ কাব্য হয় না; আবার অলংকার নেই, কিন্তু রসোত্তীর্ণ কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ধ্বনি, রস ও অলংকার প্রসঙ্গে আচার্য আনন্দবর্ধনের সঙ্গে আচার্য দণ্ডীরও মতভেদ আছে। দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-গ্রন্থে রসকে কাব্যের বা সাহিত্যের প্রাণ বা আত্মা বলেন নি। তবে আচার্য ভামহের অপেক্ষা আচার্য দণ্ডীর দৃষ্টি অধিকতরভাবে প্রসারিত ও ব্যাপক ছিল। তবে পুনরুল্লেখ ক'রে বলি যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদী হলেও অভিনবগুপ্ত-উল্লিখিত রসধ্বনিকেই কাব্যের ও সাহিত্যের আত্মা বা প্রাণ বলেছেন। ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন—'আনন্দবর্ধন মনে করেন যে, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির অর্থাৎ রসের বা রসধ্বনির হইতে পারে বর্ণ, পদাদি, বাক্য ও সংঘটনা—এমনকি প্রবন্ধ পর্যন্ত।' এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে—

যস্ত্বলক্ষ্যক্রমোব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদাদিষু।
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেঽপি দীপ্যতে॥'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আনন্দবর্ধন আচার্য ভামহ কথিত মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ—এই তিনটি গুণকে স্বীকার করেছেন কাব্য ও সাহিত্য-প্রকাশের সার্থকতার জন্য। গুণসকল শব্দ ও অর্থের গুণ, এরা রসপ্রকাশক শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়। অভিনবগুপ্ত তাঁর 'লোচন'-টীকায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'আত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্যাদয়ঃ উপচারেণ তু

শব্দার্থয়োঃ,'—অর্থাৎ মাধুর্যাদি গুণসমূহ পরমার্থত কাব্যের ও সাহিত্যেরও আত্মভূত রসেরই গুণ। যদিও উপচারবশতঃ বলা হয় যে, এ'গুলি শব্দ ও অর্থের গুণ—'অর্থস্য তাবৎ সম্পর্কত্বং ব্যঙ্গং প্রত্যেব সংভবতি, নান্যথা, শব্দস্যাপি স্ববাচ্যার্থকত্বং নাম কিয়দলৌকিকঃ যেন গুণঃ স্যাদিতি ভাবঃ।' অবশ্য এরপর রীতি, বৃত্তি প্রভৃতির বিচার আছে। তাছাড়া আছে সংঘটনা প্রভৃতিরও বিচার। আচার্য আনন্দবর্ধন এ সকলের বিচার করেছেন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য।

দুই

অধ্যাপক ডক্টর সুধাংশুশেখর শাসমল লিখিত 'ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের ভূমিকা লেখার অবসরে 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য আনন্দবর্ধনের বৃত্তান্ত লেখার আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ধ্বনির প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন প্রমুখ বিদগ্ধ আলংকারিকদের কিছু মতবাদের আমরা আলোচনা করেছি কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে চারুশিল্প সংগীতের সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়ার জন্য।

'ধ্বনির শিল্প—রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ-রচয়িতা সুসাহিত্যিক ডক্টর সুধাংশুশেখর শাসমল তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শব্দের ও অলংকার-মাধুর্যের যাদু রবীন্দ্রবাক্‌শিল্পকে উদ্দেশ্য ক'রে। তিনি গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন—'রবীন্দ্র-সাহিত্য বাক্‌রূপের দিব্যশক্তিতে উদ্দীপিত। রবীন্দ্রসংগীত শব্দের মায়াপুরী। রবীন্দ্রসংগীতে সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র প্রতিধ্বনিত। কথা ও সুরে সমন্বিত রবীন্দ্র-সংগীত কল্পান্তকালবাহী মানব-চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ্য ও রহস্যময় বাতায়নগুলো উন্মোচিত ক'রে দিয়ে এক দিব্য আনন্দময় জগতের বায়ুবেগ এনে দিয়েছে।' কথাও তাই—'শব্দময় জগৎ, ধ্বনিময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।' তাই গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণের রহস্যকথা প্রকাশ ক'রে বলেছেন—'রবীন্দ্র-সংগীতের ভাষাপ্রকরণের সর্ববিধ বৈদগ্ধ্যভঙ্গি, সৌষ্ঠব-বৈচিত্র্য, মিলধ্বনি, প্রতীক-উপমা, চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা, ছন্দ, সংগীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ধ্বনির শিল্প' বলে অভিহিত করতে পারি। এই ধ্বনির শিল্পের বর্ণময় বর্ণনায় রবীন্দ্ররচনার নির্মিতি'। সেজন্য বর্ণ, পদ, পদবন্ধের সার্থক রূপ-প্রমাণের জন্য গ্রন্থকার আটটি পরিচ্ছেদে অভিনব বিশ্লেষণ-রীতির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, ষষ্ঠ প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি সুপরিস্ফুটভাবে বলেছেন—

'কবিতার প্রাণ হল ছন্দ। সংগীতের প্রাণ হ'লো সুরের তান-বৈচিত্র্য। ভাষার ছন্দপ্রকরণ এখানে (রবীন্দ্রসাহিত্যে ও রবীন্দ্রসংগীতে) 'নৃত্যরস-ভঙ্গিমা'ময় হ'য়ে উঠেছে।' সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনার অক্ষর, শব্দ, ধ্বনির মিল, অনুপ্রাস ও ধ্বনিস্পন্দনের বৈচিত্র্যময় দিক থেকে। মোটকথা 'ধ্বনির শিল্প—রবীন্দ্রসংগীত'-গ্রন্থ সাহিত্য ও সংগীতের সম্মিলিত রূপ নিয়ে একটি অপরূপ অসাধারণ গ্রন্থ। বিচিত্র অলংকার, সুর ও ছন্দের সমারোহ নিয়ে এবং বিচিত্র রচনাভঙ্গী ও রূপ-প্রকরণ, পূজা-প্রকৃতি-প্রেম-বিচিত্র পর্যায়ের গানের ভাবের দিক থেকে বিচক্ষণ গ্রন্থকার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে যে উপমা ও চিত্রকল্পের বহুবর্ণী সমারোহ লক্ষ্য করা যায়—সে কথা গ্রন্থকার শ্রীসুধাংশুশেখর মহাশয় বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি দার্শনিক আলংকারিক অপ্পয় দীক্ষিতের 'উপমৈকাশৈলুষী সংপ্রাপ্তা চিত্র-ভূমিকাভেদান্' প্রভৃতি তত্ত্বের উপপাদনে ছ'টি বিবৃতি উপস্থাপন করেছেন, যাদের বক্তব্য হলো রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার সূক্ষ্মভাব ও রসবাহী হয়ে গানের পদবন্ধে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি না ক'রে কাব্যগীতির রসপরতন্ত্র ও আত্মার অলংকার্য হ'য়ে উঠেছে। তাঁর ষষ্ঠ প্রস্তাবনাটি অর্থপূর্ণ—যেখানে তিনি বলেছেন—অলংকার-প্রয়োগে মূর্ত ও বিমূর্ত, সামান্য ও বিশেষ, জড় ও চেতন প্রভৃতি ক্রমানুসরণ ও প্রস্থানগুলি অসামান্য কাব্যিক কৌশলে নির্মিত হ'তে পারে গানের সৃষ্টিমুখে ও সম্প্রসারণে, কেননা রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথ রূপ অপেক্ষা ভাবের (Form অপেক্ষা Content-এর) গুরুত্বকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, এবং কথাই তাই যে, ভারতীয় সংগীতের মর্ম কথা হ'লো আন্তর-চেতনাকে জাগ্রত করা—সে জাগৃতি মানে শিল্পীজীবনে পরিপূর্ণতা বা চরম-সার্থকতা। এই তত্ত্বের ও সত্যের উপপাদনে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শাসমল স্পষ্টভাবেই বলেছেন—'সাহিত্যের রসাস্বাদ হলো ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। পরম সত্যকে সাহিত্য না পারলে সংগীতই ধরতে পারে। গানই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা—'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তার চরণ ছুঁয়ে যাই'। সেই সত্য রূপ-অরূপের কার্যকারণে ধরা পড়ে। পরন্তু রবীন্দ্রনাথ তাই চিত্র ও সংগীত এই দুটো উপাদানের মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্তকে দেহভাবে অর্থাৎ ছবি ও সুরের আকারে (Form-এ) আনারই সার্থক উপায় ব'লে মনে করেছিলেন' (পৃঃ ১৩৮)। সেজন্য গ্রন্থকার ঠিকই বলেছেন—সাহিত্য ও কাব্য হ'লো intellectual (বুদ্ধিসঞ্জাত) আর্ট, আর

চিত্র ও সংগীত প্রধানতঃ ফাইন আর্ট। তাই কলাবন্তদের রাগরাগিণীর ধ্যানরূপকে বলা যায় কবি-কল্পনা। হিন্দোল, বিলাবল, কুকুভ, খাম্বাজ, গৌড়ী, বসন্ত, মল্লার বা মল্লারিকা, মেঘ, দীপক প্রভৃতি রাগরাগিণীদের প্রতিমা বা মূর্তি-কল্পনার পিছনে থাকে মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা বা psychological process, যে process psycho-material হলেও তার সার্থক রূপায়ণ spirituality বা আধ্যাত্মিকতার ভাবধারাকে নিয়ে প্রকাশ পায়। সংগীতসাধনার সার্থকতাই হয় সেখানে পূর্ণ, কেবলই বাস্তব-রূপায়ণে নিবদ্ধ থেকে জীবনদর্শনের মর্মকথাকে নিষ্ফল করে না।

রবীন্দ্রসংগীতের তাল ও ছন্দোবৈচিত্র্যের নূতন কথারও উল্লেখ করেছেন বিচক্ষণ গ্রন্থকার। আর উল্লেখ করেছেন সংগীতাখ্য শব্দানুষঙ্গে সুরের তরঙ্গ-প্রহত আবহভূমির কথা। সেজন্য তিনি গীতানুষঙ্গগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ গানের মতো কবিতাকেও বিশিষ্ট সুর-চেতনায় নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিকর্মে, ধ্বনিময় ছন্দ-সৃষ্টিতে, এমনকি অসামান্য ভাষাসৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের সুর-সচেতন প্রতিভা সদা সক্রিয় থেকেছে। কবিতার ছন্দ ও সুরের তাল-লয়, সুর ও ধ্বনিময় শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদির উদাহরণসহ বিশদ ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার সে কথা চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রসদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থকার কবিতায় ও সংগীতে রসের সৌন্দর্য ও আনন্দস্বরূপতার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন—যা শুধুই রবীন্দ্রসংগীতে নয়, ভারতের ও বিশ্বের সকল গানে সুসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ সংগীতে কোনো বাঁধাধরা নিয়মকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, বা গানের রচনায় ও প্রকাশে ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে অচলায়তন সৃষ্টি করতেও বলেন নি। তিনি চিরকালই প্রতিভাধর, অনন্ত প্রতিভার অধিকারী, নব নব উন্মেষশালিনী-বুদ্ধিরূপ প্রতিভাকে তিনি সকল সৃষ্টিকর্মে লাগিয়েছেন। সংগীত প্রকৃতপক্ষে বাঁধাধরা air-tight compartment নয়, এর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অসামান্য। সেজন্য বুদ্ধি ও প্রতিভার অনন্য-অপরূপ-আলোকে সংগীতকে নবনবভাবে সৃষ্টি ও প্রকাশ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন হাজার গানের মধ্যে নূতন নূতন রাগেরও সমাবেশ দেখা যায়। নূতনতার তিনি পূজারী। সেজন্য পুরাতনকে পরিত্যাগ বা

অবহেলা ক'রে নয়, পুরাতনের বুকে নূতন সুষমার আলোকমালার মর্যাদাকে তিনি পরম সমাদরে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' নিবন্ধে বলেছেন—'কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক-শিল্পীর বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ 'এক'কে চরমরূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন।' 'ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে বিচক্ষণ গ্রন্থকার অতি দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সংগীত ও সাহিত্যের সকল কিছু বিষয় বিচার বিশ্লেষণ ক'রে উপস্থাপন করেছেন—যা সত্যই প্রশংসনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে বস্তুনিষ্ঠ, নিয়মিত ও বিজ্ঞান-সম্মত করেছেন। বাংলাছন্দের ইতিহাসে শুধু নয়, বাংলাসাহিত্যে, গীতিকবিতায়, সংগীতে, নাটকে ও গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের দান অনন্য ও অতুলনীয়। সাহিত্যে, সংগীতে ও সকল চিন্তা-ভাবনায় বর্তমান যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলেই আমরা চিহ্নিত করি। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এ-সকল কথা বলার উদ্দেশ্য—তাঁর গীতিকবিতা, সংগীত, সাহিত্য, নাটক বা যে কোনো রচনার বৈশিষ্ট্যকে আমাদের মনে জাগ্রত রাখা।

ডক্টর শ্রীসুধাংশুশেখর শাসমল তাঁর এই বিচিত্র উপাদানপূর্ণ রসান্বিত রচনা 'ধ্বনির শিল্প—রবীন্দ্রসংগীত' সর্বসাধারণের সমাজে উপস্থাপন করেছেন বিষয় ও রূপগত সকল কিছুর আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ, নিদর্শন প্রভৃতির সমাবেশ ক'রে। গ্রন্থকারের গদ্যভাষাভঙ্গি অপূর্ব, শিল্পশ্রী-মণ্ডিত। গ্রন্থকারের চিন্তা ও রচনা মৌলিক, তথ্যসমৃদ্ধ ও রসোত্তীর্ণ। তাঁর এই গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত হবে—এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-৬

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি, ওগো কবি,
আমায় পড়বে আঁকা ;
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা, এই মহিমা
আর রবে না ঢাকা।

স্বগত

সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে

আমার বিশ্বাস, ভারতীয় মনীষীদের সীমাহীন বৈদগ্ধ্য ও মনস্বিতা থেকে যে ধ্বনিরাত্মা-তত্ত্বের উদ্বোধ, তার সার্থকতম ও তাৎপর্যমণ্ডিত প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। কেবলমাত্র ধ্বনির শিল্পের দিব্যমহিমায়, রূপ রস ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর গানগুলি বিশ্বরসচৈতন্যের কাছে অনশ্বর উপাদান হিসেবে গৃহীত ও নন্দিত হয়েছে, হয়েছে শাশ্বতকালের জন্যেও।

আজপর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন-বৈশিষ্ট্য বা তার সাংগীতিক প্রকৃতির গুরুত্ব-দেওয়া ছাড়া তার ভাব-ভাষা-সুর ইত্যাদির নানামুখী অসাধারণত্ব কোথায়—সে বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা হয়নি। এই সীমাবদ্ধ অনুভাবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে বোঝা যাবে, মানুষের প্রকাশ্য ও মগ্ন-চৈতন্যের মর্মমূল থেকে আহৃত ভাব-রস ও আনন্দের যে অলৌকিক মায়ার জগৎ, সেখানে প্রবেশের সহস্র প্রশস্ত পথ ক'রে দিয়েছে কবিগুরুর গান। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেন—"মানুষকে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান তাঁর গান। মানুষকে রবীন্দ্রনাথের দান এত বিচিত্র ব্যাপক প্রচুর ও অমূল্য যে, তার মধ্যে কোন দান যে শ্রেষ্ঠ তা বলা বড় কঠিন। কিন্তু একথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর গানের চেয়ে তাঁর আর কোন দান বড় নয়।" (প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন)।

আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের গতির সঙ্গে প্রাতিস্বিক হ'য়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও বাণী। একদা গ্রাম-গৃহাঙ্গনে স্বদেশিয়ানায় ব্যস্ত পিতার বিচ্ছিন্ন গীতচর্চার কিছু প্রেরণা অবোধ শিশু-মনে সঞ্চারিত হয়েছিল গোপনে—'কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপনকথা শুনিবারে বারে বারে।' আজও

তার অনুরণন সমস্ত সত্তায়। সাহিত্য ও সংগীতের অনেকান্ত বিশেষজ্ঞতা নেই আমার। কিন্তু কবিগুরুর গানের ভাব-ভাষার দূর-সঞ্চারী রস-সংবেদন ও সুরের মর্মভেদী রঞ্জনশক্তি আমার কাছে অমোঘ হ'য়ে উঠেছিল। একসময় গীতিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে গানের শত শত বিস্ময়কর শব্দ ও পংক্তির শ্রেণীগত তালিকা করতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলাম। সেই আত্যন্তিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার কথাই এ গ্রন্থে নানাভাবে বলতে চেয়েছি। বহুপূর্ব থেকে প্রায় অভিপ্রায়হীন অনিয়মে যা জানতে সচেষ্ট ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-অনুমোদনের পর তা নিয়মবদ্ধ সংহত বিষয়সূচীতেই এই পরিক্রমা-করা। আমার বিষয়-ভাবনার সূত্রগুলি সংক্ষেপে বলা যায়—

প্রথমতঃ সকল সাহিত্য-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উপাদান যে গীতিকবিতা, তার থেকেও অধিক বৈশিষ্ট্যে ও মূল্যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-ভাষার নির্মিতি, যার অধিকাংশই যে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা—সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হবার জন্যে ধ্বনিময় পরম ও চরম শব্দ ও বিচিত্র অনুষঙ্গগুলির প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির পর্যালোচনা করেছি। এখানে বিশ্বকাব্যচেতনার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণ লক্ষ্য ক'রে বলতে চেয়েছি—রবীন্দ্রনাথ এক অদ্বিতীয় কবিকুল-অধিরাজ।

দ্বিতীয়তঃ দিব্য সুরলোকের আনন্দরঞ্জকতা মর্মে সঞ্চারিত করে এই গান। ভাবোপযোগী স্বকীয় রীতির সুরসৃষ্টিতে, রাগরাগিণীর প্রয়োগ ও মিশ্রণে, বাণী-সুর-তাল-লয়ের নিবিড় সন্নিপাতে সৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীতকে ভারতীয় মার্গ ও দেশী-লোকায়ত গীতি-ঐতিহ্যের ও প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ আধুনিক পরিণতি হিসেবে গণ্য করা যায়। এখানেও কবিগুরুকে দেখেছি—এক তুলনাহীন গীতিকার ও সুরকার।

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের ত্রিবেণী-রসাবর্তে ধ্বনি ও শব্দশক্তির লীলা প্রকটিত—যাকে অবলম্বন ক'রে কবিগুরুর স্বজ্ঞালব্ধ সেই শব্দ বা নাদব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি করা যায়। বাক্‌প্রতিমা এখানে তিল তিল সৌন্দর্যের তিলোত্তমা। ভাষার মৌলশক্তিতে ও বিচিত্র প্রকরণ-লীলায় যে 'ধ্বনির শিল্প'—তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যথার্থতঃ এক বিস্ময়কর বাক্‌পতি।

চতুর্থতঃ বিচিত্রের দূত সেই রোম্যান্টিক মরমিয়া কবির একান্ত সুর-মনস্কতা, তাঁর সীমাতিশায়ী দুঃখজয়ী ঋষিকল্প চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা ইত্যাদির স্পষ্ট পরিচয় মেলে এখানে। সে-হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতকে আখ্যা দেওয়া যায় 'রবি-রত্নাকর'।

পঞ্চমতঃ একথা স্বীকৃত যে, ভাব ও রূপের অদ্বৈত-সাধনেই প্রকাশ-পূর্ণতা ও ফলশ্রুতি। তা সত্ত্বেও বর্তমানে সাহিত্য-স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ভাব অপেক্ষা রূপ-এর বিচার অগ্রস্বীকৃতি পাচ্ছে। বিষয়ের গভীরে যাওয়া অপেক্ষা রূপের গভীরে যাওয়াই বর্তমানকালে জরুরী হ'য়ে উঠেছে রসজ্ঞের কাছে। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে এভাবে যথেষ্ট সমীক্ষা হয়নি আজও। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এ পর্যন্ত প্রচলিত রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা সাধারণতঃ Content-এর উপর বেশী জোর দিয়ে তার Form-এর দিকে আপেক্ষিক ঔদাসীন্য দেখিয়েছে।" (পরিচায়িকা: রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ)। আমার মনে হয়েছে, ফর্ম বা রূপকে অবলম্বন ক'রে ভাবের ও রসের স্তরান্তরে উত্তীর্ণ হওয়া প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত পন্থা। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতের 'ধ্বনি-শিল্প' অর্থাৎ ধ্বনি-মিল, ছন্দঃস্পন্দন, অনুপ্রাস, উপমা, বাক্‌প্রতিমা, প্রতীক, বিচিত্র বাক্-প্রকরণ ও অনুষঙ্গ নির্ভর ক'রে সামগ্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রসস্বরূপ, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, যেহেতু সুরের অবিচ্ছেদ্য সন্নিপাতে এই কাব্যগীতির নির্মিতি, সেজন্য বাকৃশিল্পের সঙ্গে সুরের প্রয়োগ, সম্পর্ক ও সার্থকতা বোঝার চেষ্টা করেছি। অপিচ, সহৃদয় পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারবেন যে, এ গ্রন্থ কেবল রবীন্দ্রসংগীতের অনুস্মৃতিমাত্র নয়, এ গ্রন্থ মহান রবীন্দ্রপ্রতিভার এক অভিনব তথ্যান্বেষণও।

রূপপ্রকরণগত আলোচনার পাঁচটি পরিচ্ছেদ পূর্বধারায় এবং ভাববিষয়ক প্রসঙ্গের তিনটি পরিচ্ছেদ উত্তরধারায় নিবদ্ধ। এ গ্রন্থের প্রায় চল্লিশটি অনুচ্ছেদে ধ্বনি-শিল্পের রূপ ও প্রযুক্তির অত্যাবশ্যক বিশ্লেষণের সঙ্গে রসতাত্ত্বিক ও নান্দনিক উপায়ের সহায়তা সমানে গৃহীত হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলির প্রাসঙ্গিক ভূমিকা তত্ত্বচিন্তা ও বিষয়-উপস্থাপনায়, শব্দ পদ বিশেষণ উপমা বাক্‌প্রতিমা অনুষঙ্গগুলির বিশ্লেষণে শত শত দৃষ্টান্তসহ এক নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ-পরীক্ষা আছে। রবীন্দ্রবাকৃশিল্প বা ধ্বনিশিল্পের অসীম রূপৈশ্বর্য যে শব্দ বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদিতে পরিস্ফুট—তাদের প্রাকরণিক ছক, সারণী বা কৌণিক ডাইমেনশন্ থেকে যেভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে (দ্রঃ পৃ. ৮৭, ৩৩৭)—তা প্রচলিত ধারণার কাছে অভিনব সন্দেহ নেই। বিদগ্ধ সমালোচকগণ মানবেন যে, সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চা ও রসবিচারের ক্ষেত্রে কোনো অভ্রান্ত বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবী চলে না। নতুন চিন্তা-ভাবনার বাতায়ন খোলা

থাকেই। তাছাড়া কবিগুরুর অতিমানুষিক বিরাট প্রতিভার সীমা স্পর্শ করাও এক দুর্ঘট ব্যাপার। ভক্তি, আবেগ কিংবা বিরূপতার বাধাগুলো সরিয়ে ক'জন পৌঁছতে পেরেছেন অভীপ্সিত লক্ষ্যে ? এ গ্রন্থ রচনার সময় এ-বোধই আমাকে শঙ্কিত পথে চালিত করেছে। এখানে একটি কথা স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, আমার সর্বৈব উপলব্ধি ও কাজের গভীরে কবিগুরুরই ভাব-ভাষার প্রবাহ-বেগ বয়েছে অন্তঃশীলা ধারার মতো। এই অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূলে কিংবা প্রশ্রয়তার মূলেও ছিলেন যিনি, তিনি সেই আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথ। আর একটি কথা, এখানে বিশেষণে সবিশেষ করতে গিয়ে আমার মধ্যেও বিশেষণ-বাতিকতার ছায়া পড়েছে। চেলাগিরিতে চরিত্র বদলায় যদি, তার দায়িত্ব তো গুরুর ওপরে অর্শায়।

আমার নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রচর্চার অতি বিলম্বিত সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রগবেষণার বিরাট অগ্রগতি দেখেছি। প্রাসঙ্গিক সর্ববিধ রচনা অনুধাবন করেছি, গুণিগণের মতামত নিয়েছি, অতঃপর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির সংযোগে এই ব্রত-উদ্‌যাপন-করা। অখণ্ড রবীন্দ্র-অর্চনার অজস্র উপচারের সঙ্গে এ-এক দীন ভক্তের অকিঞ্চিৎ অঞ্জলিমাত্র। এর বেশী দাবী নেই আমার। কতটুকুই বা বলতে পারি ; আমার অনেক না-বলা বাণী নীরব হ'য়ে আছে এ-বইর পাতায় পাতায়। বিশেষভাবে বলবার যে, বিধ্বস্ত গ্রামবাঙলার অতি-বিধ্বস্ত এক পরিবারের কঠিন প্রাতিকূল্যে বিচলিত-ছাত্রজীবনের সময় থেকে একমাত্র প্রেরণারূপে পেয়েছিলাম কবিগুরুর গান। আজও যখন দুঃখ-দুর্ভোগ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে আমাকে, তখনও পরম এক সান্ত্বনা এই গান। এ-গান গাইতে গাইতে কেবলই মনে করি—'তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান, শ্রাবণধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।'

কবিগুরু বলেছিলেন—'এই পার্থিব জীবন ও পৃথিবীর মানুষকে আমি ভালোবেসেছি। এই ভালোবাসা রেখে গেলাম আমার গানের সুরে গেঁথে। মানুষ যদি আমাকে মনে রাখে, তবে এই গান দিয়েই রাখবে।' কবিগুরুর এই নম্র আকাঙ্ক্ষাটুকু ব্যর্থ হবার নয়। আশা করা চলে—অবক্ষয়িত সংস্কৃতি ও জাতীয় নৈতিক-মানের পুনরুন্নয়ন ও চিন্তা-প্রকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মহান মনীষী, তাঁদের কৃত্য ও অবদানের যথাযোগ্য মূল্যায়ণ হবে। এই দুঃসময়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত-কণ্ঠ হয়েও তবু বিশ্বাস ক'রে যাওয়া যায়—একদিন নবজীবনের উজ্জ্বল উত্তরণে আগত-অনাগত প্রজন্মের কাছে কবিগুরুর গান

নিয়ে আসছে এবং নিয়ে আসবে অনেক আশা আশ্বাস ও আনন্দের বৈতালিকী।

নামকরণ প্রসঙ্গ। রচনাটির পরিকল্পনা ও বিষয়-সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বীকৃতি-প্রাপ্ত 'রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণ' (ক. বি. ১৯৭২) নামটি পরিবর্তন ক'রে বর্তমান নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নামের উপযোগী ক'রে পূর্ববর্তী রচনাকে পরিমার্জন-সংযোজন সহ প্রায় নতুন ক'রেই সাজানো। কবিগুরু-কথিত ধ্বনি ও প্রতীকের মুখাপেক্ষী হিসেবে দ্বি-সহস্রাধিক গানের সংখ্যাতীত আশ্চর্য শব্দের তথ্যগত অনুসন্ধান আছে এ গ্রন্থে। বইর সর্বাঙ্গে শত শত শব্দ, পংক্তি ও পংক্তিগুচ্ছের উদ্ধৃতিতে সেই আশ্চর্য পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে—দেখতে পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লাভাষা ও সাহিত্যবিভাগে নবপ্রবর্তিত লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষপত্রের সূচনা-বর্ষের ছাত্র হিসেবে ১৯৬১ সালে পুরুলিয়া সিংভূম অযোধ্যাপাহাড় অঞ্চলে সরেজমিন গবেষণার অভিজ্ঞতা হয়েছিল; দক্ষিণপ্রান্ত বাঙ্‌লার লোকভাষা-সংস্কৃতির তথ্যও সংগৃহীত ছিল অনেক। তা সত্ত্বেও আমার সর্বাধিক অনুরাগ ছিল কবিগুরুর সাহিত্য ও সংগীতের ওপর। কর্ম-জীবনে যোগ দেবার পর কলকাতায় এক সাক্ষাৎকারে পূজনীয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আমার পরিকল্পনার রূপরেখা অনুধাবন ক'রে বিস্মিত হ'য়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়ের অবিকল চিন্তা আমার খসড়ায় ধরা পড়েছে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার চাপে তিনি যা পারেন নি, এক নির্জন ছাত্রকে সে-বিষয়ে প্রাগ্রসর দেখে আনন্দিত হন এবং গবেষণায় উৎসাহিত করেন। লোকান্তরিত প্রিয় আচার্যের স্নেহ ও স্মৃতিটুকু আজও নাড়া দিয়ে যায়। এই রবীন্দ্রচর্চায় লোকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের প্রভূত প্রেরণা ও স্নেহ-শুভাশিস্ পেয়েছি।

দর্শন-সাহিত্য-সংগীত-জগতের দিক্‌পাল গবেষক মনীষী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ডঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ ডি. লিট. মহাশয় বহুপূর্বে এ-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনুধাবন ক'রে পত্রে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এখন একান্ত স্নেহবশতঃই এই দীর্ঘ ভূমিকা ও পরিচিতি রচনা ক'রে দিয়ে আমাকে আশীর্বাদে ধন্য করেছেন। কর্মব্যস্ততা ও বার্ধক্যের বাধা থাকা সত্ত্বেও বইটিকে পুনরায় তন্ন

তন্ন ক'রে পড়তে হয়েছে তাঁকে—এ'কথা সংকোচের সঙ্গে মনে ক'রেই তাঁকে শত প্রণাম নিবেদন করি। এ-গ্রন্থের জন্য সপ্রংশস পত্র দিয়েছিলেন সাহিত্য ও সংগীতের প্রাজ্ঞ গবেষক রবীন্দ্রভারতীর বাংলাবিভাগের রীডার ডঃ অরুণকুমার বসু এম. এ., পি. আর. এস্., পি. এইচ. ডি. (প্রাক্তন প্রধান, বাঙ্‌লা সাহিত্য বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম. এ., বি. এল. (প্রাক্তন ডীন অব্ দি ফ্যাকাল্টি অব্ ফাইন আর্টস্, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)। এ-বই প্রকাশ হওয়া অবধি ডঃ বসুর স্নেহপ্রীতি-স্নিগ্ধ অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি। অধ্যাপক মিত্রের আনুকূল্যে রবীন্দ্রভারতীতে সংগীতের উচ্চতর ঔপপত্তিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতের বিশুদ্ধ গায়কী ও শান্তিনিকেতনী ঘরাণার স্বর-শিক্ষণের জন্য আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্রসংগীতবিভাগের শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া সেনের কাছে। সাহিত্য ও সংগীতের বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বহুপূর্ব থেকেই আমাকে সাহিত্য, সংগীতচর্চা ও গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ মনীষী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রসংগীতবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শান্তিদেব ঘোষ আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতীর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রবীণ অধ্যাপক সুধাংশুশেখর পাণ্ডা, এগরা কলেজের অধ্যক্ষ দুলালচন্দ্র দাস প্রমুখ সকলের প্রীতিশুভৈষণার কথা স্মরণ ক'রে সকলের প্রতি বিনম্র প্রণতি জানাই।

প্রকাশনা-সংযোগে শ্রীসুবোধকুমার গিরি (কাঁথি বীণাপানি লাইব্রেরী), পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতিতে শ্রীমতী কণিকা শাসমল এবং অধ্যাপক নলিনীকান্ত মাইতি, অধ্যাপক শিশির দাস, অধ্যাপক কৃষ্ণানন্দ দে, অধ্যাপক সুশান্ত দাস, অধ্যাপক স্নেহাংশু সরকার, শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী প্রমুখকে সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সদাহাস্যমুখর আনন্দিত দুই শিশু অমর্ত্য ও অরুণিমা ওরফে ঋষি ও চৈতী আমার অনেক ব্যস্ত সময়ের সঙ্গে আমার অনেক আর্ত ও ক্লান্ত সময়ও অপহরণ ক'রে নিয়েছে। এদের প্রতি আমার অনন্ত স্নেহ-শুভাশিস্।

প্রকাশনা-ব্যাপারে ইতস্ততঃ ঘুরতে গিয়ে জেনেছি—ভাগ্যবান হ'লে এ-বই প্রকাশ পেতো ঠিক দশ বছর আগে। যথেষ্ট বিলম্ব ও নৈরাশ্যের মধ্যে এক সাহসী প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটি প্রেসে জমা দিয়েছিলেন। এবং সান্ত্বনার কথা যে,

এক পুণ্য-তিথিতে বইটির প্রকাশ ঘটেছে। এই উপলক্ষে তরুণ প্রকাশক প্রীতিভাজন শ্রীসুধাংশুশেখর দে, তদীয় অগ্রজ শ্রীহিমাংশু দে ও শ্রীপরেশচন্দ্র দে-কে আমার একান্ত ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। মুদ্রাকর শ্রীনিশীথ ঘোষ এবং কর্মীদের প্রতি রইল প্রীতি-শুভেচ্ছা। প্রচণ্ড শ্রম ও সতর্কতা সত্ত্বেও ছাপাখানার ভৌতিক দৌরাত্ম্যগুলোকে সর্বতোভাবে নির্মূল করা যায় নি, ভুক্তভোগীরাই জানেন এর মনস্তাপ কতখানি। বিনীতভাবে একটি শুদ্ধি-নির্দেশ রাখা আছে ৪৩১ পৃষ্ঠায়।

এবার আমার কথাটি ফুরোলো। বিষয়-গবেষণা থেকে আজ অবধি ধ্যানে-জ্ঞানে সেই বিশ্বাত্ম অতি-মানসের অপ্রতিহত প্রভাব থেকে সার কথাটি বুঝতে পাই যে, তাঁর অনুকম্পা ছাড়া কোনো সত্যদর্শন বা শ্রেয়োলাভের উপায়মাত্র নেই। উপনিষদ বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম।' (কঠ ৫২, মণ্ডুক ৫৭)

প্রার্থনা করি : হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ (ঈশ ১৫)
: করো করো অপাবৃত, হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতি মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ। (জন্মদিনে ১৩)

হিরণ্যা,
কাঁথি, মেদিনীপুর

শ্রীসুধাংশুশেখর শাসমল

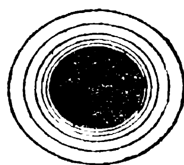
বিষয়-পঞ্জী

(রবীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্‌শিল্প-ধ্বনি-রূপ-রস-নন্দনতত্ত্ব ও সার্বিক বিশ্লেষণ)

● পূর্বধারা (ধ্বনিতত্ত্ব, বাগৈশ্বর্য, উপমা, চিত্রকল্প, ছন্দ, অনুষঙ্গ)



পূর্বধারা



'আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান।
যখনি মানব-কণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।
গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।'

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এলো যবে
প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির শিল্প : বিষয়-প্রবেশক ভূমিকা

এক

সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র

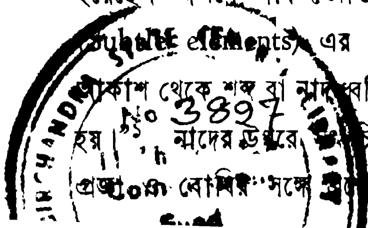
রবীন্দ্রসাহিত্য বাক্‌রূপের দিব্যশক্তিতে উদ্দীপিত। রবীন্দ্রসংগীত শব্দের মায়াপুরী। রবীন্দ্রসংগীতে সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র প্রতিধ্বনিত। এখানে শব্দশক্তির অকল্পনীয় লীলার যাদু ও ঐন্দ্রজালিকতা এবং সুরধ্বনির প্রহত আবহভূমি পাঠক-চিত্তকে অনির্বচনীয় আনন্দে আবিষ্ট করে। কথা ও সুরে সমন্বিত রবীন্দ্রসংগীত কল্পান্তকালবাহী মানব-চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ্য ও রহস্যময় বাতায়নগুলো উন্মোচিত ক'রে দিয়ে এক দিব্য আনন্দময় জগতের বায়ুবেগ এনে দিয়েছে। অন্তঃপাতী রস-স্বরূপের সকল আনন্দ ও সৌন্দর্য নিয়ে তার মহিমান্বিত প্রকাশ। বাংলাসাহিত্য ও বাঙালীর সংগীত ঐতিহ্যের এ এক বিস্ময়কর সংবাদ। আমি এই গ্রন্থে একটি অন্তরঙ্গ অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বারংবার বলতে চেয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার দ্বারা বাংলাসাহিত্য ও ভাষাচর্চার যে অকল্পনীয় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, তার সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যসংগীতে।

ভাষা-প্রকরণের বিশিষ্ট রূপ-শৈলীকে কবিগুরু 'ধ্বনির শিল্প' বলেছেন— 'ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প।' ভাষাতে ধ্বনির যে

বীজমন্ত্র আমাদের আবিষ্ট করে, রবীন্দ্রসংগীতে সেই ভাষণ-শিল্পের সকল মৌল সূক্ষ্মতা ও অনু-শক্তির লীলা প্রকট হ'য়ে উঠেছে। তিল তিল সৌন্দর্যে গড়া সেই আশ্চর্য ভাষা-তিলোত্তমার মোহিনী মায়া ধরা পড়তে পারে প্রকৃত রসজ্ঞের পরিশীলিত বুদ্ধি ও রসবোধের কাছে। কেবল বিমুগ্ধতা নয়, অন্তরঙ্গ রবীন্দ্র-চর্চার দ্বারাই বাঙালী ও বাঙ্‌লা-ভাষীদের মানসিক ক্ষয় ও সংকটের অনেক সমাধান হ'তে পারে, আমাদের বিশ্বাস। দূর ভবিষ্যতের জন্যেও অনেক বিস্ময় ও প্রেরণা নিয়ে অপেক্ষা করছে কবিগুরুর গান।

রবীন্দ্ররচনাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একটা প্রচণ্ড বিস্ময় মনে এসে লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ কি বাক্‌শক্তির সূক্ষ্মতম লীলাটুকু তাঁর স্বজ্ঞায় ধরতে পেরেছিলেন? কিংবা বাগ্‌দেবীর দিব্যস্বরূপ প্রমূর্ত-রূপে কবির চেতনা-চক্ষুতে আভাসিত হয়েছিল? ঋক্‌বেদ বলছেন—কখনো কখনো বাগ্‌দেবী প্রেমময়ী সুসজ্জিতা জায়ার মতো কারও কারও কাছে প্রকটিত হন—'উতো ত্ব অস্মৈ তন্বং বি সস্রে—জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ'। করুণাময়ী বাগ্‌দেবী রবীন্দ্রমানসলোকে প্রকটিত হ'য়ে যেন রবীন্দ্রনাথকে 'বাক্‌পতি'রূপে প্রচারিত করেছিলেন! মনস্তাত্ত্বিক, রসতাত্ত্বিক, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক যে কোন বিষয়সূত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর কার্যকারণ আবিষ্কার করা সম্ভব। দর্শন-সূত্রে একটা কথা স্বতঃই উপস্থাপিত করা যায় যে, পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূল উপাদানের পরিণতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রে যতদূর পৌছোতে পারে, সেই শেষতম স্থানে শব্দশক্তি ব্রহ্ম হ'য়ে বিরাজ করছেন। কবি-প্রতিভা স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানে স্বচ্ছন্দচারী। রবীন্দ্রপ্রতিভা শব্দব্রহ্মের অনুধ্যানে উত্তরণ করেছিল। দর্শনের এই নাদব্রহ্ম তত্ত্বটি রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রসঙ্গে বিচার্য হতে পারে! সাহিত্য, কাব্য ও সংগীতের মৌল প্রেরণাতে আছে শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্মের দিব্য প্রভাব। কবি-প্রতিভার সকল সূক্ষ্ম অভিপ্রায়গুলোর বাহ্যিক প্রকাশ-পরম্পরায় এই নাদতত্ত্বের উন্মীলন লক্ষ্য করেছেন মনীষিগণ।

শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিকভাবে শব্দ ও ধ্বনির অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়েছে। দর্শনে পাঞ্চ-ভৌতিক সত্তার (Gross elements) সঙ্গে পঞ্চ-তন্মাত্র (Subtle elements)-এর সম্পর্ক-সূত্র নিয়ে শব্দ ও ধ্বনির ব্যাখ্যা হয়েছে। আকাশ থেকে শব্দ বা নাদ-ধ্বনির সৃষ্টি। "নাদোৎপত্তি আকাশাগ্নি বায়ু হইতে হয়।"[1] নাদের উপরে [illegible]-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। মানবের প্রজ্ঞা ও বোধির সঙ্গে [illegible]র সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে শব্দ ও ধ্বনি। শব্দ ও



ধ্বনির সে হলো অলৌকিক এক শক্তি। নাদধ্বনির ও সামগানের সুরের প্রভাব বেদ-অপহরণকারী অসুরদেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটাতে পেরেছিল। মহাভারতের আদিপর্বে ঋষি বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে এই উপাখ্যানের দ্বারা জগৎ চরাচর-ব্যাপ্ত ধ্বনির তত্ত্ব ও ধ্বনির শক্তির কথা বোঝালেন। ব্যক্ত-অব্যক্ত শব্দ বা স্ফোট জগৎ-প্রপঞ্চের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রক এবং নিখিল জগতের মৌল উপাদান-ও বটে। শব্দময় জগৎ, ধ্বনিময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এ তত্ত্বটি অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মীশক্তি সরস্বতীর পূজোয় শব্দকে স্ফূট করবার জন্য ফুটকড়াই অর্পণের বিধি আছে। দর্শনে শব্দ বা স্পন্দ-শক্তিকে কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে। মানবদেহের গুহ্যদেশ থেকে দু'আঙ্গুল ওপরে লিঙ্গমূল থেকে দু' আঙ্গুল নীচে চার আঙ্গুল বিস্তৃত ক'রে ব্রহ্ম গ্রন্থী বা মূলাধারে সহস্রার শতদল অবস্থিত। এখানে ইড়া ও পিঙ্গলা দুই সূক্ষ্ম নাড়ী সংযুক্ত, এদের মাঝখানে সুষুম্না। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে পৌঁছে দেবার জন্য কুম্ভক করতে হয়। শাস্ত্রে প্রাণায়ামাদি যৌগিক প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে এজন্য। ব্রহ্মগ্রন্থীতে অবস্থিত নাদরূপ কুণ্ডলিনী-শক্তি উত্তপ্ত অপান বায়ু দ্বারা বিক্ষোভিত হ'য়ে চক্রে চক্রে ঊর্ধ্বগামী হ'য়ে অবশেষে কণ্ঠে শব্দ বা স্বর-রূপে প্রকাশ পায়। মন্দ্র-মধ্য-তার এই তিন গ্রামে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বর ও বাইশ শ্রুতির মাধ্যমে সেই ব্রহ্মশক্তিই সংগীত হয়ে প্রকাশ পায়।[২] শাস্ত্রকারগণ উৎপত্তিস্থান ভেদে শব্দের চার নাম দিয়েছেন—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। নিম্নে মূলাধার চক্রে বায়ু দ্বারা পরা নামে সূক্ষ্ম ধ্বনি সৃষ্টি হয়, নাভিতে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমার উৎপত্তি, মুখ থেকে বৈখরী। মানবকণ্ঠে এই বৈখরী-ই ভাষা রূপে সৃষ্টি পেয়েছে। এই ভাষার ধ্বনিতেই মানস-চৈতন্যের পরিপ্রকাশ। অনির্বচনীয়, অতীন্দ্রিয় রূপ নেয় শব্দ-ধ্বনির শিল্পে—যাকে আমরা বলছি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি।

দেহ এই সব শক্তির আধার। দার্শনিক গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন—"সমস্ত জড় ও জীবজগতের সমষ্টিসত্বা ঘনীভূত হইয়া মানব দেহ রচিত হয়। মনের ও অহংভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহে হইয়া থাকে।"[৩] বৈখরী-শব্দশক্তির অর্থাৎ বাক্‌-এর প্রকাশ অনেকটা দেহ-উপাদান-নির্ভর। অনাহত হৃদয়-চক্র থেকে অনাহত-নাদ সৃষ্টি-মুখী তীব্রবেগ নিলেই মন ও বায়ু

ঊর্ধ্বায়িত হয়। "মন ও বায়ুর গতি যখন কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া বাগ্‌যন্ত্রকে স্পর্শ করে তখন উচ্চারণ স্থানে বায়ুর আঘাত বশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং বর্ণ, বর্ণমূলক পদ, বাক্যাদি যাবতীয় ভাষা কণ্ঠ হইতে অভিব্যক্ত হয়।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ ভাষাসূচনার জন্মজন্মান্তরের গতির কথা উল্লেখ করেছেন—'আমরা যে এই ধরণীর নিশ্বসিত পবনের আদিমধ্বনির জন্মেছি সন্তান'। প্রাণ সঞ্চারিত মানুষের কণ্ঠে যে ধ্বনি, শিশু অস্তিত্বের প্রথম যে কাকলি, গিরিশীর্ষে ঘন শ্রাবণের উন্মত্ত বর্ষণের যে শব্দ-স্বনন সে সবই হ'ল ভাষার আদিম রূপ। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন—সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র। এই মন্ত্রই নাদ-ব্রহ্ম। সৃষ্টি-স্থিতির, জন্ম-বিলয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে গঠন করেছে 'নাদাত্মকং জগৎ'।

তত্ত্ব ও দর্শন-শাস্ত্রের নাদস্বরূপ-ব্যাখ্যা কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতের প্রসঙ্গে আবশ্যিকভাবে ধরেছেন সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সংগীতজ্ঞ মনীষিগণ। গীত চন্দ্রোদয়ে উল্লিখিত হয়েছে—

নাদ বিনা গীত নহে নাদ সর্বমূল, দেখহ শাস্ত্রেতে নাহি নাদ সমতুল।

তথাহি আগ্নেয়ে—: ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ
নাদরূপং পরং জ্যোতিঃ নাদরূপী স্বয়ং হরি ॥[৫]

দর্শনে বৈখরী-রূপে ভাষা ও শব্দের সৃষ্টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা যুক্তিসিদ্ধ। দেহতত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষা থেকেও সেই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। এঁদের পরীক্ষা প্রমাণ করছে,—স্বরোৎপাদক সূক্ষ্মতন্তু বহির্গামী বায়ু-প্রবাহ দ্বারা আহত ও কম্পিত হয়ে ধ্বনি উৎপাদন করে। "It has been proved by observations on living subjects, by means of the laryngoscape, as well as by experiments on the larynx taken from the dead body, that the sound of the human voice is the result of interior laryngeal ligaments, or true vocal cords which bound the glottis, being thrown into vibration by currents of expired air impelled over their edges." (Hand book of phisiology : William Senhouse Kirkes MD)[৬]

মানব-বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ ও সক্রিয়তার ফল হলো ধ্বনি, এবং সেই ধ্বনি শ্রুতিযন্ত্রে প্রহত ও আভাসিত হচ্ছে। উচ্চারিত বা কৃত কোন শব্দধ্বনির

নিয়মবদ্ধ ভাইব্রেশন আছে, যা প্রজ্ঞাদ্যোতক। ব্রিটানিকায় শব্দ বা সাউণ্ডের যে ব্যাখ্যা আছে : "Sound, subjectively the sense of impression of the organ of hearing ; and objectively the vibratory motion which produces the sensation of sound."[৭]

সংগীত, কাব্য, নাট্য-সংলাপ ইত্যাদি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ভাইব্রেশন বা তরঙ্গ-ধ্বনি কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রহৃত হচ্ছে, তারপর সূক্ষ্ম অর্থধ্বনিতে তার পরিণতি ; এবং সেটাই হলো বোধি বা প্রজ্ঞান। অর্থহীন শব্দ-সৃষ্টির কোন আবেদন হৃদয়ে বা জ্ঞানে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। সাহিত্যে ও কাব্যে শব্দ-ধ্বনি ও অর্থধ্বনির মরফিমবাদ বিশেষভাবে স্বীকৃত। সংগীতেও এই মরফিম ছাড়া যে সূক্ষ্ম উপাদান সংযুক্ত, সে হলো স্বর ও স্বরের তান। শব্দ-ধ্বনি নিয়েই সাহিত্য ও সংগীতের কার্যকরতা। শব্দ ও অর্থের ধ্বনি বিবিধ রূপ-পরম্পরায় শিল্পত্ব লাভ করেছে সহৃদয়সংবাদী ও রসজ্ঞের হৃদয়ে মনে, যেখানে নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও রসতাত্ত্বিক কৌশলে ধ্বনি হয়ে উঠছে রসের ব্যঞ্জনা। এই রসের অভিব্যক্তিতেও সেই ধ্বনির শিল্পের অনিবার্যতা।

মানব-চিন্তা ও চিত্তের বায়ুভূ'ত নিরালম্ব উপাদানগুলোকে কিংবা অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অরূপ উপলব্ধিগুলোকে কবি শব্দ-শক্তির মাধ্যমে ও বাচিক উপায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন। ভাবের অ্যাব্‌স্ট্রাকশন-কে ভাবের মূর্তরূপে ধরার ও ভাবকে বাক্‌প্রকরণে ধরে দেবার লোকোত্তর ক্ষমতা কবিরই আছে। কাব্যে প্রযুক্ত শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার মন্তব্য করেছেন,

"কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশের চাবিকাঠি শব্দের হাতে, ও এই শব্দের প্রসাদ অর্জন না করলে কারও প্রবেশাধিকার নেই। শব্দের মধ্যেই অন্যসমস্ত উপাদানের বিক্ষিপ্ত শক্তি সংহত হয়ে একটা শক্তি-কেন্দ্র রচিত হয়, এবং এখান থেকেই কবিতার পূর্ণমূল্য উপলব্ধির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কবির হাতে শব্দই যেমন প্রধান অস্ত্র, পাঠকের বোধ-শক্তি উদ্দীপনে শব্দও তেমনি মুখ্য সহায়ক। শব্দের সংকেত অনুসরণে কবি প্রেরণার অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন, তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মানস-পুনরাবৃত্তিই কাব্যের রসাস্বাদনের একমাত্র উপায়। সুতরাং লেখকও প্রকারান্তরে শব্দের শব্দ-ব্রহ্মত্ব স্বীকার করে নিলেন।"[৮] কাব্য-রসাস্বাদনে শব্দ-শক্তির অনিবার্য দায়িত্ব ব্যাপারটিকে ব্রাড্‌লে বোধ করি বলেছেন 'an atmosphere of infinite suggestion'। কাব্য ও সংগীতে

অর্থ ও ধ্বনি বিশেষিত ও সম্ভাবিত করবে—শব্দের আস্বাদ, শব্দের ধ্বনি, শব্দের স্পর্শ, শব্দের গন্ধ, শব্দের রূপ। এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থাগুলো কাব্যে বা সংগীতে সর্বপ্রকারেই এক অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় সাজেশন্ এনে দিচ্ছে ব'লে কবির প্রতিভা এত সূক্ষ্ম হয়েও উপলব্ধি-গম্য। রবীন্দ্রসংগীতের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল বিভূতি, অর্থধ্বনির সূক্ষ্ম উল্লাস, তাছাড়া সংগীতে আরোপিত সুরের বিস্ময়কর অন্তর্গুঞ্জন,—সব মিলিয়ে সে এক অলৌকিক মায়ার জগৎ।

দর্শনের স্ফোটবাদ, শব্দ-ব্রহ্ম ইত্যাদি পর্যালোচনা ক'রে রবীন্দ্র কবি-স্বরূপের সূক্ষ্ম লূতাতন্তুর মূল টানা যায়। আশ্চর্য প্রতিভার অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া-পরম্পরার মূল খুঁজতে গেলে শব্দের চাবিকাঠি সর্বাগ্রে অধিগত করতে হবে।

কাব্যের থেকে সংগীতের ভাবের ও সুরের অ্যাবষ্ট্রাকশন্ ভিন্নরূপ। সংগীতের বিকাশ হয় চরমে। শাস্ত্রীয় ও মার্গসংগীত, পরবর্তীকালের খ্যাল, ঠুংরি ইত্যাদি এবং বাদ্যযন্ত্রের রাগরাগিণীর সুরে সেই অনির্বচনীয় রসস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের একান্ত বিলাস ও সুরসর্বস্বতা নেই; আছে সুরসম্পৃক্ত অর্থময় বাণীর সূক্ষ্ম আবহপট, বিশাল বিমোহন ভাষণ-রূপ ও রূপের লাবণ্য। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে সেই শব্দশক্তির প্রধান অস্তিত্ব ও একান্ত-প্রকরণ বিস্ময়ের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়। রবীন্দ্র-সংগীতের শব্দগুলোকে তন্নিষ্ঠ রসিকচিত্ত কি নাদরূপে উপলব্ধি করবেন? যোগাচার-সিদ্ধ যোগী দেহবদ্ধ সহস্রার কুণ্ডলিনীকে জাগাতে চাইলে, তিনি তা পারেন। শব্দ বা নাদরূপ কুণ্ডলিনীকে মন ও অপান-বায়ুর দ্বারা বিক্ষোভিত ক'রে উর্ধ্বে নিয়ে কণ্ঠে স্বর ও বাক্‌রূপে প্রকাশ করে দিতে পারেন যিনি, তিনি যোগী। তাহলে রবীন্দ্রনাথের বাক্‌সাধনাকে কি যোগ-সাধনার তাৎপর্যে ভাবতে পারা যায়? ভারতের সাধক, ঋষি ও মনীষিগণ বিশ্ববিধান ও আত্মস্বরূপের সমস্ত অবস্থা ও বিকাশকে নানাভাবে আত্তীকরণ করেছিলেন। ভারতের অধ্যাত্মরাজ্যের ঋষিগণ, রসসাহিত্যের কবিগণ, সংগীতললিত শিল্পের শিল্পী ও কলাবন্তগণ যে যুগবাহী ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাধনা ও মূল্যবোধের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, বিংশশতাব্দীতে বোধ করি, তারা নূতনছন্দে ও সমগ্রতার বেগবান ধারায় এসে মিলে গেছে রবীন্দ্রপ্রতিভার মহাসমুদ্রে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র সেই আত্মিক সাধন-সৌকর্যের নিখুঁত প্রকাশ দেখতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিচারে একথাটা স্বতঃই মনে আসতে বাধ্য যে, এত বিপুল সংখ্যক কাব্য-সংগীত রচনা করতে গিয়ে কবি যে

সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তার পশ্চাতে এক মহান ঐতিহ্যের সংক্রমণ থাকা সম্ভব। ব্যক্তিস্বজ্ঞায় ঐতিহ্যের অনিবার্য প্রেরণার কথাটি এলিয়ট যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, তাকে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ বিচারে একটি উপায় হিসেবে মান্য করতে বাধা নেই, তবে রবীন্দ্রনাথ যে সৃষ্টি-ছাড়া প্রতিভাকে সঙ্গে পেয়েছিলেন, —তার সন্ধান পাওয়ার চেষ্টাই বিড়ম্বনা মাত্র; রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণে সেই স্বর্গীয় রত্ন-ভাণ্ডারের কাছে দাঁড়িয়ে একথা সকলেরই মনে আসা স্বাভাবিক ব'লে আমার মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও পদবন্ধে বিস্ময়কর প্রতিভানের স্পর্শ দেখা যাবে; যেন সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্রে উদ্দীপিত সেই ভাষাপ্রকরণ। ওয়ালটার পেটার কাব্যের চরমসিদ্ধিতে শব্দবিশেষের (Unique word) প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ধরেছেন। রবীন্দ্রসংগীতে সেই চরম শব্দ (Unique word) গুলো যথাযোগ্য আভিজাত্য-গর্বে উপস্থিত। সামান্য কিছু ব্রাত্য বা অবাঞ্ছিত যেগুলো উপস্থিত, তা নজরে পড়ে না। শব্দ ও নাদশক্তির অন্তর্লীন কোন কোন প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতভাবে কাজ করেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মমার্গে নির্বচন ব্রহ্ম-স্বরূপকে যেমন মাত্র একটি প্রণবধ্বনিতে (ওঁ/ওম্‌) কিংবা বীজমন্ত্রের দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশের নামকীর্তন ও নামজপের বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়া আজ বিশ্বে স্বীকৃত। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর গ্রন্থে (Bengal Vaishnabism) নামকীর্তনের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ও সিদ্ধির মূল্য ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'রক্ত বীণার ছন্দে আমার দেহবীণার তার, বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝংকার।' বাংলার কীর্তন গানের একটি সহজতম অথচ চরমতম প্রাকৃত রূপ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ইত্যাদি" এই ধুয়োতেই সুসিদ্ধ ও সম্পূর্ণ। কাজেই যুগসংস্কার হোক বা কবি-প্রতিভার নিজস্ব ক্ষমতাই হোক, রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌রূপে এক পরম সাধকের সহজ যোগসিদ্ধি ও আনন্দোপলব্ধি সহজেই ধরা পড়েছে। বাণীর রূপৈশ্বর্যে ও জ্যোতির অন্তরালে যে সুরস্পন্দন আছে তা শ্রোতাকে উচ্চ ভাবনায় উন্নীত করে। সংগীত শ্রবণে ভক্তের আত্মোন্নতি হয়, যা ব্রহ্ম লাভের সহায়ক। শ্রুতি বলেন—আত্মলাভান্ন পরংবিদ্যতে। সংগীত সেজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত-কলা। শোপেনহাওয়ার বলেন—সংগীতের ওপরে আর বড় কিছু নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত-কলা এবং যাঁহারা উহা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা। ঈশ্বরকে স্মৃতি-পথে রাখিবার

জন্য অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ-সংগীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলিতেছেন,—নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু চ,
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"[৯]

সংগীতকে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়ায় কোন বিতর্ক নেই। অনির্বচন রাগরাগিণীর স্বরের রচনা যেমন সাধনা-সাপেক্ষ, তেমনি আধুনিক বাচ্যনির্ভর কাব্য-সংগীত রচনা করাও কতবড় সাধনা-সাপেক্ষ রবীন্দ্রসংগীতের বিস্ময়াবহ বাক্-প্রকরণ লীলার ও ধ্বনি-শিল্পের বিশ্লেষণে অগ্রসর হ'তে গিয়ে আমরা তা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে পারি।

দুই

ভাষার স্বর নিয়ে যে ধ্বনির শিল্প, রূপ-সৃষ্টির অনিবার্য উপাদান যে শব্দ-ধ্বনি, —তার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে গেলে বাগ্‌রূপের অনন্ত বিভূতি আমাদের কাছে প্রকট হ'য়ে উঠবে। এই গ্রন্থে ভাষারূপের সেই প্রত্যয়গত অনুসন্ধান আছে। কেন এই বাগ্‌রূপের বিশ্লেষণ? আগেই বলেছি, বাক্-এর মাধ্যম এনে দিয়েছে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'কে। বাক্ ও অর্থের মিলনে, উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতে, কিংবা বলা যায়, ভাব ও রূপের সন্নিপাতে রসস্বরূপ অভিব্যক্ত। ভারতীয় আলংকারিকগণের মধ্যে অভিনবগুপ্ত, কুন্তক, জগন্নাথ প্রভৃতি এবং আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ, ব্রাড্‌লে, ওয়াড্‌স্বার্থ প্রভৃতি এই ভাব ও রূপের সম্মিলনে কাব্যাত্মা বিচারে বিশ্বাসী। আধুনিক কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এলিয়ট প্রমুখ বস্তুবাদী সমালোচকগণ কাব্যের আঙ্গিক-প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের ও বাক্‌রূপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁরা বিশ্বাস করেন, ভাব (Content) অপেক্ষা রূপ (Form) বিশ্লেষণে কাব্যের মর্মকেন্দ্র উন্মোচিত হতে পারে। ধ্বনি, ধ্বনিমিল, অনুপ্রাস, উপমা, চিত্রকল্প, ছন্দ প্রভৃতি ভাষণ-প্রকরণই হলো রূপ বা ফর্ম। রবীন্দ্র-কাব্যসংগীতে সেই বাগ্‌রূপের লীলা সহৃদয় রসিকের কাছে প্রকট হয়েছে। সুরসম্পর্ক ছাড়া কেবলমাত্র গীতিকবিতা হিসেবেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রযোজনা ও প্রকরণ বুঝতে পারলেও কৃতার্থ হওয়া যায়।

জনৈক সমালোচক বলছেন—"শব্দ-ব্রহ্ম কথাটি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য, তেমনটি আর কিছুর সম্পর্কে সত্য কিনা জানি না। একটি গীতিকবিতার শব্দ পাঠককে কি দিতে পারে? দিতে পারে ছন্দ, চিত্রকল্প,

অনুভূতি, তত্ত্বচিন্তা, বিচিত্র অনুষঙ্গ, এবং আরও অনেক কিছু।......কবিতাটি যতই এগোতে থাকে, ততই এরা আলোকিত হয়ে ওঠে, পাঠক সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিচিত্র বিচ্ছুরণ, জটিল অথচ নিটোল এবং সজীব একটি মুহূর্তকে পান। কবি যেমন ঐ শব্দগুলিকে পান, তেমনি পাঠককেও ঠিক সেই শব্দ সেই বিশিষ্ট শব্দগুলিকেই চোখের সামনে রাখতে হবে। শব্দগুলিই কবিতার ভাব, এই শব্দগুলিই কবিতার রূপ, শব্দ ব্রহ্ম, শব্দই সৃষ্টি।"[১০] কাব্য সম্পর্কিত শব্দের আধার ও সামর্থ্যশক্তির মূল্য এভাবে স্বীকার করার যুক্তি হলো রসকেও পরোক্ষে স্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথও "সাহিত্যের আসরে রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব"[১১] বলে স্বীকার করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত শব্দকে ব্যাপক অর্থে 'প্রকাশ-রূপতা'[১২] আখ্যা দিলেন। পাশ্চাত্য মনীষী ব্রাড্‌লে কাব্যের ফর্মকে ব্যাপক অর্থে বলেছেন 'এক্‌স্‌প্রেশন'।[১৩] তবে কাব্যরূপের স্পষ্ট স্বীকৃতি এতে ধরা পড়ে না, যেমন ধরে দিয়েছেন এলিয়ট, অ্যাবারক্রম্বি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমালোচকগণ।

কবিতার ভাব ও রূপ (Content & Form) সম্পর্কিত আলোচনার শেষ নেই। আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে কবিতার আত্মরসের সঙ্গে তার ভাষাকে 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' বলা হয়েছে। মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—"যদিও বিশ্লেষণ-বুদ্ধির কাছে তাদের রচনাভঙ্গি ও অলংকার প্রয়োগের কৌশল নিরূপণ দুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান কবির রসসমাহিত চিত্ত থেকে তারা ভিড় করে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসে।"[১৪]

কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি বহিরঙ্গ উপাদানগুলো আবশ্যিক উপায় হিসেবে কাব্যের উদ্দেশ্য অর্থাৎ রসস্বরূপকে সৃষ্টি করে না,—"রসই নিজেকে মূর্ত করে তোলার আবেগে কাব্যের এই সব অঙ্গের সৃষ্টি করে।"[১৫] ধ্বন্যালোক বলছেন—তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ। ভারতীয় রসবাদের এই চিন্তা যথেষ্ট মন্ময় ও দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ; আধুনিক কালের বস্তুময় চিন্তার সঙ্গে তার প্রচণ্ড গরমিল আছে মনে করার কারণ নেই। মনীষী কুন্তক বক্রোক্তি-জীবিতবাদে বাক্‌রূপশৈলীকে সাহিত্যস্বরূপ বিচারের প্রধান প্রকরণ ব'লে ধরেছিলেন। তাঁর বক্রোক্তি হলো বৈদগ্ধ্যভঙ্গি এবং "বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্ম কৌশলম্‌"; অর্থাৎ কুন্তকের মতে বর্ণে, পদে, বাক্যবিন্যাসে ও প্রকরণশৈলীতে রস বক্রতারই প্রকার-ভেদ হয়ে দেখা দেয়। 'রসগঙ্গাধর'-এ সুকবি জগন্নাথও রমনীয়ার্থ-প্রতিপাদক শব্দ ব'লে এই বাক্‌প্রকরণের মূল্য

স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কুন্তকের মৌলিক ও সুগভীর মনন-দর্শন সম্পৃক্ত আলোচনাকে 'পুষ্পফল সমন্বিত বৃক্ষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন[১৬]। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কুন্তকের উক্তিকে বিশদ ক'রে তুলে ধরেছেন, তা উদ্ধৃত করি,—

"কুন্তক বলেন যে, অর্থ না বুঝিলেও সাধুকাব্যের শব্দবিন্যাসেরই এমন মাহাত্ম্য আছে, এমন সৌন্দর্য আছে যে, তাহা পড়া-মাত্রই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসের ন্যায় হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করে। তাহার অর্থবোধ হইলে তাহার পদ বা বাক্যের অর্থ ছাড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে পানকরসের আস্বাদের ন্যায় এমন একটি আস্বাদ নির্ঝরিত হইয়া উঠে, যাহা দেহের মধ্যে প্রাণের ন্যায় সমস্ত কাব্যশরীরকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে।"[১৭] আমাদের আলোচনা থেকে এই বিশ্বাস গড়ে তোলা যায় যে, কাব্যসত্য আবিষ্কারে রূপ বা রসতত্ত্ব নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে রকম আলোচনাই হোক না কেন, তাদের একটা সূক্ষ্ম সংযোগ-সাদৃশ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে এসে গেছে। এবং আধুনিক বাক্রূপপ্রকরণ-বাদীদের গুরুত্ব স্বীকার করতে গিয়ে এই রসবাদীদেরও একাসনে বসিয়ে বোঝবার প্রয়োজন আছে। এলিয়ট, কোলরিজ, মালার্মে, পল ভ্যালেরি প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা বাক্রূপকে মৌলস্বরূপ ধরেছেন; "কোলরিজ আবার ভজিয়ে ছিলেন যে কবিতা শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস।"[১৮] মালার্মে, ভ্যালেরি প্রমুখ কবিগণ শব্দকেই মৌল সংগীতধর্ম বলে চালিয়েছেন দীর্ঘকাল, এবং দাপটের সঙ্গে বহু অনুগামীদের ওপরও।

আলোচ্য মতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের বাক্-শিল্পের গুরুত্ব ও প্রকরণশৈলীর মূল্যায়ন করা চলে। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমন্বয় ও সমগ্রতাবাদের অনুবর্তী। ভারতীয় মনীষী অভিনব গুপ্ত, আনন্দ-বর্ধন এবং পাশ্চাত্যের ব্রাড্লে, ওয়াড্স্বার্থ প্রমুখ মনীষিগণ ভাব ও রূপের সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্র-কবিস্বরূপের একটি মৌল সূত্র হিসেবে সীমা-অসীম-চিন্তাতত্ত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত; রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সূত্র নির্ধারণ করে গেছেন। এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। (আবর্তন : উৎসর্গ)

মহনীয় ভাবস্বরূপকে বাক্‌প্রকরণ দিয়ে ধরতে পারার সম্ভাবনাগুলো আমরা আলোচনা করেছি এই বোঝাতে যে, রবীন্দ্রসৃষ্টিকে কণামাত্রে বিভাজন ক'রেও এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচকগণ ব্যাপক কালানুক্রমিক ও ভাবপরিণতি-মূলক (দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ)—এই দ্বিবিধ পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন বিস্ময়কর প্রাচুর্যে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষাগত উপায় ও উপাদান-প্রকরণকে অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রকাব্যশিল্পরূপের লয়বিলয়ের লীলা বেশী কেউ দেখলেন না।[১৯] আমাদের এই প্রয়াস প্রধানতঃ কাব্যশিল্প-রূপকেন্দ্রিক, কিংবা বলা যায়, রূপকে দিয়ে রূপাতীতকে ধরার শৈলী। আমার বিশ্বাস, 'শ্রেষ্ঠ রচনার শ্রেষ্ঠ শব্দবিন্যাস' কথাটিতে কোলরিজ কেবলমাত্র আভিধানিক নিয়মে তাঁর বক্তব্য প্রচার করেননি, শব্দপ্রকরণকে অতিমানুষিক শ্রেয়োলাভের উপায় নির্দেশেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট; কেন না তিনি কেবলমাত্র সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিও।

রবীন্দ্রবাক্‌শিল্প সম্পর্কেও এই কথা। ভাব ও রূপ অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ কাউকে বাদ দিয়ে এগোনো যায় না। একটাকে ধরলে অন্যটিরও আবির্ভাব হয়—'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'। রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্পর্কে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আরও বলেছেন—"তাঁর রচনাবলী প্রায়ই ভাবগৌরবে আশ্চর্য রকমের গরিষ্ঠ বটে, কিন্তু তাতে প্রসঙ্গ আর প্রকরণ এমনই অন্যোন্য-নির্ভর যে একের পৃথক্করণে উভয়েরই সমান ক্ষতি।"[২০] শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ভাব ও রূপের সমানুপাত সম্পর্কে এরূপ মতের বিশ্বাসী। তিনি বলেন—"সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর-আত্মা, যেমন রূপ তেমনি ভাব! বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিল ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল।"[২১]

ভাব ও রূপের এই অদ্বয়বাদকে রবীন্দ্রনাথ আরও অধিক গুরুত্বে সর্বত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এসব মতানুসরণেই আমরা রবীন্দ্রসংগীতের বাগ্‌রূপের প্রয়োগ-শৈলী নিয়ে পর্যালোচন করতে অগ্রসর হতে পেরেছি। বর্ণ, শব্দ, পদবিন্যাস ও প্রকরণ-বক্রতা দিয়ে নির্মিত রবীন্দ্রগীতিকাব্য ও কাব্যসংগীতের এমন সীমাহীন বিভূতি ও সৌন্দর্যকে সহজে কুড়িয়ে ধরা যায় না; এমনই রূপের প্লাবনের বেগ।

এই রূপশৈলীর বিকাশ কত সূক্ষ্ম কবিচেতনা থেকে সম্ভব হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথের কোন উল্লেখযোগ্য গানের ভাষং-প্রকরণকে বিশ্লিষ্ট ক'রে

দেখলেই তা সহজে বোঝা যায়। বাগ্‌রূপের বহিরঙ্গ প্রযুক্তি কিংবা ছন্দতান ইত্যাদি সব মিলিয়ে কেবলই চরম শব্দের অথবা Unique word-এর আবির্ভাবকে স্পষ্টীভূত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বোধকরি যতটা নিখুঁত বাক্‌প্রকরণ ছিল, তাঁর সংগীতে কথা ও সুরের নিবিড় সন্নিপাত থেকে বাক্‌শিল্পের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য গ'ড়ে উঠেছিল অনেক বেশী। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষুদ্র অবয়বে সামান্য কয়েকটি শব্দের ভেতর দিয়ে অনির্বচনীয় রসজগতের সব গোপন তত্ত্বগুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[২২] রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় দিব্যলোকের মায়াকুহক ঝরে ঝরে পড়েছে। অ্যাবারক্রম্বি মহৎ বাগ্‌রূপের যাদুকরী মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'Magic incantation' কথাটির মধ্যে। রবীন্দ্রসংগীতে সেই শব্দশক্তির ঐন্দ্রজালিকতা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে দেখতে হয়। যদি কেউ রবীন্দ্রসংগীতের সুর না জানেন, তাঁকেও বাণীর ধারা এসে স্পর্শ করবে। শব্দের ধ্বনি, সুরের অন্তর্গুঞ্জন ও সুরের মন্ত্রশক্তি আছে সেই বাগ্‌রূপে। ধূর্জটিপ্রসাদ এ সম্পর্কে বলেছেন— "but in reality it (Tagore's Music) was more dependent in words than on music itself, verbal rhythm was more varied than sound rhythm and verbal texture got the better of sound texture."[২৩]

রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতাকে প্রকরণ-বৈচিত্রী বাণীভঙ্গিমায় বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। এই কথাগুলো মনে রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের বাক্‌প্রকরণ ও ভাষণশিল্পকে বিশ্লেষণ করেছি। এই কাজে স্বতঃই তাঁর প্রকাণ্ড ব্যক্তিস্বরূপকে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নির্বাধ সম্মিলনকে ঠেকানো যায় নি ব'লে আমাদের বাক্-ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে ভাব-প্রকরণ, হয়ে উঠেছে ভাব-বিশ্লেষণ। এরকম কাজ অনেক বেশী দুষ্কর ব'লে মনীষিগণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, সে সব উক্তিগুলিও চারপাশে ভিড় করে আছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ বলেন—"রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা এক অভিনব ভাষা, তার আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা, এবং তদ্‌ব্যতিরেকে তাঁকে বুঝতে চাওয়া মরুচারীকে নৌবিদ্যা শেখানোর চেয়েও হাস্যকর।"[২৪] কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃতি, প্রেরণা, রূপ, ও স্বীকরণ-শক্তি ইত্যাদির সমালোচনা-ব্রতীকে যেমনটি ভেবেছেন—"তাঁহাকে যেমন খাঁটি সাহিত্যরসিক হইতে হইবে, অর্থাৎ ভাষার বাণীমন্ত্রবিৎ হইতে হইবে, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত,

মধ্যযুগের বাংলা ও আধুনিক পাশ্চাত্য, বিশেষ করিয়া ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে পদ্মলগ্নভ্রমরের মতো প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে।"[২৫]

মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদের উক্তি—"বিশুদ্ধ কবিতা যেমন সুরের স্পর্শে অশুদ্ধ; বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনাও তাই। যদি রবীন্দ্রনাথের সুরবিন্যাস রীতি, সুর, অর্থাৎ স্বর, ধ্বনি, তান, মান লয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকে তবে রবীন্দ্র-কবিতার বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনা অসার্থক হয়।"[২৬] রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ আরও বলেন—"রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে কথা সুর ও ভাব সমন্বয়ের যৎসামান্য বিচার হয়েছে। কিন্তু কবিতার উপরই বেশী জোর পড়েছে। আমার বিশ্বাস এ ধরনের বিচারই অসম্পূর্ণ, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবিন্যাসে যে প্রতিরূপ (Image) ও প্রতীক (symbol) সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সেই সংগীতের কথাকৃত ও ছন্দকৃত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সন্ধান দেখানো হয়নি, দু'য়ের মধ্যেকার যোগ স্থাপিত হয়নি।"[২৭]

ভাবীকালের রবীন্দ্রসমালোচকগণ এইসব মনীষিগণের নির্দেশ মান্য করলে বোধকরি এতদিনের বিচার-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার অসার্থকতার কিংবা নির্বাধ ঔদাসীন্যের অপরাধ নিরসন করতে পারবেন। রবীন্দ্রসংগীতের রূপপ্রকরণ নিয়ে আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছি এবং সুরের প্রকৃতি ও তত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের মৌল বিশিষ্টতা নির্দেশ করেছি। এতে সামগ্রিক বিশ্লেষণের কাজ যথেষ্ট সম্পূর্ণ করতে পেরেছি বলে আমার দাবী নেই; তবে এতদিনের কাব্যব্যাখ্যার নির্ণয়-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গানের শব্দ-শক্তিতে সুরেরও সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে চেষ্টা পেয়েছি। বাক্-প্রকরণের বিভিন্ন পর্যালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বৈশিষ্ট্য ও সন্নিপাত কতটুকু, দেখতে চেষ্টা করেছি। একটা বিষয় বিচার করতে বসলেই অন্যটা এসে গেছে, এসেছে একটির সঙ্গে অন্যটির কার্যকারণ-পরম্পরা। বাংলাভাষার মর্মমূল থেকে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর রূপৈশ্বর্য আহরণ করে এনেছেন, প্রতিদিনের ব্যবহার্য আটপৌরে কিংবা পোষাকী ভাষা তাঁর হাতে যে নতুন বিস্ময়কর পরিচয় নিয়ে এসেছে,[২৮] তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছি প্রায় দু'হাজার রবীন্দ্রসংগীতকে বিশ্লেষণ ক'রে।

দেখেছি, শব্দরূপ বিশ্লেষণ করতেই এসে পড়েছে উপনিষদের তত্ত্ব, রস ও অলংকারশাস্ত্রের মতবাদ, রাগরাগিণীর প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। বিশ্লেষণ ব্যাপারটি খণ্ড খণ্ড হতে পারে, কিন্তু এর পারম্পর্যে সমগ্রতার পরিচয়

বার বার এসে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে বাগ্‌রূপের সঙ্গে সুরের মর্মভেদী রঞ্জনক্রিয়া নিবিড় সংশ্লেষে উপস্থিত হয়েছে। সুরের জ্ঞান না থাকলেও সেখানে সুরের অন্তর্গুঞ্জন ও ধ্বনির সূক্ষ্ম উদ্ভাস অনিবার্য গুরুত্বে দেখবেন যে কেউ রসজ্ঞ ও সহৃদয়সংবাদী।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা-প্রকরণের সর্ববিধ বৈদগ্ধ্যভঙ্গি, সৌষ্ঠব-বৈচিত্র্য, মিলধ্বনি, প্রতীক-উপমা, চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা, ছন্দ, সংগীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ কথিত "ধ্বনির শিল্প" বলে অভিহিত করতে পারি। এই ধ্বনির শিল্পের বর্ণময় বর্ণনায় রবীন্দ্ররচনার নির্মিতি। রবীন্দ্রসংগীতে যে শব্দের মায়াপুরী, ধ্বনি ও রূপের যে ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা, ভাষণ-শৈলীর সূক্ষ্মতার ও অনু-শক্তির যে পরাকাষ্ঠা—সে সব কথা বুঝতে গিয়ে আমরা বাক্‌রূপকে বিষয়-প্রকরণে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। নির্দিষ্ট বিষয়ক্রম সীমাকে ছাড়িয়েছে, চিন্তার পরিধিকে অতিক্রম করেছে। বাগ্‌রূপের বিশ্লিষ্ট অবয়বগুলোতে অনির্বচনীয়লোকের স্পর্শ অনুভূত হয়েছে বারংবার; অ্যাবারক্রম্বি যাকে বলেছেন কথার ও ধ্বনির অসংশয়িত পরাগ বা সূক্ষ্ম অংশগুলো।[২৯] রবীন্দ্রসংগীতে শব্দশক্তির যাদু ও মায়ার পরাগগুলো লেগেছে যেখানে যেভাবে, তাদের বিষয়শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা গেল নিম্নরূপ। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে এই সূত্রানুসরণে রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণ করতে আমাদের সংকুচিত চেষ্টা। পদ্ধতিটি রীতিসম্মত কিনা, ব্যাকরণ-ভিত্তিক কিংবা বিদগ্ধ সমালোচনার নিয়মসম্মত কিনা—ভেবে দেখবার অবসর ছিল না। সহস্র সহস্র শব্দের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যেভাবে যতটা ধরতে পেরেছি, সেভাবেই বিজ্ঞাপিত হলো নিম্নরূপ :

এক : বর্ণ, পদ ও পদবন্ধে বিস্ময়কর মিলের রূপপ্রকরণ। শব্দে শব্দে ধ্বনি-তরঙ্গ লীলায়িত হ'য়ে যে সুরশক্তি উজ্জীবিত করে, তাকে সাধারণ ভাবে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার, অন্তমিল, ইত্যাদি বলা হয়েছে। তাছাড়া নানাপ্রকার শব্দধ্বনির মিলস্পন্দন সুরপ্রহত আবহের মতো প্রতিভাত হয় এখানে।

দুই : শব্দ ও পদবন্ধে বিষম-মিলের বক্রতাভঙ্গি প্রোজ্জ্বল। ভাব-গৌরব যত সমুন্নতই থাক, শাব্দিক বিষমভঙ্গিমার বিদগ্ধশৈলী রবীন্দ্রসংগীতে প্রাচুর্যে ভ'রে আছে। এবং এই ভঙ্গির অন্য একটি সাধারণ প্রকরণকে বিরোধাভাস ইত্যাদি অলংকারের মাধ্যমেও দেখতে পারা যাবে।

তিন : বিশেষণ ও বিশেষ্য-প্রযোজনার এমন অভিনব কলাকৌশলময় শৈলী ও সৌষম্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। আবার পদবিন্যাসের সহজ, ঋজু ও গম্ভীর স্টাইল এবং বাগৈশ্বর্যের অতুলনীয় বিভূতির বিকাশ দেখা যাবে গানগুলোতে।

চার : উপমালোক নিয়ে বাগ্‌রূপের বিশিষ্ট প্রকরণশৈলীর নাম চিত্রভূমিকা-ভেদ। রবীন্দ্রসংগীতে উপমার চিত্রভূমিকা সুষমাময় ও রসের আনন্দে হৃদয়দ্রাবী। বলা যায় 'উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য'।

পাঁচ : আর আছে বাকৃপ্রতিমা। ভাষার কি রঙ্‌ বা বর্ণ আছে? রবীন্দ্র-সংগীতে ভাষা-প্রতিমার বিমোহন বর্ণালী বিস্মিত হয়ে দেখতে হবে। চিত্রকল্প বা ইমেজারি ও প্রতীক নিগূঢ় তত্ত্বের গাম্ভীর্য নিয়ে দুচোখে মায়া হয়ে কেবলই ভাসছে। ভাষাপ্রকরণে কুহকময় ভাবগুলো প্রতিমা হয়ে উঠেছে বারংবার। ভাষণ-শিল্পের এমন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাফল্য অন্যত্র সুলভ নয়। বোধকরি, কবিগুরু তাঁর চরম সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, সর্বাধিক গৌরব উপস্থাপিত করেছেন তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি গানগুলোতে।

ছয় : কবিতার প্রাণ হলো ছন্দ। সংগীতের প্রাণ হলো সুরের তান। রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যছন্দ এবং সুরের ছন্দ সতেজ প্রাণস্পন্দনের মতো সঞ্চলন করেছে। ভাষার ছন্দপ্রকরণ এখানে 'নৃত্যরসভঙ্গিমা' হয়ে উঠেছে! এখানে কাব্যছন্দ ও সুরের তান নতুন এক সমন্বয়ের সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল।

সাত : রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে সাংগীতিক অনুষঙ্গের বিশেষ প্রভাব আছে; বাণীতে সুরের অনুষঙ্গ দিয়ে তরঙ্গপ্রহত এক আবহভূমি নির্মিত। গীতাত্মক অনুষঙ্গ হিসাবে ক্রিয়া, শব্দপদ, বাদ্যযন্ত্র ও রাগরাগিণীর নাম প্রতিটি গানে ব্যবহৃত হয়ে আবহসংগীতের প্রক্রিয়ার মতো মধুর সংবেদন ও সূক্ষ্ম অন্তর্গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে। গীতাখ্য ভাষা দিয়েই সুর ছাড়া সংগীতে সুরেলা পরিমণ্ডল রচনা করেছেন কবি। এ প্রক্রিয়া তাঁর কাব্যাবলীতেও স্পষ্টীভূত। তবে গানে যথেষ্টই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখতে পাই।

আট : এ গ্রন্থের উত্তরধারায় রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়গত প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আলোচনা যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে ভাব-রসের প্লাবন। মানব-

চেতনার সর্ববিধ সরল ও জটিল অবস্থাগুলি এবং সুখ আনন্দ-উদ্দীপনা দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই গানগুলিতে। সাধারণভাবে এই আলোচনার সঙ্গে বাঙালীর সংগীত-চিন্তা ও তার প্রতিফলন, রবীন্দ্রসংগীতচিন্তার বিশিষ্টতা ও মৌলিকত্ব, কবিতা ও সংগীতের স্বরূপ-সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও পার্থক্য, কবিতা ও গান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নির্ণয়-শৈলী ও পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত করেছি। উত্তরধারার এ-সব আলোচনা আরও অনেক পূর্ণতা দেবার পরিকল্পনা মনে রেখে আমি এ গ্রন্থের পূর্বধারায় বাক্-শিল্প বিশ্লেষণকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণে গতানুগতিক ব্যাকরণ-সম্মত রীতি অনুসরণ না ক'রে বাগ্‌রূপের স্বচ্ছন্দ গতিবেগের অনুবর্তী হয়েছিলাম বলে এরকম স্বভাব-নিয়ন্ত্রী বিচিত্ররূপে দেখেছি। এ-যেন এক বিশ্বরূপ দর্শন। রবীন্দ্রসংগীতের বাগ্‌রূপের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ম এবং তাদের প্রাসঙ্গিক ও আবশ্যিক পরিচয়কে আনতে হয়েছে; আর এসেছে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট তত্ত্বচিন্তাগুলো। এবং স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য ও তার নান্দনিক তত্ত্ব বিপুল উদ্যমে এসে পড়েছে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের অনুকূলের বা প্রতিকূলের যাথার্থ্যে। উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ বিষয়গুলোর পর্যালোচনা করেছি এবং টীকায় যথাযথ নির্দেশ-ও উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু এর দ্বারাই কি আমার সমস্ত অভিপ্রায়গুলো সুনিশ্চিত ভাবে অভি-ব্যক্তি লাভ করেছে? রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও ভাষারূপের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন-সম্পর্কিত সাহিত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা গেলেও সংগীতের সুর-প্রয়োগ ব্যাপারটি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আবশ্যিকতা আছে। যদি-ও রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণে সে দায়িত্ব পুরোপুরি আসে না, তবুও আমরা বাগ্‌রূপের সঙ্গে সুরের উপাদানগত পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্নরূপে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনাগত কালের জন্য তাঁর যে প্রত্যাশা ও অভিপ্রায়টি একস্থানে ব্যক্ত করে গেছেন, সেকথাটি পুনরাবৃত্তি ক'রে আমরা এ নান্দী-কথা শেষ করতে পারি। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

"সুরের অন্তর্গুঞ্জন যে উত্তেজিত অনুভূতিকে সমস্তচিত্তে পরিব্যাপ্ত করে, তাই কাব্যের অসামঞ্জস্য দূরীকরণে নিজ অমোঘ প্রেরণার পরিচয় দেয়।

সঙ্গীতোৎফুল্ল কবিদৃষ্টি এক শাশ্বত সত্যের ধ্যানলোক আবিষ্কার ও অধিকার করে। রবীন্দ্রসংগীতের এই নিগূঢ় অনুপ্রেরণা এক স্বতন্ত্র ও দূরবিসর্পিত আলোচনার প্রতীক্ষা করছে। সংগীতে যে চিরন্তন ভাবসত্যের এমনকি ভগবৎ-স্বরূপের মর্মোদ্‌ঘাটন করে, কাব্যসৌন্দর্যের মোহের উপর যে সুরের ঘনতর অঞ্জন মাখিয়ে দেয়, তার তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন তার দ্বারাই সম্ভব, যে একাধারে সাহিত্য-রসিক ও সংগীত বিশারদ। এই আদর্শ রসিকের জন্য সমস্ত ভবিষ্যৎ উৎকর্ণ হয়ে আছে।"৩০

নির্দেশপঞ্জী

১। শ্রীপাদনরহরি চক্রবর্তী—গীতচন্দ্রোদয় (দ্রঃ রাগ ও রূপ দ্বিতীয় খণ্ড)

২। বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—রাগ ও রূপ (২য়) পৃঃ ১১৬
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—সংগীতচন্দ্রিকা পৃঃ ৮
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ভারতীয় সংগীতকোষ পৃঃ ৬৩ ইত্যাদি

৩,৪। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ—সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (২য়) পৃ, ১৭৪, পৃঃ ১৬৭

৫। নরহরি চক্রবর্তী—গীতচন্দ্রোদয় (দ্রঃ রাগ ও রূপ ২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯৯

৬। W. S. Kirkes—Hand Book of Phisiology

৭। Encyclopaedia Britanica—Vol. 25, P. 438

৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা গ্রন্থের ভূমিকা পৃঃ ১৫

৯। স্বামী বিবেকানন্দ—পত্রাবলী (২য় ভাগ) পৃঃ ১৭৭

১০। ডঃ গুণময় মান্না—রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা পৃঃ ৪০

১১। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৫২

১২। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ২৩

১৩। Dr. A.C. Bradley—Oxford Lectures on poetry, P. 18 & P. 24

১৪,১৫। অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্য জিজ্ঞাসা পৃঃ ৪৯, পৃঃ ৪৮

১৬। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক পৃঃ ৩৩৯

১৭। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—কাব্য বিচার পৃঃ ৫৬

১৮। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কুলায় ও কালপুরুষ, মুখবন্ধ পৃঃ ছ

১৯। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থানে যে সব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব বিস্ময়ের হলেও কবির শেষ লক্ষ্য হল প্রকাশ পরিপূর্ণতা ; পাঠকচিত্তে কাব্যানুভূতির অনবদ্য সংক্রমণ। Form ও Content

এর অভিনবত্ব সাধনই কবি প্রতিভার দুরূহতম পরীক্ষা। এ পর্যন্ত প্রচলিত রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা সাধারণতঃ content এর উপর বেশী জোর দিয়ে তার Form এর দিকে আপেক্ষিক ঔদাসীন্য দেখিয়েছে"। তিনি আরও বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের আসল মূল্য জানা যাবে তাঁকে ভারতীয় কাব্য বা সংস্কৃতির নিরিখে যাচাই করে নয়, তাঁর ভাবধারার অবিমিশ্র বৈচিত্র্যে বা উৎকর্ষে নয়, তাঁর বাণীভঙ্গিমার শাশ্বত ও দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনাশক্তির উপলব্ধিতে।"

রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ (গৌরীপ্রসাদ ঘোষ লিখিত) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কুলায় ও কালপুরুষ পৃঃ ৯

২১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ১০

২২। ব্রাড্‌লে এ প্রসঙ্গে বলেন—The poet speaks to us one thing but in this one thing there seems to lurk the secret of all." Oxford Lectures on poetry P. 26

২৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—S. Academy—Centenary Volume P. 180

২৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কুলায় ও কালপুরুষ পৃঃ ২০

২৫। মোহিতলাল মজুমদার—রবিপ্রদক্ষিণ ভূমিকা পৃঃ ৯

২৬, ২৭। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বক্তব্য পৃঃ ১০৭, পৃঃ ১০৯

২৮। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন "অপরিমিত শব্দ অপরিমিত অর্থ থাকিলেও কতকগুলি বিশেষ শব্দ ও বিশেষ অর্থই ব্যঞ্জনার উপযোগী, মহাকবিদের প্রয়োগ হইতে জানা শব্দেরও নূতন পরিচয় লাভ হয়"। কাব্যবিচার পৃঃ ১৪০

২৯। অ্যাবারক্রম্বি মন্তব্যমী বাগ্‌রূপের যে বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন।

"Uususpected filaments of fine allusion and suggestion."

The Idea of great Poetry, P. 23

৩০। ভূমিকা ১।১০।১৯৬৯ (রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : গৌরীপ্রসাদ ঘোষ)

———

এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে,
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ হ'তে ভেসে আসা
এ যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসির রাশি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগ্‌রূপের মৌল ও সূক্ষ্ম শক্তির বিচিত্র বিস্ময়কর প্রকাশ ও প্রকরণ

এক

অক্ষর, শব্দ ও ধ্বনির মিল, অনুপ্রাস, সাস্তর্মিল, ধ্বনি-স্পন্দন ইত্যাদি।

অদ্বৈত-সূত্রে এরকম চিন্তা করা হয়েছে যে, দুটি 'একক'-এর সমাহারে সৃষ্টিলীলার বীজাঙ্কুর অকস্মাৎ শিহরণ পায়, আসে বিমূর্তের রূপাবয়বে পরিণতি। বিশ্ববিধানের এই স্বাভাবিক স্বভাব আছে ভাষা-জগতেও। দুটি অক্ষর এবং দুটি শব্দ একত্র সংলগ্ন হ'লে অনিবার্যভাবে জন্ম দেয় ধ্বনি ও সুরমূর্চ্ছনা। অর্থ প্রকাশক্ষম সুনির্বাচিত শব্দ-সম্মিলন কাব্যের ক্ষেত্রে অমোঘ বিধান রচনা করে। একথাটি ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কবিতা ও গানে অক্ষর ও শব্দের চরমতম ক্রিয়া-পরম্পরা ও সিদ্ধি আছে সতেজ সুন্দর এক ভাবের রূপ-সৃষ্টিতে।

প্রাসঙ্গিক একটা কথা। অক্ষর ও শব্দের ধ্বনি (Sound)-সাদৃশ্য ও অর্থ (Sense)-সাদৃশ্য নিয়ে প্রচলিত শ্রুতিতত্ত্ববাদের একটির নাম মরফিম-বাদ। রিচার্ডস বলেন :—"Two or more words are said to share a morpheme when they have, at the same time, something in common in their meaning and something in common in their

sound. The joint Semantic-Phonetic Unit which distinguishes them is what is called a Morpheme".[১]

অক্ষর ও শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিলের মধ্যে যে মরফিম্, আমরা তাকে একরকম সাংগীতিক স্বরবিন্যাস বলতে পারি। কবি ও সহৃদয় পাঠকের মনে শব্দ-এর এই শ্রুতিগুণ সমভাবেই সক্রিয় হয়। অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সংস্কারে সেই সুরের ক্রিয়া আছে। গীতিকবিতার আস্বাদ'ন থাকে জনৈক সমালোচকের কথায় Literary Experience[২]। এবং এলিয়ট বলেছেন যে, কবিতায় বিজ্ঞাপিত আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে বিমিশ্রিত অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের মনে ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ সঞ্চার করে। লেখক-বিশেষের রচনা-নির্মিতির মধ্যে কবির অনুভূতি যতই সংশ্লিষ্ট, ততই তার সাফল্য।[৩] দান্তে প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন যে, কাব্যসত্য প্রণিধানে কবির জীবন-প্রত্যয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রত্যয়ে এই শব্দ-শক্তির প্রতিক্রিয়া এ'ভাবেই মিলিয়ে দেখতে হবে।

ভাষার শ্রুতি ও সংগীতচেতনার মতবাদগুলোতে কবির ব্যক্তিস্বরূপ ও তাঁর সৃষ্টি-কর্মকে অদ্বয় ক'রে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিব্যক্তিত্ব ও শব্দশক্তির সম্মিলিত লীলার রূপ ফুটে উঠেছে। রিচার্ডস কথিত ধ্বনি ও অর্থের সাদৃশ্যের 'মরফিম' এবং এলিয়ট কথিত কবিপ্রত্যয়-এর সম্মিলিত রূপ প্রণিধান করতে হয়। পাঠকের মনে এই সমগ্র (অদ্বৈত)-এর প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রসংগীতের অকল্পনীয় মিলের শৈলীতে বুঝতে চাই। অক্ষর ও শব্দের ধ্বনি ও অর্থগত সংলগ্নতায় এবং কবিব্যক্তিত্বে যে অদ্বয় সম্পর্ক আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে সমগ্রের সাধনা বলেছেন। বলেছেন—"সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি, তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সংগে রঙের মালা-বদল।"[৪] এই তত্ত্ববোধ ও কবিপ্রত্যয় কাব্যরূপোপাদান (শব্দ, মিল, ধ্বনি, ছন্দ ইত্যাদি) কে নিয়েই সমগ্রতার অনুধ্যান ক'রছে কতকাল। কবিতা ও গানের অক্ষর-শব্দের ধ্বনি ও অর্থগত মিল-বিন্যাস এবং সম্পূর্ণ সংলগ্ন-শব্দ-প্রবাহের ভেতরে যে অনির্বচনীয় রসরূপ আছে তা পাঠককে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে। "শব্দ গীতিকবিতার এক অপরিহার্য চেতনা।... গীতিকবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে যেইমাত্র শব্দটি বেজে উঠলো, সেই তখন থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত সমস্ত কবিতাটি পাঠকের চিত্তে বাজতে থাকা চাই"।[৫] এবং "কবির উপলব্ধির মধ্যে কোন ফাঁকি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর শব্দ-

নির্বাচন, পরস্পর সংলগ্ন শব্দপ্রবাহের মধ্যে যথাযথ আশ্রয় পেয়ে সার্থক হবে।"[৬] শব্দ, বাক্য বা পদবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ভাষাচিন্তা তা সার্বিক ও সামগ্রিক হয়েছিল; সেজন্য বোধকরি রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষাকেই বলেছিলেন "ধ্বনির শিল্প"। তিনি বললেন — "ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল। পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি।"[৭]

শব্দ-নির্বাচন কবিপ্রত্যয়-সিদ্ধ একটি মূল্যবান শৈলী। শব্দরূপাবয়বে সংগীত-ধর্মের উজ্জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার নাম 'মিল'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ও গানে এই মিল নিয়ে বিস্ময়াবহ বিচিত্র সংঘটন ঘটিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতা ছিল ব'লে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। বলেছেন,

"মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়। একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে। জোড়া-মিলের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে, কেবলমাত্র কথার দ্বারা মন যতটুকু বুঝিত, মিলের ঝংকারে অনির্দিষ্টভাবে তাহাকে আরও অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয়, তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।"[৮] কবিতায় মিলের ঝংকারে যতখানি সুরের সঞ্চরণ হয়ে যায়, গানের পদবন্ধে ততোধিক হওয়া সম্ভব। কেননা সুরানুরাগ ও সুরের সংস্কারযুক্ত কাব্য-সংগীতের শব্দদেহে কবির উপলব্ধির গভীরতা ও আবেগের গতি অধিক প্রতিফলিত হ'য়ে ধ্বনি, মিল, ছন্দঃস্পন্দনকে একান্তভাবে সংবেদনশীল ক'রে দেয়। মিল কবিতার একটি গুরুতর পদ্ধতি। রবীন্দ্রকাব্যে ও তার প্রকাশ বিস্ময়কর। কিন্তু অধিক বিস্ময়ের কথা, মিলের এমন ঐন্দ্রজালিক চাতুরী, এমন বেপরোয়া একটানা মিলের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মকারু-কৌশল রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্যত্র সুদুর্লভ। এমন কি রবীন্দ্রকবিতাতেও এত বৈচিত্র্য দেখা যাবেনা।[৯] রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রকাব্য অনুসরণ ক'রে এই মিল-পদ্ধতির নিম্নরূপ বৈচিত্র্য অনুধাবন করা যায়।

: সমস্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, সংযুক্তাক্ষর ও সমশব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এবং পদ ও শব্দদ্বৈতে সুষম ও বিষম ধ্বনি-মিল-এ সুরধ্বনি সৃষ্টি লাভ করে। আদি, মধ্য ও অন্ত্যমিলের প্রক্রিয়ায়, স্বরবর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ভাবধ্বনি-অলংকার (onomatopoeia) সৃষ্টি হয়, এ-সবের কোন পরিণতি আনবে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার। "ধ্বনির আশ্রয়ে শব্দালংকার ইহা কাব্যের একটি সংগীত ধর্ম"[১০] এবং "শব্দালংকার ভূষণমাত্র নয়, ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ করে।"[১১]

: অক্ষর ও শব্দের ক্রমিক মিল হয় চরণে ও চরণান্তরে স্বরূপ ও ক্রমসাদৃশ্যে যেমন—যৌবন-নব (স্বারূপ্য), যৌবন-বন (ক্রম-সাদৃশ্য)।

: কাব্যছন্দের শ্রুতি, বৃত্তি ও অন্ত্যানুপ্রাস ধ্বনি-সৃষ্টির অন্যতম উপাদান, শ্রুতিগ্রাহ্য সদৃশ ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তি ও বৃত্ত-অনুপ্রাস শ্রেষ্ঠকাব্যের পক্ষে অপরিহার্য।

: বাক্যাংশে ও চরণে মিল ও পুনরাবৃত্তি, মধ্য ও স্থানিক মিল, পর্বে ও চরণে ছন্দের তান ও লয় শ্রেষ্ঠকাব্যে সহজ গতিবেগ সঞ্চারিত করে। অক্ষর ও দল-স্পন্দন কবিতা ও কাব্য-সংগীতে অপরিহার্য হ'লেও রবীন্দ্রনাথ ভাব-সৌন্দর্য অপেক্ষা তাদের বেশী মূল্য দেন নি। কিন্তু কবির অজ্ঞাতেই তারা এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলের বর্ণালী রচনা ক'রে। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—"সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে মিল ও অনুপ্রাসের ফুলঝুরি বাংলাকাব্যের আকাশকে কি অপূর্ব সৌন্দর্য-আভায় উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলেছে।"[১২]

: পদবিন্যাসে বিশেষ্য-বিশেষণের মিল, একবর্গীয় ভিন্ন বর্গীয়, মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ বর্ণের মিল, ক্রিয়ার মিল, সমধাতু-সমধাতুজ কর্তাকর্ম, নামক্রিয়া প্রভৃতির মিল, ধ্বন্যাত্মক শব্দের মিল, শব্দদ্বৈত ও দ্বিরুক্ত শব্দের মিলের সম্ভার।

রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসংগীতের বাকৃশিল্পে মিলের কুহক-মায়া সীমাতিশায়ী প্রাবল্যে ভ'রে গেছে, যার তালিকা রচনা করা সহজ নয়। কবিগুরুর এই শৈলীর তালিকা করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু— "শব্দ, পদ, ছন্দ, স্তবক, পংক্তিতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ সহযোগে মিল, মাত্রা, সম-অসম মাত্রিক অনুলাপ বৈচিত্র্য, মিলহীনতার বৈচিত্র্য, একান্তর মিল, ক্রমিক পংক্তিতে তিনমিলের শিল্প, শব্দধ্বনির মিলে ভাবানুষঙ্গ" ইত্যাদি। এবং বাংলা-ভাষার বিচিত্র বিপুল মিলের আবিষ্কর্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ ক'রে বুদ্ধদেব বসু বললেন—"এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, বাংলাভাষা তার তৎসম তদ্ভব,

দৈশিক ও বিদেশী শব্দের সম্ভার নিয়ে মিল বিষয়ে কতবড় প্রতিভাশালী, কি গভীর সেই মিলের রহস্য, কী উদার সম্ভাবনায় ভরপুর।"[১৩] রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় একথাটা ধরে নিতে হবে যে, এই বিচিত্র মিল-পদ্ধতির ও মিলের দ্বারা কাব্যের প্রযুক্তির কলা-কৌশল যতই পৃথক পৃথক ভাবে বোঝা যাক্ না কেন, তার ফলশ্রুতির ব্যাপারটি সামূহিক এবং সুসম্পূর্ণ। গীতিকবিতার অবয়ব ও গঠন-নির্মিতির সংগে রবীন্দ্রগীতির ঘননিবদ্ধ নিটোল নির্মাণের তুলনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীত গীতিকবিতার সকল বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের সারনির্যাস নিয়ে সংক্ষেপে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এখানে ভাষার মৌল সূক্ষ্মতা ও অনুশক্তির বিস্ময়কর প্রাকট্য। কবিতার মিলের সাংগীতিক লক্ষণ এখানে এমন সূক্ষ্ম তারে বাঁধা হয়েছে যে, যেন বাতাস লাগলেই সে তার বেজে উঠবে। কবির সূক্ষ্ম শব্দচেতনা সুরশ্রুতিসুভগ ইন্দ্রিয়ের কাছে নাড়া দেয়। অক্ষরে শব্দে চরণে অনুপ্রাস অনুকারবৃত্তি, ছন্দের লীলায়ন ও তানলয়ের প্রতিক্রিয়া কানে এসে লাগে ঐকতানের মধুর ধ্বনির মতো। সুরের নির্বিশেষ রূপকে কর্ণেন্দ্রিয়ে রূপায়িত করতে এ যেন এক আশ্চর্য শব্দ-বাদন। কবি যথার্থই বলেছেন, "একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে।" ইন্দ্রিয়ের কাছে ও বোধের কাছে ধরা দেবে যথাক্রমে শব্দের বর্ণময় দেহরূপ (Concrete form) এবং অর্থময় চিদরূপ (abstract form)।[১৪]

অক্ষর ও শব্দের ইন্দ্রিয়বেদী দেহরূপের মিল ও ছন্দতান ধ'রে কবি হাজার তারের ঝংকার তুলে দিয়েছেন। সুর ছাড়াই সেখানে সমধুর সুর ধ্বনিত হচ্ছে, বচন আবৃত্তি করতে করতে অনির্বচন হচ্ছে। এই চরমতম সুর-চেতনার বিকাশ দ্বিসহস্র সংগীতের আকাশ পটে,—যেখানে তারা মায়াময় বর্ণময় ঝাঁকে ঝাঁকে সুরের পাখী হ'য়ে ভ'বে দিয়েছে দৈগন্তিক আকাশপট, সহৃদয়সংবাদী তাদের স্বর্গীয় সুরের আবেদন অনুভব ক'রে পুলকিত হবেন। এবং কবির সুতীব্র অনুভূতির সংগে তাঁর অনুভূতির সংযোগ ঘটবে এই শব্দরূপের মাধ্যমে; কেননা— "কবিকে তাঁহার অক্ষরগুলি অনুভূতি দিয়া যাচাই করিয়া চয়ন করিতে হয়।"[১৫]

শব্দ চয়ন ও মিলের পূর্বনির্ধারিত তালিকা-সূত্রে কিছু মূল্যবান উদাহরণ উপস্থাপিত ক'রে বোঝা দরকার।

দৃষ্টান্ত : তালের বনের করতালি কিসের তালে (প্র ৪), শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে, করুণকাতর গানে রে (প্র ১১), অতি মঞ্জুল অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল, গুঞ্জন কুঞ্জে, শুনিরে শুনি পল্লব পুঞ্জে। হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে, হাস বিভাস বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে। চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে (প্রকৃতি ১), ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে, মেঘমুক্ত সহাস্য শশাংক-কলা সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে, পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা,
উন্মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা (প্র ১০৪),
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে (প্র ১০৬)
বর্ষণ হর্ষভরা ধরণীব বিরহ বিশংকিত করুণ কথা (প্র ৯৯),
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর, নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর, চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে বাণী মঞ্জরী সঞ্চলিতা, ওগো ললিতা (প্রে ১০৪), ইত্যাদি।

এমন ঋজু ও গম্ভীর শব্দসম্ভারে মিলের মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। এরকম উদাহরণের সীমা নেই। কেবল দু-একটি পংক্তিতে নয়, কোন কোন সম্পূর্ণ গানই এই গুরুতর ধ্বনি গাম্ভীর্যে ও মিলের ঝংকারে উদ্দীপিত। অক্ষর ও শব্দ-মিলের এবং অসামান্য অনুপ্রাস ও বিবিধ মিল-পরম্পরার আরও কিছু উদাহরণ সংকলন করা গেল। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমিক-ধ্বনি-পরম্পরায় বিকশিত। মনে হয়—ক গ চ ঝ ত দ ধ ন প ব ম ষ র ল স/শ প্রভৃতি ব্যঞ্জন-অক্ষরগুলি ধ্বনি সৃষ্টিতে বিশেষ উপযোগী। রবীন্দ্ররচনায় এই স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ও অক্ষরগুচ্ছের স্বারূপ্য ও ক্রমসাদৃশ্যের ধ্বন্যাত্মক মিল পাঠকের প্রাণে শিহরণ জাগায়।

দৃষ্টান্ত : বন-অঙ্গন-ময় রবিকর-রেখা/ লপিল আলিম্পন-লিপি-লেখা (প্র ১৬৬),
কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি (প্র ২৭),
শ্বেত শতদল শীতল শিশির ঢালা (প্র ১৪৪), রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয় (প্রে ৮৮), মনের বনের ফলের রাঙা রাগে (প্রে ৯৯), উড়ালো চুল বকুল বনে আঁচল পাতা, লবন পারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি, মরিলি পিপাসায় (প্রে ৩২১), কলসে কংকনে কিনিকিনি (প্রে ১০৫), বাহির বাঁধনে বাঁধিবি কি বন্ধুরে (প্রে ৩২০), নারীর

লোলিত লোভন লীলায় (প্রে ৩৩৩), পল্লবে পল্লবে পাগল জাগন আলস লালস পাসরি (প্র ১৬৯), পুষ্পমালার পরশ পুলক পেয়েছ বক্ষ তলে (প্রে ৩১৮), সব কিছু কেন নিল না নিল না নিল না ভালবাসা (প্রে ৩৩৭), তুমি যে ভুলেছ, ভুলে গেছি তাই এসেছি ভুলে (প্রে ১৮৭), কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন (প্রে ১৪৬), ইত্যাদি।

চিরকুমার সভার একটি হাসির গানে শব্দানুপ্রাস ও শব্দধ্বনির অফুরন্ত মিল বিস্ময় উদ্রেক করবে। এরকম অনেক গান তিনি লিখেছেন। "মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি। স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী। রোষারুণ রাগরঞ্জিতা বঙ্কিম-ভুরুভঙ্গিতা। গোপন হাস্য কুটিল আস্য কপটকলহ গঞ্জিতা ইত্যাদি।

আমাদের মিলপদ্ধতির তালিকানুযায়ী এরকম অসীম উপকরণ রবীন্দ্রসংগীতে পাবো। দু'একটি উদাহরণ পর্যালোচনা করা যাক্।

—দিনেকের দেখা তিলেকের সুখ ক্ষণেকের তরে শুধু হাসি মুখ,
পলকের পরে থাকে বুক ভরে চিরজনমের বেদনা—

এখানে কের্, ক, খ, দ, র, এবং এ স্বর-ধ্বনির পুনঃপুনঃ আবর্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন এবং নিয়মিত ঝোঁক পংক্তি দুটোতে সুর প্রবাহ এনে দিয়েছে। ধ্বনি ও লয়ের এই কুশলী সজ্জীকরণে সংগীত অনিবার্য হয়ে আসে ; সঙ্গে আসে ভাব ও রসের বেগ অর্থাৎ ধ্বনি ও ভাবের মরফিম। উদ্ধৃতিগুলোতে বাক্ধ্বনির মিল, অনুপ্রাস ও ছন্দঃস্পন্দন, লয় ইত্যাদি অনুভব করতে পাই। মহাকবি দান্তে ধ্বনি-বিচারে শব্দের জাতি ভাগ করেছিলেন—দ্রুত বিলম্বিত, কোমল কঠিন, লঘুগম্ভীর, মসৃন কর্কশ ইত্যাদি। এ'রকম শব্দজাতি রবীন্দ্রসংগীত থেকেও দেখানো যায়। তবে কর্কশ শব্দের উদাহরণ রবীন্দ্ররচনায় দুর্লভ। কবির ভাষণ-শিল্পে পরিব্যাপ্ত বিশ্বপ্লাবী সৌন্দর্য।

আর একটি আলোচনা। ধ্বনি মিলে 'আ' স্বরের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রসংগীতে 'আ' স্বরের প্রভাব যথেষ্ট। —বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে, হাস বিভাস বিকাশ আকাশ (প্র ১), আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি (প্রে ২৭৪), ইত্যাদি।

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেন—"আমাদের ভাষায় 'ই'কার ক্ষুদ্রত্ব এবং 'আ' কার বিশালতা বা বড়ত্ব সূচক। অনাবৃত আ-ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা বা বিশালতা রহিয়াছে। এইজন্যেই মহাকবি কালিদাস সংস্কৃতেও আ-ধ্বনির কুশল সজ্জা করিয়া সমুদ্রের ও তীরবর্তী বনরাজির বিপুলতা বা

বিশালতা বুঝাইয়াছেন—"দূরাদ্ অয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী। তমাল তালী বনরাজি নীলা। আভাতি বেলা লবনাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"[১৬] স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্ত-আবৃত্তিতে (অনুপ্রাস ইত্যাদিও) শ্রোতার মনে ভাব সৃষ্টি হয় ও চিত্র অংকিত হয়; কারণ এতে আছে সংগীত-ধর্ম ও চিত্র-ধর্ম উভয়-ই। "ধ্বনির রং দিয়া অর্থ আঁকা" শব্দমিল ও অলংকারের বড় কাজ। এহো বাহ্; "ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ করে"। রবীন্দ্রসংগীতের রসাকর্ষণে মিলের প্রয়োগ-শৈলীর তুলনা পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক সেন্ট্‌স্‌বারী বোঝাচ্ছেন যে, মূল্যবান কবিতায় শব্দের সামূহিক গতিবেগের প্রবাহে বিষয়, ভাব ও ধ্বনি একাকার হ'য়ে যায়; ধ্বনি ও অর্থের চমৎকার মরফিম্ গড়ে উঠে। একটি উদ্ধৃতি:

"The fairy breeze blew, the white foam flew,
The furrow followed free;
We were the first that ever burst
Into that silent sea."

উদাহরণটি নিয়ে জি ল্যাম্‌বোর্ণ বোঝালেন—"That is the fine example of general harmony between the subject and the sound" তিনি বলছেন, 'এফ্' অক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবর্তনে তরঙ্গ-ধ্বনি এমন স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, যে কেউ তা সহজে ধরতে পারবে।[১৭]

বিষয়ানুগ শব্দধ্বনি থেকে যে উপলব্ধি আসে, তাতে কোন বিশেষ একটি অক্ষরের বিচ্ছিন্ন মূল্য বেশী ক'রে দেখার প্রয়োজন আসে না। রবীন্দ্রসংগীতে সেভাবেই ভাবের উপযুক্ত বাক্‌প্রকরণ দেখতে পাই। পাশাপাশি শব্দ ও অক্ষরের ধ্বনি, ভিন্নবর্গীয় বর্ণ ও ক্রিয়াজাত শব্দের ধ্বনি এবং সান্ত্য-মিলের উদাহরণ তুলে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে এই সান্তমিল, ক্রমমিল, স্বারূপ্য-মিল ইত্যাদি এত বিপুল সৃষ্টি লাভ করেছে যে দেখে বিস্ময় আসে। রূপ-প্রকরণ-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রসংগীতের পদবন্ধের অংশে ও সমগ্রে লক্ষ্য করা যায়।

দৃষ্টান্ত: কবে কথা কয়েছিলে, কবরী আবরি, মরমে মরিয়া, করুণ
তোমার অরুণ অধরে, কালো ছায়ার মায়ায় ঘোরে, ক্ষান্ত
কূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা, কোন অজানা বাজায় বীণা,
এক পলকের পুলক, আবরণ বন্ধন, আকুল আলোয়, ঘনজটার

ঘটা ঘনায়, চঞ্চলতার অঞ্চল যায় লুটে, চেনা চোখের মিলন মেলায়, বাণী বাজে ঝর্ণা-ঝরানো, তাই শুনি সুর এমন মধুর পরাণ-ভরানো, ছায়ার তলে ছুটে চলে, জোয়ার জলে তীরের তলে, চপল লীলা ছলনা ভরে, তরুণ মুখের করুণ হাসির, দেওয়া নেওয়ার মিলন, তৃষা তপ্ত প্রহর, দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ, দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে, দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে, বার্তা আমার ব্যর্থ হবে। বাণী ভাসে বসন্ত বাতাসে, বিরহ ব্যথার বিধুর দিনে, বকুল দলে বিছায় বিছানা, বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল, বাঁশীর স্বরেতে সুদূর দূরেতে, বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন ক'রে মারতে হবে, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, মলিনমালা, মিলন মালার কণ্টক ভার কণ্ঠে কি আর, পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে, মিলন মল্লিকা মাল্য, বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা, পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়, প্রান্তর প্রান্তের কোণে, রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে, শ্রান্তপান্থ, সন্ধ্যা অন্ধকারে, সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ায়, সুখ পাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়, ক্ষান্ত কুজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষ প্রাণ,
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে (পৃঃ ৯৩),
সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি, গগনে গগনে ধায় হাঁকি/বিদ্যুৎবাণী বজ্র-বাহিনী বৈশাখী (বি ৫২), মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী/চিরদিন অভিসারিণী/তোমারে চিনি (বি ৫:),

শব্দ ও ধ্বনির ক্রম ও স্বরূপ-সাদৃশ্য, সান্ত্যমিল এইসব উদাহরণে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ এই মিলটাকে স্বচ্ছন্দ শৈলীতে প্রয়োগ করেছেন। আরও দৃষ্টান্ত :

নিদ্রানীরব, প্রাণের প্রাঙ্গনে, মনের ময়ূর, মেঘ মেলা, ভাবের ভঙ্গে, মৌন মধুর, মরমে মরিয়া, মিলন মালা, বিছায় বিছানা ইত্যাদি।

প্রত্যেক শব্দের গোড়ায় বা মাঝখানের অক্ষরটি পরবর্তী শব্দ বা শব্দগুলির অনুরূপ অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনিগত মিল সম্পাদন করবেই—এটাই যেন রবীন্দ্রমানসের স্বভাবক্রিয়া। তাছাড়া মিলের কোনো নিয়ম নেই, অথচ মিলের মিলন পরোয়াহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত।

শব্দদ্বৈত (পুনরাবৃত্তি, সমার্থক শব্দ, অনুকার-বিকারজাত শব্দ) এর মিল-ধ্বনি রবীন্দ্রসংগীতে সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। যেমন—

তারায় তারায় দীপ্ত শিখার, গগনে গগনে আপনার মনে, যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে, গানে গানে তব বন্ধন যাক্ টুটে, বনে বনে ডালে ডালে পাতায় পাতায় রে, অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি, রঙে রঙে রঙিন হলো, পথে পথে যাবো সারে সারে, চকিতে চকিতে লহরে লহরে, পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থরথর কম্পন লাগিল রে, ইত্যাদি।

কিংবা 'পিপাসাতে দিক চারিদিক ঢাকি'—দুই 'দিক্' (ধাতু ও শব্দ) যমক অলংকারের মতো ধ্বনি সৃষ্টি করছে, অথচ যমকের ধ্বনি-শক্তিকেও ছাড়িয়ে গেছে বহুমূল্যে।

ভিন্ন ও সমার্থক শব্দ সংযোগে মিলধ্বনি, যেমন: শয়ন স্বপন, কালোধলো, বসন ভূষণ, উৎসাহে উল্লাসে, কূলকিনারা, সাঁজ সকালে ইত্যাদি। এই শব্দ বাংলা কবিতা ও গদ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হ'লেও রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত হ'য়ে তারা অভিনব বিশিষ্টতা পেয়েছে।

পদবন্ধের অংশে বা সমগ্রে সুললিত মিলের ধ্বনির ঊর্মিসংক্ষোভ যা' পাঠকের কর্ণেন্দ্রিয়ে শুধু নয়, মনের উপকূলেও এসে লাগে, ("মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে"—রবীন্দ্রনাথ)। রবীন্দ্রসংগীতে শব্দ-লীলার মূল তত্ত্বটি আরও গভীরে অনুধাবন করতে হয়।

কবির মানসী কাব্যগ্রন্থ থেকে ছন্দঃস্পন্দন ও ছন্দোবন্ধের গুরুতর বৈশিষ্ট্যের স্ফূরণ ও সূচনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল অন্ত্যানুপ্রাস ও সান্তর্মিলের সহযোগ। রবীন্দ্রসংগীতে স্বরবৃত্তের চালে ও মাত্রাবৃত্ত ধ্বনির আবর্তনে অনুপ্রাস ও মিলের চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে। ব্যাপারটিকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—(গীতবিতানে) 'মিলের সূক্ষ্ম কৌশল' ও 'অনুপ্রাসের অন্তর্লীন চাতুরী'।[১৮] যেমন:

রাতের বায়। কোন মায়ায়। আনিল হায়। বনছায়ায়। ভোর বেলায়। (প্র ১৪৭)। প্রতিপর্বে পাঁচ মাত্রার ধ্বনি ও পাঁচবার 'আয়'—ধ্বনির মিলভঙ্গিমা। একই সঙ্গে অনুপ্রাসের মূর্ছনা সুরহীন এই পদবন্ধে অনিবার্য সুর এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের বাণী-দেহে এ'রকম ঘটনা ঐকান্তিকভাবে প্রত্যক্ষ করি। এ'রকম আরও কিছু উদ্ধৃতি:

ধরা দেবার খেলা এবার; নিমেষহারা এ শুকতারা; মনোহরণ চপল চরণ; চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়; নাগাল পেলে পালায় ফেলে;

আপন মনে মাঠে বনে ; পাবার জিনিস হাটে কিনিস ; বাদল শেষে করুণ হেসে ; সে পথ দিয়ে তোমারি প্রিয়ে, বৈশাখী বন রুক্ষ যখন বহে পবন দৈন্য জ্বালা ; (কোথা) বাইরে দূরে যায়রে উড়ে, হায়রে হায় (তোমার) চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ; কোন বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী ; (আমায়) ভুলিয়ে দিয়ে যা, তোর দুলিয়ে দিয়ে না ;

এখনো ঘোর ভাঙেনি তোর যে, মেলে না তোর আঁখি ;

কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তা কি ? (পৃ ২৬৮), ইত্যাদি। এই সান্তমিলের প্রভাব আধুনিক বাংলাকাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠির মন্তব্য—"আধুনিক বাংলাকাব্যের আর একটি অবদান সান্তর্মিল (Internal Rhyme)"[১৯]। ধ্বনি-স্পন্দন দিয়ে মিলের সূক্ষ্মতা রবীন্দ্র-সংগীতে বিপুলবিস্তারী। 'আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা' পংক্তিতে পুরো পর্বান্তিক ধ্বনি-মিল, শব্দান্তিক মিল, ললিত এবং সুলোলিত ঝোঁক : ভুলিয়ে দিয়ে যা। দুলিয়ে দিয়ে না। ভুল। দুল, ইয়ে। ইয়ে, দিয়ে। দিয়ে, আ। আ ; 'এখনো ঘোর' পংক্তিতেঃ এখনো ঘোর। ভাঙেনি তোর। মেলেনা তোর ; ঘোর। তোর। তোর। ; পর্বস্পন্দন ও মিত্রধ্বনিসহ এমন নিখুঁত মিলের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রসংগীতে।

শব্দের পৌনঃপুনিক আবর্তনে ও ছন্দঃস্পন্দনের আর একটা বিশিষ্ট মিল হলো :

হাসির বানে হেনেছ কত শ্লেষ কথা। নয়ন জলে ধরগো আজি শেষ কথা (প্রে : ৭৭)। 'শ্লেষ কথা' ও 'শেষ কথা' মিলটা প্রয়াস-লব্ধ মনে হ'তে পারে ; কিন্তু সাংগীতিক মিল সৃষ্টিতে ও সাংগীতিক মূল্য-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রয়োগ তাঁর গানে হামেশাই করেছেন। কখনো একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ ক'রে শব্দধ্বনি ও ভাবের বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন :

: এবার) দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো,
তোমার) পায়ে এসে ঠেকল শেষে সকল সুখের সার হলো। (পৃ : ৯৫),
: এবার রাঙিয়ে গেল হৃদয় গগন সাঁঝের রঙে,
আমার সকল বাণী হল মগন সাঁঝের রঙে।
: মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে,
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে॥ (পৃ ৫৬৮)

: অনেক বলা বলেছি সে মিথ্যা বলা
অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা (পূ ২৪৫),

: আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই (প্রেম ২৬)

: তোর পথ জানা নাই বা জানা নাই
তোর নাই মানা নাই মনের মানা নাই (প্রে ২৯০) ইত্যাদি।

গানের স্বল্প পরিসরে নতুন শব্দ রচনা না ক'রে একই পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহারের দ্বারা এই নতুন বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ কেন এনেছেন ? শব্দে নয়, এ শব্দ ছাড়িয়ে নির্বচন-স্তরে স্বরের রসরূপকে অনুসন্ধান। বোধ করি, শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এও একরকম খেলা। ধ্বনির শিল্পের এও এক প্রকরণ-কলা, যা আমাদের আনন্দিত করে।

মিল সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গ। কবি ভাষার চলিতত্ব নিয়ে কত বেশী সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, গানের শব্দ, ক্রিয়া, সর্বনাম ইত্যাদির মধ্যে তা প্রকটিত হয়েছে। ক্রিয়াগুলোতে এবং পদবিন্যাসে চলিত কথ্যরীতির প্রয়োগ হয়েছে ; ফলে মিলের স্থূল ও সূক্ষ্মগুণ খুব সহজে প্রতিভাত হ'তে পেরেছে। যেমন :

ওরে তোরা নেই বা কথা বললি
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী,
না হয়) নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি (স্বদেশী ২৭)

এরকম—জ্বল্লি। টল্লি। চল্লি। বল্লি। পল্লী—পদগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত কথ্যভংগী ও ধ্বনি-মিল-ঝংকার পরিস্ফুট হয়েছে।

ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ মিল ও ধ্বনি বিষয়ে সচেতন। অতি সহজ কথ্যরীতির বাণীবন্ধে সে'রকম মিলের গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা আমরা স্বীকার না ক'রে পারি না। যেমন :

না হয় ডুবে গেলোই, না হয় গেলোই বা।
না হয় তুলে লওগো, না হয় ফেলোই বা। (পূ ২৭)

সামান্য ক্রিয়াপদ দুটি গেলোই, ফেলোই এবং 'বা' অক্ষর সান্তমিলের তুলনাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কবিতায় হয়তো এমন মিলের গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু গানের ভাষার জন্য এরা স্বাভাবিক ও চমৎকার প্রয়োগ।

এ'রকম : সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে (পূ ২৫)

: দহন শয়নে তপ্তধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা ;
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা ;
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ দিকে দিকে হলো দীর্ণ,
নব অঙ্কুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ,
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর—(প্র ৫৫), ইত্যাদি।

এরকম ধ্রুপদীচালের গুরুগম্ভীর শব্দবিন্যাসেও তীব্র চলিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে এমন পদবন্ধ অনেক আছে। বাস্তবিকই মিলের একটা সার্বজনীন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত এই তিন পদ্ধতির স্বরক্ষেপনে ধ্বনিমিলের বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুরে আবৃত্ত চণ্ডী প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের শব্দবিভূতি ও সাংগীতিক সংবেদন সুতীব্রভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় ধ্বনিমিলে। আ, এ, ইয়ে প্রভৃতি স্বরধ্বনি, বিবিধ ব্যঞ্জনবর্ণের গভীর স্বরধ্বনির মূর্চ্ছনায় স্তোত্রগুলি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

হিন্দীতেও বিভিন্ন গীতকারদের মধ্যে তুলসীদাস, সুরদাস, নানক, কবীর, মীরাবাঈ, যুগলপ্রিয়া প্রমুখের ভক্তিগীতিগুলোতে এই ধ্বনি-বৃত্ত, অনুপ্রাস ও মিলের প্রভাব দেখা যায়। হিন্দী পদাবলীতে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংবেদন কম নয়।

দৃষ্টান্ত : কলি নাম কাম তরু রামকো
দলনিহার দা'রদতুকাল তুখ দোষ ঘোর ঘন ঘামকো।
ভালো লোক পরলোক তাসুজাকে বল ললিত ললাম কো।
তুলসী জগ জানিয়ত নামতে সোচ ন কুচ মুকামকো।। (তুলসীদাস)

কিংবা : বরষে বদরিয়া সাওন কি, সাওন কি মন ভাবন কি,
উমড়-ঘুমড় চহু দিসিসে আয়ো, দামিন দমকে ঝর লাওন কি
নান্হী নান্হী বুঁদন মেহা বরসে সীতল পবন সোহাবন কী।
(মীরাবাঈ)

মিলের যে অন্তরঙ্গ ঐকতান, তার গুরুত্ব বোধকরি কবিতার চেয়েও কাব্য-সংগীতে অনেক বেশী হওয়া সম্ভব। কেননা, স্বল্প পরিসরেই সহজ সরল শব্দের সম্পর্কের ভেতর জলতরঙ্গের আওয়াজ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুরের নিকটবর্তী আত্মীয়তা নিয়ে সঞ্জাত হয় শব্দগুলো। সুরে যুক্ত হলেই তারা (অর্থাৎ শব্দ ও সুর) পরমাত্মীয় হ'য়ে যায়। আমরা তখন বলি, পার্বতী পরমেশ্বর, কিংবা কেউ বলেন অর্ধনারীশ্বর ইত্যাদি। আধুনিক বাংলাকাব্যে ধ্বনি-মিলের, শব্দ-

মিলের ও অনুপ্রাস-ভঙ্গিমার প্রভাব ব্যাপকতা পেয়েছে। কবিতার শব্দে যদি সূক্ষ্ম বাদ্যবৃন্দ সম্ভাষিত না হয়, তবে সুগভীর মর্মলোকে কবিতা যাবে কি ক'রে? শব্দ সচেতন কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবির কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখবো যে, শব্দ নিয়ে প্রয়োগ-শৈলীর মূল্য কবিতার পক্ষে কতোখানি।

দৃষ্টান্ত: চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মনে পড়ে সবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ; হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা; ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ, চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ, নীলাভের মতো মেঘ, ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার অংশ প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথেরই শব্দ ও ভাবরূপায়ন শৈলীর সার্থক উত্তরসূরী। বাংলাদেশের অনেক কবি নানাভাবেই সিদ্ধি অর্জন করেছেন। কবিতার ফর্ম ও কনটেন্ট নিয়ে বহু অনুসৃতি এখনও চলছে কিন্তু ক'জন কবি পেরেছেন শব্দশক্তির অকল্পনীয় যাদুকে ধরতে? শব্দশৈলীর দ্বারা সীমাহীন ভাবলোকের সমস্ত বাতায়নগুলো উন্মোচিত ক'রে দিতে পেরেছেন ক'জন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক?

বোধকরি, ঐ শব্দলীলার বৈশিষ্ট্যেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রমুখকে কবি হিসেবে অনেকক্ষেত্রে সার্থক ও মূল্যবান মনে হয়। আমার বিশ্বাস, যে যতই প্রায়োগিক কলাবৈদগ্ধের প্রচার করুন না কেন, কবিতার একটি নিজস্ব মূল্য ও সংবেদনশীলতা শব্দে ও অর্থে সহজস্বীকৃতি পাচ্ছে যুগে যুগে। কান, মন, হৃদয়, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে সমানভাবে ক্রিয়া করতে করতে কবিতা সমগ্র ফল, পরিপূর্ণ রস ও আনন্দ সৃষ্টি করে। কাজেই বড় কবি, সার্থক কবি হ'তে গেলে অনেক শক্তি অর্জন করতে হয়। প্রকৃত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা জানেন—কী অসীম শক্তি ও সংগতিতে রবীন্দ্রপ্রতিভা ভাস্বর।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলা যায়, যদিও কবিতার মিলের সংগে কাব্যসংগীতের মিল একই প্যাটার্নে বিশ্লেষণ করা যায়, তবুও কাব্যসংগীতের আলাদা গুরুত্ব থাকার জন্য ভাষার করণ-কৌশল কাব্যসংগীতে পৃথক হ'তে বাধ্য। প্রকৃত কাব্যসংগীত বাণী ও সুরের হর-পার্বতী রূপ। রবীন্দ্র-সংগীতে বাক্‌শিল্পের গুরুত্ব এভাবেই লক্ষ্য করি। আবৃত্তি-যোগ্য কবিতায় সুরকে সঠিক মেলানো যায় না ব'লেই রবীন্দ্রনাথ গান লেখার জন্যই স্বতন্ত্র ও অক্লান্ত প্রযত্ন নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো পৃথিবীর অন্য কোন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ

কবি গান ও সুর সৃষ্টিতে এমন অন্তরঙ্গ ও অখণ্ড প্রয়াস চালিয়ে গেছেন ব'লে কোন নজীর পাওয়া যাবে না। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য বলেন— "রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় লিরিক্যাল সুরের প্রাধান্য থাকলেও সুরস যোগ করলেন না। নতুন করেই গান লিখলেন। এবং যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান রচনার দীর্ঘ প্রলম্বিত সাধনার খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন, অনুরূপ নজীর সহসা মেলে না।"[২০] রবীন্দ্রনাথ যদিও 'লিপিকা' গদ্য-বইটিতে সুরযোজনার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাঁর কাব্য-সংগীতের সঙ্গে এ ব্যাপারটির সমতুল বিচার চলে না। পূর্বোদ্ধৃত পাশ্চাত্য কবিদের কবিতাগুলোতে সুরধর্ম থাকা সত্ত্বেও সে-সব কবিতাতে যেমন সুর যোজনা করা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাতেই সুর দেওয়া চলে না।[২১] সুরের উপযোগী গান তাঁকে আলাদা ক'রে লিখতে হয়েছে। এ' জন্যই আমরা গতানুগতিক কাব্যরূপ-প্রকরণ থেকে সংগীতের রূপনির্মিতিকে আলাদা ক'রে দেখতে চেয়েছি।

কবি রবীন্দ্রনাথের শব্দ-চেতনার (সরল বাংলা ও সংস্কৃতাদর্শ) এই যে সম্যক সিদ্ধি, তা এসেছে তাঁর স্বতন্ত্র জ্ঞানাহরণের ফলে। অনেক মনীষী রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট শব্দ-চেতনার মূলে সংস্কৃত ভাষাদর্শের প্রভাব দেখেছেন। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সংস্কৃত ও বাংলার পরিণয়-সম্বন্ধ ঘটেছে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেন— "কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমৎকারিত্বের দিকটি অধিকতর সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের সংগে কথার সমান অধিকারের জন্য কথার মোহ সৃজনের দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। সংগীতে কবি অনুপ্রাসের ধ্বনিগুণকে সুরের অতিরিক্ত অলঙ্কার রূপে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।"[২২] আমাদের পূর্বোদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর অংশে সংস্কৃত ও তদ্ভব বাংলার অসাধারণ ধ্বনিময় গুঞ্জন লক্ষ্য করেছি। সহৃদয় পাঠকগণ দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রকরণ ও বাক্‌প্রতিমার শব্দের অন্তরালে কী সুগভীর উপলব্ধি, মননশীলতা ও রসের প্রসারতা, উক্তি ও উপলব্ধির নিবিড় অদ্বৈতে সেই রসের প্লাবন। রবীন্দ্রসংগীতের ধ্বনিমাধুর্য মিলের মধ্যে ঐন্দ্রজালিকতা আছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু "কথার মোহ-সৃজনের দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ" উল্লিখিত প্রতিবেদকের এই কথাটা মান্য নয়। মোহ কথাটি তমোভাবের দ্যোতক। বৈদর্ভী রীতির দশটি কাব্য-লক্ষণে মোহ কথাটি নেই। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্যের বিকাশ সকলেই স্বীকার করবেন।

বাংলায় যেখানে সরল স্বরবর্ণের ধ্বনিবৃত্তিকে অনুপ্রাস অলংকারের মর্যাদা দেওয়া হয় না,[২৩] রবীন্দ্রনাথ তাকেও গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে— "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ", অর্থাৎ শব্দ-সাম্য অর্থে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি-সাম্যকেই বোঝান হয়েছে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণকে নির্ভর ক'রে অনুপ্রাস হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্বরবর্ণের অনুপ্রাস-ধ্বনি-মূল্য ও সিলেব্‌ল্-সিকোয়েন্স স্বীকৃত। অবশ্য বাংলা স্বরবর্ণ অপেক্ষা ইংরেজী স্বরবর্ণের গুরুত্ব অনেক বেশী। টেনিসনের একটি কাব্যাংশ :

And leaping down the ridges lightly, plunged
Among the bulrush beds, and clutched the sword
And strongly wheeled and threw it,

এখানে তেরো-চৌদ্দটি শব্দে বিশিষ্ট ধ্বনিবৃত্ত ও পাঁচটি ভাউয়েল-এর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে; তবে তাদের নৈকট্য (Proxmity) কম। অ আ ই উ ও এ আই অ্যা আও ইউ উই ইত্যাদি ধ্বনির উচ্চারণে ও মাত্রা-বিন্যাসে সংগীত-ধ্বনি অনিবার্যভাবে এসেছে।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি ও বাক্যের অর্থোচ্ছেদে মন-স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তা মনকে সচকিত করে; এবং মনকে বিশেষ অবস্থাগুলোতে উত্তীর্ণ হবার জন্যই প্রস্তুত করায়, রিচার্ডস্‌ও এইরূপ মন্তব্য করেছেন।[২৪] রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য-ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রচণ্ড ধ্বনিশক্তি থাকায় সেখানে স্বরবর্ণ সমর্থ ও সংগতি-সম্পন্ন হয়েছে। কবির অসামান্য ধ্বনি-বোধ থাকার ফলেই স্বরবর্ণের গুরুত্ব তাঁর গানে ব্যঞ্জনবর্ণের মতই। প্রমথনাথ বিশী এ সম্পর্কে বলেন "বাক্য ও ধ্বনির মধ্যে কোনটির উপরে তাঁহার বেশী স্বাভাবিক অধিকার ছিল, বলিতে পারি না, হয়তো দুটির উপরেই সমান দক্ষতা ছিল, হয়তো বাক্যের চেয়ে ধ্বনির উপরেই বেশী ছিল।"[২৫] এই কথাটি একটি রবীন্দ্রসংগীত বিচার ক'রে বোঝা যেতে পারে :—

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে
একথা কভু আর পারে না ঘুচিতে
আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে
একথা শিখানু যে আমার বীণারে
গানেতে চিনালেম সে চিরচিনারে

সেকথা সুরে সুরে ছড়াবো পিছনে
স্বপন ফসলের বিছনে বিছনে
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে
কুসুমপুঞ্জে সে পবনে দুলিবে
ঝরিবে শ্রাবনের বাদল সিচনে
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে

স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা সে ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে (প্রেম ৩৮)

পনের পংক্তির গানটিতে ৭৫টি ছোটবড় পদ আছে, আছে ৫৭টি 'এ' স্বরধ্বনি। এবং আ, ই ঈ, উ যথাক্রমে ৩৬ ২৬ ও ১৬ বার ব্যবহৃত। ন, ল, র, স/শ, চ/ছ, ক প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরধ্বনির এই অতিরেক-লীলার প্রকরণ-প্রবাহ সমস্ত গানটিকে অনির্বচনীয় সুরে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করেছে। উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাংশটি অপেক্ষা এই গানটির পদবন্ধে অক্ষর বা বর্ণের বর্ণালী ও সুরের সৌন্দর্য অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার মধ্যে ধ্বনি-বৃত্তি ও ছন্দঃস্পন্দ যে সাঙ্গীতিক-চেতনাকে সৃষ্টি করে, এটা সুনিশ্চিত। শ্যাম্‌বোর্ণ প্রসঙ্গটি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন :

"I believe that whenever a great poet speaks of sounds he tries, consciously or unconsciously, to suggest them by the music of his verse"[২৬]

রবীন্দ্র গীতে ছন্দঃস্পন্দ, শব্দধ্বনি ও মিলই একান্ত নয়, আরও অনেক প্রত্যক্ষ উপাদান (যেমন : সাংগীতিক শব্দানুষঙ্গ, ইমেজারী, উপমালোক, প্রতীক ইত্যাদি) একত্র মিলে উক্তির মধ্যেই গভীরতম উপলব্ধির উদ্ভাসন ঘটায়। কাব্যের বাগৈশ্বর্য ইন্দ্রিয়বেদী রসব্যঞ্জনায় উন্নীত না হ'লে তার সম্পূর্ণতা কোথায় ?

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত শব্দকে ব্যাপক অর্থে 'প্রকাশ-রূপতা' বলেছেন। তিনি বলেন, ভাষাকে তার ব্যবহারিক সাধারণত্ব অতিক্রম ক'রে অসাধারণ করতে সাহায্য করে সংগীতধর্ম। ছন্দ বা শব্দালঙ্কারের আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সংগীত ও চিত্রের ধর্মে যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।[২৭] রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে কোমল কঠিন দ্রুত বিলম্বিত শব্দ ও অর্থ-ধ্বনির বিচিত্র পারম্পর্যে এই প্রকাশ-রূপতা লক্ষ্য করি। যেমন :

ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে/বাধা বন্ধ হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া হানি দীর্ঘ ধারা
আনন্দে আতঙ্কে মিশি ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া/মত্ত হাহারবে—
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর/নৃত্য হোক তবে।
(কল্পনা : বর্ষশেষ)

কিংবা :   এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত,
ফেন হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।   (কল্পনা : দুঃসময়)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে ধ্বনি ও মিলের প্রসঙ্গে আমাদের একটা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, অতিরিক্ত বাগৈশ্বর্য ও ধ্বনির আড়ম্বর সৃষ্টি করা অপেক্ষা স্থিতধী কবি গভীর সুর-রচনাতেই নিজেকে অভিনিবিষ্ট রেখেছিলেন। এ যে কতবড় রোমান্টিক ও দার্শনিক প্রত্যয়, তা তাঁর যে কোন রচনা স্পর্শ করলেই ধরতে পারা যাবে। একটি গদ্য রচনার অংশ-বিশেষ সংকলন ক'রে বৈশিষ্ট্য দেখতে চাই। শিলাইদহ থেকে ভাইঝি ইন্দিরাকে লিখছেন

"দুপুর বেলায় নিঃস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোন রাখাল দূর থেকে উর্ধ্ব কণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয় এবং একটা নৌকো ছপ্ ছপ্ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয়, তারই ছল্ ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্ন প্রকৃতির নানারকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি দু একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই এক রকম কাতর স্বর, সব শুদ্ধ যেমন একটি করুণ ঘুমপাড়ানো গান যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করিস নে, আর তর্কবিতর্ক রাখ, একটুখানি ভুলে থাক, একটুখানি ঘুমো।"[১৮]

১০৫টি সহজ মৃদু ধ্বন্যাত্মক শব্দ সমন্বিত এই দীর্ঘ একটি গদ্য শব্দ ও অর্থের সম্মিলিত উপলব্ধিত গতি এসে যখন থামলো, সহৃদয় পাঠকের অন্তরের গতি তখন কারুণ্যে ও প্রশান্ত স্রোতে বেগমান উজ্জ্বল ১০৫টি শব্দ একত্র সম্মিলিত হ'য়ে এক মহান কবির কারিকোরা প্রতিভার আন্তরবাহ্যাবগাহী উপলব্ধিকে আলোকে আনন্দে উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছে। দুপুরবেলা, রাখাল, নৌকা, পাখি ও মৌমাছির গান ইত্যাদি নিয়ে নিসর্গ-প্রকৃতির মানবী-সত্তার পরিকল্পনা এবং তার বিপুল প্রত্যক্ষতা সৃষ্টি (যেন মা ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে) —এ শব্দশৈলীর তুলনা কোথায়? এ প্রতিভাধরের ক্ষমতার মূল্য কে বোঝাতে পারে? আমি মনে করি—ভাব-প্রত্যয়-সিদ্ধ কবির সৃষ্টিকে সেজন্য বিশেষ অনুরাগ ও উপলব্ধি দিয়েই বুঝতে হবে।

আলোচ্য প্রসঙ্গটি শেষ করার পূর্বে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। যেহেতু

কবিতার আকারে সংগীত লেখা, সেজন্য কবি-চিত্ত সুরের একটা ফর্ম বা আকার প্রস্তুত ক'রে নেন স্বাভাবিকভাবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই 'সুরের অ্যাবষ্ট্রাকশন্' শব্দে ধরা পড়ে। কাজেই শব্দকে সংগীতধর্মী হ'তে হয়। কুন্তক বলেছেন "শ্রুতিবৎ হৃদয় হ্লাদং তদ্বদাং বিদধাতি যৎ।" কবিদের কাব্য-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সুরের গুঞ্জন ও অনির্বচনীয় আনন্দ স্ফূর্তি লাভ করে। মনীষী কার্লাইল বোধ করি এজন্যেই কবিতাকে সংগীতময় চিন্তা (musical thought) ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে সেই সুরের চিন্তন ও অনুভবের বেগ বাক্‌রূপে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্য করি। এখানে অনুকার ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের এত ব্যাপক প্রয়োগ কেন?[২৯]

দৃষ্টান্ত : হায় গো ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো (প্রে ২৪৩),

হার মানালে গো ভাঙিলে অভিমান হায় হায় (পূ ৫৬৯),

পূবের হাওয়ায় হায় হায় হায় রে (প্রে ৩৬),

ফাগুন কাঁদিছে হাহা ফুলের দলে (প্রে ১১৯),

ফিরে হা-হা করে উদাসী মলয় (পূ ৩৮০).

ইত্যাদি পংক্তিতে প্রকৃতির পটে কবির অন্তর্নিরুদ্ধ হাহাকারগুলো কিংবা কোথাও আনন্দ আবেগ ইত্যাদি সুতীব্র সুরের রূপ নিয়েই উদ্ভাসিত হয়েছে। সুর ও বাণী একত্রে বিলীন হয়েছে ব'লে এই শব্দ-ধ্বনিগুলো পেয়েছে সংগীতের ধর্ম। এরকম আরও দৃষ্টান্ত—

আলোকের ঝলক ঝলে পরাণের পুলক-বেগে (প্র ১০২),

জলে ঢেউ তুলে ছলকি ছলকি কী খেলা (প্রে ১২৩),

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গম্ভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ঐ শুরু (প্র ৬৮),

ঘন ঘন ঝন ঝন ঝনন ঝনন রনরন নুপুর টুঙারে (পূ ২৩৩),

তালে তালে দুটি কংকন কনকনিয়া। ভবন শিখিরে নাচাও গনিয়া গনিয়া,

তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী (প্র ৪),

ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট (প্র ১০৭), ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্বনি-অনুকার শব্দ বিপুলভাবে প্রযুক্ত। সরল ও গুরু শব্দ-সমষ্টির দ্বারা রচিত পদবন্ধ সম্পর্কেও এই কথা। সুরের প্যাটার্ণ এদের নিয়ন্ত্রণ করেছে ব'লে ধ্বনি ও মিলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে স্বরধর্ম। যেমন :

নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর, হে গম্ভীর,

বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর, ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর, হে গম্ভীর।

এখানে রুদ্ধদলে ঠাসা অন্ জন্ পুন্ সম্ অম্ ইত্যাদি ও মুক্তদল ন্ ম্ ঝ্ র্ ইত্যাদি নিয়ে অনিবার্য স্বর-সঞ্চরণ হয়েছে। মুক্ত ও রুদ্ধদলে ছন্দঃস্পন্দিত বাণীর চরিত্র ও চলন অনুযায়ী স্বরের চলনটিও লক্ষ্য করার মতো। মধ্যম-পঞ্চম স্বরে হে গম্ভীর গীত হ'য়ে সোজা মন্দ্র নিষাদে নেমে ষড়জে উঠে স্থির হলো হে গম্ভীর।

সমা মা া | পা া া | ন্া ন্া া | সা া া | া া া।
হে গ ম্ ভী ০ র্ হে গ ম্ ভী ০ ০ ০ ০ র্

(স্বরবিতান ৩)

এরকম বাণী-সমৃদ্ধ কাব্যসংগীতে স্বর-প্রয়োগের অন্তরঙ্গ কৌশলগুলি আমাদের মুগ্ধ করে। ভাষা-শিল্পের সঙ্গে স্বরের যোগও শিল্পসম্মত হ'য়ে উঠেছে। এরকম—মৃদু বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে, কলগীত সুললিত বাজে, কিংবা—হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে, উঠে রব ভৈরবতানে ইত্যাদি চরণগুলোতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি-সমারোহে ও ছন্দের স্পন্দন-দোলায় ধরা পড়েছে সুর ও স্বরের বিশিষ্ট চলন।

র্সা া র্সর্া র্সা | না না র্সা না | ধা া না ধা | পা া ধা পা
ক্ষু ব্ ধ ভ য়া ০ ল বি শা ০ ল নি রা ০ ল পি

মা া পা মা | গা া মা গা | রা গরা গা া | া া া া |
য়া ০ ল ত মা ০ ল বি তা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

(স্বরবিতান ৩৬)

কেবলমাত্র সুরজ্ঞ বা গায়ক হ'লেই নয়, ভাষা ও ভাবের অন্তরে প্রবেশ করতে না পারলে রবীন্দ্রসংগীতের বিবক্ষিত বাচ্যের এবং প্রযুক্ত স্বরের কোনো মহিমা, অনন্যতা এবং গভীর ধর্মকে ধরা যাবে না।

একথা আজ সর্বসম্মত যে, কেবলমাত্র গানের জ্ঞান ও সুকণ্ঠের অধিকারী হ'লেই কিংবা নিখুঁত স্টাইল অনুসরণ করলেই রবীন্দ্রসংগীতের বড় ও মহৎ শিল্পী হওয়া যায় না। খাঁটি রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞের সুগভীর রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রকাব্য-ভাবনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। রসবোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে তন্ময়তার অধিকারী হতে হবে প্রকৃত মহৎ শিল্পীকে।

রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য সিদ্ধির মূলে চিন্তাশীল সমালোচকগণ দূরায়ত ঐতিহ্যের প্রবাহ দেখেন, দেখেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্মীকি-কোকিল কিংবা কালিদাসের আবির্ভাব।[৩০] কেউ বলেন, জয়দেবের কাছ থেকে কবির বাণীদীক্ষা।[৩১] একথা ভিন্নরূপেও স্বীকার করা যায় যে, কবি-প্রতিভা ঐতিহ্যকে (tradition) আত্তীকরণ ক'রেই নতুন ভাবে রূপ নেয়। কেননা, প্রতিভা সর্বদাই গতিশীল। এলিয়টের ট্রাডিশন ও ব্যক্তির প্রতিভা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা যায়।[৩২] জয়দেবের গীতগোবিন্দে অক্ষর ও শব্দের ধ্বনি-সংরাগ নির্বোধ শ্রোতাকেও সচকিত করে কেন, বুঝতে অসুবিধে নেই। দু'একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে ব্যাপারটি বিচার করা যাচ্ছে—

করতলতাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কলস্বন-বংশে
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ গীতম্ ৪।৬
নয়ন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বিকাশ-নিরাশ করে শ্রুতি মণ্ডলে
মনসিজ-পাশ-বিলাস ধরে শুভ বেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ গীতম্ ২৪।৩

বেশী উদাহরণ দরকার নেই। প্রথমটিতে ক ত ল র ব শ স আ ই এবং দ্বিতীয়টিতে ই আ এ শ ন ঙ্গ ণ্ড প্রভৃতি অক্ষর-ধ্বনি ছন্দধ্বনিসহ পদগীতে সাংগীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বলাই বাহুল্য, তার উপর 'রামকরী রাগেন যতিতালেন চ গীয়তে।' জয়দেবের কোমলকান্ত পদের বিস্ময়কর রসমঙ্গলশ্রুতি স্বীকার করেও আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের বাগৈশ্বর্য, বাক্‌প্রকরণ ও বাকনির্মিতি যেন আরো কিছু বেশী।

তালের বনের করতালি কিসের তালে, হাসবিভাস বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে, বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল, কিয়ে রক্ত অলক্তক ধৌত পায়ে, ইত্যাদি পংক্তিগুলো গীতগোবিন্দের ভাষার শব্দ ও ধ্বনি-পরম্পরার সঙ্গে প্রায় মিলে গেলেও এখানে বাগ্‌রূপের মধ্যে একটি সহজ অনির্বচনীয় রস অনুভব করা যাচ্ছে। একটা কথা, গীতগোবিন্দের অর্থগৌরব পদলালিত্যের তুলনায় কম; কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে বাণী ও অর্থের সমান গুরুত্ব ও মহিমা। গীতগোবিন্দের ছন্দ-ধ্বনি-লয় রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কর্ণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছে। কালিদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "গীতগোবিন্দের পরেই মেঘদূতের শব্দচ্ছায়া রবীন্দ্রকাব্যের ভাষায় কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়" এবং "রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষার মূলধনের বিশিষ্ট অংশ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা থেকে নেওয়া।"[৩৩] রবীন্দ্র-ভাষানির্মিতির ওপর প্রভাবের

দিকটি এত গুরুত্ব দিয়ে ভাববার আবশ্যক হয় না। মহাকবিদের যুগবাহী সত্তাচেতনা সংস্কারে ও ঐতিহ্যে প্রবাহিত, তাই প্রভাবের ব্যাপারটিকে ধরবো আপতিক। রবীন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব, কবিপ্রত্যয় ও প্রতিভা তাঁর সমূহ রচনাবলী ও কর্মকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে ফেলে-আসা দূরবর্তী যুগের ঐতিহ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমানের ও বহুদূর ভবিষ্যতের বিপুল কৃতি ও সম্ভাবনা সংহত হয়েছে। অতঃপর ব্যক্ত হচ্ছে, হ'তে থাকবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যক্তি-বিশেষ কিংবা সাময়িক অস্তিত্ব মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ অনশ্বর এক রসচৈতন্যের পরিণতি ও অখণ্ড গতির ধারা। এই অকল্পনীয় স্বয়ম্ভু-প্রতিভা সকলকালের সকল প্রতিভাকে ছাড়িয়ে গেছে, সমস্ত তুলনা ম্লান হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

সার্থক কয়েক হাজার কবিতা, প্রায় আড়াই হাজার সংগীত [৩৪] এবং অন্যান্য বিচিত্র রচনা, গদ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নৃত্য-গীত প্রসঙ্গ ইত্যাদি সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়েও সারা বিশ্বে এর তুলনা নেই। এমন যে রবীন্দ্রসাহিত্য, তাতে বিশ্ব সাহিত্য-জগতের সব কিছু ঐতিহ্য আত্তীকরণ হয়ে গেছে, সেখানে এই রকম সংক্ষিপ্ত তুলনার বিচারণা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। আমার এই প্রত্যয়ের অনুকূলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধার করছি। তিনি বলছেন—

"রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রয়োগ তাঁর সহজ কাব্য-সংস্কার-প্রসূত; কবির স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধের দ্বারা কাব্যের বিশেষ আবহ উপযোগী ও তাঁর কবি-মেজাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপে মৃদু ছন্দঃস্পন্দিত কোমল ও ছায়াস্নিগ্ধ ভাববাহী ভাষার প্রয়োগ। এ ভাষা নির্বাচনের পিছনে কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।"[৩৫]

দুই

ধ্বনি ও শব্দগত বিপরীত-কথন, বিষম-মিল, বিরোধমূলক অলংকার ইত্যাদি।

ভাব ও রূপগত মিল পদ্ধতি আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতে ভাব ও রূপগত বিপরীত-কথন ও বিষম-মিলের আলোচনা আবশ্যিক। উক্তির আপাত-বৈপরীত্যে ভাব, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সুগভীর তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা, এবং তাৎপর্যে ভাষাগত সুষম করণ-কৌশল প্রদর্শন করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে এই রীতির

সূক্ষ্ম ও বৌদ্ধিক প্রকরণ-শৈলী আমাদের উপলব্ধি ও চেতনাকে নাড়া দেয়। এ-ও এক আশ্চর্য ধ্বনির শিল্প, কাব্য-সৌন্দর্যের অসামান্য উদ্ভাস। প্রতিটি সংগীতে এ'রকম বাক্‌প্রকরণ-শৈলী যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে তার সংখ্যা কত দাঁড়াবে অনুমান করা দুষ্কর। সাধারণ বক্তব্যেও আমরা বাক্‌ভঙ্গি ও বাক্-কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকি। বক্তব্যের কিছু বক্রতা, কিছু শৈলী থাক বা না থাক, কাব্যের রূপ-নির্মিতিতে কৌশল অতি আবশ্যক। কুন্তক তাঁর বক্রোক্তিজীবিতবাদ-এর মাধ্যমে কাব্যের রূপ (Form) ও রূপকলার গুরুত্ব ও বৈশিষ্টতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যে এলিয়ট প্রমুখ কবিগণও রচনা-নির্মিতি অর্থাৎ বাক্‌রূপের মূল্য-নির্ধারণে যে মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাকে অংশগত বিচার মনে হ'লেও তাঁরা রূপ ও ভাবের (Form & Content) সমন্বয়ের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করেন নি। জন ডান-এর মতো এলিয়টও আপাত-বিরোধী ভাব ও অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয়ের প্রচারক ছিলেন। সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু সাহিত্যের সত্য মূল্য ও সাহিত্যের স্বরূপ সুস্থির। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে নানা-ভাবে সমগ্রের সত্যকে ভেবেছেন এবং বাক্‌প্রকরণে বিচিত্রভাবে সেই চিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর সংগীতের রূপকলার বিচারে আমরা তাঁর অনুভবনীয় সমগ্রের রূপ, রস ও আনন্দের সত্য-স্বরূপকে কেবলই বুঝতে পারি।

মিল, ছন্দঃস্পন্দন, অনুপ্রাসাদি বাক্‌শৈলীকে ঋজু ও সরল-রেখ হতে হয়, বাক্‌প্রকরণে বিষম-প্রয়োগ হবে অনতিরেক ও সূক্ষ্ম। মিলের ধ্বনিতে থাকে সীমাতিশায়ী বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতা ও বৈশদ্য। বিষম প্রয়োগে থাকবে বাক্-এর বক্রতা, তীক্ষ্ণতা ও গাম্ভীর্য। মিলের দাবী হৃদয়ের কাছে, বিষম প্রয়োগে বুদ্ধিকে নাড়া দেয়। বৈপরীত্যের (Contrast) বাধা লেগে বাক্ ও অর্থে জাগে উপল-ব্যথিত নির্ঝরিণীর গান। রবীন্দ্রনাথের গানে ভাবের সূক্ষ্ম ধ্বনিরূপ ও রসের আনন্দরূপ এই বিপরীত-প্রয়োগে বিশেষভাবে বাজতে শোনা যায়। আঘাত পেয়ে সেতারের সব তারের জোয়ারিগুলো যেমন ঐকতানে কম্পিত হয়, এও ঠিক তেমনি। তারগুলো যদি নিয়ম মাফিক বাঁধা না থাকে, তবে তাতে ধ্বনির সোরগোল উঠবেই। বাক্‌প্রকরণে সেই নিয়মিত ধ্বনি-বিন্যাস খুব সূক্ষ্মভাবে বাঁধা আছে। সংগীতে নিয়মিত স্বরতরঙ্গে (Vibration) থাকে পিচ্ ও ফ্রিকোয়েন্সির (Pitch ও Frequency) নিয়মবদ্ধতা।[৩৬] শব্দ-ধ্বনি ও বিষম-প্রয়োগে ঠিক সেই নিয়মানুসরণ থাকা চাই, নইলে তা সংগীত হ'য়ে

বাজতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার বিষম-প্রয়োগকে আমি একটি মূল্যবান কাব্যশৈলী বলতে চাই। এত ঘনিষ্ঠ ও বিপুল দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতাতেও পাওয়া যায় না। আলোচ্য বিষয় আমরা সাধারণভাবে যেমনটি বুঝতে পারি, সেভাবেই বিবৃত করছি নিম্নরূপ :

: শব্দে শব্দে বিপরীতার্থক রূপ। বাক্যে, পদবন্ধেও বিপরীত ভাবের পদ বা পদগুচ্ছ। বাহ্যত: এই প্রয়োগ-শৈলীতে শাব্দিক ধ্বনির প্রকাশ দেখা যায়, বা কবিতার সংগীতকে সংবেদনশীল করে ধ্বনি-মিলের মতো।

: শব্দ ও পদবন্ধে এই বিষম-প্রয়োগে ভাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কাব্যের ফলশ্রুতিতে মনীষিগণ বৈষম্যের ক্রিয়াকে (effect of contrast) বিশেষভাবে মূল্য দিয়েছেন।

: দুই বস্তুর আপাত-বিরোধ তাৎপর্যে বিরোধ-রহিত হ'য়ে গিয়ে বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি প্রভৃতি বিরোধমূলক অলংকার হয়। প্রকরণ ও ভাবগত বৈশিষ্ট্যে দু'একটি সাদৃশ্যমূলক অলংকারকেও এই দলে নিতে চাই, যেমন অপহ্নুতি। প্রকরণগত বিরোধভাব অপেক্ষা কবিগুরু ভাবের তাৎপর্যে এই বিরোধক্রিয়াকে ও রূপ-শৈলীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একে তাঁর কবি-প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাতিস্বিক হ'য়ে থাকতে হয়েছে। তাঁর সূক্ষ্ম রসচেতনার একটি নির্ণায়ক সূত্র হিসেবে এ'কে ধরতে পারি। এই তাৎপর্যটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁর একটি কবিতা দিয়ে বোঝা যায়।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। (আবর্তন : উৎসর্গ)

কবিগুরুর সমগ্র জীবনবাহী একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ছিল, সীমা-অসীম তত্ত্ব। তাঁর বিশাল রচনা-সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় বাক্-প্রকরণের দ্বারা সেই গভীর দার্শনিকতা ও কবি-প্রত্যয় বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা ও গানের বাক্-বিশ্লেষণে সে বিরাট তত্ত্ব খণ্ডে খণ্ডে ধরা দিয়ে যায়।

পুরো একটি গানে সেই বিপরীত কোটির শাশ্বত লীলার গুরুতর আভাস-তত্ত্ব ফুটে উঠেছে সুন্দর বাক্-শৈলীতে। দৃষ্টান্ত :

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙ্গে।
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয় ভ্রূভঙ্গে।
শৈলের লীলা নির্ঝর কলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত-না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু হেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধূলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥ (বিচিত্র ৮৯)

রূপ-প্রকরণের দিক দিয়ে বিরোধমূলক অলংকারগুলো ইংরাজী Epigram ও Oxymoron-এর সঙ্গে অনেকটা সদৃশ। রবীন্দ্রনাথের বিষম শব্দ-শৈলীতে ধ্বনি ও অর্থের মিলিত মরফিম্ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু ইংরেজীতে শব্দের এপিগ্রাম ইত্যাদিতে অর্থঘটিত গুরুত্ব বেশী। অধ্যাপক বেইন (BAIN) বলছেন :

"The Epigram is an apparent contradiction in language which by causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath."[৩৭]

ভাষণ-শিল্পে বিপরীত-কথনের সুগভীর তাৎপর্য ও চমৎকারিত্ব :

রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে এইরূপ প্রকরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমুন্নত ভাবমহিমার উদ্ভাস লক্ষ্য করতে পারি।

দৃষ্টান্ত : অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি (প্রে ১৪৭), আঁকিও হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে (প্রে ৭৮), যে জন দেয় না দেখা, যায় সে দেখে ভালবেসে আড়াল থেকে (প্রে ৮৯), বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে ; হারিয়ে যাওয়া হৃদয় তব, মূর্তি ধরে নব নব (প্রে ১০২), তোমার সঙ্গে বিনা কথার মনের কথা কইতে (প্রে ১১৬), নয়নে তোমার উঠিবে জ্বলিয়া নীরব সম্ভাষনা (প্রে ৪২), চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে (বি ২২), সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি, দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে, হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি, পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘোরে (পূ-প্রা ৭৪) ইত্যাদি।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র বিরোধ-মূলক ভাষণ-সৌকর্যই এখানে প্রধান হ'য়ে ওঠেনি, বাচ্যাতিরিক্ত রসের ব্যঞ্জনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়েছে রচনাগুলিতে। সজল আঁখির কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া, নয়নে নীরব সম্ভাষনাও এক জটিল আইডিয়ার প্রকাশ। আঁখিতে হাসির ক্রিয়া কিংবা নয়নে সম্ভাষণের ক্রিয়া কার্য-কারণের বিষম সংঘট্ট। কবির ভাষণ-শক্তি কতখানি চরমে পৌঁছতে পারে এ'রকম বিপুল দৃষ্টান্তের মধ্যে সে পরিচয় স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। সুখের মধ্যে দেখা কিন্তু দুঃখের মধ্যে প্রাণ ভ'রে লাভ করার মধ্যে সুগভীর তাৎপর্য প্রকাশ হয়। মিলনের প্রকৃত মূল্য বোঝার জন্য প্রাপ্তির পরে আবার হারিয়ে ফেলা—এসব বক্তব্যগুলিতে কবির অতলান্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির স্বরূপ প্রকট হয়েছে। বিশিষ্ট পদরচনারীতি এবং বৈদগ্ধ্যভঙ্গির চূড়ান্ত সিদ্ধি এসেছে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে। সুগভীর ভাব ও ভাবনা, তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি ও রসের ব্যঞ্জনা নিবিড় ভাষণ-সৌকর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে এখানে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ধ্বনির শিল্প বলেছেন, বাক্‌শিল্প ও ভাষা-প্রকরণের সর্বশেষ সাফল্যের সীমায় সেই ধ্বনি ও রসের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রসংগীতের পংক্তিতে পংক্তিতে প্রকটিত হতে দেখা যায়। অক্ষর ও শব্দঘটিত মিল-পরম্পরা কিংবা বিষম-মিলের মধ্যে সেই বিরাট ভাব-ধ্বনির কলগুঞ্জন শোনা যায়। ভাব (Content) অনুযায়ী ভাষণ-রূপ (Form) এখানে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এখানে বিরোধমূলক অলংকার হিসেবে কিংবা এদের শুধু ভাষাগত বিষম বা বিপরীত প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য দেখিনা ; ভাবের ও চিত্র-রূপকল্পের তাৎপর্যে দেখি এদের মহিমান্বিত উদ্ভাস। সাধারণ অথচ ভাষণ-শৈলীর মূল্যেও এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে রবীন্দ্রসংগীতে। আরও দৃষ্টান্ত :

প্রেম পর্যায়ের গান : কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে/নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে (১৫৭), পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা ১৫৭', আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া (১৭২), ভূষণ পরালে বিরহ বেদন ঢালা (১৭৬), দুখের আলোয় নেবো চিনে (১৭৯), যারে যায়না পাওয়া তারি হাওয়া লাগলো কেন মোরে - ৪), অলখ পথেই যাওয়া আসা (১৮৬), মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্যভাতি (১৮৭), দুঃখের পথে লওগো চিনি (১৯৮), হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙোনা হৃদয়, রেখোনা লুব্ধ ক'রে মরণের বাঁশি মুগ্ধ ক'রে (২০২), দুঃখের প্রসাদে এলো আজি মুক্তির কাল (২১২), ভাঙল যা তাই ধন্য হলো চরণ পাতে (২১১), মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে (১৫৬', ইত্যাদি।

প্রকৃতি পর্যায়ের গান থেকে : জানার মধ্যে অজানারে করেছি সন্ধান (৮), তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে (১০), সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে (৩১), না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার (৪৬), কাহারা কোন কালের পানে ছুটে (৫৬), মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা (৫৮), সেই আগুনের কালো রূপ আমার চোখে নাচে (৬০), অলখ তারে বাঁধা অচিন-বাণা (৭৬), অচেতন মনোমাঝে তখন ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে (১৩১), এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে (১৩৩), ইত্যাদি।

পূজা পর্যায়ের গান থেকে : দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে (২০৪), দুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দ লোক মিলবে তবে (২১০), একহাতে ওর কৃপাণ আছে আর একহাতে হার, ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার (২১১), মরণেরই পথ দিয়ে ও আসছে জীবন মাঝে (২১১), মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ, অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান (২২২), তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার (২২৯), মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ, দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত (২৩৪), চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখবো যখন আলোক নাহিরে (২৫৩), অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে, মুদিত লোচনে চাই (২৫৬), নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে/ না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে/আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে/ অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে (৫৬', দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই, নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সেকথা যে ভুলে যাই (৩৬৫),

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে (৩৪৭), জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা (২৯৬), যারে করলি হেলা সবাই মিলি,

আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি (৩৪৫), নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে সকল মাঝে, তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না যে (৩৮৫), চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া/শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া (১০৪), দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন (৪৫), নিজেরে হারায়ে খুঁজি (পৃ ৫৮৭), ইত্যাদি।

বিচিত্র পর্যায় থেকে: যারা সোনা বালির 'পরে পাকাঘরের ভিত্তি গড়ে (১২১), আলোয় যারে মলিন মুখে মৌন দেখি, আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি একি (১০৭), নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই (৭৬), চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে (২২), ইত্যাদি।

এ রকম শতসহস্র উক্তি ছড়িয়ে গুঁছিয়ে থাকতে দেখি সংগীতগুলোতে; উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা মুস্কিল। বাণী-ভঙ্গিতে কেবলমাত্র বিরোধাভাস কিংবা বিষম প্রভৃতি অলংকারের সৌন্দর্যই ফুটে উঠেছে ব'লে নয়, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে কবি-বিবক্ষিত বাচ্যের রসব্যঞ্জনা চকিতে চমক লাগিয়ে যায়। অলংকার অপেক্ষা বোধ করি সুললিত ধ্বনি-ব্যঞ্জনা মনকে বিমুগ্ধ করে। পূর্ব অধ্যায়ে ধ্বনি ও মিলের দৃষ্টান্তে বাগৈশ্বর্যের শিল্প-বৈভব লক্ষ্য করেছি। এখানে সে আড়ম্বর ও জৌলুষ নেই, কিন্তু সহজ সরল ভাষা নির্ভরে গুরুতর ভাবের সমারোহ দেখি। কুন্তক বলেছেন—"কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধান-ক্ষমত্বম্ এব বাচক লক্ষণম্"। সামান্য সাধারণ শব্দ কিংবা বাক্য কবির অভিপ্রেত অর্থকে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ ক'রে দেয়। বিরোধমূলক শব্দ ও বাক্য রবীন্দ্রসংগীতে এত বেশী কেন? সংগীতের স্বল্প-পরিসরে গভীর ও বিরাট ভাবকে প্রকাশ করতে ভঙ্গি-ভঙ্গীতি লাগে। অলংকার সেই উদ্দেশ্য সহজে সম্পাদন করতে পারে। সংগীতে শব্দ ও অর্থের এত সূক্ষ্মতা সে-জন্যই। ওয়াল্টার পেটার অর্থ প্রকাশক্ষম বিশেষ শব্দকে চরম শব্দ (Unique Word) বলেছেন। তাঁর বক্তব্য—"The one word for the one thing, the one thought, amid the multitude of words, terms, that might just do: the problem of style was there! the unique word, phrase, sentence, paragraph, essay, or song, absolutely proper to the single mental representation or vision within"[৩৮] এই একটি শব্দ (One Word) তাঁর মতে চরম শব্দ (Unique Word)। তাঁর মতে কবিতা, প্রবন্ধ বা গানে রাশি রাশি শব্দের মধ্যে সেই চরম শব্দটি কবি-প্রতিভানকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিতে পারে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, কবিতা বা গানের পদবন্ধে ধ্বনি-ঝংকার বা অনুপ্রাস বা সাস্তমিলের বাহুল্য থাকাটাই যথেষ্ট নয়, বিবক্ষিত অভিধার অন্তরেও সেই সুর-ঝংকার থাকা চাই। সেজন্য চরম শব্দের সংঘটন আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীতে বাক্ ও অর্থের এই বিস্ময়কর সম্মিলন আমরা কেবলই দেখতে পাই। কবির সূক্ষ্ম শব্দ-চেতনা অভিপ্রেত ভাব ও অন্তরের উপলব্ধিকে সহজে ব্যক্ত করে। এ্যাবারক্রম্বি বলেন—A poet does not compose in order to make of language delightful and exciting music; he composes a delightful and exciting music in order to make what he has to say peculiary efficacious in our minds.···We can never be sure, from the music alone, that we are in the real presence of poetry. What does convince us of that is something in the meaning of the words."[৩৯]

বৈষম্যে সুষমার সমারোহ :

পদবন্ধে বিরোধাভাস ও অন্যান্য অলঙ্কার। ধ্বনি ও অর্থ সমন্বিত এই বিশেষ শব্দ ও পদবন্ধ পূর্ব অনুচ্ছেদে সংকলন করেছি। আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গেও আমরা বহু পংক্তি তুলেছি। এখানে পদবন্ধে, শব্দে শব্দে বিষমরূপের বিপুল দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক। সাবলীল সহজ প্রয়োগে (শব্দ . ও ক্রিয়ায়) প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে এরা ভিড় ক'রে আছে কাননব্যাপী পুষ্পের সমারোহের মতো। যেমন :

প্রেম পর্যায়ের গান থেকে : হাসির দহনে, করুণ অরুণ অধরে, নীরব সম্ভাবণা, পথের স্রোতেই ভাষা, নিবিয়া বাঁচিল, কুহরিল মৌন পাখি, কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, ভীষণ মধুর, ভালোবাসারই ঘায়ে, দুখের মাধুরী, করুণ হাসি, দুখের আলোয়, না-বলা বাণীর, নিষ্ঠুর সত্য, মধুর বেদন, অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, বিরহ মধুর হলো, কাছে পেয়ে কাছে না পায়, কাছে থেকে কাছে না পায়, কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে (প্রে ৩২০), নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে (প্রে ৩২০), আভরণে আজি আবরণ কেন তবে, বিনা সাজে সাজি (ঐ), সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, ইত্যাদি।

পূজা পর্যায়ে : মৌন মন্দ্র ভাষণে, নিজেরে হারায়ে খুঁজি, রুদ্র নিষ্ঠুর স্নেহ,

অঝরা অশ্রুনীরে, অলখ আলোকে, অরূপ কান্তি মুদিত লোচনে চাই, অরূপ মূর্তি, অরূপের কত রূপ, মরবারই আনন্দে রে, রুদ্র নিষ্ঠুর স্নেহ, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে, ও অকূলের কূল, অনাথের নাথ, পতিতের পতি, অবোলার বোল, ইত্যাদি।

আপাত-বিরোধ তাৎপর্যে বিরোধ-অবসান হ'য়ে কাব্য-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। উদ্ধৃত পদগুচ্ছ ও পংক্তিগুলোতে হয়েছে বিরোধাভাস ইত্যাদি। আমরা বলেছি, কেবলমাত্র আলংকারিক বিচারে রবীন্দ্র-বাক্-প্রকরণের মূল্যায়ন হয় না। প্রকৃত রসরূপের এবং চিত্র ও সঙ্গীত ধর্মের আকর হিসেবেই এদের মূল্য। এভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি অলংকারের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হ'লো।[৩৯ক]

বিষম: কারণ ও কার্যের আপাত-বৈষম্যরূপ কিংবা বিপরীত ফলের চমৎকার-সৌকর্য ; রচনারূপ হলো,—তুমি যে ভুলেছ, ভুলে গেছি তাই এসেছি ভুলে (প্রে ১৯০)—পুনঃপুনঃ উক্ত 'ভুল' শব্দের যমক-সদৃশ অলংকারের ওপরে সুন্দর ধ্বনিময় অর্থালংকার। দূরে যবে যাবো সরে তখন চিনিবে মোরে (প্রে ৩০৭), হাতের ধরা ধরতে গেলে, ঢেউ দিয়ে তায় দেই যে ঠেলে (প্রে ৩১৯), তোমায় নতুন করেই পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ। দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন (পূ ৪৫) ইত্যাদি।

অসঙ্গতি: কারণ ও কার্য ভিন্ন আশ্রয়ে, কিন্তু ভাবার্থের সুন্দর গুরুত্ব ও চমৎকারিত্ব। কাছে যবে ছিল পাশে হলো না যাওয়া, চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া (প্রে ১৯১)—কারণ ও কার্যের ক্রমটি চমৎকার, কাছে ছিল অথচ যাওয়া হয়নি, চলে যেতেই তার মূল্য স্মরণ করা। এমন দৃষ্টান্ত: পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রু সাগরে ভাসা (প্রে ৩১৩), তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই, কতই কি চাই। দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই (প্রে ২৪৩), নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলই করি অপমান (পূ ৪৯২) ইত্যাদি।

বিশেষোক্তি: কারণ সত্ত্বেও কাজ বা ফলের অভাব দ্যোতিত হ'লে হবে বিশেষোক্তি। গন্ধ আসে কেন দেখিনে মালা (প্রে ১৮৫), পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা (প্রে ১৮৫), আমি জলের মাঝে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি (প্রে ৩৯১) ইত্যাদি।

বিভাবনা: বিনা কারণেই কাজের উৎপত্তি বা ঘটনা, কিন্তু কল্পিত কারণ উল্লেখে বা অনুল্লেখে কার্য সিদ্ধির কবি-কল্পনা। যেমন: যারে যায় না পাওয়া

তারি হাওয়া লাগলো কেন মোরে (প্রে ১৮৪), যে গান কানে যায়না শোনা, সেগান যেথায় নিত্য বাজে। প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো সেই অতলের সভার মাঝে (পূ ৬০৭), ইত্যাদি।

অপহ্নুতি : সাদৃশ্যমূলক অলংকার হলেও ভাষা-ভঙ্গিমার আপাত-বৈষম্যের চমৎকারিত্ব দেখে আলোচ্য প্রসঙ্গে এই অলংকারটি নেওয়া হলো। ভাষা ও ভাবের সূক্ষ্ম ও বৌদ্ধিক কারুকৌশল এরকম অলংকারেও যথেষ্ট আছে। প্রকৃত (উপমেয়) কে অস্বীকার বা নিষেধ ক'রে অপ্রকৃত (উপমান) কে প্রতিষ্ঠা করার কাব্যকৌশলকে অপহ্নুতি বলা হয়। নহে, ছলে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি (পূ ১৩২),
দয়ার ছলে তুমি হয়োনা নিদয় (প্রে ২০২), মিলন ছলে বিরহ আনো (প্রে ১৬২), আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় (পূ ৩১৮),
কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া (প্রে ১৭২),
এ তো খেলা নয় খেলা নয় এ যে দহন জ্বালা সখি (প্রেম ৩১৫),
ওরা সবে যায় আর বাঁশি-পানে চায় হাসি ছলে (প্রে ১৭), ইত্যাদি।

কবিগুরু এই কবিত্বপূর্ণ কাব্য-কৌশলটিকে গানে এতবেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, পুরো এক একটি গানের প্রতি পংক্তিতেই এই বিষম বাক্-নির্মিতি দেখা যাবে। কবিতার বড় পরিসরে বিভিন্ন কাব্য-প্রকরণ প্রযুক্ত হয়, গানের স্বল্প পরিসরে সেগুলি পায় গভীরতা ও ঘনত্ব (intensity)। কাজেই এক একটি গানের প্রতি চরণে এই বাক্-প্রকরণ যুক্ত-হওয়া এক বিশেষ ঘটনা, যা অন্যত্র দুর্লভ। এরকম অনেক দৃষ্টান্তের একটি উদ্ধৃত করেছি প্রথমে—"আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় (বি ৮৯)। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ :

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয় ভরা।
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসা-হরা। (প্রেম ৩২৫)

সম্পূর্ণ গানটি বিষম-ভাবের দোলায় দোলায়িত। কেবল ভাব নয়, বুদ্ধির মূল ধ'রে নাড়া দিতে দিতে গানের গতি প্রতিটি চরণের (পংক্তির) ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গোপন অন্বেষণ, পাওয়া-হারানো, দূর-নিকট, শুষ্কতা-বর্ষণ ইত্যাদি দুই বিপরীত-এর দ্বন্দ্ব-বোধ ও তাদের সুমহান তাৎপর্য বুঝে উঠতে না পারলে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে প্রবেশ করা যাবে কি করে?

তৃতীয় উদ্ধৃতি :

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।
মিলনের মাঝে বিরহ কারায় বাঁধা রে।
সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধারে।
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারি বাণী যে,
জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই—
আমার ভুবন রবে কি কেবলই আধা রে। (প্রেম ২৬৯)

এরকম প্রত্যেক চরণে বিপরীত ভাষণ-শিল্পের সমারোহ আরও অনেক গানে প্রকটিত। সম্পূর্ণ গানটিই এই অসামান্য বিষম-ভাষণ-কৌশলের মাধ্যমে গভীরার্থ ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। এরকম কিছু গানের প্রথম পংক্তি উল্লেখ করা হলো :

আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে (পূজা ৫৬)
না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তেয়াগিলে আসে হাতে (প্রেম ২৬১)
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু (পূজা ৯০), চোখের
আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে (পূজা ২৫৩), সুখের
মাঝে তোমায় দেখেছি দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে (পূ+প্রা৭৪)

সম্পূর্ণ এক একটি গানে এত বৈপরীত্যের আভাস-তত্ত্ব, মনন-শীলতা, বৌদ্ধিক চেতনা ও গুরুভার দার্শনিক প্রত্যয়; অথচ সজীব সতেজ মহিমা ও রসব্যঞ্জনায় এবং বিনম্র কবিব্যক্তিত্বে তারা কতো সংবেদনশীল ও আনন্দকর। বাংলা কাব্য-সংগীতে এরকমটি কখনও দেখা যায় নি। আবার ভাবোপযোগী সুরারোপ ক'রে কবি এখানে অনির্বচনীয় আনন্দলোক সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন। এমন পূর্ণায়ত সার্থক সফল রচনা কবিতার রাজ্যেও সচরাচর অপ্রতুল।

আর একটি প্রসঙ্গ :

বিদায় বিষণ্ণতার পটভূমিকায় সংস্থাপিত কবির আশাবাদ তাঁর বেশী সংখ্যক গানে নানা তাৎপর্যে প্রকাশ লাভ করেছে। সহৃদয় পাঠকের চিত্ত এ প্রসঙ্গটি নিয়ে বিচলিত হবে। কবি এ ধরণের গানে ইমন, পূরবী, প্রভৃতি করুণ রসের রাগিণীর সুর সংযোগ করেছেন। বাণী ও সুরের সঙ্গে বিদগ্ধ দার্শনিকতা মিমিশ্রিত হ'য়ে নিবিড় মধুর রসলোক রচনা ক'রে দিয়েছে।

আমার জীর্ণপাতা যাবার বেলায় বারে বারে,
ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগর তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁজের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠলো তারা সারে সারে। (বিচিত্র ২৮)

ইমন সুরে ধ্বনিত এই বেদনার্দ্র অনুভূতি পরম সান্ত্বনায় উত্তরণ করেছে। জগতে কিছুরই শেষ নেই। বাহ্যতঃ কোন কিছুর আপাত ধ্বংস ও বিলয় দেখা যায়; মরজগতে আপাত মৃত্যুর ঘনঘটা; আসলে কোন কিছুরই বিলয় হচ্ছে না। মহাবিশ্বের গতি-আবর্তে এ এক অক্লান্ত খেলা। এ খেলারও শেষ নেই। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে মরণে ফল ফলবে।
শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? (পূজা ৬০৬)

কিংবা সব কথা সব কথার শেষে, এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।
শুদ্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বলো। (পৃ ৬০৫)

কিংবা তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।

ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের—
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন।
ও মোর ভালোবাসার ধন। (পূজা ৪৫)

এই প্রসঙ্গেই বলি, কবির অধিকাংশ গানে—বিশেষ ক'রে পূজা, প্রেম, বিচিত্র, প্রকৃতি পর্যায়ের গানে হাসি ও অশ্রু, কিংবা হাসি ও কান্না—এই বিপরীত কথা দুটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে; কোথাও সম্মিলিত তাৎপর্যে তারা প্রোজ্জ্বল। হাসি ও অশ্রু বোধকরি কবির উপলব্ধির নিবিড় দুটো আধার। এবং তাষানুষঙ্গ হিসেবে ব্যথা, বিরহ, কাঁদন, বিদায়, বেদনা, অশ্রুজল, বিচ্ছেদ, কান্না ইত্যাদি নিবিড় ও করুণ শব্দগুলি অধিকাংশ রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে যুক্ত আছে। দুখ জাগানিয়া এই গানগুলোতে আছে কান্নাধারার দোলা। হাসি ও আনন্দের সঙ্গেও করুণ মাধুরী প্রায় সব গানেই পেলব মহিমা প্রকট করেছে।

হাসি ও অশ্রু : মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি (প্রে ১৮৭)
চোখের জলে সে যে নবীন রবে (প্রে ১৭৯)
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা (প্রে ১৫৭)
রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া সুখের অশ্রুজলে (প্রে ৩১৮)
আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে (প্রে ৭৮)
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায় (প্রে ১২০)
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে (প্রে ১৫৬)
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল (প্র ৮১)
হাসি ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে (প্র ১৪৪)
ফাগুন দিনে গো কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি (প্র ২০১)
অশ্রু-ধোওয়া কাজল রেখা আবার চোখে দিক্‌না দেখা (নাট্য ৮২)

অধর ও নয়ন প্রত্যক্ষ রূপকল্পে বা ইমেজারিতে প্রোজ্জ্বল ব'লে এই শরীরাঙ্গের ক্রিয়াগুলো (অর্থাৎ হাসি ও অশ্রু) বিমূর্ত থেকে প্রতিমায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। "আঁকিও হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে"—হাসির একটা রৈখিক রঙ আছে, তাকে বিষম উপাদান 'চোখের জলে'র সঙ্গে কম্পোজিশান ক'রে নিয়ে আঁখির কোণে লাগানো যায়,—অশ্রুধোওয়া কাজলরেখা। এ আঁখিতে বাহ্য-বিমোহন কজ্জল আঁকা হয়নি, সূক্ষ্ম চেতনার রূপ-রসের ব্যঞ্জনা সে অঞ্জন-রেখায়। সেখানে সুখ ও দুঃখের নিবিড় আবেগে ও আকুলতায় হাসির রঙ্‌ ও চোখের জল একাকার হ'য়ে ছল্‌ ছল্‌ করে কাঁপছে। অপূর্ব!

তিন

বিশেষণ-প্রয়োগ, পদবিন্যাস কৌশল ও বাগ্‌বিভূতিতে অসামান্য শিল্পায়ন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপনির্মিতির বিভিন্ন উপাদানগুলো কবির অন্তঃপাতী অভিজ্ঞতা, মনন ও জীবন রস-প্রতিবিম্বী শক্তিরই রূপভেদ। শব্দশক্তির দিব্যদ্যোতনা, ভাষার সূক্ষ্ম বিভূতি ও সুরধর্মকে তিনি অক্লেশে অবলীলাক্রমে তাঁর বিশাল ব্যাপক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বীজাকারে ছড়িয়ে ফল ফলিয়েছেন বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে। তাঁর প্রচণ্ড উপলব্ধির সমপাতী ভাষা-প্রকরণে দুটো উপাদানকে বিশেষভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়, একটি চিত্র, অন্যটি সংগীত। বাহ্য ও সূক্ষ্ম ভাষা-বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যসংগীতের যে বহু-প্রকরণ লীলা, তাকে বিশ্লেষণের উপযোগিতা যে কতখানি, তা আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছেদ-গুলোতে অনেকটা ব্যবহারিক বৈশদ্যে ব্যাখ্যা করেছি। এখানে বিশেষণ ও পদ-সংগঠন এবং বাগ্‌বিভূতির অসামান্যতা বিষয়ে তথ্যগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। বাক্‌পতি-র এক অসীম শক্তির রূপ দেখে আমরা বিস্মিত না হ'য়ে পারি না।

এখানে ভাষার সাধারণ ও দুরূহ রূপশৈলীর পর্যালোচনা করতে সর্বাগ্রে যে ব্যাপারটির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গিমা। কয়েকটা পদ বাক্যে প্রযুক্ত হ'য়ে অর্থ প্রকাশ করলেই কাব্যের সব প্রকাশ হলো না। শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্,—কথাটির তাৎপর্য গভীরতা-ব্যঞ্জক। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রিগণ সব রূপোপাদানগুলোর অনেক ঊর্ধ্বে ভাব-ধ্বনি ও রসগত ব্যঞ্জনাকে কাব্যাত্মা ব'লে প্রতিপন্ন করেছেন। বোধকরি, কুন্তকই অনেকটা স্পষ্টার্থে তাঁর বক্রোক্তিজীবিতবাদে কাব্যের বাক্‌রূপের প্রকরণ-শৈলীর আবশ্যিক প্রাধান্যের ইঙ্গিত দিয়ে গেছিলেন। কাব্যাত্মার স্বরূপ প্রণিধানে শাব্দিক বক্রতা বা বিদগ্ধভঙ্গির গুরুত্ব কতখানি তা পাশ্চাত্যে অধিকতর আগ্রহে আলোচিত হয়েছে; করেছেন এলিয়ট প্রমুখ রূপবাদী কবিগণ। 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'—বাক্‌ ও অর্থের সমন্বয় ও স্বরূপ বিশ্লেষণে কত বিচিত্র মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

"অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির অদ্বৈত যে সাত্ত্বিক সংকল্পের পরাকাষ্ঠা, তার প্রত্যেক পর্বে ভাবনা ও বেদনার ঐক্য তো অপরিহার্য বটেই, এমনকি তাতে ইতর বিশেষের সাযুজ্য অথবা অন্তর-বাহিরের মিলন পার্বতী-পরমেশ্বরের মতোই নিবিড়; এবং বাগ্‌-অর্থের উদ্বাহবন্ধনে কালিদাস ও মালার্মে প্রথম ও শেষ

ঘটক নন, তাঁদের পূর্বে ও পরে যে সৎ কবিদের দেখি, তাঁরাও সেই বৃত্তির উপজীবী। সুতরাং এ-রকম কোনও ভাব বা আবেগ নেই, যা কায়মনো-বাক্যের সহযোগ-ব্যতিরেকেও, কেবল কাব্য রচনার উপযোগী; এবং ছন্দ ও অনুপ্রাস, উপমা ও রূপক তখনই সার্থক, যখন তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত অবৈকল্যের ঐকান্তিক উপলব্ধি অন্যের গোচরে আসে। উপরন্তু বচনমাত্রে বিশ্লিষ্ট শব্দের উদ্দেশ্যমূলক সন্নিপাত; এবং যদি মানি যে, সাধারণ শব্দ স্বাতন্ত্র্যসূচক, তবে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদির অন্বয়ে হয়তো বা একটা অপ্রাকৃত পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। কোলরিজ আবার ভজিয়েছিলেন যে, কবিতা শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস, এবং সেই শৃঙ্খলায় ইচ্ছাশক্তির স্বাক্ষর যতই স্পষ্ট হোক, কবির শব্দ নির্বাচনে ছন্দের প্রভাব আরও পরিষ্কার। অন্ততঃপক্ষে তাই ভালেরি-র বিশ্বাস; এবং সংগীতে স্বরের অনুক্রম যেমন আত্মনিয়ন্ত্রিত, তেমনই কাব্যের শব্দসমষ্টিও অন্যোন্যনির্ভর বলে তিনি প্রচার করেছিলেন যে উভয়ে সমান সাবলম্বী, উভয়ত্র মূল্যের ভিত্তি নিজস্বে।"৪০

কথাগুলি মনে রেখে এবারে রবীন্দ্রসংগীতে বাক্-প্রকরণ ও পদবিন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ লেখা গেল।

প্রথমতঃ উক্তি ও উপলব্ধির বাচনিক (শাব্দিক/ভাষাগত) রূপ একটি উদ্দেশ্যমূলক সন্নিপাত, রবীন্দ্রসংগীতের পদবিন্যাসের ক্রম ও পারস্পরিক মিলে একটা গভীর উদ্দেশ্য সক্রিয়। কোলরিজের কথা the best words in their best order রবীন্দ্রসংগীতে বহুপ্রকরণ-বৈচিত্রী হয়ে উঠেছে। ভাবকে উপলক্ষ্য ক'রে ভাষাটাই অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ব'লে অনেক সময় পাঠকের ভ্রান্তি আসতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাব ও রূপ (কন্‌টেণ্ট ও ফর্ম) অকল্পনীয়রূপে অদ্বৈত।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতির মধ্যে বিশেষণের গুরুত্ব কবিকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখতে পাই। এক, দুই, তিন, চার এবং তারও বেশি বিশেষণ কবি স্বচ্ছন্দভাবে গানে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষণ প্রয়োগ গদ্য-গল্প-নাট্যসংলাপ এবং কবিতাতেও সমানগুরুত্বে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষণে সবিশেষ বলতে কবির অসীম উৎসাহ।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পদ বা শব্দ ধ্বনি, অনুপ্রাস, মিলের ভূমিকা নিয়ে পদবন্ধে সংগীত-ধ্বনি সম্ভাবিত করেছে। যা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে ব্যাখ্যা করেছি।

চতুর্থতঃ পদবন্ধে পদগুলির ক্রম (order) নিয়ে কবি বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন ব'লে মনে করা যেতে পারে। সংগীতের কবিতাকে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য দান করা যায়, কবি অবলীলায় তা করেছেন। কবিতা ও গদ্যের ভাষায় তিনি যে বিচিত্র প্রকরণ-কৌশল সম্পাদন করেছেন, গানেও তাই দেখি।

পঞ্চমতঃ রবীন্দ্রসংগীতের ভাষায় এসে মিশেছে প্রাচীন বাংলা, পদাবলীর ভাষা, তৎসম, তদ্‌ভব, কিছু দেশী ও বিদেশী শব্দ ; কার-ও সঙ্গে কোনো গরমিল নেই এতটুকু।

ষষ্ঠতঃ রবীন্দ্রসংগীতের ভাষায় একটা তীব্র চলিষ্ণুতা আছে। শব্দ, পদবিন্যাস, ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষণ ইত্যাদিতে চলিতবাংলার সহজ প্রভাব পড়েছে। গুরুগম্ভীর ভাষাভঙ্গিমার সঙ্গে আটপৌরে হাল্‌কা ধাতু ও শব্দের সংযোজনাও দেখা যায়।

গীতিকবিতা অপেক্ষা কাব্যগীতির ভাবপরিমণ্ডল সীমাতিশায়ী ও বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত। অথচ রূপাঙ্গিকের মানদণ্ডে গীতিকবিতা অপেক্ষা কাব্যসংগীতের পরিসর সংকীর্ণ ; প্রত্যেকটি সংগীতের বাচনিক রূপ সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ স্তবকবন্ধ প্রায় নির্দিষ্ট। কাজেই ভাবের সমারোহ, সুরের উজ্জীবন ও রসের উৎসকে রক্ষা করতে ভাষাকেও তেমনি হ'তে হয়েছে স্থিতিস্থাপক, শক্ত ও কোমল, তীক্ষ্ণ ও পেলব এবং সর্বাবয়ব অলংকারধর্মী। কম ভাষায় অনেকবেশি ভাব প্রকাশ করতে হয়েছে ব'লে ভাষা হয়েছে সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাধর্মী। রবীন্দ্রনাথ ভাষা রচনার অতুলনীয় শৈলী দেখিয়েছেন তাঁর গদ্য, নাটক, গল্প, কবিতা সর্বত্র। স্টাইল ও বাগ্‌বিভূতির অধিক সফলতা কোথায়, আমরা বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতি-সহ তুলনামূলক আলোচনা করেছি। তাঁর গানে সর্বজন-ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, দেশী বা তদ্‌ভব শব্দগুলো কেমন অলৌকিক বৈশিষ্ট্যে ও ঐন্দ্রজালিক মায়ায় ধরা পড়েছে, সাধারণ পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিত সেই কারুকরণে সামান্যতম পরিমার্জন ও সংযোজনের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষানির্মান এমন এক স্বজ্ঞাপ্রসূত, যার নাগাল কোনো বিদগ্ধ মনীষী সমালোচকেরও পাওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণ-শৈলীতে এবং বাগৈশ্বর্যে এমন সব আশ্চর্য উপাদান আছে, যা কোনো শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক কিংবা কবির পক্ষেও তার সামান্য অংশ অর্জন করা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। তিনি তাঁর স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রী ক্ষমতায় শব্দশক্তিকে যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছেন।

সুকঠিন ঘননিবদ্ধ গাম্ভীর্যময় তৎসম পদবন্ধ অবলীলাক্রমে সংগীতের উপযোগী হয়ে উঠেছে। সুরের দিকে তাকিয়ে ভাষাকে অত্যন্ত পেলব ও সরল হতে হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংগীতে তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে গীতভাষার জগতে, কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটালেন। আবার, সুরের উপযুক্ত হবে না, এমন ভাষাকেও রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। বলেছেন "আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব, সেই সব কথা ব্যবহার করেছি, সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ ক'রে বসবার জন্যই প্রতীক্ষা করে।"

সংগীতের বাক্‌শিল্পের ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য-গুণ এতকাল কেউ যাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি, রবীন্দ্রসংগীতে তা সম্ভব দেখে তাঁরা বিস্মিত ও পুলকিত হবেন। শুধু তা-ই নয়, ভারতীয় রাগরাগিণী ও বিভিন্ন উৎস থেকে সুর ও সুরের কাঠামোকে নিয়ে তিনি বাগৈশ্বর্যের সঙ্গে সন্নিপাত ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতে সুর ও ভাষা কোন্‌টি বড়, এ পার্থক্য ও বিভেদ খোঁজা অনাবশ্যক মনে হবে। কাজেই একথা মনে রেখে আমরা তাঁর ভাষণ-প্রকরণ-শৈলী পর্যালোচনা ক'রে সমগ্রের স্পর্শ নিতে চেষ্টা করবো।

আমাদের প্রধান আলোচনা, পদবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অর্থাৎ বিশেষণকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ্য-বিশেষণ বিন্যাসের দ্বারা ভাষার রূপগত ও ভাবগত মূল্য সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে। সংস্কৃতভাষার শব্দধ্বনির সূক্ষ্ম ক্রিয়া ও সুরধর্ম সম্পর্কে[৪১] এবং বিশেষণের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁর ওপর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরও ভাষার প্রভাব অনেকে লক্ষ্য করেছেন। আমি বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রভাবটা বড় কথা নয়, অনুপ্রেরণাই ছিল আসল কথা। নকলনবিশি নয়, প্রচণ্ডতম আত্তীকরণ। গীতগোবিন্দের কান্তকোমল পদাবলী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। My Reminissence গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'the sound of the words and the lilt of the metre filled my mind with pictures of wonderful beauty."

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি অনেক শব্দ জয়দেব ও কালিদাসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন।[৪২] ডঃ সেন তার বক্তব্যকে উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অলস, নিবিড়, তরল, তল, তিমির, পুলক, বিপুল প্রভৃতি শব্দ জয়দেব থেকে নেওয়া। যেমন: অলস নিমীলিত

লোচনয়া, দোর্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তন পীড়নানি ইত্যাদি। শ্রীসেন আরও বলেছেন যে, বিরহ, স্তিমিত, চির, নিত্য, বলাকা, পাণ্ডু, প্রভৃতি শব্দ কালিদাস থেকে নেওয়া। মহাকবিদের মধ্যে যুগাতিশায়ী লেনদেনের সম্পর্কের ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করার সার্থকতা আমি দেখি না। বিশাল রবীন্দ্ররচনায় কোটি কোটি বাক্‌রূপের প্রকরণ-লীলায় তিনি নিজেই লীলাকারী। আমরা তাঁর সংগীত ধরেই সেই ক্ষমতাকে বুঝে নিতে পারবো। সংস্কৃত ভাষাদর্শের স্বীকরণ তাঁর গানেই অধিক। ক্ষুদিরাম দাসও এই কথা বলেন, "কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমৎ-কারিত্বের দিকটি অধিকতর সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভাষার সহজ, ঋজু ও স্বচ্ছন্দ চলন ও বেগ ভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটনে অধিক সক্ষম। তিনি বলেছেন, গল্পে চিত্র ফোটাতে এবং সংগীতে অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করতে সংস্কৃতভাষা সক্ষম হয়নি। ইংরেজী লিরিকের মতো কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর গান ও জয়দেবের পদগান কিছুটা সার্থক হলেও "বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।"[৪৪] বৈষ্ণব পদ, বাউলপদ, সংস্কৃতগান প্রভৃতির মধ্যে ভাবের যে প্রতিরূপ, তা রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছে। "যে মধুর ভাব ও মধুররস বাঙালীচিত্তের সিদ্ধভাব ও রস, যে ভাব ও রসের নিবিড় পরিচয়ে বাংলায় সাধন-সংগীতের অনন্যতা, পদাবলীগীতি, রবীন্দ্রগীতি ও বাউলগীতি সমভাবেই এই একই ভাব ও রসের আধার।"[৪৫] কবির এই সিদ্ধ-ভাব ও স্বীকরণ-প্রক্রিয়া তাঁর সহজ সরল ভক্তি-সংগীত বা প্রেম প্রকৃতি পর্যায়ের গানের ভাষার মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। এই ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পণ্ডিতাচার্য বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন—

"এই সময়ের (গীতাঞ্জলি পর্ব) ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, অলংকার বিহীন প্রাণের ভাষা। এই ভাষার সহিত তুলনা করা যায়, শুধু নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, দ্বিজ বলরাম দাস প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের সহচরদের ভাষা। গোবিন্দদাস কবিরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কৃত্রিম আলংকারিক ভাষা ছাড়িয়া সরল প্রাণস্পর্শী ভাষাতেই তাঁহার প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা লিখিয়াছেন। এই দুইখানি গ্রন্থে যেমন দৈন্য প্রকাশ করা হইয়াছে, অকপট অন্তরে ভগবৎ কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও সেইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। প্রাক্‌-গীতাঞ্জলি যুগে অথবা গীতালির পরের যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যে এরূপ নম্রতার ভাব পাওয়া যায় না।"[৪৬]

রবীন্দ্রনাথের সীমাতিশায়ী ভাব-ব্যঞ্জনার সন্নিপাতে তাঁর বিরাট বাক্‌নির্মিতি ও বহু-প্রকরণ-শৈলীর বিচার্য হওয়া আবশ্যিক। সেই ভাব ও রূপের প্রকাণ্ড আধারে ভাবুক, কবি, দার্শনিক, শিল্পী ও আলংকারিক-সত্তা ধরা পড়েছে। কিংবা বলা যায়, বহু প্রতিভার স্বীকরণ-ক্রিয়ার পর রবীন্দ্রনাথ একটি সমগ্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিভা। ঐতিহ্যের প্রবাহে ব্যক্তিগত প্রতিভার উজ্জীবনকে বিশেষ মূল্যে বিচার করতে হবে। কেবলমাত্র প্রভাবের কথাটি ব্যক্ত ক'রে ক্ষান্ত হ'লে যুগোত্তীর্ণ প্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন হয় না। ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বনিয়াদের ওপর অধিষ্ঠিত থেকেই কোনো প্রতিভার সম্পূর্ণতা, গতি ও সিদ্ধি আসে না। প্রতিভা গতিশীল। প্রাচীনকে বারংবার ছাড়িয়ে যাওয়াই তার ধর্ম। রবীন্দ্রপ্রতিভা তেমনই এক বিস্ময়কর ঘটনা। যুগের ঐতিহ্য শিক্ষা-ভাবনাকে স্বীকার ক'রে আপন মহিমায় অজস্র বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে রবীন্দ্রপ্রতিভা। অতীত ও ভবিষ্যতের দূর-বিস্তৃত প্রশস্ত পথ জুড়ে তার গতির ও চলার অধিকার সাব্যস্ত হ'য়ে গেছে। এই শাশ্বত অধিকার অর্জন করতে ভাষাসম্রাটকে সংগ্রাম ও সংগঠন-চেষ্টা করতে হয়েছে তাঁর সমস্ত জীবন ধ'রে। অলৌকিক প্রতিভাধরের পক্ষেই এটা সম্ভব।

বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি শব্দসৃষ্টিতে কবির চিত্তচেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে, কেবলমাত্র শব্দ-প্রকরণ বিশ্লেষণ ক'রে আমরা তা ধরতে পারি। বিশেষ্য ও বিশেষণের লঘু-গুরু গুণের ক্রম সাজিয়ে নিয়ে তাঁর দুরূহ বাগৈশ্বর্য পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করা যাক্। কবিতা ও গানে সরল মধুর কোমল শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে। পদাবলীর যে ধরণের শব্দ-প্রকরণ রবীন্দ্রসংগীতে স্পষ্টীভূত, সেরকম শব্দের একটি সাধারণ তালিকা 'পদরত্নাবলী' থেকে নেওয়া গেল।

থির বিজুরি, পরাণ পুতলী, দূতরপন্থ গমন ধনি, কনকবরণ, নিছনি দিয়ে, স্বপের পাথারে, চীত নহে থির, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল, অরুণ কিরণ দেখি, চিত্রবিচিত্র নাট, চরণে চাঁদের হাট, রজনী শাঙনঘন, ঘনদেয়া গরজন, অঙ্গ অবশ ভেল, আকুল পরাণ মোর, কিবা সে মধুর বাণী, কতরঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়, অরুণ অধর মৃদুমন্দ হাসে, চঞ্চল নয়ন কোণে, মন্থর চলনখানি, বিনা মেঘে ঘন আভা, অধরে মধুর মৃদু হাস ইত্যাদি।[৪৭] বিভিন্ন বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম পদগুলি এখানে বিশিষ্ট স্বভাব-অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়েছে, পদাবলীর ভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রেই তারা সংযুক্ত।

রবীন্দ্ররচনায় পদাবলী, গীতগোবিন্দ কিংবা কালিদাসের ভাষা নতুন ক'রে

নতুন রূপে ছায়া ফেলেছে। এখন বিশেষণ সর্বনাম ও বিশেষ্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

বস্তু, ভাব, গুণ, জাতি, কার্য ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ্য, এবং গুণাদি বাচক, উপাদান সংখ্যা পরিমান পূরণাদি বাচক বিশেষণ, সেই সঙ্গে সর্বনামের বিপুল প্রয়োগ রবীন্দ্রসংগীতে আছে। গানে বহুবার আবৃত্ত, বহু-ব্যবহৃত সাধারণ ও বিশিষ্ট শব্দ বা পদবন্ধগুলি সংকলন করা গেল এক বা একাধিক দৃষ্টান্ত সহযোগে। সাধারণভাবে কয়েকটি শ্রেণীগুচ্ছে শব্দগুলিকে সাজিয়ে নিচ্ছি।

বিভিন্ন পদ ও বিশেষণ।

(ক) অতি, অতো, অনেক, অমন, অকারণ, আরো, এমন, এবার, এমন, এমনি, এখন, এখনো, এত, কতো, কবে, কখন, কেন, কেমন, কেমনে, কোথা, কোথায়, কোন, মতো, মতন, যতো, যখন, যতবার, যতখন, সব, সকল, সবে, সেই যে, সেই তো, সে, সেই, সদা, সকলি, অবেলায় ইত্যাদি অতি সহজ সাধারণ পদগুলিও প্রয়োগ-গুণে ভাববাহী গুরুত্ব লাভ করেছে রবীন্দ্রসংগীতে।

দৃষ্টান্ত : অতি নির্মল, অতি মঞ্জুল, অনেক দিয়েছ নাথ, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে, অকারণে অকালে মোর, আরো একটু বসো, আরো আরো প্রাণ, এমন দিনে তারে বলা যায়, এমনি করেই যায় যদি দিন, এখনো ঘুম ভাঙেনি তোর যে, এত আলো জ্বালিয়েছ, এবার সখি সোনার মৃগ, কেন ধরে রাখা, কেমনে রাখিবি তোরা, কবে কোন মধুরাতে, কত যে তুমি মনোহর, কখন বসন্ত গেল, ময়ূরের মতো নাচেরে, মেঘের মতন যায়, সকলই ফুরাইল, আমার প্রাণের সকল সরে, কোথা যে উধাও হল, সে যে বাহির হল, সে আমার গোপন কথা, সেই তো বসন্ত ফিরে এল, সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে, সকলি ফুরালো স্বপন প্রায়, অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে, ইত্যাদি।

(খ) অথির, অধীর, আকুল, ব্যাকুল, অস্থির, উতল, উতলা, উথলা, উছল, উদাস, উদার, কম্পিত, চকিত, চমকিত, চপল, ত্রস্ত, মত্ত, পুলক, বিলোল, বিহ্বল, বিভল, বিভোল, বিভোর, বিবশ, ভীরু, শিথিল, দিশেহারা, অজানা, অচেনা, অনিমেষ, অলক, অমল, অলখ, পেলব, ব্যাকুলিত, অবাক।

দৃষ্টান্ত :

আকুল আলোয় দিশেহারা রাতে, তৃষিত আকুল আঁখি, ব্যাকুল কর হানি, ব্যাকুলিত ধরণীতে (ভূমিকা), অধীর অদর্শন তৃষা, আকুল কেশের পরিমলে, উতল আঁখি উছল করুণায়, উতলা কলাপী, উতলা উত্তরীয়, গান তুলিছে নীল আকাশের হৃদয় উথলা, ব্যাকুল হাওয়ায় উতল পথের চিহ্ন ধরে, আমার ভাঙা উদাস সুরে, উধাও হাওয়ার পাগলামিকে, চমকিত মন চকিত শ্রবণ, চঞ্চলিত এলোকেশে, জনপদবধূ তড়িত চকিত নয়না, চকিত ইসারায়, বজ্র সচকিত ত্রস্ত শর্বরী, মত্ত হাওয়ায় ছন্দে (প্র ১০৫), নবীন চোখের চপল আলোয়, চপল তব নবীন আঁখি দুটি, পুলকিত চম্পার, নূতন পাতার পুলক হাওয়ার পরশনে, বিভল হাসিতে, বিহ্বল বায়ে, বিলোল বিভোল (প্র ১), পুষ্প বিভোর ফাগুন মাসে, জ্যোৎস্না বিবশ নিশীথে, শিথিল কোমল বহিছে বায় (প্র ১০৭), ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে, অজানাখনির নূতন মণির, অচেনাকে ভয় কি আমার, অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে, অমল কমল সহজে জলের কোলে, পেলব সীমানাটিতে, অবাক আলোর লিপি।

(গ) অতল তল নিতল অসীম অকূল অগাধ অনন্ত গহন গোপন গভীর ঘন সঘন অগম দূর সুদূর।

দৃষ্টান্ত : অতল রোদন, নীল অতলের কূলে, অকূল অবকাশে, অকূল তিমিরে, নিতল নীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী, অতি অগাধ আনন্দ রাশি (পূ ৩৭১), অগাধ জলের তলা হতে, গভীরের গোপন ভালবাসায় (প্র ৮৯), শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, জাগো তামস গহন নিমগ্ন, সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়, ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে (প্র ১০৫), ধরায় তখন তিমির গহন রাতি, গোপন ব্যথা গোপন গানে, আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে, গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা, জলভেজা কেতকীর দূর সুবাসে, মধুর সুদূর হাসি (প্র ২৬৪), বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে (প্র ১২৫), দূর রজনীর দূর ফাগুনের (বি ৭২)ইত্যাদি।

(ঘ) অবাক অবুঝ অলস আলস অধীর অধীরা কাতর করুণ সকরুণ কোমল চপল তরল বিধুর বেদন বেদনা বিরহ বিবশ।

দৃষ্টান্ত : অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে, আলস ভরা অবহেলায়, অলস লিপি লেখা, অবাক আঁখি দুটি করুণ করে, সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়, করুণ কোমল এসো, করুণমধুর অধীর তানে বিরহ বিধুর পাখি, বিরহ কাতর শর্বরী, বিরহ বিশংকিত করুণ কথা, ক্লান্ত কপোত ডাকে করুণ কাতর গানে, বেদন বাঁশি উঠলো বেজে, কী বেদনা সে কি জান, চপল তব নবীন আঁখি, উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা (প্র ১০৪), কাননবীথির বিবশ বাতাসে (প্র ১৬০), তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা (প্র ১১০), তরঙ্গিনী ধায় অধীরা।

(ঙ) বিপুল পরম দারুণ বিজন নির্জন নিবিড় নীরব বিভৃত নিঃসীম তিমির নিশি।নিশীথ নিস্তৃত নিশিথিনী মধুর মধুরিমা তনিমা ঘনিমা মাধুরী মেদুর মদির মদিরা মুখর সুরভি সৌরভ।

দৃষ্টান্ত : স্বপ্নের তীরে বিপুল অন্ধকার বাহি (প্রে ২২৬), বিপুল তব শ্যামল স্নেহে, গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন, বিপুল গান, বিপুল ভবিষ্যৎ, বিপুল ঢেউ, বিপুল তরঙ্গরে, পরম শেষের অন্বেষণে, দারুণ দাহন বেলা, দারুণ গ্লানি, দারুণ অগ্নিবানে রে, বিজন বাতায়নে, বিজন বেদনায়, ক্লান্ত কুজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা, নির্জন উৎসবে (বি ৯৬), নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ, নিবিড় সুরে, নিবিড় সুধায়, সেদিন তিমির নিবিড় রাতে (প্রে ১০৫), নীরব দীঠে (প্রে ৯২), ভীষণ নীরবে, নীরব রজনী, নীরব নীড়ে, এই তারা হারা নিঃসীম অন্ধকারে, নিশীথ তিমির মালিকা (প্র ১৫০), নিশি না পোহাতে, মধুর নীরব, আঁখিতে আঁখিতে মদির মলিন মধুর হুতাশে মধুর দহন, মত্ত মদির বাতাসে, সংগীত মধুরিমা, তিমির মেদুর বনাঞ্চলে, মৃদু মধুর মদির হেসে, এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ, নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে, তরল প্রলয় মদিরা, মুখর তরঙ্গিনী, বিধুর ব্যাকুল মধু মাধুরী, এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ, শিউলি সুরভী রাতে, ক্ষিতি সৌরভ রভসে।

(চ) রাঙা রঙিন নীলিমা নীল সুনীল শ্যামল সবুজ সোনালি রুপালি লাল রক্তিম নীলিমা।শ্যামলীম কালো সাদা ধলো ধূমল ধূসর বসন্তী।

রঙ্ বিষয়ক :

'রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি' (প্রে ১১২)—কবির ভাষণ-শিল্প রঙে রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে; শুধু তাই নয় সে চিত্রকল্প কত সুগভীর তাৎপর্যে রচিত। মনের পর্দায় তরল কম্পিত মায়াবিনী মরীচিকা, দূর-বিস্মৃতির ওপার থেকে কোন উদাসিনী বিদেশিনী মনে মনে আভাসিত—এমনকি তাকে জানা না থাকলেও জন্মজন্মান্তরের চৈতন্যধারায় মগ্ন সে—কম্পিত রঙের রেখায় মনে মনে আভাসিত হচ্ছে। অপূর্ব ব্যঞ্জনা। সাধারণ শব্দগুলি অসাধারণ ভাবব্যঞ্জনায় কতখানি গুরুত্ব ও গৌরব লাভ করেছে—আমরা এই সংকলনে তা লক্ষ্য করেছি। রঙ্ বিষয়ক শব্দগুলোর প্রচুর দৃষ্টান্ত চিত্রকল্প অধ্যায়ে সংকলিত। যাই হোক, এখানে সেরকম দৃষ্টান্ত সেজন্যই থাকছে না।

আরও অনেক বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি পদ যেগুলি রবীন্দ্রসংগীতে বারংবার ব্যবহৃত, তাদের একটা তালিকা করতে পারি। ব্যবহৃত এই সরল সাধারণ শব্দগুলি গানে অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে।

(ছ) অগ্নি, অনন্ত, অজানা, অকারণ, অনেক, অমল, অমৃত, অরূপ, অরুণ, অলখ, অল্প, অশান্তি, অশ্রু, অসীম, আগুন, আঁধার, অবকাশ, আঁখি, আনন্দ, আলো, আলোক, উতলা, উতরোল, উল্লাস, উন্মুখ, কখন, কঠিন, ক্লান্ত, ক্লান্তি, কান্না, কুসুম, কেবল, কোথায়, কাল, ক্ষণ, খেলা, ক্ষুব্ধ, কুণ্ঠিত, গন্ধ, গোধূলি, গভীর, গহন, গগন, গোপন, গান, ঘন, ঘুম, চপল, চঞ্চল, চোখ, চরণ, চাঁদ, চিত্ত, জগৎ, জোছনা, জীবন, জাগরণ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, তিমির, ত্রস্ত, তৃষ্ণা, স্তিমিত, দলিত, দুরন্ত, দুরাশা, দুঃখ, দয়া, দিনান্ত, দিন, দূর, ধূসর, নব, নতুন, নিদ্রা, নিবিড়, নিঠুর, নগ্ন, নিভৃত, নিমেষ, নির্মল, নীল, নীলাঞ্জন, পথ, পাখি, পাগল, পিপাসা, পুরানো, পুরাতন, প্রচণ্ড, প্রাণ, প্রেম, ফুল, বন, বজ্র, ব্যর্থ, বিমুখ, বঁধু, বন্ধু, বাদল, বাঁধন, বাঁশি, বিদায়, বেদনা, বিজন, বিফল, বেসুর, ভুল, ভোর, মধু, মধুর, মরণ, মায়া, মন্থর, মুখর, ম্লান, মৌন, মেঘ, রাত, রজনী, শীত, শীতল, শান্ত, শূন্য, শুভ, শুভ্র, শেষ, সঘন, সীমা, সুন্দর, সুর, স্মৃতি, হাসি, হৃদয় ইত্যাদি। শব্দগুলির দৃষ্টান্ত নানা স্থানে তুলেছি। বাহুল্যবোধে এই শব্দগুলির দৃষ্টান্ত আর সংকলন করিনি।

পূর্বে বলেছি, গীতগোবিন্দ কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর সমধর্মী এ'ধরণের সহজ সরল ঋজু ভাষা কবিতা বা সংগীতেরই উপযুক্ত অনুষঙ্গ হ'য়ে আসতে পারে।

অনেক শব্দ খুব সাধারণ হয়েও কবির রচনায় অসাধারণ হয়ে পড়েছে। নিবিড় বিপুল নিথর অনেক আমার তোমার প্রভৃতি অনেক শব্দের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। নিবিড় ও বিপুল শব্দদুটি কবি তাঁর সমগ্র রচনায় বোধকরি বেশী ব্যবহার করেছেন। একটি পরিমান ও অন্যটি সংখ্যাসূচক। "নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ" কিংবা 'মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে (মানসী)"—পংক্তি দুটোর প্রথমটিতে ব্যথার বিনম্র ও তীব্র প্রতিক্রিয়াকে এবং দ্বিতীয়টিতে কেশের বিপুল রূপ ও ঘনত্বকে সুস্পষ্ট ও ব্যঞ্জিত ক'রে দিচ্ছে 'নিবিড়' শব্দ। ছোট হোক, বড় হোক রবীন্দ্রনাথ শব্দশক্তির অলৌকিক দ্যোতনাকে অপ্রতিহত মহিমায় উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করেছেন। শব্দ ও পদবিন্যাসে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম প্রভৃতি পদগুলি আমাদের কাছে সাধারণ হয়েও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাগৈশ্বর্যের সতেজ দীপ্ত সমারোহে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর দানের পরিমাপ হয় না। আচার্য সুনীতিকুমারের কথাটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন—"He was one of the greatest artist in language, and he drew out from Bengali, which before his advent was a provincial language of India, all its latent powers of expression. He found his mother tongue to be as brass, but he left it as gold. From a language the atmosphere of which was largely mediaval he was able to forge a modern means of expression, nervous and forceful, which can keep abreast of any advanced language of the world."[৪৮]

রবীন্দ্রনাথকে যথার্থই বাক্‌পতি আখ্যা দিয়েছেন সুনীতিকুমার। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে সত্যই তাঁহাকেই বাক্‌পতি বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়। আমাদের বাংলা ভাষা ধন্য, ইহার কাব্য সাহিত্য ধন্য, ইহার তথ্যানুশীলন ধন্য, যে এই ভাষার এতবড় বাক্‌পতি কবি ও মনীষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি সত্যকার বাগ্‌দ্রষ্টা ও বাক্‌শ্রোতা, এবং যাঁহার নিকট বাগ্‌দেবী আপনাকে প্রকট করিয়াছেন।"[৪৯]

রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণ ক'রে বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তা, স্বরূপ ও প্রতিভাকে চেনা যায়; একথা মনে ক'রে আমি প্রতিটি

রবীন্দ্রসংগীতকে বিভিন্ন রূপ-প্রকরণে বিশ্লিষ্ট ক'রে তালিকা করেছিলাম। সেই বিরাট সংকলন থেকে সামান্য উপাদান এই পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবারে বিশেষণ প্রয়োগ ব্যাপারে কবির অভিপ্রায়গুলো আমরা যেভাবে ধরতে পেরেছি, তার উল্লেখ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। পূর্ববর্তী তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষণ ছাড়া কোনো বিশেষ্যকে বরদাস্ত করতেন না। একটা দুটো তিনটে বিশেষণ ব্যবহার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু চার, পাঁচ, এবং তারও বেশী বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছেন। এই বিশেষণ-লীলাকে বিশেষিত করতে তাঁর সমকক্ষ বাংলা সাহিত্যে কেউ নেই। গদ্যে, গল্পে, উপন্যাসেও এই প্রবণতা সক্রিয়। ষষ্ঠী বিভক্তির (সম্বন্ধ) বিশেষণ, ক্রিয়া ও বিশেষণের বিশেষণ, বিশেষ্যকে বিশেষণ, ধ্বনি-অনুকারাত্মক বিশেষণ, উপচরিত বিশেষণ, সমাস-সন্ধি-প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষণ ইত্যাদি বিশেষণলীলা রবীন্দ্রপাঠককে বিস্মিত করে। আমরা এবারে রবীন্দ্রসংগীত থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখতে চাই।

বিশেষণ নির্মিতি : রবীন্দ্রপ্রতিভার সফলতম একটি উত্তরণ

এক ও দুই বিশেষণ :

পূর্ব উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর পরিপূরক হিসেবে এই তালিকা। খুব সুন্দর, সুমিত ও বিশিষ্ট ভাষণশৈলীর কয়েকটি নমুনা। যেমন : উন্মদ সমীরে, অলখ পথের, অকিঞ্চন জীবনের, অশান্ত বন্যায়, অরূপ মাধুরী, ঘুমের প্রান্তপারে, ভাবনার প্রাঙ্গণে, খ্যাপা বাতাসেই, নিঠুর হাওয়ায়, দলিত কুসুম, দুরন্ত যৌবন, দূর নীলিমার, নগ্ন প্রাণের, নিষ্ফল সাধনারে, বিস্মৃত জন্মের, ম্লান স্মৃতির, স্তিমিত তারা, স্তব্ধ নীড়ে, মৌন সমীরণে, পলাতকা যত ঢেউ, বিষণ্ন নিশ্বাসে, পলাতকা ছায়া ফেলে, নির্মল কান্ত, স্নিগ্ধ সুশান্ত, শরম নমিত নয়নে, ব্যাকুলিত ধরণীতে, পেলব সীমানাটিতে, বিবশ বাতাসে, অপরূশ আঁচলের নবনীলিমা, অরুণিম উৎসবে, অবাক্ আলোর লিপি, পলাতক পরশখানি,

দুই ও তিন বিশেষণ :

আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন, সাধারণতঃ দুটোর বেশী শব্দ জুড়ে বাংলায় সমাস করা হতো না। কিন্তু সংস্কৃতের বহুপদ-সমাসের অনুকরণে বাংলায় বহুপদ সমাসের উত্তর অনেকটা বিশেষণ-বাচকও হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রসংগীতে

বহুপদ-সংলগ্ন-পদবিন্যাস ও সমাস সহস্র সংখ্যক। আমি এদের লগ্ন-পদবন্ধ বলতে চাই। দুটো বা তিনটি বিশেষণ কখনো কখনো বিশেষ্য ও সর্বনামকে নিয়ে-ও এমন সমাহার হয়েছে, সেখানে কোন্‌টি কোন্ পদ তা বোঝা দুষ্কর হ'য়ে পড়ে। এই অসামান্য বিশিষ্টতা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। শব্দ-সৃষ্টিতে প্রচলিত ব্যাকরণ-রীতির প্রতি বিশ্বস্ত হয়েও তিনি বহুক্ষেত্রে অনপেক্ষ পরীক্ষা-প্রয়াসী।

দৃষ্টান্ত : অনুরাগ অলস আঁখি, গভীর বিষাদের শান্তি, চির সুন্দরের অভিবন্দনা, মৌন মধুর সাঁজে, দিগভ্রান্ত নিদ্রালস আঁখি, কঠিন প্রেমের প্রতিমা, তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে, পুষ্পমালার পরশ পুলক, স্বপ্নের তীরে বিপুল অন্ধকার, তাপ বিহীন মধুর স্মৃতি, কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে, আকুল বাতাসে মদির সুবাসে বিকচ ফুলে, আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন মধুর হুতাশে মধুর দহন, স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে, লেপিল আলিম্পন-লিপি লেখা, চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব, মম ভীরুবাসনার অঞ্জলিতে, দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত, সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন (প্রে ২২৮)।

চার ও ততোধিক বিশেষণ,

কিংবা প্রত্যয় বিভক্তি সমাসসিদ্ধ লগ্নপদবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য বাগ্‌বিভূতির বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত পদবন্ধে।

দৃষ্টান্ত : আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত, স্বপ্ন মদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা, বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, বিরহের কোন ব্যথাভরা লিপিখানি, শ্রান্তদুঃখের মৌন তিমিরে শান্তির দান, সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এসো, মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়, মৃদুবায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে, স্মিত উদয়ারুণ কিরণ বিলাসিনী পূর্ণ-শীতাংশু বিভাস বিকাশিনী নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা (প্র ১৭০), হিসাব-পত্তর-ত্রস্ত তহবিলমিল-ভুল-গ্রস্ত লোচন-প্রান্ত-ছলছল হে (বি ১২৩), মন্থর নবনীলনীরদ পরিকীর্ণ দিগন্ত, নামধাম গোত্র গৃহবাক্য দেহ মনে (চিত্রাঙ্গদা), অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত (চিত্রাঙ্গদা)।

সংস্কৃত তৎসম, তদ্ভব, বাংলা প্রত্যয়-যুক্ত ও সমাস-নিষ্পন্ন ধ্রুপদীচালের এই দীর্ঘ পদবন্ধ রবীন্দ্রকবিতায়-ও সমধিক প্রযুক্ত। সংগীতে যেখানে সুরের আবশ্যিক প্রভাব স্বীকৃত, এবং সুরের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য বাণীভঙ্গিতে ঋজুতা ও অনতিরেক একান্ত কাম্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথ অক্লেশে কবিতা-বাঞ্ছিত পদসমষ্টি দিয়ে তাদের ভ'রে দিয়েছেন। আর দিয়েছেন বাণী ও বিষয়বস্তুর ভাব অনুযায়ী রাগরাগিণীর সুর। বাগৈশ্বর্যে যেখানে সংগীত-ধর্ম স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই অভিব্যঞ্জিত, সেখানে তার ওপরে-ও সুর-প্রয়োগ। কাজেই রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কীর শ্রোতা অনির্বচনীয় আস্বাদন পেতে পারেন ভাষা ও সুরের সম্মিলিত ফলশ্রুতি থেকেই।

অভিনব অসামান্য পদবন্ধ :

বাগৈশ্বর্য ও বাক্‌শিল্প-বিভূতির অভিনব দৃষ্টান্ত সংকলন করেছি। সন্ধি, সমাস, বাংলা কৃদন্ত পদ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণকে দীর্ঘ পদসমষ্টিতে রূপ-দেবার গুরুত্বপুর্ণ শৈলী এটা; আমি একে লগ্ন-পদবন্ধ বলেছি, যা ইংরেজিতে অনেকটা সিন্‌ট্যাকৃটিক্যাল ও সেমেন্টিক্যাল কম্পাউণ্ড বাক্য-এর মত। রবীন্দ্রনাথ গানে এরকম অত্যাশ্চর্য ভাষণশৈলী হামেসাই প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত ঃ

জননীর মুখ তাকানো-হাসিতে (পূ ৯৯), সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে, বাসায় ফেরা ডানার শব্দ, ভাসন খেলার নদীতটে, পথ হারানোর অধীর টানে, না দেখা কোন পরশ ঘায়ে, চেয়ে থাকা তারায় সাথে, ফুল ঝরানোর ছল, সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান, নতুন পাতায় পুলক ছাওয়া পরশ খানি, প্রিয় বন্দনা গান জাগানো রাতে, দুঃখের অনল জলনে জন্মে যে প্রেম, আধ ঘুমের প্রান্ত-ছোঁয়া বকুল মালার গন্ধ, কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন, বউ কথা কও তন্দ্রহারা নিবিড় ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা, তন্দ্রাহারা-পিক-বিরহ কাকলি কূজিত দক্ষিণ বায়ে (প্র ২৭১), ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষাকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন বর্তমানকালের লেখকগণ। সমালোচকগণ তাঁদের বক্তব্যের অনুকূলে দৃষ্টান্ত সংকলন করছেন রবীন্দ্রসংগীত থেকে। এছাড়া বোধহয় উপায় ছিল না। বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের বিরাট অভিপ্রায়গুলো প্রত্যক্ষ ও গুরুতরভাবে এখানে বিকাশ লাভ করেছে, ভাষা-প্রকরণের সমস্ত সূক্ষ্ম লীলা এখানে প্রকটিত। গীতবিতানের ভাষার

ঐশ্বর্য, বাক্‌শৈলী, বাক্‌শিল্প, ছন্দ, চিত্রকল্প, উপমা, অলংকার ও রসদাক্ষিণ্য সমগ্র বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রাজ্যে অতুলনীয় অভূতপূর্ব সৃষ্টি। এ সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন—"(গীতবিতান) বাংলা সাহিত্যের তো বটেই রবীন্দ্রনাথের নিজের বিপুলসাহিত্যেও অতুলনীয়।"[৫০] আমাদের এই রচনায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণরূপ নিয়ে সেই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে আমরা চেষ্টা করেছি।

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' বইতে বাক্যের পদের ক্রম, সঙ্গতি ও মিলের বিন্যাসে তিনটি গুণের কথা বলেছেন, যোগ্যতা (Propriety), আকাঙ্খা (Expectancy) ও আসত্তি বা নৈকট্য (Proximity)। বাক্যে বা কবিতার চরণে অভিজ্ঞতাকে ও যোগ্যতাকে অর্থসহ প্রকাশযোগ্য হ'তে হবে। দ্বিতীয়তঃ বাক্য বা উক্তির দ্বারা পাঠকের আকাঙ্খা পূরণ হবে। তৃতীয়তঃ অর্থসঙ্গতির জন্য পদগুলোকে পর পর বসাতে হয়। কবিতায় পদগুলোর ক্রম সঠিক থাকা সম্ভব নয়, তথাপি অর্থের জন্য পদগুলোর নৈকট্য মানতে হয়।[৫১] ব্যাকরণ-ঘটিত পদবিন্যাসরীতি রবীন্দ্র-সংগীতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় নি, হবার কথাও নয়—তথাপি ভাবের প্রবল বেগকে কেমন ধরতে হয়, সাজাতে হয়—জানতেন কবি। তাঁর রীতি তাঁর নিজস্ব। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে তাঁর পদবিন্যাস-কৌশল কিংবা ভাষা-নির্মিতির রূপটি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমরা কয়েকটি ছক-এর পরিকল্পনা করতে চাই। বিশেষ্য, বিশেষণ, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সংগীতের প্রত্যেক পংক্তিতে যে ঐশ্বর্যময় বৈভব ও স্থিতিস্থাপক অনুপাত রক্ষা পেয়েছে তা লক্ষ্য করতে পারি।

এক নম্বর ছক :

ছ'টি বিশেষণ ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ করণ-কৌশল

			বিশেষণ	বিশেষ্য
			উতল	আঁখি (প্রে ২৮০)
		তৃষিত	আকুল	আঁখি (প্রে ২০০)
	ক্ষুধিত	তৃষিত	তাপিত	চিত্ত (প্রে ২৫২)
	নিবিড়	তমিস্র	বিলুপ্ত	আশা (প্র ১১৯)
কথন	অগম	গোপন	গহন	মায়ার (প্রে ২৯০)
আমার	ক্ষুধিত	তৃষিত	তাপিত	চিত (প্রে ২৫২)

					বিশেষণ	বিশেষ্য
	মন্থর	নব	নীল	নীরদ	পরিকীর্ণ	দিগন্ত (প্রে ২৫২)
		ক্ষুব্ধ	ভয়াল	বিশাল	নিরাল	বিতানে (প্র ১)
	সজল	জলদ	স্নিগ্ধ	কান্ত	সুন্দর	(তুমি) ফিরে এসো
	মৃদু বায়ু	হিল্লোল	বিলোল	বিভোল	বিশাল	সরোবর (প্র ১)
সোনালি	রূপালি	সবুজে	সুনীলে	সে	এমন	মায়া (পূ ৫২৫)
৬	৫	৪	৩	২	১	

তিন পর্যন্ত বিশেষণ রবীন্দ্রনাথ অযত্ন সহজ গতিতে প্রয়োগ করেছেন। তিন বিশেষণ শুধু নয়, সমাস-বদ্ধ তিন পদগুচ্ছ, তিন বিশেষ্য, তিন ক্রিয়াকে পাশাপাশি বা পুনরাবৃত্ত করতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। চারের বেশী বিশেষণ ব্যবহার ঠিক স্থিতিস্থাপক কিংবা সমানুপাত হয় না সাধারণতঃ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্ধি প্রত্যয়াদির দ্বারা দীর্ঘ পদসমষ্টির সৃষ্টি ক'রে বাংলা ভাষায় নতুন ঐশ্বর্য এনেছেন। ছকটিতে দেখা যাচ্ছে ৪টি, ৬টি বিশেষণও তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষণ বৈচিত্র্য আরো আছে। ধ্বনি অনুকার, রুদন্ত শব্দ সমষ্টি ইত্যাদি নিয়েও বিশাল বিশেষণ-নির্মাণ। যেমন:

থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লব পুলকিত ফুলআকুল মালতীবল্লীবিতানে

১ ২ ৩ ৪

(প্র ১৮৯) ; এখানে বিশেষণের পুনরাবৃত্তি ও ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করার মতো।

আরও উদাহরণ:

আঁখিতে আঁখিতে মধুর মিলন মধুর হুতাশে মধুর দহন শরম অরুণরাগে।
আকুল বাতাসে মদিরসুবাসে বিকচফুলে।
অতি মঞ্জুল অতি মঞ্জুল শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে।
অতি নির্মল অতি নির্মল অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদ লক্ষ্মী বিরাজে।
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমালবিতানে (প্র ১)
এস অরুণ চরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে (প্র ১৮৯)

দু নম্বর ছক :

বিশেষণসহ বিশেষ্যের পর্বস্পন্দনগত ভারসাম্য ও অনুপাত

আলোর বাণী	হিরণ কিরণ পদ্মদলে
করুণ মধুর অধীর তানে	বিরহ বিধুর পাখি
স্তিমিত তারা	চেতন হারা পাণ্ডুগগন
ফুলফোটানোর খেলায়	কেন, ফুল ঝরানোর ছল
বিরামবিহীন বিজুলিঘাতে	নিদ্রাহারা প্রাণ
বর্ষণ হর্ষভরা ধরণীর	বিরহ বিশঙ্কিত করুণ কথা
জ্যোতিসম্পদ ভরি দিক চিত্ত	ধন প্রলোভন নাশন বিত্ত

তিন নম্বর ছক :

বিশেষণরূপে লগ্ন পদসমষ্টি	বিশেষ্য
তুমুল রঙের	কোলাহলে
তাপবিহীন মধুর	স্মৃতি
পথ হারানোর (লাগল)	নেশা
সন্ধ্যা মেঘের মায়ার	মহিমা (প্র ২২)
উত্তরীয়ের পরশের	হরষ (প্রে ১০১)
সকল ভাবনা ডুবানো	ধারায় (প্রে ২৭২)
কূলহারা কোন রসের .	সরোবরে (প্রে ৩১৯)
স্বপ্ন মদির নেশায় মেশা এ	উন্মত্ততা (প্রে ২৭১)
উদাস করা হৃদয় হরা না জানি কোন	ডাকে (প্রে ২৫৫)
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের	গন্ধ (পূ ৬০৪)
আধঘুমের প্রান্ত ছোঁওয়া বকুল মালার	গন্ধ (প্র ১৯)
তন্দ্রাহারা-পিকবিরহ-কাকলিকূজিত-দক্ষিন	বায়ে (প্র ২৭১)

চার নম্বর ছক :

বিশেষ্যসংখ্যা	বহু বিশেষ্যের ক্রমানুবৃত্তি
৩	ওরে বকুল ওরে পারুল শালপিয়ালের বন
৩	তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম
৩	বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে
৩	সকলযোগী সকলত্যাগী (এস) দুঃসহদুঃখভাগী
৪	বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
৪	বিশ্বতনুতে অনুতে অনুতে (কাঁপে) নৃত্যের ছায়া
৫	তালেতালে সাঁঝসকালে রূপ সাগরে ঢেউ লাগে
৫	শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো
৬	ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো
৬	শ্রান্তি আলস বিষাদ বিলাস দ্বিধা বিবাদ দূর করো হে

বিশেষণ-রূপে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদবিন্যাস সুন্দর সুষমাময় ও গভীর ভাবব্যঞ্জক। বহু বিশেষ্যের ব্যবহারে ভাষণ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য নতুন কিছু নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছেমত বিশেষ্য বসিয়ে গেছেন বিশাল ভাব সম্ভারকে একত্রে গুছিয়ে নিতে।

'তিন'-এর রীতি ও প্রকৃতি :

এসব ভাষানির্মাণ-শৈলী থেকে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, সে হচ্ছে তিন সংখ্যায় শব্দ নির্মাণ ও পদবিন্যাস। ছন্দ ও ভাবস্পন্দন এবং স্মিত ভাষণে তিনটি উপাদানের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ যত্রতত্র স্বীকার করেছেন। এই তিনের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। তত্ত্ব, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে ভাষণ-শিল্পের প্রকরণে এই তিনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখতে পাই।

এখানে এই 'ত্রিত্ব' সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। জগৎ, সৃষ্টি জীবন, চেতনা, মন সকলক্ষেত্রে একটা অপ্রত্যক্ষ ত্রিকৌণিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে কোন কাল থেকে। ত্রিকাল, ত্রিযাম, ত্রিভুবন, ত্রিনাম, ত্রিকোণ, ত্রিনয়ন, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু ত্রয়ীর ছন্দ বাহ্য প্রকৃতি ও সর্বজাগতিক লীলায় প্রকট হয়েছে। মানুষের জীবনের মধ্যে, সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের মধ্যে সেই 'তিন'-এর নিঃশব্দ পদসঞ্চরণ। ত্রিকৌণিক দ্বন্দ্বই কি জগৎ চরাচর ও মানবজগতের অশ্রান্ত অগ্রগমনের প্রেরণা? এই 'ত্রিত্ব' চেতনাই সবদেশের সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে অনন্তকাল ধরে সত্যানুসন্ধান করে চলেছে। সন্ধানের শেষ নেই। প্রশ্নের শেষ নেই। অতঃ কিম্?

রবীন্দ্র-ভাষাতত্ত্বের গবেষকগণ একটা "ত্রিত্ববাদ" খাড়া করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের ধ্যান-কর্ম-চিন্তা, প্রতিভা, রসচেতনা, সুর-মনস্কতা, সাহিত্যিক চরিত্র ও কবিত্ব—সর্বত্র এক অনন্ত সত্যানুসন্ধান ও গতির লীলা প্রকট হতে দেখা যায়। তাঁর জীবনভাবনা তাঁর সকলপ্রকারের সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। সেই সাহিত্য-পটভূমিতে কত বিচিত্র বিস্ময়কর কৃতি-কৌশল। মনে হয়, কবির জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এই 'তিন' প্রবণতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নয়, এরকম বাগৈশ্বর্য, দীর্ঘলগ্ন-পদবন্ধ, শব্দদ্বৈত, মিল ও ত্রিত্ব-প্রবণতা তাঁর কাব্যে, গদ্যে, গল্পেও বিপুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষা-প্রযুক্তিতে এই 'ত্রিত্ব-রীতি' কি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন? নানাস্থানে এ সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক,

দার্শনিক ও প্রায়োগিক মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। বলছেন—"নিয়মিত গতি মাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে ; কিন্তু জন্তুর পা বলো, পাখির পা বলো, মাছের পাখনা বলো দুই এর যোগে তবে চলে। সেই দুই-এর নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায়, তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতিবেগ বাড়িয়া যায়, এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে।" (ছন্দ পৃঃ ১৫)

—"তিনমাত্রা মূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। এই ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমান দরের একক বলে ধ'রে নিতে বারংবার কানে বাজত। সেইজন্য যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসেছিল। (ছন্দ পৃঃ ৬৬)

—"দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এইজন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেইটাকে নাড়া দিয়া তাহার যতরকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে, সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না। (আষাঢ়, বিচিত্র প্রবন্ধ)

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও অন্যান্য রচনায় অনির্বচনীয় রসরূপকে প্রত্যয়িত ও প্রকাশিত করতে শব্দশক্তিকে বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। শব্দদ্বৈত, শব্দ বা বাক্যগত ত্রিত্ব-কৌশল সেজন্য এত গুরুতর ক্রিয়া-পরম্পরায় দেখা দিয়েছে রবীন্দ্ররচনায়।

বলাকা কাব্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিলাম। বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদির বাক্‌নির্মিতির বিস্ময়কর প্রয়োগ-শৈলী রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য-কবিতা, গদ্য, গল্প ইত্যাদিতে-ও দেখা যাবে।

বলাকা :

বাগৈশ্বর্য : ভূতল গগন মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন
(৩৭ নং কবিতা)

পূর্ণিমার দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে (৭ নং)

চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে (৩২ নং)

সারারাত্রির পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর প্রতীক্ষার দীপ মোর নিমেষে নিবায়ে (১২ নং)

হীরা মুক্তা মানিক্যের ঘটা/যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা (৭ নং)

প্রেমের করুণ কোমলতা/ফুটিলতা/সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে (৭ নং) ইত্যাদি।

ত্রিত্ব : দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়, নাই নাই নাই যে সময়।

প্রভাতের অরুণ আভাসে,...দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে, চামেলির লাবণ্যবিলাসে।

ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।

তুমি স্থির, তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে, অশান্তির ঘূর্ণি দেখি...।

হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। ইত্যাদি।

গদ্যে :

রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে এই বাগৈশ্বর্যের ও ত্রিত্ব-প্রবণতার দৃষ্টান্ত সংকলন করা যেতে পারে।

শকুন্তলা (১) প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা এ তো অন্যত্র দেখি নাই।

(২) শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব গম্ভীর ও স্থায়ী।

লোক সাহিত্য (৩) ইহা একই কালে সুন্দর ও বিরাট, অন্তরঙ্গ ও বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক ও অনির্বচনীয়। (৪) একদিকে বসন্ত-পুষ্পাভরণা শিরিষ-পেলবা বেপথুমতী উমা, অন্যদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্র বিশাল হৃদয়।

ক্ষুধিত পাষাণ (৫) তাহার পরে সেই রক্ত কলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্র সংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য প্রবাহে ভাসমান হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্প মঞ্জরী

কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ, অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে ?

বিচিত্র প্রবন্ধ (বসন্ত যাপন) (৬) হায়রে সমাজ দাঁড়ের পাখি। আকাশের নীল আজ বিরহিনীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল, তবু তোর পাখা দুটো আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে, এই কি মানব জন্ম।

ছিন্নপত্র ৬৪ নং (৭) আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অংকুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত শষ্য ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

একি গদ্য না কবিতা ? কবিতা ও গদ্যের রূপপ্রকরণের প্রচলিত দ্বৈধতা, বিভেদ ও বৈসাদৃশ্যনীতি রবীন্দ্রনাথ বাতিল করেছেন। এ গদ্যে কবিতার সুর প্রতিধ্বনিত। এভাবে গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথের বাক্‌বিভূতির অলৌকিক দীপ্তি লক্ষ্যে পড়ে, যা চোখকে ধাঁধায় না, হৃদয়কে গিয়ে স্পর্শ করে। পদবিন্যাসের ক্রম-সংগতি, কর্তাক্রিয়া সমাস প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়ম-কানুন রবীন্দ্ররচনায় বর্তেছে। স্থপতি বা মৃৎশিল্পী যেমন বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিমোহন মূর্তি গড়েন, রবীন্দ্রনাথও বাক্ ও ভাষার উপাদানে সেই আকাঙ্খা-সম্মত বাক্-প্রতিমা গড়ে দিয়েছেন। এ রূপ-লাবণ্য সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। বানভট্টের প্রভাত বর্ণনাকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ভাষার ইন্দ্রজালে কেবলমাত্র বিশেষ্য বিশেষণের বিন্যাসে একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে।"[৫২] রবীন্দ্ররচনা প্রসঙ্গেও আমাদের সেই কথা। কবির রচনা-পাঠের অনতি-বিলম্বেই আমাদের হৃদয়ে সুবর্ণ সুরম্য সুন্দর ভাব ও রসের সঞ্চার হয়ে যায় ; ভাষার রূপনির্মিতির গুরুত্ব কতখানি তা বুঝতে পারি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলছেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব বিস্ময়ের হলেও কবির শেষ লক্ষ্য হলো প্রকাশ পরিপূর্ণতা, পাঠকচিত্তে কাব্যানুভূতির সংক্রামন। ফর্ম ও কন্‌টেণ্ট-এর অভিনবত্ব সাধনই কবি প্রতিভার দুরূহতম পরীক্ষা।"[৫৩]

ভাব ও রূপের অদ্বৈত লীলা-করণে রবীন্দ্রনাথের হাত সমানে চলেছে কবিতায় ও কাব্য-সংগীতে। অপিচ, একদিকে আছে প্রাচীন সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, কালান্তর; আর একদিকে আছে বিচিত্র প্রবন্ধ, ছিন্নপত্র, শেষের কবিতা ইত্যাদি অসামান্য গ্রন্থগুলি; গদ্যভাষা ও কাব্য-ভাষায় সমন্বয় সাধন ও প্রকরণ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্বত্রই সমান সক্ষম বিস্ময়কর সঞ্চরণ।

আশ্চর্য বিশেষণ : এক প্রত্যয়

রবীন্দ্রসংগীতের পদবন্ধে আশ্চর্য বিশেষণগুলো ভাবের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়; অবাক ক'রে দেয় তাদের সূক্ষ্ম সুন্দর বাণী-বৈদগ্ধ্য। কবিগুরুর হাতে বিশেষ্য-বিশেষণের এই প্রয়োগগত সাফল্য দেখে মনে হয়েছে যে, তিনি এ বিষয়ে খুবই সচেতনতার সঙ্গে ভাষণ-শিল্পের বিভিন্ন শাখা যেমন উপমাদি অলংকার, চিত্রকল্প, ধ্বনিমিল ইত্যাদির অত্যাশ্চর্য গঠন কাঠামোতে বিশেষণ-বিশেষ্য প্রযোজনার কাজটি নিষ্পন্ন করেছেন। বিশেষক'রে এই বিশেষণগুলিই রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল ভাষাশিল্পের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সহজ সরল সাধারণ কিংবা গুরুগম্ভীর পদ ও বিশেষণগুলি সর্বক্ষেত্রেই রূপগত অসাধারণত্ব এবং ভাবগৌরবী উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে চলেছে। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে একথাটা আবার বুঝতে চেষ্টা করছি।

১. সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো/আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো, আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো/তোমার হাসির তুলনা (প্রে ১৮৯)

২. বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা/করুণগন্ধে কয় কী গোপনকথা (প্রে ১৭৪)

৩. বাজবে বুকে বিদায় পথের চরণ ফেলা (প্রে ১৯৮)

৪. চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব/আলিপন আঁকিয়া যায়/ভাবনার প্রাঙ্গণে (প্রে ২২৮)

৫. মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে/ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়/দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত/তব অকৃপণ করে/সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন (ঐ)

এবং, নয়নে তোমার উঠিবে জ্বলিয়া নীরব সম্ভাষণা (প্রে ৪০), দিক ভোলাবার পাগল, ফুল ঝরানোর শীতের রাতে, ফুল ঝরানোর ছল, নতুন পাতার

পুলক ছাওয়া পরশখানি, জননীর মুখ তাকানো-হাসি ইত্যাদি পদবন্ধে বিশেষণ ও বিশেষ্যের অসামান্য রূপগত বৈদগ্ধ্য লক্ষ্য করতে পারি। হাসির তুলনা, করুণ গন্ধ, বিদায় পথ, নীরব সম্ভাষণা, ভাবনার প্রাঙ্গণে, পলাতক পরশখানি, অরুপণ কর প্রভৃতি বাক্যাংশে ভাষণশিল্পের অনন্যতা কোথায় আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না। বাতাসে মনের প্রলাপ জড়ানো, মালতীলতার করুণগন্ধে কথা বলা— অভিনব ইন্দ্রিয়বেদ্য ক্রিয়ার সংঘট্ট। 'আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা' পংক্তিটিতে উপমেয় আছে, উপমান নেই, সাধর্ম্য অনুল্লেখিত। কিন্তু তুলনা শব্দটিতে বিশেষ তাৎপর্য উপস্থাপিত হতে দেখি। হাসি নয়, হাসির তুলনাকে আকাশে ছড়িয়ে রাখা—এই বক্তব্যটিতে কোন্ ধ্বনির ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়? এ কোন্ ধ্বনির শিল্পকলা? বাতাসে প্রলাপ জড়ানো, করুণগন্ধে কথা বলা—এই অসামান্য চিত্র-প্রতিমাগুলি ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয় চেতনার মিশ্র প্রক্রিয়ায় জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। এবং এই ভাবগর্ভ পদগুলি নিবিড় রসে অভিব্যঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে সহৃদয়সংবাদীর চিত্তে। কবিগুরুর এই বিশেষণকে আশ্চর্য বিশেষণ বলা চলে। রবীন্দ্র-বাক্‌শিল্পের একটি বিশেষত্ব ও মহিমা এই পদ-প্রকরণের লীলা থেকেই অবহিত হওয়া যায়।

আর একটি দৃষ্টান্ত: আশ্চর্য বিশেষণের শক্তি ও যাদু

সে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বন নীলিমার পেলব সীমানাটিতে
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা (ভূমিকা)।

কাব্যাংশটির তিনটি চরণে তিনটি বিশেষণ: ব্যাকুলিত, পেলব, অপূর্ব। তিনটি বিশেষণের প্রয়োগ-শৈলী ও তাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা আমাদের বিস্মিত না ক'রে পারে না। চেতনা-প্রাপ্ত ধরণীর ব্যাকুলিত হওয়া স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু বননীলিমার সীমানাটি যে পেলব, সেই পেলব সীমানাটিতে আমাদের বুদ্ধি-মনন-কল্পনাকে পৌঁছে দিয়েও আমরা সেই আশ্চর্য সীমা-রেখা স্পর্শ করতে পারি না। অথচ কবি-প্রত্যয়-সিদ্ধ সেই নিসর্গ চিত্রকল্পটি একটি 'পেলব' বিশেষণে অসামান্য ঐন্দ্রজালিক প্রভাব সৃষ্টি করে উপযুক্ত রসজ্ঞের হৃদয়ে মনে। 'সে' অপূর্ব এক অস্তিত্বের আগমন-বার্তা বিঘোষিত করছে; নিসর্গ ও জন-জগতের প্রতিক্রিয়াকে পরিচায়িত করতে কবিগুরু শব্দশক্তিকে আশ্চর্য ক্ষমতায় প্রয়োগ করেছেন। গুরুগম্ভীর ভাব-মহিমাকে প্রকাশ করতে সাধারণ তিনটি বিশেষণেও 'মায়ার কুহক' সঞ্চারিত হয়ে গেছে। বিশেষতঃ সেই শব্দ-শক্তিকে

'মায়ার কুহক' বলা হয়েছে। রবীন্দ্ররচনায়, কাব্য ও সংগীতে সেই মায়ার যাদুর লীলা প্রকট হতে দেখি। বিশেষক'রে তাঁর সংগীতের ছত্রে ছত্রে সেই মায়ালোকের স্পর্শ কিংবা উত্তরণের সংকেত খুঁজে পাই।

বাস্তবিকই, পলাতক পরশখানি, করুণগন্ধ, জননীর মুখতাকানো হাসি, বিবশ বাতাস, অবাক আলোর লিপি, পেলব সীমানা, কিংবা হাসির তুলনার মতো তুলনা আমরা আর কোথাও দেখিনা। রবীন্দ্রকবিতা ও সংগীতের ছত্রে ছত্রে সেই চরম ও পরম শব্দগুলির অরুণিম উৎসব দেখে কেবলই বিস্মিত হ'য়ে যাই আমরা।

কবিতা, গদ্য ও গল্পের বিশেষ্য ও বিশেষণ বিশ্লেষণ ক'রে এবং ভাবোপযোগী বাক্-নির্মিতি বিচার ক'রে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সংগীতের বাক্রূপের সঙ্গে এই প্রকরণ-শৈলীর বিশেষ ভেদ নেই। কবিগুরু লিপিকায় সুর যোজনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোর আবৃত্তি ও সংলাপে সুর-যোজনা ব্যাপারটি একরকম নতুন টেক্নিক। তাঁর রসসিদ্ধ গদ্যের মধ্যে যে কমনীয় লক্ষণ আছে, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কাব্যগীতির সঙ্গেও সম-তুলনীয়। এ রচনা-নির্মিতির আবশ্যকতা আছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র ক'রে যে যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য আখ্যা এবং কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ প্রসঙ্গেও আজ আর মতভেদ নেই।"[৫৪] তিনি আরও বলেন—"সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে বিরোধ ঘুচলো।"[৫৫]

অতঃপর রবীন্দ্রসংগীতে বাক্রীতির কিছু বিষয়গত ও ব্যাকরণগত প্রকরণের উল্লেখ করা যাচ্ছে। খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সহ আমাদের বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত করছি।

ধ্রুপদী রীতি :

মহাকাব্য, বিশিষ্ট কবিতা ও গদ্যের ভাষণ-শিল্পে ধ্রুপদীরীতির গুরুগাম্ভীর্য-পূর্ণ অলংকার-সমাসনিবদ্ধ বাণীবিন্যাস থাকা সম্ভব। কিন্তু গানের কথার অবয়বে বৈদগ্ধ্য ও ধ্রুপদী চালের প্রযোজনা কি সম্ভব? অনির্বচনীয় সুরের বাহন হিসেবে

গানের ভাষাকে সূক্ষ্ম, ঋজু ও হালকা হ'তে হয়। কাব্যসংগীতের গতানুগতিক ইতিহাসও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত এই রীতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছে ভাব, ভাষা ও স্বরের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার গাম্ভীর্য ও বিভূতি যে কতখানি—আমার পূর্ব ও পরবর্তী আলোচনাগুলিতে প্রচুর দৃষ্টান্তসহ লক্ষ্য করেছি। এখানে সে রকম কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হ'লো।

মধুগন্ধে ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপকুঞ্জতলে
শ্যাম কান্তিময়ী কোন স্বপ্ন-মায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।
ফিরে রক্ত-অলক্তক ধৌতপায়ে ধারা সিক্ত বায়ে,
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি প্রান্তে জ্বলে। (প্র ১০৪)
নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর—
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর।...
দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর! (প্র ৫৫)

উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই। এই কাব্যভাষার বিদগ্ধ রীতিও স্বর-সংযোগে সংগীত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে।

চলিত বা কথ্যরীতি ॥

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিমায় গুরুতর চলিষ্ণুতা থাকায় শব্দ, পদ, ক্রিয়া ইত্যাদিকে কথ্যরীতির পথ ধরতে হয়েছে। দেশীবিদেশী শিষ্ট অশিষ্ট শব্দরূপের ও ক্রিয়ার কথ্যরীতিতে বহু রবীন্দ্রসংগীত নির্মিত। কথ্য উচ্চারণ ভঙ্গি এবং উচ্চারণ অনুযায়ী বানানও আবশ্যিকভাবে এসেছে সেখানে। এ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও শব্দ-প্রকরণে লৌকিক বাঙ্‌লার ও মাতৃভাষার বিশিষ্ট গুণ ও ধর্মের প্রভাব অস্বীকৃত হয়নি। ক্ষুদিরাম দাস বলেন—"বহিরঙ্গ যে শব্দ এবং যে বাক্‌রীতি কবিকে মুগ্ধ করুক না কেন, লৌকিক বাঙ্‌লার, মাতৃভাষার বিশেষ গুণ ও ধর্মের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত।" তিনি আরও বলেন—"রবীন্দ্রনাথ বাইরের যে কোন বিষয়ই গ্রহণ করুন না কেন, বাঙ্‌লা

বাক্য গ্রন্থন এবং সিদ্ধ-প্রয়োগের মূলনীতি তিনি কদাচিৎ লংঘন করেছেন এবং সব মিলিয়ে মাতৃভাষার প্রকাশ-শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছেন অসামান্য রূপে।"[৫৬]

গানের ভাষণ-শিল্পের এই তীব্র চলিষ্ণুতা তাঁর গুরুগম্ভীর পদবন্ধকেও বেগবান ও হাল্‌কা করে দিয়েছে। কবিতায় যা অসম্ভব ছিল, গানে তা সম্ভব করেছেন কবি। গানের ভাষা কোথাও আড়ষ্ট ও মন্থর হ'তে পারেনি এই অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মশক্তির জন্যই। সুকুমার সেন ঠিকই বলছেন—'গানে একদিকে এই নিতান্ত হালকা চাল্, অপর দিকে অপরিচিত সংস্কৃত (তৎসম) শব্দবহুল এমন গম্ভীর চালও আছে, যাহা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় চালাইতে উৎসাহ দেখান নাই। যেসব ভারি শব্দেও কবিতার ভূমি-তলে চঙক্রমণ ষ্টীম রোলারের মত নিদারুণ সশব্দ মন্থর হইত, তাহা গানে সুরের চক্রান্তে গগনে উধাও হইয়াছে।"[৫৭]

গানের ভাষার চলিতত্ব গানের ভাব, সুর ও গায়কীর পক্ষে সুসহ হয়েছে। মিল, অনুপ্রাস, ধ্বনিরূপ, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদিতে পদবন্ধের হাল্‌কা-চালটি, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের চল্‌তি রূপটি রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ উপযোগী হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের শব্দঘটিত কয়েকটি প্রয়োগ-শৈলী।

(ক) কম প্রচলিত, অচলিত, দেশী-বিদেশী, পদাবলীর গৃহীত শব্দ ইত্যাদি থেকে বিশিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ। (পূজা পর্যায়ের গানের শুধু সংখ্যা ও অন্যান্য পর্যায়ের নাম ও গানের সংখ্যা নির্দেশ করা আছে)।

দৃষ্টান্ত: অমন, অমনি, এমনে কাটিবে (পূ ৩৯), তোহারি, তারি মাটির প্রদীপ (পূ ৯), আমারি, আগায়, আঁধি, আপদ (১০), একের কথা আরে (১৪), আঁধারা (প্র ২৮), আঁটি (৭৯), আভিয়া (প্র ২৫৭), একেলা (কেটেছে একেলা বিরহের বেলা), ওইখেনেতে (৪৬৯), কাঁসি (২৪), কতমতো (১৮১), কুহেলি (৭), খুন, খুশি, খরা (রৌদ্র হল খরা (প্র ১৯৬), গদি (স্ব ২৬), গোলেমালে (স্ব ৪৬), গাঙ্ (স্ব ৫) গলি (প্র ২৫৯), ঘুর (পূ ২৮১), চাবি, জমা, জিনিস, জুয়ারে (জোয়ার। পূ ১৩৩), ঝারি, ঝুলি, টেঁকা (স্ব ৩৬), ঠেলা (৩০), ঠেকা (২৭), ঠাঁই (১৮), ঠাটে (২৮), ডালা (১১), ঠিক-ঠিকানা (৪২), বান-কোটালে (বি ১৪০)।

তৃষা (৩৭), ততখন (২৮) তুফান, তুহারে (১৩৩), তরাস —পাকাধানের তরাস লাগে (প্র ১৫২), থালিকা, দড়াদড়ি, দেয়াল (৫৫৪), দাগ, দোসর, দেনা (৭৫), ধাঁধা, ধাঁদা, ধৈরজ (প্র ১৩০), নাড়া, নাড়ানো, নিঃস্বর (প্র ২০৬)।

পরানি, পুর, পাড়ি, পাকের ঘোরে (১৯০), পাগলা (৩১), পরান-পুতলা, ফাঁদে, ফাগুন, ফাঁসি (২৪৪), ভরা বাদর, বিজুল শিখা, বাঁশুরি, বেনুকা, বসন্তী, বোবা (৮), বেদন (১২), বালাই (৬১১) বড়াই (২৫৯), বাতি, ভরসা, ভাবনাতে, ভেলা, ভিড়, ভুঁই, ভুঁয়ে (প্র ১৫১), ভগন (৪৯৭), মত মতো, মতন, মাড়া (২০০), মিতে, মধ্যিখানে (স্ব ২৭), মেয়াদ (৬১১), মার (১৯৯), ভুখের পরে (৯৮) যতখন (২৮), রাজি (৫৫৩), লাগাম (৫৭০), শিকল (২২), সৌরভ (৭১) সাঁজ, সাঁঝ, সনে সঙ্গে সাথে, সেইখেনে (স্ব ২৯), হওয়া, হিসাবি (স্ব ৪১), হুকুম (৪৪), হাজার (১৫৩), হাট, ইত্যাদি।

(খ) :—শব্দদ্বৈত, দোসর ও সহচর, সম ও বি-সমভাবের শব্দ রবীন্দ্রনাথ কেবলই ব্যবহার করেছেন। মিল ও বিষম মিল দুটি অনুচ্ছেদে এরকম উদাহরণ তুলেছি। সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করা গেল—

শব্দদ্বৈত : তারায় তারায়, কালে কালে, সুরে সুরে, রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে, (ক্রিয়ায় দ্বিত্ব) পোহালো পোহালো বিভাবরী, ইত্যাদি।

অনেক গানের দিকে তাকালে এই শব্দদ্বৈতের অফুরন্ত প্রয়োগ দেখতে পাবো 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' গানটিতে শব্দদ্বৈতের ধ্বনি ঝংকার—

বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, কোণে কোণে, রঙে রঙে, গানে গানে, মনে মনে, খনে খনে, জনে জনে, বারে বারে, দ্বারে দ্বারে, কেঁপে কেঁপে, হেরো হেরো, পাতায় পাতায় ইত্যাদি। এভাবে বহু সংগীতের অবয়বে শব্দদ্বৈতের লীলা দেখতে পাবো, দেখবো তাদের অনিবার্য প্রভাব।

সহচর শব্দ : কুলকিনারা, চেনাশোনা, ঝড়বাদলে, টাকাকড়ি, কাননগিরি, ধনেজনে।

সহচর শব্দ (দুইএর অধিক) : সুখেদুঃখে লাজে ভয়ে, হাটে মাঠে বাটে (২২৮), তনুমন প্রাণ, ধনজন মান (২৩৬), প্রেমে প্রাণে গানে (৪২১) পিতা মাতা ভ্রাতা (৪৯৮), নদীগিরিবন (২০০), রবি তারা ইন্দুতে (৩৪৯) ইত্যাদি।

(গ) অচলিত ও প্রাচীন ঢঙের শব্দ ও ক্রিয়া, নামধাতু ইত্যাদি

দৃষ্টান্ত : হ্যাদে গো নন্দরানী, পীতধড়া (বি ৮৮), তুহারে (পূ ১৩৩), তুয়ারে, তিয়াস, দরদিয়া (পূ ১৬৩), বঞ্চিত তব দাসে (পূ ১৭০), নগ নদী (বি ৯৯), নিয়ড়ে নাই (পূ ৩৮৪), দিঠি, দোহে, অনিমিখ, আথর (পূ ৬০২), কলংকভাগী, সকল দাগে হবো দাগী (প্রে ৯১) হৃদি, তিলেক (প্রে ১২১), আন্ কাজে থমকি, শরম লাগে (প্রে ১২২), উলসিত-উথলিত-পাশরিব (প্রে ৩৬৪) পিয়ে (পিয়ে···প্রলয় মদিরা প্রে ১৭৪), চরণ নিছায়ে (পূ ১৩) পাসরি সর্বদুঃখ, চিত্ত মাঝে বিহরো, মুদিয়ে আঁখি পুটে (পূ ১৭১), নূতন পাতা উঠবে জিয়া, তেয়াজি (দুঃখশয়ন তেয়াজি প্র ১৫০), কররহ (দন্ত কররহ দূর পূ ১৭৭), বিসরিব সব দুঃখ, বিচরিবে, উজিয়ে যেতে চাই (পূ ২০৩), তরব পারাবার (পূ ২১৮) নে যায় (পূ ৫৫৮) এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া (পূ ১০৭)।

(ঘ) গানে অশিষ্ট প্রয়োগ : কবিতা ও কাব্যসংগীতে অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগের বাধা বিষয়ে কোন বিধিবিধান নেই। সাধারণতঃ বিষয় ও ভাবগৌরবী রচনায় অশিষ্ট শব্দ অনেকক্ষেত্রে ভাব ও রচনা-নির্মিতির অনিষ্ট ঘটাতে পারে। কিন্তু কৌশলী কবি সুকৌশলে সে-সব প্রয়োগ ক'রে দিতে পারেন, রসহানির কারণ না ঘটিয়ে। রবীন্দ্রসংগীতে অধিকাংশক্ষেত্রেই এই অশিষ্ট-শব্দগুলি ভাব ও বাক্‌প্রকরণে বিরূপতা সৃষ্টি না ক'রে ভাব-ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। যেমন : চুলায়, বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে (পূ ৪৮১), গোলেমালে, গদি, লেখাজোখার কারখানাতে, ফেরাফেরি, কাঁসি, হট্টগোল, ফুটোর পরে ফুটো তাতে (পূ ৫৭০), লাগাম : তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম পরানো, অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন (পূ ২০), আগায় কল : কাঁদাইতে জানে কল (প্রে ৩৮০), বেলাবেলি : চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি (পূ ৪৮১), ফেরাফেরি (বি ৫৪) ইত্যাদি।

(ঙ) বিশিষ্ট কিছু বিশেষ্য ও বিশেষণ, উপচরিত বিশেষণ : অকরুণ, মৃদুস্মিত, অগ্নিজিতা, নির্বিশেষ, অনিমিখা, অনিমিখে, বসন্তী, দীপ্তিমা প্রভৃতি। ওগো অকরুণ কী মায়া জান, মৃদুস্মিত

স্বপ্নের আভাস (প্র ১৪০), বসন্তী রঙ্ দিয়া (বসন্ত কালের রঙ হিসেবে বসন্তী রঙ ?), বাহির হয়ে এলো অগ্নিজিতা (প্র ২৮৩), কে রয় চেয়ে নির্নিমেষে (বি ১৭০), সারাদিন রজনী অনিমিখা, সারা আকাশ তোমার দিকে চেয়েছিল অনিমিখে (প্র ১২১), অনিমিষ শব্দ যজুর্বেদীয় উচ্চারণে (ষ=খ) অনিমিখ ও অনিমিখা হ'য়ে থাকে।

দীপ্ত, দীপ্তিমা, শ্যামলিম, নীলিমা, ঘনিমা, ধূসরিমা প্রভৃতি। নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে (প্র ৯৮), মরু তীর হতে সুধা-শ্যামলীম পারে (প্র ১১৫), দিল তব দেহে নীলিমলেখা (প্র ১২৫), সাথিহারা রাতে, বাজবে বুকে বিদায় পথের চরণ ফেলা, উতল আঁচল এলোথেলো চুল, নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত প্রভৃতি উপচরিত বিশেষণ। সাথিহারা রাত, উতল আঁচল, অপূর্ব একা ইত্যাদি অনেক পদবন্ধ রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও ভাষাকে মহিমান্বিত করেছে। অনেক বিশেষণের বিচিত্র রূপ দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।

তরাস্, পড়ন-কে : পাকা ধানের তরাস লাগে (প্র ১৫২), ভয়কি তোর পড়ন্-কে (পূ ৫৯২)। তরাস্, পড়ন্ শব্দদুটি বিশিষ্ট প্রয়োগ।

(চ) **পদবিন্যাসে বিচিত্র প্রকরণ-শৈলী :** (ক্রম, নৈকট্য ইত্যাদি)

বিশেষণকে বিশেষ্য :

বাকি—আন্ কুড়িয়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি (বি ২৪)
উতলা—বিদায় প্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে (প্রে ১৭১)
একা—কোন আর এক একা ওরে খোঁজে (বি ২৭)
একা—বহুজনতার মাঝে অপূর্ব একা (ভূমিকা)
নূতন—ওগো আমার নিত্যনূতন দাঁড়াও হেসে (বি ২৮)
লজ্জিত, নগ্ন—জাগো, পুণ্য বসন পরো লজ্জিত নগ্ন (বি ৩০)
আকস্মিক—এসো ওহে আকস্মিক, (পূ ২২১)
প্রশান্ত—অকুণ্ঠ আঁখি মেলি দেখো প্রশান্ত বিরাজিত (পূ ২২৬)
অতল—নীল অতলের কোথা থেকে (পূ ৩৪২)
নীরব—নিতল নীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী (পূ ৬৩) ইত্যাদি।

এই প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে শতসহস্র। বিশেষণ যেন বিশেষ্যের ভূমিকায় থেকে দুটো পদের গুণ বা পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে দিচ্ছে। 'বলাকা'য় দেখি—পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ, নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি; নিশ্চল, চঞ্চল, শব্দ দুটি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে কবিতাকে তীব্রতা ও মহিমা দিয়েছে।

(ছ) পদের ক্রম (Order) ও **আসক্তি বা নৈকট্য** (Proximity)

রবীন্দ্র-সংগীতে পদের ক্রম বা নৈকট্য কতখানি ইচ্ছাকৃত ও চমৎকারিত্ব লাভ করেছে দৃষ্টান্ত দেখলেই বোঝা যায়। কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই পদ ও ক্রিয়ার স্থানান্তর অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রভাষার ক্রম-ব্যতিক্রম পদ্ধতি কিছুটা অভিনব।

দৃষ্টান্ত: সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে পৃ ২০৯
আলোক যে তার ম্লান হতাশ পৃ ১৫২
উদার তব সহাস চোখ পৃ ২২১
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর পৃ ২২৫
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ পৃ ৩৩৬
পথ হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে প্র ১২৫
পুরোনো ভাঙা দিনের ঢেলা তাই দিয়ে ঘর গড়ি বি ২৬
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো প্র ১৮৯
আকাশে বয় বাতাস উদাস (প্র ১৭৩)
শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল (ঐ)

সামান্য স্থানান্তর ঘটিয়ে শব্দ বা ক্রিয়ার ক্রম ও নৈকট্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দিয়েও পদবন্ধে চমৎকার গতি, ধ্বনি, অনুপ্রাস ও মিল সৃষ্টি করা হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের সর্বত্র। কবিতায় পদের এই স্থানান্তরিত ক্রম-নির্মিতি নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক একটা বিদগ্ধ কৌশল। রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে এই করণ-কৌশল সহজসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(জ) গদ্য ও সংলাপ ভঙ্গিমা : ছন্দ-মুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের নতুন শৈলী

এই সর্বশ্রেষ্ঠ শৈলী নৃত্য-নাট্যগুলোতে সমধিক। সংলাপ ও কথোপকথনে সুর প্রযুক্ত ক'রে নতুন আঙ্গিকের কলা-বিপ্লব সূচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানেও সেই চল্‌তি কথার ঢঙ্।

দৃষ্টান্ত : তুমি কথা ক'য়ো না। তুমি চেয়ে চলে যাও (প্রে ৩৬৩), এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও (ঐ), পাব প্রসাদখানি তাই ভোরে উঠেছি (প্র ১৪৯), হার মেনেছ? মেনেছি (প্র ২৭৭), কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস্ নে তুই তা কি? (পূ ২৬৮), অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাবো (পূ ৩৭১), আমি চোখ বুজে পথ পাইনে বলে কেঁদে ভাসাই পাড়া, শেষে দশ জনারে দোষী করি (পূ ১৫৪), ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে (প্রে ২৪০), নেই বা কথা বললি, দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী, মনে মনেই জ্বললি, চুপেচাপেই চললি, নেই বা তাতে টললি (স্ব ২৭), ইত্যাদি।

অ-ন্ত্যমিলহীন গদ্যভঙ্গিতে লেখা রবীন্দ্রসংগীত।

যেমন : (গানের প্রথম লাইন নির্দেশ করা হ'ল)

যদি হায় জীবন পূরণ নাহি হল, তব অকৃপণ করে, মন তবু জানে (প্রে ২২৮)

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, ও যে সুদূর প্রাতের পাখি (প্রে ২৩০)

ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা, (প্রে ২৩৩)

দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী পরে, এপারে কৃষি হলো সারা, যাব ও পারের ঘাটে,

হংস বলাকা উড়ে যায় দূরের তীরে তারার আলোয়

তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে (প্রে ২৩৫)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোর ম্লানস্মৃতি,

সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি (প্রে ২৩৬) ইত্যাদি।

চণ্ডালিকার পদবন্ধ ও গদ্যভঙ্গিমা : সাধারণভাবে অন্ত্যমিল আছে, কিন্তু চালটা গদ্যের। গদ্যে সাজালে দাঁড়ায়—

কি যে ভাবিস তুই অন্য মনে নিষ্কারণে বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে, রাজবাড়ীতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। বেলা বহে যায়। রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো, তোর আঙিনা হয়নি যে নিকোনো। তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল। কখন বা চুলো ধরাবি, কখন ছাগল তুই চরাবি। ত্বরা কর্ ত্বরা কর্।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির ও বিভিন্ন নাটকের গানগুলোতে গদ্যভঙ্গিমা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে।

(ঝ) রবীন্দ্রসংগীতের ক্রিয়াপদ, কথ্যরীতির ভঙ্গিমা, গদ্যাত্মক হাল্‌কাচাল—

ক্রিয়াপদ গঠন, অচলিত ও চলিতরূপ, নতুন প্রয়োগ ইত্যাদির কিছু দৃষ্টান্ত :

আসছি তোমায় চেয়ে, তুমি যে চেয়ে আছ, এনু (কিসের লোভে এনু পৃ ৫৩), এলেম, এসেছিলেম, কোরো, করো, করাবে, কইতে (পৃ ৪), কহিতে (পৃ ৭), কাঁদলেম (পৃ ৪৮), বেলা কাটাস্ না, খেলেন (খ্যালেন) প্রাণের খেলাঘরে (পৃ ৫৩), কবরী খসিয়া খুলিছে (প্র ১১৩), এ লজ্জাভয় খসাবে (পৃ ৮৮), ঘুচবে, ঘুচাও, চাই চাইনে, চড়ি (সেই ভরসায় চড়ি পৃ ৩১), চলিতেছিনু, বাতাস ছুটুক, ঢেউ তোলাও (পৃ ৫৭), দুঃখ শয়ন-তেয়াজি (প্র ১৫০), তরব পারাবার (পৃ ২১৮), কেমন যে তান দে'য়া (পৃ ২৮), ধরো, ধরিস্, ধরব, ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে (প্রে ৩৮৬) গাহুক, থুয়ে, রহুক (পৃ ১০৮), বারেবারে দেয় দাগিয়া (পৃ ১০৭), হৃদয় নিল হ'রে (প্র ৭৩), দিকে দিকে আগুন জ্বলাস্ (প্র ২০৫), নূতন পাতায় উঠবে জিয়া (প্র ২৭৬), বিজলি ঝলিয়া উঠে (প্র ৭৯), টানে না, ঠেকাই মাথা, মাথা ঠেকা (পৃ ২৪২), থামল থাকল, থুই থুইল, দেয়া, নেয়া (পৃ ২৯৮), দাঁড়ায়ে দাঁড়িয়ো (পৃ ২৪), দরদ দিলি (পৃ ৩৪৫), নিয়ো, নিইনে কানে (পৃ ১৮), নিলি, নিয়রে, নাবিয়া (পৃ ১৩), নাবে (পৃ ২৯), চরণ নিছায়ে (পৃ ১৩), নে যায় (পৃ ৫৫৮), বুঝিয়ে দে (পৃ ৫৮৬)

পিয়েছিলে (পৃ ৩২), পিয়ো হে পিয়ো, হবে বেলাটুকু পোহালে (প্র ১০৮), প'ল (পড়ল) (প্র ২২১), বোসো, বসো, বোস্ না, বইতে, বিছায়ে, বলিয়ো, বেরোল (বাহির হল পৃ ৩৪৫), হাতবাড়িয়ে আনো, ভুলিয়েছ মোর প্রাণ, ভোলাব, মেলে আঁখি (পৃ ৮), মেলো (ম্যালো), মেলাতে, মিলাব, ম'ল (মরল পৃ ৫৯২), দিলি আঁধার মেলে, স্বর নেবো সেধে (পৃ ৫৮৬),

ঘুঝিয়ে পাই (বি ১০০), রই, রইল, রয়েছ, রইবে, রহি, লয়ে, লবে, লাগাস, লুঠন তোমার পদধূলি (বি ১১২), শুনায়ে, সরতে দাও, হোস, হই, হয়ে, হ', হরো, হরে ইত্যাদি।

(গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ অধ্যায়ে ক্রিয়া সম্পর্কিত আরও বিবরণ দ্রষ্টব্য)

কৃদন্ত ইল, ই, ইলি, নু, নে, নি, এ, য়ে, লেম প্রভৃতি যোগে ক্রিয়ার চলিত ভঙ্গি :

ই, ইল :—পার করে নিই (পৃ ৪৪), নিই নে কানে, কি নিলি তোর দান, আইল রে প্রিয়তম,

নি, নেঃ—জানি নে পথ, দেখতে আমি পাইনি, পাইনে আমি ছুটি, হোস্‌নে আকুল, কথা কোসনে লো রাই, গান ফিরে নে (পৃ ১০), শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি, চাইনে, করিনে, গাইনে কেন কী কব তা, যাই নে কেন জান না কি (পৃ ৮)

নু :—খবর পেনু, কিসের লোভে এনু, চলিতেছিনু তব কমল বনে (পৃ ৭), জাগি হেরিনু, ভাঙাইনু-বাগাইনু-জাগাইনু (বি ১২৯), দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি, কত মনে করিনু ((প্র ৩২৭),

এ, য়ে :—লাগিয়ে দিলে, নে (নিয়ে) যায়, যুঝিয়ে, রঙিয়ে, থুয়ে, আগিয়ে, বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায় (প্রে ৩৮৭),

লাম, লুম, লেম :—এলাম ঘুরে, এতদিনে জানলেম, ভিজিয়ে দিলেম না, আনন্দে তাই ডুবেছিলেম, যে কাঁদনে কাঁদলেম, শুনিয়েছিলেম গান, পথের দুঃখ দিলেম তোমায়, ভেবেছিলেম আসবে ফিরে তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়, ইত্যাদি।

নাট্য সংলাপে লুম-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া অধিক হলেও কবিতা ও কাব্যসংগীতে এই শ্রেণীর ক্রিয়া অপ্রতুল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ শ্রুতিরম্য শব্দ ও ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। মনে করতে বাধা নেই, রবীন্দ্র-নাথের অশিষ্ট প্রয়োগ সুনিশ্চিতভাবে তাঁর ইচ্ছাকৃত। গানের ভাষণে লুম-যুক্ত ক্রিয়াপদ দেখা যায় না। লেম্ ব্যবহার সর্বত্র।

যৌগিক ক্রিয়া :

দৃষ্টান্ত : ছাড়ে ছাড়ুক, কুড়িয়ে বেড়াই, দিলেম খুলে, খুঁজে ফিরি, চেয়ে নিয়েছিলে, প্রাণ উড়ে চলুক, কাঁদন জেগে ওঠে, কেমন করে দিলে জুড়ে, জেগে থাকুক, জমিয়ে তুলেছি, জীবনটাকে তোল জাগিয়ে, নামটি রাখ থুয়ে, দিচ্ছ মেলে, দাও ভেঙে দাও, বয়ে বয়ে বেড়াস, পরতে গেলে লাগে এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে, বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায় (প্রে ৩৮৭), তাইতো পরান

পয়ানপথে হাত বাড়িয়ে মাগে (পৃ ৭৮), আমায় পথে লুকিয়ে চল সাথে (পৃ ৮৪), ঠেলিয়া চলেছি (পৃ ১০০), ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার জোড় ও সহচর :

হেসে খেলে গেছে বেলা, জেনে শুনে বিষ করেছি পান, ধুয়েমেজে, কত গান সুরে গলিয়া ঝরিয়া, হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে, আসা যাওয়ার পথের ধারে. দেয়ানেয়া, দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়ার জোড় :

আসব যাব চিরকালের সেই আমি, আসে যায়, আসবে যাবে, রাখো মারো, কাড়ো কাড়ো, এবার যা করবার তা সারো সারো, ইত্যাদি।

সাধু ও কথ্যভাষার ক্রিয়ার মিশ্রণ :

আমি ফুল তুলিতে এলেম (প্র ৩৪৪); কাছে যে টানিয়া আনে (প্রে ৩২৫), তারে রাখতে নারি টানি (=টানিয়া) (প্রেম ৩২৩), দিতেছে আঁকি (=আঁকিয়া), দিয়ে চরণ গেল চলিয়া (প্রে ২৫৩), কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে (প্রে ৫০), দিয়ে রচিব না মোরা প্রিয়ে (প্রে ৪৯) ইত্যাদি। সাধু ও কথ্য ভঙ্গির ক্রিয়ার মিশ্রন রবীন্দ্রসংগীতের অনায়াসসিদ্ধ ব্যাপার।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পুনর্বৃত্তি :

কাঁদিয়া কাঁদাও গো (প্রে ৩৭৪), কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া (প্রে ৩৭০), এসে এসে ফিরিয়া যায়, আয় আয়, যায় যায়, যেতে যেতে একলা পথে, ডেকে ডেকে, আমার পানে চেয়ে চেয়ে, বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে, তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে, হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে, পিও হে পিও, নিও হে নিও, বাজাও আমারে বাজাও, আসে বুঝি আসে, ডুবতে দাও ওগো মরতে দাও, টুটলো বাঁধন টুটলোরে, নন্দিত করো নন্দিত করো, প্রভু বলো বলো কবে, যা করবার তা সারো সারো, সব কাড়ো কাড়ো, ভোলাও ভোলাও, তারে তুমি ডাকো ডাকো, ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ, যাবার দুয়ার খোলো খোলো,

পোহালো পোহালো বিভাবরী, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে,
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর (পৃ ১০৪) ইত্যাদি।

(ঞ) নামধাতু: রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে শব্দের ধাতুরূপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি।

রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যান্তর পর্যন্ত নামধাতু প্রয়োগের বিপুলতা দেখা যায়, যেখানে ভাবের সঙ্গে শব্দ ও নামধাতুর সমন্বয় গড়ে উঠেছে। একটি কবিতা: "দিগ্‌বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া এ বক্ষ পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণকক্ষ সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ অন্ধকারাগার, হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে—" (বসুন্ধরা/মানসী)।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত নামধাতু:

সংস্কৃত ও দেশী প্রাকৃতজ পদের নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক নামধাতু ইত্যাদি যথেচ্ছভাবে রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে উপস্থিত হয়েছে।

(পূজা পর্যায়ের গান থেকে): ক্রন্দি, তর্জি, গর্জি (২৩৭), বিসরিবে, বিচরিবে (২৭৩), কম্পিছে (৩২২), কুহরে, বাহিরায় (২০৬), নির্ঝরিয়া গলিবে (২৩৪), ইচ্ছা তরঙ্গিছে, পূর্ণ প্রকাশিছে (২৯৪), বিহারো, (৩৬৩), আকুলিয়া দাও প্রাণ, মন তারি উদাসে (৫৬৪), সন্ধিয়া, ক্রন্দিয়া (১১২), বাঁশরির সুরে বিলাসে (৬৬), সব গগন উদ্‌বেলিয়া (৩২২),

(প্রেম পর্যায়ে): ছাঁদিয়ো, ধাঁদিয়ো, ফাঁদিয়ো (১২৬), ব্যথিছে হৃদয় (১২৭), মুঞ্জরিল শুষ্ক সাখি, কুহরিল মৌন পাখি (১৪১), পরান কেন দুখায় রে (১৫৬), লাজ লাজানো (১৯০), চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া (১৯৬), রেখো সরসিয়া (৩৩২), তৃণ কুসুম শিউরেছিল, হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া (২৯৬),

(প্রকৃতি পর্যায়ে): হৃদয়ে মন্দ্রিল (১০৩), প্রসারিল (২৪), মর্মরিছে (২৩), দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ (৭৯), আঁধারিল মন (১১৯), মম অন্তর উদাসে (২৮১), আজ প্রভাতে হৃদয় ওঠে চঞ্চলি (১৫৩), কানন কানন মর্মরি (৭৮),

(বিচিত্র পর্যায়ে): ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে (১২৬), মন্দ্রি উঠে সারা আকাশ (১০৭), নয়নে উঠে গো আভাসি (৬৫), ইত্যাদি।

ধ্বনি ও অনুকারাত্মক নামধাতু:

দৃষ্টান্ত: ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে, আঁখি আমার ছলো ছলে (পূ ১৪৭), পিনাক টংকারো (পূ ২৩৩), ঝংকারিয়া উঠিল আকাশ (পূ ৫৬৪), ঝলকিছে কত ইন্দু (প্রে ৩২), বিজলি ঝলিয়া উঠে (প্র ৮৪), গাও গুণগুণ গুঞ্জরিয়া (প্র ১২১), ঝনু ঝন ঝনিল (প্র ২৩৯), টলটলিয়া, নয়ন ছলছলিয়া (প্র ২৫৩), পাতালগুলি শিরশিরিয়ে (প্র ১৭৬), শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্মরিছে (প্রে ২৯৮),

(ট) **সমধাতুজ কর্ম ও পদ:** রবীন্দ্রসংগীতে এই শব্দটির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করতে পাই; প্রচলিত ও নতুনভাবে গঠিত সমধাতুর কর্ম।

দৃষ্টান্ত: নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে (প্রে ৩৮৫), গোপনে কে এমন করে এ ফাঁদ ফেঁদেছে (ঐ), নীপশাখায় দুলিছে পুষ্প-দোলা (প্র ১১০), কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে (প্র ১২৯), নামাবলীর আঁকন আঁকে (পূ ৬০২), অস্তরবির রাঙারসে রসিল (বি ১৪০), বোঝায় যত কথার বোঝা (পূ ১৪), তোমার হাসি হেসে, মধুর খেলা খেলে (পূ ৩০), যে কাঁদনে কাঁদলেম (পূ ৪৮) কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি (পূ ৫৩), আছ তুমি এই জানা তো জানি, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে, অনেক কথা বলেছি সে মিথ্যা বলা, অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা; বাহির-বাঁধনে বাঁধিবি কি বন্ধুরে (প্রে ৩২০), তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না (পূ ৩৫৯), দাও স্বরের ঢালা ঢেলে (পূ: ৩০), যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা (ভূমিকা), ইত্যাদি।

নির্দেশপঞ্জী

(এক)

১। I.A. Richards—The Philosophy of Rhetoric (1936) P. 59

২। L. Abercrombie—The Theory of Poetry P. 14

৩। T. S. Eliot—Sacred Wood P. 54-55

৪। কবির কৈফিয়ৎ-রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ৩০২

৫। গুণময় মান্না—রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা পৃঃ ৫০

৬। হরপ্রসাদ মিত্র—কবিতার বিচিত্র কথা পৃঃ ৬২

৭। ছন্দ—রবীন্দ্ররচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ২৩৪

৮। শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্ররচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ৬২

৯। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) পৃ, ৫০

১০, ১১। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক পৃঃ ৩৭৪, পৃঃ ৩৭৫

১২। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতিবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১৭২

১৩। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৮৫

১৪। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কার চন্দ্রিকা পৃঃ ৭

১৫। প্রবাসজীবন চৌধুরী—সৌন্দর্যদর্শন পৃঃ ২৯

১৬। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক পৃঃ ৩৭৫

১৭। E.A Greening Lamborn—The Rudiments of Criticism P. 45

১৮। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৪০

১৯। দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় পৃঃ ২৫৯

২০। অরুণ ভট্টাচার্য—সংগীতচিন্তা পৃঃ ১৩৩

২১। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসংগীত আলোচনায় উভয় বিষয়ে তীব্র সুরধর্মের সঞ্চরণ লক্ষ্য ক'রে মন্তব্য করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কবিতাতেই সুর সংযোজন করা সম্ভব। শুনিয়াছি শেষ বয়সে তিনি উর্বশী কবিতাতে সুর সংযোজন করিয়াছিলেন এবং বিদায় অভিশাপকে সুরে গাঁথিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৫২

আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাতে সুর সংযোজন করা যায় না। কেননা, সুর বহন-যোগ্য কবিতার ভাষা ও গঠনের সঙ্গে সাধারণ কবিতার ভাষা ও কাঠামোর কতখানি পার্থক্য তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, গানের যোগ্য কবিতার চরিত্র ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা ও ধ্বনি-মিল-উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি সাধারণ কবিতার থেকে পৃথক হ'তে বাধ্য। বর্তমানে বাংলা কবিতার অফুরন্ত সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গান বা কাব্যগানের সৃষ্টি হচ্ছে না যোগ্য গীতিকারের অভাবে। রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তার সমান্তরাল গীতিকার-সত্তার বারংবার উজ্জীবন হয়েছে ; কখনো কখনো কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন গীতিকার। এমনটির নজীর মেলে না কোথাও।

২২। ক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় পৃঃ ১৪৬

২৩। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কার চন্দ্রিকা পৃঃ ১০-১২

২৪। রিচার্ডস্ বলেন—'Sequences of syllables both as sounds and as images of speech—movements leave the mind ready for certain further

sequences rather than for others."

Principles of Literary Criticism P. 134

২৫। প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ১৫২

২৬। Greening Lamborn—The Rudiments of Criticism P. 50

২৭। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ২৩

২৮। রবীন্দ্রনাথ—ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩৭

২৯। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা-বিশ্লেষণে কোন কোন সমালোচক সংগীতে অনুকার ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ-প্রয়োগের অনুপযোগিতার কথা তুলেছেন; রবীন্দ্রনাথের গানে সেজন্যই এ-সবের প্রয়োগ সীমিত ব'লেও মন্তব্য করেছেন। (দ্রষ্টব্য—বাংলাসাহিত্য পত্রিকা [ক. বি.] ১৯৭০ পৃঃ ১৪৩)। কথাটি ঠিক নয়, বরং উল্টো। আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধ্বনি-মিল, সান্তর্মিল, বিশেষণ, গীতাত্মক অনুষঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই জাতীয় শব্দের উদাহরণ সহ আলোচনা করেছি; এবং বলতে চেয়েছি রবীন্দ্রসংগীতের অবয়বে এই ধ্বনির শিল্পই অন্তরে বাহিরে সুরের আবহপট সৃষ্টি করেছে, সুর ছাড়াই রবীন্দ্রসংগীতকে সুরেলা মনে হবে।

৩০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ত্রয়ী (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

৩১। সুকুমার সেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার: রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৫৫

৩২। T.S. Eliot—Tradition and The Individual Talent: Sacred Wood

৩৩। সুকুমার সেন—রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১১৫

৩৪। রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাজনের নানামত। সম্প্রতি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারটির সমাধান করেছেন। তাঁর মতে, সুরে বসানো এবং সুরে দেওয়া হয়নি এমন সমস্ত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা হ'লো ২২৩২।

৩৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা (ডঃ গুণময় মান্না) ভূমিকা পৃঃ ২০

(দুই)

৩৬। "Frequency and Pitch—Sound may derived into noised and musical notes. A mere noise is an irregular disturbances. If we study the source of producing it, we find that there is no regularity of vibration. A musical note always arises from a source of which has some regularity of vibration." Encyclopaedia Britanica. Vol. 25, P. 25

৩৭। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কার চন্দ্রিকা পৃঃ ১৬৫ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য

৩৮। Walter Pater - Style, Appreciations P. 25,

৩৯। Abercrombie—Poetry: Its music and meaning P. 43

৩৯ক। সাদৃশ্যমূলক অলংকার, উপমাদি অর্থালংকার ও অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত।

(তিন)

৪০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কুলায় ও কালপুরুষ, মুখবন্ধ পৃঃ চ-ছ.

৪১। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী চিত্র প্রবন্ধে বলেছেন—"সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য ধ্বনি-গাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণভাবে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্‌সর্ট বাজিয়া উঠে; তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্-নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না।" প্রাচীন সাহিত্য পৃ. ৬০

৪২। সুকুমার সেন—রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড)—পৃঃ ১১৭-১১৯

৪৩। ক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় পৃঃ ১৪৬

৪৪। রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য পৃঃ ৫৯

৪৫। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য—পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২৭

৪৬। বিমানবিহারী মজুমদার—বাংলাসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃঃ ৮২

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সংকলিত—পদরত্নাবলী (আদি ব্রহ্মসমাজ ১২৯২)

৪৮। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—Sahitya Academy Centenary Vol. (1961) P. 123

৪৯। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথ (ইষ্টলাইট প্রকাশন) পৃঃ ৫

৫০। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১৮৪

৫১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ পৃঃ ৪২৮-৪২৯

৫২। রবীন্দ্রনাথ—কাদম্বরী চিত্র : প্রাচীন সাহিত্য

৫৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ (গৌরীপ্রসাদ ঘোষ) ভূমিকা পৃঃ ১৬

৫৪, ৫৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কুলায় ও কালপুরুষ—পৃঃ ৩০, ৫৩ যথাক্রমে

৫৬। ক্ষুদিরাম দাস—বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি পৃঃ ২৭৬

৫৭। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৫৩৯

মেঘ রঙে রঙে বোনা আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ্ যে বাজলো পাখির রবে।
আজ রঙ্ সাগরে তুফান ওঠে মেতে,
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপমা ও চিত্রকল্পের বহুবর্ণী সমারোহ

উপমালোক : উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য

এক

"উপমা কালিদাসস্য কথাটা দেড়হাজার বৎসর সমুজ্জ্বল থেকে আজ কিন্তু ম্লান হয়ে গেছে আমাদের রবির আলোকে। আজ আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য।"[১] জগতের সত্যকার প্রতিভাধর কবি পাঞ্চভৌতিক জগৎ, 'নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী অরণ্যের পতঙ্গ অবধি' স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি, ইন্দ্রিয় ও বোধের দ্বারা আয়ত্ত করেন। তাঁর সেই অসামান্য অলৌকিক লীলায়নের প্রকাশ হবে বাণীতে, এবং 'বাণীতে সমর্পিত জগৎ।' কাব্যসংসারের প্রজাপতি-প্রতিম কবি স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবরসের ও আনন্দের রূপ দেবেন অলংকৃত 'বৈদগ্ধভঙ্গিভনিতি'র মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে (গদ্য নাটক উপন্যাস গল্পেও) অসীম অকল্পনীয় উপমালোক দেদীপ্যমান।

উপমা অর্থে সর্ববিধ অর্থালংকারকে বোঝায়। আলংকারিক মনীষী বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে সমস্ত অর্থালংকারের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার-

গুলি চমৎকার-বিশেষ-বিধায়ক ও সংখ্যার হিসাবে সর্বাধিক। সেই সকল সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের আশ্রয়স্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ হলো উপমালংকার। আলংকারিক বিশ্বনাথ একথা মনে করেই তাঁর সুবিখ্যাত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে উপমাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন—"অর্থালংকারেষু প্রাধান্যাৎ সাদৃশ্যমূলেষু লক্ষিতব্যেষু তেষামপ্যুপজীব্যত্বেন প্রথমমুপমালংকারঃ।" (সাহিত্যদর্পণ। দশম পরিচ্ছেদ)। এ প্রসঙ্গে শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেন— "এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, উপমার অর্থ এখানে শুধু পূর্ণ বা লুপ্ত-উপমা অলংকার নয়; উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ভ্রান্তিমান ইত্যাদি সাদৃশ্যাত্মক সকল অলংকার। উপমা কালিদাসস্য-তে এই নানাভাবের উপমার কথাই বলা হয়েছে।"[২]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—"কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাচ্য সর্ববিধ অলংকার অর্থে উপমা কথাটির ব্যবহার নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসার্থক নয়, উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালংকারের মূলীভূত অলংকার।"[৩] সাহিত্যের উপকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ক'রে বলেছেন—"সাহিত্য আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে।" তাঁর মতে "চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।"[৪]

পরন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাব ও বাক্‌নির্মিতি-কৌশল হিসেবে সমস্ত অলংকারকে 'চরমের প্রতিরূপ' বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে 'রসবোধের চরমতা' পাওয়া যায়।[৫] বলেছেন, যেহেতু কাব্য হলো শিল্পকলা, তাই তাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে— 'মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন করে সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।' সাহিত্যের অধরা-মাধুরীকে বাক্-এর উপাদানে গড়তে হয়। ঐ উপাদান স্থূল হতে পারে, কিন্তু নির্বিশেষ ও অনির্বচনকে ধরতে ধরতে স্থূল উপাদান-ও সূক্ষ্ম হ'য়ে যায়। অনির্বচনকে রূপে রূপায়িত করতে করতে বাক্ হয়ে ওঠে অরূপ-প্রতিমা। রবীন্দ্র-বাক্‌শিল্পে সেই অনির্বচন ও নির্বিশেষকে অপরূপ প্রতিমায় রূপায়িত হ'তে দেখি।

বিশ্বরসচৈতন্যলোকের সকল প্রকার কার্যপরম্পরা ও সম্ভাবনার রূপ রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনার মধ্যে বিধৃত। রবীন্দ্রসৃষ্টিতে অনন্ত ভাবজগতের মায়া ও সৌন্দর্যের প্রস্রবন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'বিশ্বমনঃ বাক্‌পতি।'

'Rabindranath Tagore was that unique and rare pheno-

menon in the domain of man—the Full or Complete and Integrated man, with a mind of the widest perception···"[৫]

ভাষ্য-উপক্রমনিকায় ঋগ্বেদ বলছেন : উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উত ত্বঃ শৃন্বন্ ন শৃনোতি এনাম্।
উতো তু অস্মৈ তন্বংম্ বি সস্রে
জা এব পত্য উশতী সুবাসাঃ।

অর্থাৎ—বাক্‌কে কেউ হয়তো দেখেও দেখলো না; শুনেও শুনলো না কেউ হয়তো। অথচ সে কারও কাছে নিজেকে অনাবৃত করে দেয়, যেমন পতির কাছে সজ্জিতা পত্নী আত্মসমর্পণে করে। বাস্তবিকই বাণীর রূপৈশ্বর্য, বাণীর সুরসঙ্গতি সকলের অধিকারে আসেনা। বাণীর অনুগ্রহ যাঁর ওপর, তিনিই তাঁর অধিকার পান।

রবীন্দ্রনাথ বাক্-এর সত্যকার শ্রোতা ও দর্শক এবং বাক্ তাঁর সকল প্রসাদ ও রূপ নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। "He was thus a Lord and Lover of speech from all aspects; And this love of speech is part of his wider mental make-up, his mind having been ever open to everything in this world which was of interest for man. He was thus a Visva-Manaha and a Vak-pati at the same time."[৬]

বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রচনাগুলিতে বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিলীলা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এখানে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি মুখ্য অংশ-বিশেষের আলোচনা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সংগীতের ভাষাকে কাব্যোপাদানের চেয়েও গুরুত্ব ও মূল্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উপমা-প্রয়োগ ও বিশেষণ-নির্মাণ-কৌশল ইত্যাদি তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু আমরা দেখতে চেষ্টা করবো, সংগীতের বিষয়, ভাব ও পরিসর যেখানে সীমা-স্বীকৃত ও সুরাশ্রয়-সাপেক্ষ, সেখানে সাধারণ বাক্-নির্মাণকৌশল কতখানি উপযোগী। ভাষাচাতুর্য, ভাষার স্থাপত্য-নির্মাণ, ছন্দোবন্ধের করণলীলা ইত্যাদি সংগীতে যথেচ্ছ চলতে পারে কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে অকল্পনীয় বাগৈশ্বর্য, বাক্‌শিল্প, ছন্দঃস্পন্দন ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা তিল তিল সৌন্দর্যে তিলোত্তমা হয়েছে; লাবণ্যে ও প্রসাদে তার তুলনা নেই। উপমাদি অলংকার সেই ভাষার ও ভাবের

অঙ্গে এমনই অঙ্গীভূত হ'য়ে আছে যে, না খুঁজলে তাদের দেখতে পাওয়া সহজ নয়। কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসের অলংকার্য গুণ হিসেবে এই বিস্ময়কর বাক্‌প্রকরণ, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদিকে বুঝতে হবে। উপমার কাজ পাঠকচিত্তকে রঞ্জিত ক'রে দেওয়া। শব্দ ও বাচ্যের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সে মর্মমূলে উত্তরণ করে; চোখ পেরিয়ে যায় মনে, মন পেরিয়ে রসে। আলংকারিক অপ্পয় দীক্ষিত তাঁর 'চিত্র-মীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন—

উপমৈকাশৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা ভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥

অর্থাৎ উপমা এমন এক নটী যে চিত্রভূমিকা-ভেদ[৭] নিয়ে কাব্যমঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্য-বোদ্ধাদের চিত্তরঞ্জন ক'রে দেয়। রাগরাগিণীর-ও বড় কাজ শ্রোতার চিত্তকে রঞ্জন করা। কথা ও সুর এ দুটো উপাদানের প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি যথাক্রমে বাহ্য ও সূক্ষ্ম হলেও পরিণতিতে দুটোই সূক্ষ্ম, অনির্বচন ও রসতা-প্রাপ্ত। তাই রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার ভিন্ন পদ্ধতিতে বিবেচ্য হওয়া দরকার।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রসংগীতের উপমাদি সাদৃশ্য-মূলক অলংকারগুলো সহজ সরল ভাষায় নির্মিত। কিছু গানের বাণীবন্ধ গুরুভার, শক্ত, সুন্দর শব্দ নিয়ে রচিত এবং সেখানে অলংকারের ভাষা গুরুতর হলেও বাক্, অর্থ ও সুরের সঙ্গে তার সুন্দর মিল হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার সূক্ষ্ম ভাব ও রসবাহী হ'য়ে গানের পদবন্ধে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেনি। রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার শব্দশক্তিরই এক বিস্ময়কর প্রকাশ, কাব্যগীতির রসপরতন্ত্র ও আত্মার অলংকার্য হ'য়ে উঠেছে। অভিনবগুপ্ত বাচ্য-অলংকারাদিকে 'আত্মৈবালংকার্য' বলেছেন; রবীন্দ্রসংগীতের অলংকারকে সেভাবেই বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রসংগীতের উপমা অসামান্য চিত্রালেখ্যহিসেবে বিকশিত।

চতুর্থতঃ প্রতিটি গানে পরিসরের রীতির নির্দিষ্টতা (২, ৩, ৪ কলি) থাকায় অলংকারের পরিমাণ ও অবস্থিতি তাঁর কবিতা অপেক্ষা গানে অধিক ও অধিকতর প্রকট হয়েছে ব'লে মনে করি। কবিতার বিস্তৃততর অবয়বে অলংকারগুলো যথেষ্ট রীতিসম্মত মূল্যে ও মহিমায় সংস্থাপিত হয়। তাদের পরস্পরের ঘনসংবদ্ধতা ও নৈকট্য গানের অলংকারগুলোর মতো নয়। অলংকারের অবস্থিতি তাঁর কবিতা অপেক্ষা গানে অধিকতরভাবে প্রকট মনে

হবে এইজন্তে যে, ছোট ছোট গানের অবয়বের মধ্যে যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত অলংকার ব্যবহার ক'রে গেছেন তিনি। অবশ্য অলংকারবিহীন গানও কম রসবাহী নয়।

পঞ্চমতঃ রবীন্দ্রোপমা সহজ স্বচ্ছন্দ বেগবান ও প্রসাদ পূর্ণ; এবং সর্বোপরি 'অপৃথক্ যত্ননির্মাণ'।

ষষ্ঠতঃ অলংকার-প্রয়োগে মূর্ত ও বিমূর্ত, সামান্য ও বিশেষ, জড় ও চেতন ইত্যাদি ক্রমানুসরণ ও প্রস্থানগুলো অসামান্য কাব্যিক কৌশলে নির্মিত হয়েছে গানগুলোতে।

রবীন্দ্রসংগীতের অলংকার একটি আলাদা কাব্যনির্মিতি-উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে না ব'লে আমরা বলেছি। রূপ অপেক্ষা ভাবের (ফর্ম অপেক্ষা কনটেণ্ট) গুরুত্ব বৃদ্ধিতেই তাদের আবশ্যকতা অধিক। উপমা-রূপক-উৎপেক্ষা-সমাসোক্তি প্রভৃতি চিত্র-বৈদগ্ধ্যে প্রোজ্জ্বল শুধু নয়, সংগীতের আত্মাস্বরূপ রস ও সুরচেতনার সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টীকৃত হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—"শব্দালংকার ভাষার সংগীত-ধর্মের অন্তর্গত, ভাষার চিত্রধর্মে জাগে ভাষার অর্থালংকারগুলি।"[৮] রবীন্দ্রনাথের গানে অলংকারগুলো চিত্রধর্ম ও সংগীতধর্ম সৃষ্টি করতে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রযুক্ত অলংকারগুলো সূক্ষ্ম সারল্যে মর্মরস উদ্দীপ্ত করে। ডঃ দাশগুপ্ত আরও বলছেন—"ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে চিৎপ্রত্যয় (Concept) লাভ হয়, মন তাহার নিজের শক্তিতে তাহার ভিতরে নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়।...আমাদের জ্ঞানকর্ম নিষ্পন্ন হয় সম্পূর্ণ না হইলেও অধিকাংশই বহির্বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে। এ জিনিষটি খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে যখনই আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাই, এ সকল বিষয়ে কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিকে বলিতে হইবে। ভাষার ভিতরে নিহিত এই যে বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি, তাহাই ভাষার চিত্রধর্ম।"[৯]

সাহিত্যে জগত ও জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়। এই চিত্রভূমিকার বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ধর্ম আছে। বাহ্য বা আধ্যাত্মিক জগতের স্বরূপ ভাষার শক্তির মাধ্যমে যতটা উপলব্ধিতে ও মনে প্রতিভাত হয়, ততটাই প্রত্যয় বা কন্‌সেপ্‌ট্। রবীন্দ্রনাথের অলংকার সেই প্রত্যয় এনে দিয়েছে সর্বদাই। বিশেষক'রে তাঁর কবিতা ও গানের অলংকার সংগীত ও চিত্রধর্ম সৃষ্টি ক'রে বস্তুজগতের জ্ঞানের

সঙ্গে লোকোত্তর রসের জগতের সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের অলংকারের বিচার প্রধানতঃ এই রীতিতেই হওয়া উচিত। অলংকারকে কাব্যের রূপাবয়বে ও অর্থের বৈভবে দু'ভাবে দেখা যায়। সংগীতের অবয়ব ও ভাব-সংগতির পরিসর যেহেতু সংকীর্ণ, সেজন্য সাধারণ কবিতার মতো এখানে অলংকার প্রয়োগ চলে না। সেজন্য সংগীতের উপযোগী স্বল্পায়তন ভাষার অলংকারই উপযুক্ত বাহন হয়। "আর গানের পক্ষে অলংকারের প্রয়োজন-ও খুব বেশী, কেননা এমন এক একটি অলংকারের প্রয়োগের দ্বারাই অনেক কথা বাঁচানো যায়, আর তাতেই ভাবব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়। বোধকরি সমাসোক্তি (সমাসোক্তি মানেই সংক্ষেপোক্তি) অলংকারই গানের পক্ষে সেরা অলংকার।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোট ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমত তাল ঠুকে বেড়াতেই হয়, তাহলে বড় আখড়া চাই। তাছাড়া গান জিনিষে বেশী বোঝাই সয় না, যারা মালের ওজন ক'রে দরের যাচাই করে, তারা এরকম দশ বারো লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না।"[১১]

রবীন্দ্রসংগীত উপমা ও রূপকাদি অলংকারের সহজ দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সমাসোক্তি অলংকার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অচেতনে বা উদ্ভিদে বা নিসর্গে বা গুণে চেতন ও মানবোচিত শক্তি, গুণ বা ব্যবহার আরোপ ক'রে সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতে। বিশেষক'রে প্রকৃতিকে এই লক্ষণাক্রান্ত হতে দেখা যাবে সর্বত্র, ভাবে ও চিত্রে এদের তুলনা নেই। রবীন্দ্রসংগীতের ভাবের স্বর্গস্পর্শী ব্যাপ্তি ও মহিমাকে ধারণ ক'রে রেখেছে তার বাগৈশ্বর্য ও অলংকার। সেজন্যও "রবীন্দ্রনাথের গানের অলংকার নিয়ে আলোচনা করবার বিশেষ সার্থকতা আছে।"[১২] প্রশ্ন আসতে পারে, সুর-সাপেক্ষ গানের কাব্যদেহ আলোচনার সার্থকতা কি? রবীন্দ্র-কাব্যকীর্তির ও প্রতিভা-স্বরূপের বিপুল গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে; কিন্তু তাঁর কবিতা ও গানের ভাষণরূপের মধ্যেই যে এই স্বরূপ-উদ্ঘাটনের বিপুল উৎস ও সম্ভাবনা আছে, —এটা তেমন আবিষ্কৃত হয় নি। সুর বাদ দিলেই রবীন্দ্রনাথের গানের যে কাব্যরূপটি বাকী থাকে, তা আর্ট হিসেবে এত বেশী যে, তাকে ব্যবহারিক উপায়ে ধরতে চেষ্টা করার ক্ষতি কোথায়? তাছাড়া গান মনে ক'রেই

গতানুগতিক সংস্কারের বশে রবীন্দ্রনাথের গানকে অধিক মূল্য দেবার পরিবেশ ও প্রবণতা খুঁজে পাননি বাংলা ভাষাভাষী গুণিজন। সুলক্ষণের কথা এই যে, দেরী হলেও এই অমেয় রত্ন-ভাণ্ডারের দিকে গভীর প্রত্যাশায় মুখ ফিরিয়েছেন তাবৎ বিশ্বের রসিক সুজন।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই গান লেখায় স্বতঃস্ফূর্ত ও সদানন্দ ছিলেন। তিনি বলেন—"আর একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড় বড় দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়; কর্তব্যের দাবীগুলোকে মন একধার থেকে না-মঞ্জুর করে দেয়।⋯ সৃষ্টির অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায়, তখনি বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোট জুঁই ফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলা-ঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয়, যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।"[১৩]

চারখানি পাপড়ির ছোট জুঁইর মতো একটুখানি গান, অথচ সেখানে বিশ্ব-চরাচরের লীলাখেলা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। প্রাকৃত অতিপ্রাকৃত জগতের ও ভাব-রসের বিশাল জগৎ পরিব্যাপ্ত ক'রে তাঁর গীতপুষ্প অপরূপ সহস্র সহস্র পাপড়ি মেলে দিয়েছে, বিলিয়ে দিচ্ছে ঘ্রাত অনাঘ্রাত অনির্বচনীয় অমৃত সৌরভ। এই গীতপুষ্পের রূপপ্রতিমার রূপায়নিক ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল পাপড়িগুলোকে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায় ফুটতে দেখা যায়। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী'তে কবি তাঁর গানগুলোকে "হাল্‌কা মাল" ব'লে বিনয়ের সঙ্গে ভারী মাললোভীদের পরিহাস ক'রে নিয়েছিলেন। আমরা সেই পরিহাসকে অমান্য ক'রে তাঁর গানকে অসীম মূল্যে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। কেননা, খুব সহজেই বুঝতে পারি যে গানগুলোর মাধ্যমেই কবি তাঁর নিজস্বতা, প্রতিভা, সংস্কার ও উপলব্ধি সহজভাবে বিলিয়ে দিলেন পাঠকদের মনে।[১৪] এই হিসেবে তাঁর গানগুলোকে আমরা বলতে পারি 'চিৎস্পন্দনের শব্দপ্রতীক।'

দুই

কবিকে কেন 'উপমা-পতি' বলা হবে, তাঁর সাহিত্যাবলীর নৈষ্ঠিক রসজ্ঞ পাঠক একথা ভাবতে পারেন। মূর্ত-অমূর্ত, চেতন-অচেতন, বস্তু-অবস্তু প্রভৃতির সাদৃশ্য ও তুলনাকরণ-ক্রিয়ার[১৫] মাধ্যমে তাঁর অলংকারগুলো এসেছে। এবং চিৎপ্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়বেদিতার বাণীরূপায়ন তাঁর উপমা ও রূপক ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত। আলংকারিক অপ্পয় দীক্ষিত মুখ ও চন্দ্র দুটো শব্দের উপমেয়-উপমান প্রয়োগ-ভেদে বাইশটি অলংকার উল্লেখ করেছেন। আলংকারিক প্রয়োগ-সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের গানে আশা করা যায় না। সূক্ষ্ম ও জটিল তুলনাকরণ যেগুলোতে (যেমন প্রতিবস্তুপমা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি) আছে, সেরকম অলংকার অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত অলংকার (যেমন উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস, সমাসোক্তি, অনুপ্রাস ইত্যাদি) গুলো রবীন্দ্রসংগীতে পর্যাপ্ত পরিমানে উপস্থিত। এবং গানগুলোর পক্ষে এগুলোই অধিক উপযোগী। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যশৈলীর অনিবার্য সরল ঘটনা হিসেবে তাঁর উপমালোককে বিচার করা দরকার। উপমার সংখ্যার হিসেব নিয়ে মূল্যায়ন করলে তাঁকে বিশ্বকবিকুলে কুলপতি মনে হবে। এ ব্যাপারে তিনি কালিদাসকে নিজ প্রতিভায় সম্পৃক্ত ক'রে নিয়ে সহস্র গুণে সেই মহাকবিকেই ছাড়িয়ে গেলেন অনেক শ্রেষ্ঠতায়।

ভিন্ন অনুচ্ছেদে বিরোধ, বিরোধাভাস, বিষম ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি; এবং আর এক অনুচ্ছেদে শব্দালংকারের অনুপ্রাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূত্রে। এখানে রবীন্দ্রসংগীতের বহু ব্যবহৃত রূপক উপমাদি অলংকারের বিষয়-ভেদে প্রচুর উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করা যাচ্ছে। দু'হাজার গানের কয়েক হাজার অলংকারের বিশ্লেষণ দুর্ঘট ব্যাপার; তাই এ ব্যাপারে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত সূত্রানুসন্ধানই যথেষ্ট হবে, মনে করতে পারি। কবিগুরু বলেন, "কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা ও পদের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।"[১৬] অলংকারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সীমা নেই তাঁর গানে।

কবিগুরু ভাষায় মূল লক্ষণকে বলেছেন 'প্রতীক-দ্যোতনা'। উপমার সঙ্গে প্রতীকের সংযোগ নিবিড়। কল্পনা বাসনা সংস্কার ইত্যাদির মূলীভূত

অনুপ্রেরণা প্রকৃতি-জগৎ ও মানব-জগৎ সম্পর্কিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে এ ধরণের প্রতীক দ্যোতনার অজস্র উপাদান আছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ চরাচর, বন পুষ্পাদি নিসর্গজগৎ, প্রাণীজগৎ, মানুষের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাব-ভাবনা, মূর্ত ও বিমূর্ত উপাদান ইত্যাদি নির্ভর ক'রে সেই ক্রান্তিকারী প্রতিভার জগৎ।

মূর্ত (Concrete): মূর্ত উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতে আলো আকাশ সূর্য গ্রহ তারা পথ নদী বাতাস ঝড় রাত্রি পাখি পথ বন ফুল দেহ কেশ কবরী উত্তরীয় অশ্রু হাসি ইত্যাদি বিপুল শব্দের সমাবেশ।

বিমূর্ত (abstract): বিমূর্ত উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতে জীবন মৃত্যু দুঃখ শান্তি প্রেম চিত্ত কাল সময় স্বপ্ন জ্ঞান খুশি বিরহ ভাব রস অরূপ অমৃত বাণী আশা গান সুর [১৭] ইত্যাদি অনেক শব্দের সমাবেশ।

মূর্ত ও বিমূর্ত উপাদান, এদের নিয়ে সাধর্ম্য বিচার-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-সংগীতের অলংকারের বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা দেখতে পারি। এভাবে হাজার হাজার রূপক ও উপমার উজ্জ্বল ও মহৎ দৃষ্টান্তগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংকলন করেছি।

বিশ্বজাগতিক নৈসর্গিক উপাদান: উপমালোক

আকাশ সূর্য তারা চাঁদ অরুণ কিরণ রোদ প্রভাত রাত্র অন্ধকার ইত্যাদি উপমেয়-উপাদানের সঙ্গে বিচিত্র উপমানের আশ্চর্য তুলনা-করণ। রূপক, উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও সমাসোক্তির উজ্জ্বল বাণী-শিল্পায়ন।

দৃষ্টান্ত: বাহির হ'ল জোয়ার স্রোতে শুক্লরাতে চাঁদের তরণী (প্র ২৪২)—
চাঁদ ও তরণীর মধ্যে নিবিড় এক উপমা।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মালা হয়ে জড়িয়ে আছে (পূ ২২৯)—
চন্দ্র সূর্য ফুলের মতো মালা। অপূর্ব!

এরকম: আকাশের প্রাণ, আকাশ বীণা, চাঁদের ফুল, চাঁদের তরণী,
তারার মালা, তারার বাঁশি, অরুণ মালিকা,
অরুণ-কিরণ-কলিকা, কিরণতরী প্রভৃতি অনেক অনেক উপমা।
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা, তারার ভাষা উঠবে ফুটে,
তারার মতো কায়াবিহীন মায়া, সন্ধ্যাতারার শিখাটিরই মতো,

আলোক-ধেনু সূর্য তারা দলে দলে,

হিরণ কিরণ পদ্মদলে, চন্দ্র কিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে,

রাত ও অন্ধকার :

চির রাতের পাথার পারে, আঁধার কুঁড়ি, তিমির অবগুণ্ঠনে.

নিশীথ তিমির মালিকা, নিশীথ তিমির থালিকা, নিশীথ বিরাম সাগরে,

নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে,

তুমি রবে নীরবে···নিশীথিনী সম (প্র ৬২) ইত্যাদি।

রাত, আঁধার, তিমির, নিশা প্রভৃতির সঙ্গে পাথার, কুঁড়ি, অবগুণ্ঠন, মালা, থালা, সাগর ইত্যাদির সাধর্ম-সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর।

আলোর চরণ ধ্বনি :

বিষয় অনুষায়ী ভাবের গাম্ভীর্য ও দার্শনিকতা উপমারূপকের সূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশলের ভেতর দিয়ে সমুদ্ঘাটিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো—আলো অগ্নি বহ্নি জ্যোতি দীপ্তি ইত্যাদি নিয়ে কেবলই আলোর চরণ-ধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে সীমাহীন বৈচিত্র্যে অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে এবং 'আনন্দিত আলোর সাথে' কবি নিজেকে সংযুক্ত ক'রে নতুন সৃষ্টির জাগরণ উপলব্ধি করছেন আপন সত্তার ভেতর। স্বনামধন্য কবির জীবনলীলায় সূর্যসম্ভাবনা প্রমূর্ত হ'য়ে উঠেছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো।

দৃষ্টান্ত : আলোর বাণী, আলোর রবে, আলোর তৃষা, আলোর রাখী, আলোর আঁচল, আলোর অমল কমলখানি, আলোকের ঝারি, আলোক লোকে, আলোকের এই ঝরণা-ধারায়, আলোর স্রোতে, অরূপ আলোর অঞ্জলি, আলোর মালা. আলোর জোয়ার, তারার আলোর গানের ঘোরে, প্রেম আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে, আলোক ধেনু, সাজালো ডালা অমরাকূলে আলোর মালা চামেলী-বরণী (প্র ২৪২), এইতো তোমার আলোক-ধেনু সূর্য তারা দলে দলে (পূ ৫২০), আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠলো নেচে মল্লিকা মালতী (বি ৪৬)।

চামেলীর রঙ ও আলোর রঙ এর মধ্যে সূক্ষ্ম ও সতর্ক সাধর্ম্য-চিন্তা থেকে সৃষ্ট আলোর মালা চামেলী-বরণী। অসামান্য! সূর্য তারাদের আলোকধেনুরূপে,

আলোর স্রোতকে পালতোলা নৌকোর মতো হাল্কার প্রজাপতিরূপে কবি-কল্পনা কতখানি তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহৎ যে, আমরা বিস্মিত না হ'য়ে পারি না। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো 'আলোক-তরবারি' :

যখন আনেন তমোহারী আলোক তরবারি
তখন পরান আমার কোন্‌খানে যে লজ্জাতে মুখ ঢাকে। (পৃ ১১৫)

তমোহারির হাতে আলোক-তরবারি দৃশ্যটার মধ্যে বীরভাবের সংযোগ নেই। মোহগ্রস্ত প্রাণের লজ্জার মধ্যেও কোনো জটিল প্রতিক্রিয়া নেই। আছে নিবিড় আত্মোপলব্ধি এবং আলোর উত্তরণের শিক্ষা। উপমা ও চিত্র-কল্পটি অসামান্য হ'য়ে উঠেছে।

এ ছাড়া অগ্নিবাণ, অগ্নিভুজঙ্গমদংশনে, অগ্নির ভাষা, অগ্নিরবীণা, বহ্নিবাতে, বহ্নিস্নান, দীপ্তি সাগরে, জ্যোতিসমুদ্রেই, আলো ছায়ার আঁচল খানি ইত্যাদি উপমার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোময় রূপপরিকীর্ণ বৃহৎ বিশ্বজগৎ রবীন্দ্রসংগীতে বিমূর্ত হয়েছে।

কাল সমুদ্রেই ফোটে বিশ্বকমল ; মহাকাল-রথ-সারথি চালিয়েছেন কবিকে নির্বাধ সময়ের বুকে ; কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে। কেবলই উপমা।

মর্তলোকের বীণাতারে, ভবসাগর, ভবসংসার বাতায়নতলে, দিনেরস্রোতে, ফাগুন দিনের স্রোতে, হারানো দিনের ভাষা, শ্রাবণ সন্ন্যাসী, বসন্তের মন্ত্রলিপি, বজ্রভেরী ইত্যাদি।

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে (পৃঃ ৪৪৭)
কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী, শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি
ডাক এলো তার তরঙ্গেরই বাজুক বক্ষে বজ্র-ভেরী অকূল প্রাণের সে
উৎসবে। (পৃ ১৮৫)

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে, আকাশ কাঁপে তারার আলোয়
গানের ঘোরে।

বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নতুন তারা ব্যথায় ভরে। (পৃ ১৫৮)
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি-সমুদ্রেই (পৃ ৩৪২)
বোস না ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে
অরুণ আলোর-স্বর্ণরেণু মাখা হয়ে। (পৃ ৩৫৬)

কাল সাগর, কাল সমুদ্র, আলোর যাত্রী, বজ্রভেরী, অগ্নিবীণা, বহ্নিঘাত,

জ্যোতিসমুদ্র, আলোর স্বর্ণরেণু—এরকম বহু বিচিত্র উপমায় উজ্জ্বলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান।

বিশ্বচরাচরে গ্রহে তারায় সূর্যচন্দ্রে বজ্রে অগ্নিতে কেবল আলো আর আলো। আলোয় ভুবন ভরা।

আলোর অমল কমল-খানি কে ফুটালে
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে। (প্রকৃতি ১৬৭),
আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা
আলো-নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা। (বি ৪৬)

এত আলোর মহিমায় ভরে আছে রবীন্দ্র-সাহিত্য; রবীন্দ্র-সংগীতে সেই আলোর উত্তরণ। বাকৃপ্রতিমায় এই আলোর উপমালোক কেবলই সুগভীর তত্ত্বে, তাৎপর্যে রূপ পায়; এবং কেবলই জাগে আলোক-লোকে। আর··

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো,
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো। (পূ ৩১৯)

বনপ্রকৃতি ইত্যাদি :

রবীন্দ্ররচনায় বন প্রকৃতির অঢেল আশীর্বাদ বর্ষিত। শ্যামায়িত স্নিগ্ধ প্রকৃতি তার অসামান্য রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে শাখায়িত পল্লবিত পুষ্পায়িত হয়েছে রবীন্দ্র-সংগীতে। এই উপমালোকে অবলম্বিত শব্দগুলি হলো—

বন, কানন, তরু, বৃক্ষ, তৃণ, কুসুম, ফুল, পাতা, কাঁটা, ছায়া (তরুছায়া) ইত্যাদি।

শেফালি বনের মনের কামনা, বনের প্রাণে, অরূপ-ফুলে, ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো, ফুলের আগুন, বনের বীণায় কি সুর বাঁধা রে, অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল, কুসুমকোমল, চেনাফুলের গন্ধস্রোতে, কণ্টকশয্যা, ফুলের আগুন, মঞ্জরী দীপ-শিখা, তৃণের অঙ্গুলি, তৃণ আঁচলখানি, সোনার কদম্বফুল, রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে,ছায়াতরণী, ছায়ার ঘোমটাপরা, ঘনচ্ছায়াজাল, কুজ্ঝটিজাল ইত্যাদি।

ভরিল ভরা অরূপফুলে সাজালো ডালা অমরাকূলে (প্র ২৪২),
—বিমূর্ত-মূর্তের (অরূপ ফুলে) সুন্দর কবিকল্পনা।

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরেছে গলে,
কিংবা নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।

শর্বেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল। (প্রকৃতি ২৬২),
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুল বনে (প্রে ৩০ :),
ওগো শেফালী বনের মনের কামনা, কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে (প্র ১৫০),
বনের প্রাণে মর্‌মর্‌ানির ঢেউ উঠালে। (প্র ১৬৭)।

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো গলা জড়িয়ে ধরে ; কিংবা নীল দিগন্তে ফুলের আগুন ও সৌরভের শিখায় উদ্দীপিত শব্দের এ শক্তি কতখানি, ভাবলে বিস্মিত হ'য়ে যাই। নীল দিগন্তে আগুনের আভার প্রত্যাশা করা সম্ভব গোধূলিতে কিংবা প্রভাতে ; কিন্তু দিগন্তে ফুলের আগুন লাগার কল্পনা এবং পুষ্প সৌরভের শিখার চঞ্চল উদ্দীপনার বস্তু-ভাবনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বেদী ও অতীন্দ্রিয় সংঘট্ট হ'য়েছে —তার মূলে কী অসামান্য শব্দশক্তির দ্যোতনা।

প্রাণী জগৎ ও প্রাসঙ্গিক উপাদান :

উল্লেখ্য শব্দগুলি :

পাখী, মৃগ, জোনাকি, ঝিল্লি, হরিণ, নীড়, ডানা ইত্যাদি।

জ্বালি জোনাকি প্রদীপ-মালিকা, ভরি নিশীথ তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে, সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে (প্র ১৫০)
তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই (প্রে ১৮৪)
এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা, (প্রে ৩৪৮)
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর, হে গম্ভীর (প্র ৫৫)
থামাও রিনিকি ঝিনিকি বরিষণ, ঝিল্লিঝনক ঝন-নন, (প্র ১০৯)
স্তব্ধ হোক বেদন গুঞ্জন সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো (প্রে ২৩৪)

জোনাকি প্রদীপ, ঝিল্লি-ঝাঁঝর, সোনার হরিণ, ঝিল্লির মঞ্জীর প্রভৃতি উপমাবৈচিত্র্য আরও অনেক আছে।

নৈসর্গিক উপাদানে উপমালোক :

মেঘ, রোদ, ঝড়, নদী, স্রোত, পথ, বজ্র, বিদ্যুৎ, বাতাস, ঢেউ, মাটি, মরু, মরীচিকা, পাথর, পাষাণ ইত্যাদি।

মেঘের দুর্গের দুয়ার, মেঘ আঁচলে, মেঘের ভেলা, মেঘের কলস ভরে ভরে প্রসাদবারি পড়ে ঝরে।

বাজুক তোমার বজ্রভেরী, তড়িৎলতা, তড়িৎশিখাসম, ক্লান্ত তড়িত-বধূ তন্দ্রাগতা, দামিনী ভুজঙ্গক্ষত যামিনী,

সে ঢেউ এর মতো ভেসে গেছে, ভরা স্রোতের দান,

পান্থ-হাওয়া, হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী, চলে গেল কে বসন্তের বাতাসটুকুর মতো, ভাসন খেলার নদীতটে, ঝড়ের রথে, ঝড়ের কেতন, উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা, বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,

মরু-দৈত্য, মরীচিকা জাল ফেলা, পাষাণ শৃঙ্খলে, প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মত্ত ত্যাগের প্রবাহ, শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে, রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলো উতলা ইত্যাদি নৈসর্গিক ভাবানুষঙ্গের বিরাট উপমালোকে নির্মিত রবীন্দ্র-সংগীত।

মানবশরীর ও মানসক্রিয়া :

মানবের শরীরাঙ্গ ও অন্যান্য, তাদের ক্রিয়া এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে **উপমালোক**। দেহ, কর, মুখ, আঁখি, চোখ, আঁচল, চরণ, ঘোমটা, অশ্রু, হাসি, যৌবন, ঘুম, স্বপ্ন, ইত্যাদি নির্ভর ক'রে উপমা।

কাঁপিছে দেহলতা থরথর, দেহমন বীণাসম বাজে, দেহবীণার তার (পৃ ১০৮), মুখশশী, রাঙা পদপদ্মযুগে প্রণমি (বা, প্রতিভা), কমল-করে, করপল্লব, আঁখি যে তোমার তড়িতবৎ,

আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি, তোমার আঁখির মতন দুটি তারা ঢালুক নয়নধারা, আঁখি তারা, তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়, ওই চাহনির তুফান তোলা, তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি, চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখি সম,

অশ্রু নদীর সুদূর পারে, অশ্রু শ্রাবণ প্লাবন, অশ্রু উৎস জলস্নানে, সহসা ঝরণা নামিল অশ্রুঢালা, নিখিল অশ্রু-সাগর কূলে, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে, চোখের জলের গান, কান্না-হাসির বন্যারই নীচে, কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা, আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা তোমার গলার হার হলো (পৃ ১২৫), হাসির মায়ামৃগের পিছে, এযে মাটির কোলে মানিক খসা হাসির

রাশি, তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙে রঙ করা, হাসির বাঁশির তান,

হাসির ইসারাতে, হাসির জালে, ঘোমটা আমার নতুন পাতার লেখনী, চরণ কমল রতনরেণুকা, চরণ ধ্বনির ভাষা, তব চরণ পদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত কর হে। মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি সখি জাগো, দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়, যৌবন সরসীনীরে, এলে যৌবনের জোয়ারে, ঘুমের প্রান্ত-পারে, নিদ্রা সমুদ্র পারায়ে,

স্বপ্ন পারাবারের খেয়া, স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা, তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন স্বপনের পারা, স্বপ্ন শেষের বাতায়নে, স্বপ্ন প্রদোষে, স্বপ্ন কমল, স্বপ্ন অবগুণ্ঠন, মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে, আপন মনে মেঘ-স্বপন আপনি রচ রবি (পূ ৭১),

সূক্ষ্ম অনুভূতি, মানসক্রিয়া, অচেতন, অবস্তু ইত্যাদি বিমূর্ত উপাদান নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে রূপক উপমা অলঙ্কার এসেছে পর্যাপ্ত পরিমানে। বাক্রূপ-প্রকরণে, চিত্রকল্পে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য পেয়েছে তারা।

চিত্ত, মন, চেতনা, মানস ইত্যাদিঃ—মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা (প্রে ১০৪), চিত্ত কুসুম, চেতনা সিন্ধু (পূ ১৪৫), পরাণ ভরানো মনছায়া জাল, স্পন্দিত নন্দিত চিত্ত নিলয়ে, চিত্তবীণার তার, চিত চাতক, পান্থচিত, চেতনা আমার শতদলসম ফুটিল, চিত্ত আকাশে, আমারি পটে আঁক মানস-ছবি (পূ ৭১,) মনের দিগন্তে, মনের মন্দিরে, মনের কামিনী পাপড়ি, মনোফুল, মানস সরস রস পুলকে, মম মনের বনের শাখে, মন আমার প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়, মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতের বিরহিনী, মনোমন্দির সুন্দরী (নাট্যগীতি)।

ভাবের জাহ্নবী :

সুখ, দুঃখ, বেদনা, খুশি, আশা, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, ভাব, বিষাদ হতাশা, মিলন, বিরহ, স্মৃতি, বিদায়, অভিমান, ছলনা ইত্যাদি শব্দগুলোর উপমান-উপমেয়ের তুলনাকরণ ও রূপক, উপমা অলংকার বিপুল ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। বিমূর্ত, মানসিক, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বেদী বিষয়গুলোর এমন সুললিত সুষমাময় ব্যবহার অন্যত্র এত সুলভ নয়।

সুখ সাগর, সুখ শয়ন, সুখপাখি, খুশির তুফান, আশার আকাশ, আশালতা, আশার অরুণালোক, আশাজাল, আশার খড়্গ, আশার হাওয়া, কামনা কুয়াশা, বাসনার শিখা, আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো, রহি রহি আনন্দ-তরঙ্গ জাগে, আনন্দ মন্দানিল, আনন্দবান, আনন্দ ভাণ্ডারে, আনন্দের মধুপাত্র, আনন্দ নিকেতন (পৃ ১৮৪) তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী (পৃ ৭১)। দুখের প্রদীপ (আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন)।

দুখের পারাবারে, দুখের ফলের ভার, দুঃখের অগ্নিমালা, দুঃখের তিমিরে (পৃ ১৯৩), দুঃখ ধারার ভরা স্রোতে (পৃ ১৯৬), তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুঃখের অলংকার (পৃ ২২৯), বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখ সুখের জাল, দুঃখ আমার অসীম পাথার (পৃ ১৯৫), বিষাদের শিশিরনীরে (প্রে ১৬২),

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে, বিরহ বেদনা মানিক খানি (পৃ ১৩৫), না বলা বেদনা···শিখারই মতো উঠিবে জ্বলিয়া, বেদনার উপহারে, বেদন ডোরে (পৃ ২০১), বিদায়-বাঁশরি বাজে অশ্রুগালা (প্রে ১৭৬), স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি, বিরহের ভার (প্রে ১৮৯), ব্যথার পূজা, ব্যথার খনি, আমার ব্যথা রৌদ্র যথা, লতার মতো জড়িয়ে ধরে আপন বেদনায়,

বিরহের বীণাপানি, বিরহতীর্থ, কান্ত বিরহকান্তারে, মিলন সমুদ্র বেলায়, মিলন শতদল, বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে, বিষাদের আঁধার, অধীর অদর্শন তৃষা, অশান্তি দোলে, অভিমানের কালো মেঘে, শরম রক্ত রাগে, ভাবনার স্বপ্ন জালে (পৃ ১৩৪), সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান, তোমার ভাবনা তারার মতন, দুরাশার দিক্‌পানে, মোহতিমির, মোহকারা, পরশ-খানি নানা সুরের ঢেউতোলা, উত্তরীয়ের পরশের হরষলেগে, প্রণয় দোলায় দোলে, প্রেমের প্রতিমা, প্রেমের জোয়ারে, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা, প্রেম আঁখি, প্রেম কুসুম, প্রেম অমৃত (পৃ ১৭০), প্রেম পাথারে, প্রেম পদ্ম, প্রেম মন্দির দ্বারে, একী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়, প্রেম বরিষায়, প্রেম ডোরে, প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে, বাঁধন খুলে দাও, দাও (প্রে ৩৩৯)—জোয়ারের উচ্ছলতা ও প্রেমের দুর্বার গতির বেগ—অপূর্বভাবে প্রকাশিত এখানে।

শান্তি পারাবার, দয়াসিন্ধু, করুণামৃত সিন্ধু, কৃপাতরণী, ভাবের রসেতে, শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,

চঞ্চলতার রাগিণী, স্মৃতির দীপ জ্বালা, বহু পূর্ব স্মৃতিসম হেরি ওকে, স্মরণ সাগর ধারে, তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে, স্মৃতি বেদনার মালা গাঁথি, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।

ডোর, বাঁধন : চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিল কে, নব মিলনডোর, বেদনডোর, লজ্জাডোর, তপের তাপের বাঁধন (প্র ৮৯), মায়ার বাঁধন, আবরণ বন্ধন, ছলনার বন্ধন, দৃষ্টির বন্ধন, গানেরই বন্ধন (প্রে ৪), মনের বন্ধন, ক্লান্তি জাল করো ছিন্ন।

জন্ম, জীবন, মরণ, প্রাণ, হৃদয়, বক্ষ, অন্তর ইত্যাদি শব্দ নিয়ে অসংখ্য উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অলংকার। এদের সঙ্গে উপমান হিসেবে আযুক্ত হয়েছে মূর্ত বিমূর্ত, নৈসর্গিক ইত্যাদি উপাদান গুলো যেমন : ফুল, প্রদীপ, পাখি, আকাশ, আলো, গৃহ, মন্দির, স্রোত, সাগর, ঝরণা, বীণা, বাঁশি প্রভৃতি। পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংকলন করছি :—

জীবন, প্রাণ : মানব জন্মতরীর মাঝি (বি ৭৩), জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তোমার রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে (পূ ১০৩), জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা (পূ ১৬৯) জীবন যখন ছিল ফুলের মতো, নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও (পূ ১২৫) ধূসর জীবনের গোধূলিতে, জীবন নির্ঝর, জীবন পদ্মে (পূ ১০৮), জীবনের ধ্রুবতারা (প্রে ১২১) বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে, পথিক পরান্ চল, পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে, নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে, পরান বঁধু, প্রাণের বঁধু, পরাণ প্রদীপ, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, প্রাণের কুঁড়ি, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালায়, প্রাণের মালা, প্রাণের কলস ভরে ভরে প্রসাদ বারি পড়ে ঝরে,

মরণ, মৃত্যু :—তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যু ক্ষুধার মতো, মরণ সাগর-পারে তোমরা অমর, মারের সাগর পাড়ি দেবো গো, মরণ-মহোৎসবে

হৃদয় : প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম, রাঙিয়ে গেল হৃদয়-গগন (পূ ৫৬৮), হৃদয় নদীর কূলে কূলে, হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল বহে যায়, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মতো নাচেরে, হৃদয় বিহঙ্গ, হৃদয় শশি হৃদ গগনে, হৃদয়-নন্দন বনে, হৃদয় শতদল উঠিল

ফুটি (প্র ৪৬১), অন্তরের অন্তঃপুরে (পৃ ৩৩৪), হৃদয়ের পত্রপুটে, হৃদয় পাখি, হৃদয় উদয়াচলে, হৃদয় বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল, হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ (পৃ ৩০৬), হৃদয়-মন্দিরে আছে গোপনে (পৃ ৩৭৯), আমার হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে (পৃ ৪৬৩),

মূর্ত অমূর্ত উপাদানের আরও সূক্ষ্ম উপমা, রূপক :

নীরবের মর্মতলে, তুমুল রঙের কোলাহলে, তপের তাপের বাঁধন, নামের তারা, নামের মধু, জাগরণের ভালে,

—অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে (পৃ ৩৪৭)

—ঘুমের পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব,

—জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণ লেখা নব।

—তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম (প্রে ৬১)

রঙ-এর অনুষঙ্গ হিসেবে তুমুল ও কোলাহল শব্দ দুটি অনিবার্য হ'য়ে সূক্ষ্ম তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। রঙ্ ইন্দ্রিয়বেদী। অনেক রঙের একত্রে প্রকাশিত হওয়া—এই সামান্য বক্তব্যটি অসামান্য হয়ে উঠলো, 'তুমুল রঙের কোলাহলে'। তেমনি নীরবের মর্মতল, তপের তাপের বাঁধন ইত্যাদির বৈদগ্ধ্য ভঙ্গি ও অভিনবত্ব আমাদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তোলে। সহজ ভাষার উপমাগুলিকে সহজে বোঝার উপায় নেই। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার পেলব মসৃণতা ও মাধুর্য সর্বাগ্রে হৃদয়ে স্পর্শ করলেও আমাদের বুদ্ধি এবং চৈতন্যকেও ধ'রে নাড়া দেয় একই সঙ্গে।

সীমাহীন অনির্দেশ্য তিনটি লোক ধরা পড়েছে রবীন্দ্র-উপমালোকে। তার পরিচয় ধরতে যাওয়াই দুষ্কর। মনে হয় পরিচয় দেওয়ার এ চেষ্টা নিঃসন্দেহে বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যবহার্য প্রচলিত ভাষা রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে পেয়েছে লোকোত্তর মহিমা, আর আলংকারিক বাগৈশ্বর্যের প্রদীপ্ত আলোকে তারা হয়েছে অতুলনীয় সৃষ্টি। রবীন্দ্র-রচনার তন্নিষ্ঠ অনিবার্য এক রূপ-প্রকরণ-লীলা হ'লো উপমালোক। উপমা কিংবা অ্যানালজি রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-বাক্‌শিল্পের অনিবার্য উপাদান। উপমা ও অলংকার ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনার কথা ভাবা যায় না। তাঁর গদ্যে, গল্পে, নাটকে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল উপমা,—উপমা শ্রী রবীন্দ্রস্য। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—

"উপমা ও কবিত্ব যে কি রকম সহবাসী তার-উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর এবং এ বিষয়েও তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। —কাব্যের দেহ থেকে তাঁর উপমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তা প্রবিষ্ট হয়ে থাকে পরতে পরতে, কাজ করে যায় গোপনে গোপনে, ফলিয়ে তোলে তাঁর অনুভূতিগুলোকে, তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বোধ ও অতীন্দ্রিয় আনন্দ বেদনাকে।"[১৮]

তিন.

রবীন্দ্ররচনার আর একটি গুরুতর বাক্‌প্রকরণের নাম সমাসোক্তি :
বাক্‌রূপের অসামান্য প্রতিমায়ন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে (কাব্যে-গানে-নাটকে) সমাসোক্তি কেবলমাত্র অলংকার হ'য়ে বিরাজ করেনি, বাক্‌রূপের জীবন্ত, চলিষ্ণু, চিত্রশালা হ'য়ে এই অলংকারটি বিরাজ করছে। প্রস্তুতের (প্রকৃত, প্রাকরণিক, বিষয় ইত্যাদি) ওপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হ'লে সাদৃশ্য-মূলক অলংকার অর্থাৎ সমাসোক্তি।[১৯] রবীন্দ্রসংগীতে উপমা-রূপকের মতোই সমাসোক্তি এত বিপুল গৌরবে উপস্থিত হয়েছে যে, তার বিবরণ দেওয়া সহজ কর্ম হবে না। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ, চেতন ও জড় বিশ্বকে কেন্দ্র ক'রে নিয়ন্ত্রিত। কালিদাসের কাব্যের বহিঃপ্রকৃতি তাঁর নিবিড় আত্মচেতনা ও রসের সমারোহে বিকশিত হয়েছিল। বহিঃপ্রকৃতির জীববৎ ব্যবহার এই দুই মহাকবির কাব্যে বৈচিত্র্যে ও স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান। "জীববদ্ ব্যবহারের পশ্চাতে রহিয়াছে এই জীবনধারা ও সৃষ্টিধারার ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্য-বোধ। মানুষের চেতন-ধর্মের ভিতরে এইভাবে বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষের মতন করিয়া দেখিবার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা চিরকালই রহিয়াছে। এই বাসনাকে আমরা নাম দিতে পারি মানুষীকরণ বা নরত্বারোপ (Anthropomorphism) মূক বধির অচেতন প্রকৃতিকে আমরা আমাদের চেতনার ভিতরে নিরন্তর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি, তাহাকে অতিস্পষ্ট করিয়া পাই কাব্যের এই অর্থালংকারের ভিতরে।"[২০] ইংরাজীতে এরকম আলংকারিক কৃতির পারিভাষিক নাম পার্‌সনিফিকেশন্ ও প্যাথেটিক ফ্যালাসি।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনা-আরোপিত আলংকারিক কৃতির তুলনা নেই। সমাসোক্তি কথাটি দিয়ে এঁদের কাব্যকারু-কৃতির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করাও যায় না; এতই মহিমাময় বৈশিষ্ট্য ও বৈশদ্যের তুঙ্গ কৃতিত্ব।

দৃষ্টান্ত : উগ্‌গলিঅ—দব্‌ভ-কবলা মুআ পরিচিত্ত-নচ্চনা মোরা,
ওসরিঅ—পণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও ॥

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌, ৪র্থ অঙ্ক)

—মৃগের খসি পড়ে মুখের তৃণ ময়ুর নাচে না আর,
খসিয়া পড়ে পাতা চারিদিক হতে যেন সে আঁখি জলধার।

(রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ)

: ভানু সকৃদযুক্ত তরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।

(ঐ, ৫ম অঙ্ক)

—সূর্য তাঁর রথে অশ্বযোজনা করলেন, গন্ধবহ রাতদিনই তিনি চলছেন।

বহিঃপ্রকৃতির চেতন-অচেতন উপাদান নিয়ে এরকম মহিমান্বিত বাক্‌প্রকরণ কালিদাসের কাব্যে পর্যাপ্ত। রবীন্দ্রসংগীতে এই লক্ষণের প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করো। এখানে ভাব ও নিসর্গসত্তার চেতন-রূপায়ন বিস্ময়কর। আবার একই সঙ্গে তারা হয়েছে বাক্‌প্রতিমার (Imagery) তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে সমাসোক্তি ও সমজাতীয় অলংকার সবচেয়ে বেশী। কয়েকটি বিষয় অনুসরণ ক'রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা গেল :—

আকাশ : সারা আকাশ তোমার দিকে চেয়েছিল অনিমিখে (প্র ১২১)
আকাশ তৃষায় কাঁপে (প্র ১২৯), আকাশ কাঁদে হতাশ সম (প্র ৯৫),

সূর্য : মলিন রবি করুণ হেসে শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে (পূ ৫৯৪)
বাজল তূর্য আকাশ পথে— সূর্য আসেন অগ্নিরথে (বি ৩৯)

চন্দ্র : চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত নিদ্রালস আঁখি (প্রে ২৯৯)
চাঁদের হিয়া গলে গেল (প্রে ২৯৫), অধীর হয়ে মাতলো কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ (প্র ২২১), কি আবেশ হেরি চাঁদের চোখে (প্র ৮১)

তারা : আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে (পূ ৬), রাতের তারা চোখ না বোজে (পূ ৫৫৮), বীণা বাজায় ভোরের তারা (পূ ৫৬৩), দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায় (প্র ১৫৯),

উষা : প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে প্রথম দিনের উষা নেমে এলো যবে (ভূমিকা), তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে (ঐ)

প্রভাত : প্রভাত আছি মুদেছে আঁখি (প্র ৯৪), বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি (শারদোৎসব)

দিন : ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে (পূ ৬০৩)

সন্ধ্যা : সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে (প্রে ৩২১), মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে (প্র ১১৯)

রাত্রি : রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন (পূ ১১৪), আলস ভরে ঘুমায়ে আছে রাত (প্র ৯৭), ভয়ার্ত যামিনী উঠেছে ক্রন্দিয়া (প্র ১১৩),

শর্বরী : ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে হায় (প্র ১৩০) বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী (প্র ১০৩)

আঁধার : স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে (প্র ২৯)

বায়ু : ফিরে বায়ু হাহাস্বরে (প্র ২৮), বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি (প্র ৯৪), সজল হাওয়া যুথীর বনে কী কথা কয় কানে কানে (প্র ৩৩), পবন মাতিছে বনে পাগল গানে (প্র ৩০) বসন্ত বায় মোরে জাগায় পল্লব কল্লোলে (পূ ৬০০)

বৃষ্টি : বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে আঁচল খানি দোলে (প্র ৬৩), বাদল বাউল বাজায় রে একতারা (প্র ৭২)

ঝড় : ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে (প্র ৩৪), ঝঞ্জনমঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে (প্র ১২২)

বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় (প্র ১৩০), ক্লান্ত তড়িত-বধূ তন্দ্রাগতা (প্র ৯৩), চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজুলী (প্র ২৯)

মেঘ : আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়, আয় আয় আয় (প্র ৪০)

ধরিত্রী : ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে নাচের তালে ওঠেন মেতে (প্র ৫৬), ধরণী দূরে চেয়ে কেন আছিস্ জেগে (প্র ১০২)

ঋতু : আষাঢ় কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া (প্র ৪২), শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে (প্র ৯২), ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে (প্র ১১৭), পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (প্র ১৭৯), দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে (প্র ২১২)।

বন : বনের বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু (প্র ১১০), বকুল বন করিছে আহ্বান (প্র ৯৬), পলাশ কানন ধৈর্য হারায় (প্র ২৪০), নীল অরণ্য শিহরে, (প্র ২৭), ব্যথিয়ে ওঠে নীপের বন (প্র ৯৯) ঘুমহারা মোর বনে (পূ ৬০০), শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি (প্র ১৫৩)

পাতা : আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায় (বি ২৮) ঝরা পাতা গো বসন্তী রঙ্ দিয়ে, শেষের বেশে সেজেছ তুমি কী এ (প্র ২৮৩)

ডাল : ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে (বি ৮১)

নীড় : রিক্ত কুলায় কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে (প্র ১৯৬),

ফুল : কেয়া কাঁদে (প্র ৯২), হে মাধবী দ্বিধা কেন, করবী দিয়েছে সাড়া, শিরিষ শিহরি উঠে (প্র ২৪২), প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরিষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি, এসেছে কি ? (প্র ৮১)

বাঁশি : পথের বাঁশি যায় কি কয়ে বিকাল বেলার মুলতানে (পূ ৫৮২)

প্রদীপ : আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে (বি ২৭)

গুণ বা অধিচেতনার সমাসোক্তি :

রবীন্দ্রসংগীতে গতানুগতিক সমাসোক্তি শিল্প-সৌষম্যে হ'য়ে উঠেছে অসামান্য বিশেষণ-বিপর্যাস, হাইপালেজ (Hypallage) ও প্যাথেটিক ফ্যালাসি। দৃষ্টান্ত—

প্রাণ : পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে (প্র ৩২)

মন : বিরহী এ মন যে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে (প্র ৪১)

ব্যথা : অনেক দিনের সে কোন ব্যথা কাঁদে হায় হায় হায় বলে (প্র ৬)

হিয়া : বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি (প্র ৩২১)

গন্ধ : সুদূর গন্ধ আসি করিল কোলাকুলি (প্রে ৭৭), ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে তারি সঙ্গে চলে গেল (প্রে ১৯২), গন্ধ যেতো অভিসারে (প্র ৮৬)

মধুর বিধু : আকাশের ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় (প্রে ৫৬)

স্বপ্ন মায়া : শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্ন মায়া ফিরে বৃষ্টি জলে (প্র ১০৪)

ধরার চিত্ত : বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলো উতলা (প্র ২৫৪)
কাশের হাসি : কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে (প্র ১৮৫)
কাঁকনের ঝিকিমিকি : সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে (প্র ১৯৩)
সর্বনাশ : আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে (পূ ২০৫)
বিবাহের গগন : বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এলো সোনার গগন রে (পূ ১৪১)

বিষয় ও ভাবের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে রবীন্দ্রোপমার বিভূতি, মহত্ত্ব ও মূল্য বুঝতে পারা সম্ভব হয় না। ভাবের সূক্ষ্মতা ও রস-স্ফূরণের সমূহ দায়িত্ব বহন ক'রে সর্বাগ্রে অবস্থান করছে অননুকরণীয় ভাষণ-সৌষম্য ও বিদগ্ধ বাক্‌ভঙ্গিমা। রসের সীমায় পৌঁছতে গেলে ভাষাকে সন্ধানীর আগ্রহে গ্রাহ্য করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারে ভাষার এই রত্ন-সম্ভাবনা এবং মায়াময় লাবণ্য, রসের দিব্যস্ফূরণ ও আনন্দের অভিব্যক্তি একই সঙ্গে জানতে ও ভাবতে পারলেই বাণী-তপস্যার সিদ্ধি এসে যায়। কিছু কিছু বিষয় ও শ্রেণীবদ্ধ দৃষ্টান্ত থেকে রবীন্দ্র-উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ইত্যাদির পরিচয় পেতে চেষ্টা করেছি। ভাব ও ভাষার এত চমৎকারিত্ব ও উৎকর্ষ অন্যত্র দেখা যায় না।

চার

অন্যান্য অলংকার

অর্থঘটিত অলংকারের শাব্দিক তুলনা-করণ রবীন্দ্রসংগীতে কত যে সাবলীল সুষমায় ও সৌষ্ঠবে সংগঠিত হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। উপমা ও সমাসোক্তির বাণী-বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রসংগীতের ভাবেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাক্‌প্রকরণ এমনই ভাব-সম্পর্ক লাভ করেছে যে, বাক্‌প্রকরণকে ভাবপ্রকরণ হিসেবেই প্রতিভাত হতে দেখতে পাই। এরকম উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলংকারকে-ও বিবেচিত করতে হবে। রবীন্দ্র-সংগীতের সহজ ঋজু সাবলীল পদভঙ্গিমায় আলংকারিক জটিলতা অনপেক্ষিত। স্বাভাবিক প্রকরণ হয়ে আসতে হয়েছে সুসহ সহজ সুন্দর অলংকারগুলোকে।

উৎপ্রেক্ষা :—

সহজ প্রযুক্তিতে উৎপেক্ষার কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্ত। অলংকারগুলো একই সঙ্গে বাক্‌রূপের উদ্ভাসে প্রোজ্জ্বল ; ইমেজারির মূল্যবান উদাহরণ হিসেবে-ও এরা বিবেচিত হবে।

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধু পারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে (প্র ৬)

ভাবনা একটি অনির্দেশ্য অধিচেতন উপাদান, ভাবনা যাকে সম্পূর্ণ অ্যাব্‌-ষ্ট্রাকশন্ বলে মনে সংশয় হওয়ার কথা ; সে কিন্তু চেতনরূপ পাখির সংশয়ে উপমিত হয়েছে। অর্থাৎ অবস্তুতে বস্তুর সঙ্গে উপমেয়-উপমানের সম্পর্কের তুলনা-করণের দ্বারা অসামান্য কাব্য-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হলো,—ভাবনা যেন সিন্ধুপারের পাখি। চলমান পাখি হয়ে ভাবনাগুলো শতসহস্র ডানা মেলে দিয়ে সিন্ধু-পারের পথ পেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এরকম সহস্র সহস্র ইমেজারি রবীন্দ্র-সাহিত্যাকাশে সহস্র সহস্র পাখি হয়ে ওড়ে।

আরও দৃষ্টান্ত :

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ
যেন রে সেই উড়ে পড়া এলো কেশের স্পর্শ (প্র ১৯)
তড়িৎ শিখা দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া
নাচিছে যেন কোন প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া (প্র ১১২)
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নবরঙ্গে, সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন (প্র ১১৬)
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুড় যেন
পথ-ভোলা এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায় (প্র ১৫৫)
যেন আমার গানের তানে তোমার ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে (প্রে ৯৯)
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়া
প্রবাসী পাখি যেন যায় সুর ভেসে (প্রে ২৩১)
নৃত্যকলা যেন চিত্র লিখা, কোন স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা (প্রে ৩১৪)
তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া
বাদল শেষে করুণ হেসে যেন চামেলি-কলিয়া (প্রে ২৫৩)
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্‌সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান (প্রে ২৭২)

উপমেয় ও উপমানের সাধর্ম্য-সম্পর্ক নির্ণয়ে যে উৎপ্রেক্ষা রচনা, তাতে কবির বিষয়-বোধে যেমন সূক্ষ্ম সচেতনতা থাকে, তেমনি থাকে উপলব্ধির প্রসাদ ও মাধুর্য। এবং তার দ্বারাই একটি পূর্ণায়ত ছবি (মূর্ত বা বিমূর্ত) সাংলগ্নিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রসংগীতে উৎপ্রেক্ষাজাতীয় অলংকার বিপুল সংখ্যক। আমাদের সংকলিত এই উদ্ধৃতিগুলোতে তাঁর কাব্যিক ও তৎসহ সাংগীতিক চিন্তার সমন্বয় ও সিদ্ধির পরিচয় নেওয়া যায়। এইসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌রূপের তুলনাহীন অসামান্য শিল্প-প্রকরণ-লীলারও পরিচয় পেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের অলংকার মানেই বাক্‌প্রতিমা (ইমেজারি) এবং প্রতীক (সিমবল্)—এর বিষয়-বৈদগ্ধ্য। চাঁদ, তড়িৎ, পাখি, তারা, নদী, ফুল ইত্যাদি সমস্তই এসেছে এখানে। পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্র-সংগীতে অলংকারগুলো বিমিশ্র ভাবসত্তার উদ্‌ভাসন ঘটালে-ও রূপ-প্রকরণে কোন প্রকার জটিলতা দেখা যায়নি। যেমন :

তুমি কোন্ কাননের ফুল, কোন্ গগনের তারা
তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন স্বপনের পারা
কবে তুমি গেয়েছিলে, আঁখির পানে চেয়েছিলে, ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তারা। (প্রে ৩৬৩)

'স্বপন' উপমান, ও 'যেন' শব্দে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ; প্রথম চরণের 'কাননের ফুল' ও 'গগনের তারা' উপমান দুটি উপমেয় 'তুমি'—র সঙ্গে সাধারণভাবে উপনীত হয়েছে রূপকে। তাছাড়া নৈসর্গিক উপাদান 'ফুল, তারা' এবং বিমূর্ত উপাদান 'স্বপ্ন' সমন্বিত হ'য়ে যে পূর্ণায়ত কাব্যগত ও রূপগত বৈভব সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে তার তুলনা কোথায়? এই তুলনাহীন বাণী-বিন্যাসে পিলুবারোয়াঁর সুরবিন্যাসের নিবিড় সন্নিপাতে যে অভিব্যঞ্জনা—একি কেবল অলংকার, না অলংকারের চেয়ে বেশী কিছু? এ কি কবিতা, না কবিতার চেয়েও অনেক বেশী?

চিত্রকল্প ও প্রতীক : বাক্-প্রতিমার দিব্য উদ্ভাস

এক

কবি একদিন সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আত্মস্বরূপের আকস্মিক সম্ভাবনাকে সূর্যোদয়ে দেখেছিলেন। "হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, এবং আনন্দে সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"[১]

জীবনোত্তরণের প্রান্ত-সীমায় এসে তিনি বললেন :

জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্থলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।[২]

রবীন্দ্রজীবন ও তাঁর কাব্যচিন্তার অন্তঃপাতী দূরগভীর ও সুদূর-বিস্তারী পটভূমিতে "কল্পযুগবাহী" নিঃশব্দজ্যোতির তাৎপর্য বিমিশ্রিত হলো, তার দার্শনিক অনুসন্ধান করার অবকাশ আছে। সৃষ্টি-স্থিতি জগৎ-জীবন চিন্তা-চৈতন্য নিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা সূর্য-সম্ভব হয়েছিল ; এবং

প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।[৩]

মধুময় রূপময় পৃথিবীর আশ্চর্য পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে জেনেছিলেন, আমরা জানি না। সে পরিচয়কে যেভাবে যতটা তাঁর বিচিত্র রচনাবলীতে ও কর্ম-কৃতিতে জানিয়ে গেছেন, তারই পরিচয় নিয়ে আমরা পুলকিত ও বিস্মিত।

রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রকল্প পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই সূর্যসম্ভব সেই বিরাট প্রতিভার সীমাহীন বর্ণালীর বিচ্ছুরণ ; অক্ষর, শব্দ ও ভাব দিয়ে কবি কেবলই ছবি রচনা ক'রে গেছেন।

সংস্কৃতসাহিত্যে মহাকবির রচনার কারু-কৌশল ও নির্মাণের সফল ও প্রত্যক্ষ উপাদান হিসেবে রূপক, উপমা, সমাসোক্তি প্রভৃতিকে বিশেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি কবির সংস্কৃত রচনায় নিপুণ কারুকর্ম ও বাণীস্থাপত্যের শিল্পরূপ প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কালিদাসের কাব্যগুলি হীরক-খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ও হীরকহারের মত সুন্দর, এবং কাদম্বরী অতুলনীয় বর্ণ সৌন্দর্যময় চিত্রশালা।"[৪] এছাড়া ভাব ও রূপের প্রথাসম্মত আদর্শের মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান বর্তমানে কাব্যস্বরূপ বিচারের আবশ্যিক মানদণ্ড হয়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে, যার নাম চিত্রকল্প (Imagery)। বিংশ শতকের পাশ্চাত্যের কবি এজরা পাউণ্ড, টি ই হিউম, ফ্লেচার, অল্‌ডিংটন, এমিলোয়েল, টি এস্‌ এলিয়ট প্রভৃতি কবিগণ চিত্রকল্পবাদ (Imagism) বা পোয়েটিক ইমেজ এর মূল্যবান অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাপারটিকে অধিকতর বৈশদ্যে বোঝালেন—"অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ।··· ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সংগীত।"[৫] জীবনবাহী প্রতিভার ক্ষমতা দিয়ে রূপ ও অরূপের নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় দিতে বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—'হাতে নিয়ে বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি।' বলেছিলেন—"সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত।"

প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগণ (রসেটি, মরিস, সুইনবার্ন প্রভৃতি) কাব্যের মৌল আধার হিসেবে সংগীত-ধর্ম ও চিত্রকল্পের প্রাধান্য স্বীকার করতেন। "ইঁহারা যেন কবি ও চিত্রকরের শিল্প-প্রণালীর পার্থক্য দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য

আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; ইহাদের এক একটি বর্ণনা যে রঙে ঝলমল, দৃঢ় রেখা বন্ধনীতে সুস্পষ্ট, সাংকেতিকতায় রহস্যময় ছবির মতো আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই চিত্র-সৌন্দর্যের প্রতি-অত্যধিক প্রবণতার জন্য কবিতার অন্যান্য গুণ, ইহার ভাব গভীরতা, গতি-বেগ, প্রকাশাতীত আভাস ব্যঞ্জনা, ধ্বনি মাধুর্য প্রভৃতি কতকটা চাপা পড়িয়াছে।"[৬] এসব কবিদের কাছে যা ছিল থিওরি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা' ছিল স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যবোধ ও প্রকাশ-পদ্ধতি। বোদলেয়র, ভেরলেন প্রভৃতি প্রতীক-বাদী কবিগণও প্রতীককে সংগীতধর্মের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ভেরলেন তাঁর 'Art Poetic' কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন—De la musique avout toute chose—সবার উপরে সংগীত সত্য।[৭] মালার্মে কাব্যরূপ-নির্মিতিতে স্বরাশ্রয়কে কবির কাম্য ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ইমপ্রেসনিজম্‌-বিরোধী হলেন ভান গগ্‌, গগ্যাঁ, কাণ্ডিনস্কি প্রভৃতি কবিগণ। গগ্যাঁর ধারণা ছিল সংগীত ও চিত্রের ধর্ম এক এবং চিত্র হলো বর্ণের সুসঙ্গতি (harmony); অতএব চিত্রের কোন দৃশ্য-বর্ণনা কিংবা কাহিনী বর্ণনার দরকার নেই।[৮] বিশ্বের কাব্য-ইতিহাসে প্রতীকবাদ, চিত্রকল্পবাদ, সুররিয়ালিজম্‌ ইত্যাদি বহু মতবাদ গড়ে উঠেছে। কাব্যে সংগীত-ধর্ম ও চিত্র-ধর্মের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে কোনো কোনো মতবাদে। কোথাও আবার কাব্যের এই দুই ধর্মের তত্ত্বটি স্বীকৃতি পায় নি। কাব্যের ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতরস' কথাটি সর্বত্র বলেছেন। সাহিত্য-তত্ত্বের সারসত্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন রূপায়নিক (ফর্ম-সম্মত) পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। ভাবের ও রসের পূর্ণ সমগ্রতা যা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আনন্দকে অভিব্যক্ত করায়, তারই মধ্যে তিনি পরম অনির্বচনীয় ব্রহ্মাস্বাদকে সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, সংগীত সেই 'চরমের প্রতিরূপ'কে সম্ভাবিত করতে পারে, সেজন্য সব সৃষ্টির অন্তরালে কিংবা প্রত্যক্ষতায় সংগীতের অখণ্ড প্রভাব ক্রিয়াশীল। ভাষাকে তিনি বলেছেন উপায়, আলংকারিকদের মতো এই উপায়সর্বস্বতাকে মূল্য দেন নি। ভাষাতীত সত্য ও সৌন্দর্যের অরূপ প্রকাশকে তিনি সারসত্য জেনেছেন। রবীন্দ্রতত্ত্বচিন্তায় এই অনন্য অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেতে দেখি।

সাহিত্যের রসাস্বাদন হলো ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। পরম সত্যকে সাহিত্য না পারলে সংগীতই ধরতে পারে। গানই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, 'মন দিয়ে যার

নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তার চরণ ছুঁয়ে যাই'। সেই সত্য রূপ-অরূপের কার্যকারণে ধরা পড়বে। পরন্তু রবীন্দ্রনাথ চিত্র ও সংগীত এই দুটো উপাদানের মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্তকে দেহভাবে অর্থাৎ ছবি ও সুরের আকারে (Form-এ) আনার সার্থক উপায় ব'লে মনে করেছিলেন। পাশ্চাত্য কবিদের ইমেজারী-পদ্ধতিও সেই আকার ও রূপ-চিন্তার একটি সহজ উপায়।

"চিত্রকল্পবাদীদের লক্ষ্য সার্থক চিত্রকল্পের উপস্থাপন, বিষয়গত ও বিষয়ীগত ব্যাপারের স্পষ্ট, বিশদ ও সমুজ্জ্বল রূপায়ন। উক্ত মতবাদের প্রধান গুরু মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড ইহার লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—চিত্রকল্প তাহাই যাহা মুহূর্তের মধ্যে মনন ও ভাবের একটি প্রক্রিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করে। চিত্রকল্পবাদী বিশ্বাস করেন যে, রচনারীতির বিশেষ ধর্মরক্ষাই কবিতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কবিতায় কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। কবি ছন্দের অন্তর্নিহিত দাবী ব্যতীত অন্য কিছু মানিবেন না (সুতরাং অন্ত্যমিল অপরিহার্য)। সর্বপ্রকার ছন্দ ও কাব্যরীতির অনুশীলন করিবেন ও তাহাতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করিবেন এবং রচনায় যাথাতথ্যের চূড়ান্ত মূল্য দিবেন। প্রচলিত কাব্যপ্রথা, নিরর্থক বাক্যধারা ও অলংকারাদি বর্জন, ভাবালুপ্রলাপ ও কাব্যিকতার পরিহার এবং সর্বোপরি ঋজু কঠিন সত্য ও মননধর্মী কবিতা রচনার আদর্শ গ্রহণ করিলে রোমাণ্টিকতার নেশা হইতে আধুনিক কবিগণ মুক্ত হইতে পারিবেন, ইহাই চিত্রকল্পবাদীর বিশ্বাস।"[৯]

চিত্রকল্পবাদের প্রক্রিয়া বা তত্ত্ব যাইহোক, স্পষ্টতঃ একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যালংকারের সাদৃশ্য-ধর্ম-প্রতিপাদন ব্যাপারের (রূপক, উপমাদি) ভেতরে চিত্ররূপায়নই অন্যতম আসল ব্যাপার। ভাবকে, অনির্বচনকে মূর্তিমান ক'রে চোখের সামনে হাজির করতে কবিগণ ভাষার কৌশলে, ভাষার রঙেই ছবি আঁকেন। এই অর্থে এই ব্যাপারটি প্রতীকীবাদ (Symbolism) এর পর্যায়েও পড়ে। ফরাসী কবিতায় প্রতীকীবাদ নিয়ে এক সময় আন্দোলন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সহজ তত্ত্ববোধে সংগীত, চিত্র ও সাহিত্যকে একীভূত ক'রে নিয়েছেন। বিচিত্র মতবাদগুলো তাঁর কাছে একান্ত আপতিক। তিনি বলেছেন—"চিত্র ও সংগীতই সাহিত্যে প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।" কবি আরও বলেছেন "বস্তুতঃ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র

এবং সেই গানই সাহিত্য।"[১০] কবিগুরু ভাষা-প্রকরণের মূল লক্ষণকে বলেন 'প্রতীক-দ্যোতনা'। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংগীতে ভাষার মৌল স্বরূপের চরম পরিণামকে আমরা সেই 'প্রতীক দ্যোতনা' হয়ে উঠতে দেখি।

যে সংগীত সংগীত-রস সাহিত্যের প্রাণের গতি নির্ণয় করে, শুদ্ধ সংগীতের সঙ্গে তার ভেদ আছে। কেননা, "বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই" ;—অলংকার, ছন্দস্পন্দন ইত্যাদি শিল্প-কৌশল একসময় অর্থকে ছাড়িয়ে সংগীত-রস অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ রচনা করে। শুদ্ধ সংগীতের স্বরক্ষেপণ কৌশল বা তান লয় তাল ইত্যাদি ভাষার মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু সাহিত্যের সংগীতরস ভাষা নিয়েই, অর্থাৎ সেই কাব্যাত্মা এমন একটি স্তরে উন্নীত যে তার সঙ্গে চিত্রদেহ-র সম্পর্ক ও স্বারূপ্য[১১] নিয়ে সূক্ষ্ম সত্তাচেতনার বিচার আবশ্যিক। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, "বাচ্যার্থ বোধের সঙ্গে বাক্-কল্পনা ও শব্দশ্রুতির কল্পনা মিলিত হলে পূর্বানুভূত সংস্কার ও চিত্রকল্পের উদ্‌বোধন হয়"[১২]। রূপ ও অরূপ, সীমা ও সীমাহীনতার দ্বৈতসত্তাকে ভারতীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদী আলংকারিকগণ একসূত্রে বেঁধেছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুভববেদ্য, উপলব্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়বেদ্য অ্যাবস্ট্রাকশনগুলো বিস্ময়করভাবে সগুণাত্মক ইস্‌থেটিক হ'য়ে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করেছে। সুরসম্পর্ক ছাড়াই রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্পে সংগীতরস বা গীতরস কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত ও অভিব্যক্ত—এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের বিভিন্ন বিচিত্র কাব্যপ্রকরণে বিভিন্নস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রধর্মিতা বা চিত্রকল্পের আলোচনাই এখানে প্রাসঙ্গিক ও আলোচিতব্য। ইংরেজী Imagery/Image শব্দটি বাংলায় প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প, চিত্রক, কল্পক, বিম্বক, রূপচিত্র ইত্যাদি শব্দ হিসাবে বর্তমানে প্রচলিত। কেউ রূপকল্প বলতে চান, কেউ বলেছেন বাক্‌প্রতিমা। একটি ফর্ম-এর প্যাটার্ন বা আদর্শ হিসেবে রূপকল্প কথাটি চিত্রকল্প অপেক্ষা অধিকতর সার্থক বলে মনে হয়। ছবি অপেক্ষা রূপ শব্দে বিষয় ও ভাবের ব্যাপকতা অনেক বেশী বোঝায়। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে ইমেজ বা ইমেজারি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাক্‌প্রতিমা কথাটিও বিশেষভাবে চলেছে। কথাটির স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও খাড়া করেছেন অনেকে। বাক্‌প্রতিমা শব্দটির দ্বারা ভাষণ-শিল্পের সামগ্রিক রূপনির্মিতির একটি প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণ ও সৌন্দর্যের পরিচয় লাভ করা যায়। সে হিসেবে ইমেজারির প্রতিশব্দ হিসেবে

বাক্‌প্রতিমা শব্দটিও গ্রহণীয় হতে পারে। আমরা এখানে প্রধানতঃ চিত্রকল্প ও বাক্‌প্রতিমা শব্দদুটি ব্যবহার করেছি।

রবীন্দ্রনাথ মহাজাগতিক সৃজনলীলার রূপকে দুচোখ ভ'রে দেখেছিলেন। সমস্ত অভিজ্ঞতা, সত্তাচেতনা ও অনুভব দিয়ে এবং পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি রূপানুধ্যান করেছেন। রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপ-রতন আহরণ ক'রে সঞ্চয় করেছেন। চেতন-অচেতন, দৃশ্য-অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়বেদ্য-ইন্দ্রিয়াতীত, লৌকিক-অলৌকিক, বস্তু-অবস্তু, দার্শনিক-বাস্তবিক ইত্যাদি সমস্ত প্রকার অবস্থা বা সত্তার চিত্র বা ইমেজ কবির কাছে ধরা দিয়েছে তাঁর উপমা-চিন্তার মতো। চিত্রকল্পকে এক অর্থে 'চিত্তস্পন্দনের শব্দপ্রতীক'[১৩] কিংবা 'চরমের প্রতিরূপ'[১৪] বলা যেতে পারে। অসামান্য কবি-বিবক্ষায় বাগ্‌-বিভূতিতে সেই চিত্তস্পন্দনকে ও 'চরম'কে কবি ধ'রে রাখলেন। কবিতায় ও গানে (এমন কি তাঁর নাটক গল্প প্রভৃতিতেও) সেই রূপ ও অরূপকে তিনি অসীম প্রযত্নে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। কবি বলেন—

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে। (পূজা ৩৪৭)

তিনি নিজ-সত্তা-সম্ভাবনাকে মহাজাগতিক ও ঐশীশক্তির মধ্যে উপলব্ধি ক'রে প্রজ্ঞাপূর্ণ গানের ভাষায় বলেছেন—

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি,
আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমন কব,
আপন মনে মেঘ-স্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী। (পূজা ৭১)

কবি স্বয়ং তাঁর স্বকীয় তত্ত্বভাবনা, ব্যক্তিসত্তা, প্রজ্ঞাস্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে এভাবে এত সহজ সুন্দর ও পর্যাপ্তভাবে বিবৃত করেছেন যে, রবীন্দ্রগবেষকদের নতুন কিছু বলবার অবকাশ খুব কম আছে বলেই আমার প্রত্যয় হয়।

কাব্যের প্রাণ যেমন সংগীতরস, চিত্রকল্প-ও তেমনি প্রাণ বা প্রাণের একটি আধার স্বরূপ। মহিমান্বিত বিষয় ও ভাবের সাংগীতিক সংবেদনে এবং চিত্র-কল্পের অসামান্য রূপোপাদানে নির্মিত হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। অর্থাৎ কন্‌টেন্ট-এর

উপযুক্ত ফর্ম-এর সাংলগ্নিক বিশিষ্টতা প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে ফুটে উঠেছে। স্থায়ী সঞ্চারী প্রভৃতি নিয়ে চার কলি কিংবা স্থায়ী ও অন্তরা নিয়ে দুই কলি রবীন্দ্রসংগীতের স্বল্প পরিসরে বিধৃত আছে মহান কবির দিগ্বাহী সত্তাচেতনা, অসীম মানস-মহিমা, সূক্ষ্ম সুগভীর দার্শনিক বোধ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অক্লান্ত রূপতৃষ্ণা এবং নির্লিপ্ত আনন্দ। প্রায় প্রতিটি গানের বিবক্ষিত অভিধার উদ্ভাসনে প্রোজ্জ্বল হয়েছে মহাকবির আন্তর-আকুলতা; এবং আরও দেখতে পাই—কুশলী রূপকারের তন্নিষ্ঠ চিত্তচিত্রণ চিত্রকল্পে প্রতিমায়িত। কল্পনা (Imagination)-র অস্পষ্ট ছায়া, অমূর্ত (abstract) ভাবের শিল্পিত মূর্তি ইত্যাদি বর্ণাঢ্য রঙে রেখায় প্রাচুর্যে রবীন্দ্রকাব্যে ও গানে উপস্থিত। অমৃতবর্ষী সুরে সেখানে বাজছে "নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি।" সহস্র সহস্র কবিতা ও দুইসহস্রাধিক সংগীত থেকে চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত বেছে নিতে যাওয়া কারও পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়।

দুই

চিত্রকল্প বা রূপকল্প বা বাক্‌প্রতিমা অভিধা আধুনিক হলেও সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় তার সহজাত সম্পর্ক আছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের কবিগণ কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, বানভট্ট কিংম্বা সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতির রচনায় অলংকৃত ভাষার যে কারুপ্রতিমা লক্ষ্য করা যায়, তার ধ্রুপদী সৌন্দর্য অম্লান এখনও। আধুনিক মতবাদনিষ্ঠ কবিগণ তাঁদেরকে সর্বতোভাবেই ছাড়িয়ে গেছেন ব'লে যে ধারণা সম্প্রতি প্রচারিত, ওতে আমি বিশ্বাসী নই। কাব্যরূপ ও প্রায়োগিক পরীক্ষানিরীক্ষা ব্যাপারে আধুনিক কবি ও শিল্পীদের মধ্যে সীমাহীন উৎসাহ ও কৃতিত্বের পরিচয় যথেষ্টই। তা সত্ত্বেও প্রাচীন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করার জটিল মনোভাব এবং তাঁদের উপেক্ষা করার সাম্প্রতিক রীতিকে অসমীচীন ও দুঃসহ মনে হয়। যুগে যুগে কালে কালে কাব্যের একটি স্বতঃসিদ্ধ সামগ্রী, মূল্য ও স্বরূপ স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কালের প্রগতির সঙ্গে তাকে তাল মিলিয়ে চলতেই হয় এবং সাহিত্য-কাব্য-শিল্প তা পারে বলেই তার অবসান বা অসম্মান নেই। এজন্যই সাহিত্য সার্বজনীন ও দেশ-কাল-পাত্র-অতিক্রামী।

আধুনিক এজরা পাউণ্ড, এলিয়ট, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, লুইস প্রমুখ কবিদের

প্রভাবে দেশে-বিদেশে চিত্রকল্পরীতির ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। আধুনিক কালের ভাবনা বড়ই আন্তর্জাতিক। দ্রুততার সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিগণ সেই চিত্রকল্পবাদ নিয়ে নবকাব্যরীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা করলেন। কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্বেই তাঁর রচনায় প্রকটিত ক'রে তুলেছেন বাইরের শিক্ষা ও প্রেরণা ছাড়াই। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন— "বাংলাসাহিত্যে চিত্রকল্পের সম্ভাবনা প্রথম রবীন্দ্রনাথই সূচিত করলেন। কবিতার বাণী ও ভাষণে, চিত্রনে, ও অলঙ্কারে অভিজ্ঞতায় ঘনীভূত সার মিশ্রিত করলেন।"[১৫] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যুগবাহী কাব্যসত্য থেকে। এ প্রেরণা কোনদিন স্তব্ধ হয়ে যায় না। অতীত-বর্তমান-ভবিতব্যকে স্পর্শ ক'রে সে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করি, শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা অনপেক্ষিত-প্রতিভাই সমস্ত কিছু সার্থকতার জন্য দায়ী। সেক্সপীয়র নাটকের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনলীলাকে নিখুঁত সার্থকতায় রূপায়িত করেছেন। কালিদাস দর্শন-ভিত্তিক জীবনচর্যার বর্ণাঢ্য ছবি এঁকেছেন কাব্যে। বিটোভেন সুরের রূপে-রঙে অনুভব ও জীবানোত্তাপকে প্রত্যক্ষভাবে ধরেছেন। পিকাসো সামান্য রেখার আঁচড়ে জীবনস্বরূপকে স্থির চিত্রার্পিত ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতায়, গানে, ছবিতে মহাজগতের অধরা-মাধুরীকে সার্থক স্বরূপে ধ'রে দিয়েছেন। এ সৃষ্টি (সুর-ছবি-কবিতা) সর্বকালের প্রথা ও প্রেরণার অপেক্ষা করে না। কাব্যরূপ-নির্মিতির এ এক স্থির অথচ বৈচিত্র্যময় ও গতিময় লীলা।

সাহিত্য ও কাব্য হলো ইনটেলেক্চুয়্যাল আর্ট। চিত্র ও সংগীত প্রধানতঃ ফাইন আর্ট। বাহ্য এই ভেদটুকু থাকলেও কিন্তু বৌদ্ধিক শিল্পকলা ও প্রায়োগিক চারুকলার মুখ্য কাজ হচ্ছে প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া। Aesthetic গ্রন্থে ক্রোচে বলেন "Expression always arises directly from impression"[১৬]। শিল্পীর প্রকাশের সব থেকে প্রধান মাধ্যম হলো সে নিজেই। আত্মস্বরূপের প্রকাশের জন্য তাকে রূপায়নিক কৌশল নিতে হয়। ভাব আবেগ অনুভূতির প্রকাশই হলো শিল্প। "The poet or painter who lacks form, lacks everything, because he lacks himself"[১৭]। যুগে যুগে কবিগণ, শিল্পীরা অস্পষ্ট আত্মার অব্যক্ত আকুতিকে প্রকাশ করতে কতোনা প্রয়াস ক'রে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত-চিত্র-সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে—আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন ক'রে পার আমার অব্যক্ত কথাটিকে ব্যক্ত করে দাও"[১৮]। এস্থেটিক বা সৌন্দর্য-দর্শনে প্রকাশ-এর কয়েকটি বৃত্তি ধরা হয়েছে; চারুকলায় কৈশিকী বৃত্তির আবশ্যিকতা সর্বস্বীকৃত। সংগীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর রূপ-অঙ্কণও এই জাতীয় বৃত্তির ক্রিয়া। এই বৃত্তির ক্রিয়া বলতে বোঝায় ভাববোধ ও ভাবপ্রকাশ। ক্রোচে ভাববোধ ও ভাবপ্রকাশকে একটি বৃত্তির ক্রিয়া বলতে চেয়েছেন। ভারতীয় মার্গসংগীতে মূর্তির কল্পনা করাও একটি বিস্ময়কর বৃত্তি-রূপ। ভাববোধ যতই সূক্ষ্ম অস্পষ্ট (abstract) হোক না কেন, তাকে যথার্থভাবে স্থূল ও স্থায়ী প্রতিমায় এনে স্থাপন করতে চেয়েছেন কলাকারগণ। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এরূপ :

—"প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালংকারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিনী। আকাঙ্খার অ-নিবৃত্তি হেতুই তাহাকে বিরহিনী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিনী সুন্দরী, বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে। তাহার বসন ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। এইরূপে অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান।"[১৯]

কলাবন্তদের রাগরাগিণীর ধ্যানরূপ ভিন্ন অর্থে কবি-কল্পনাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী এই মূর্তি কল্পনাকে বুদ্ধিজীবী মানুষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশ বলেছেন, সুর ও স্বরের শব্দময় রাগকে ভাবময় করার মধ্যে একটা মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা আছে,[২০] এভাবেই কলাবন্তরা রসের সামগ্রিক অবস্থাকে সৃষ্টি করেন। হিন্দোল, বিলাবল, কুকুভ, খাম্বাজ, গৌড়ী, বসন্ত, মল্লার প্রভৃতি প্রায় অধিকাংশ রাগরাগিণীর প্রতিমা কল্পনার পশ্চাতে মনোবিজ্ঞানের যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ফাইন আর্ট, বিমূর্ত শিল্পকলা, অনির্বচন রাগরাগিণীর সুরের তানবিস্তার —সমস্ত কিছুই বিমূর্তের মূর্ত-প্রতীক কিংবা রূপকল্প। "চিত্র-শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে যাকে বলে ভ্যারাইটি। সংস্কৃতে এই অর্থেই এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বিবিধ বর্ণ, বিবিধ রূপকল্প, বিবিধ বিন্যাস একমাত্র ছবিতে ঘটে বলেই এর সাধারণ আখ্যা হয়েছে চিত্র। যুগে যুগে নানা অভ্যুদয়ে এই অর্থটিকেই আমাদের স্মরণ করা উচিত শুধু ছবি ব্যাপারেই নয়, সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রেও।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ইত্যাদি বৌদ্ধিক ও চারুশিল্পের মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা ক'রে এক নতুন নেপথ্য-তত্ত্ব রচনা করলেন। এ তত্ত্ব তাঁর ধার করা নয়—তাঁর সহজাত প্রতিভার প্রতিভাস। ডঃ অরুণ বসু বলেন—"রবীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রকল্পের ধারণা খুব তীক্ষ্ণ ছিল না। কাব্যসজ্জার উপকরণ সম্বন্ধে তিনি কোন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন নি। অথচ একান্ত অচেতন-ভাবে তিনি চিত্রকল্প সৃষ্টি ক'রে গেছেন। যেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা কবিতার প্রত্যঙ্গের শোভা, সেখানেই তিনি আলংকারিক। যেখানে অভিজ্ঞতা কবিতার সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত, সেখানেই তাঁর চিত্রকল্প। চিত্রকল্প হৃদয়ের গভীরে নিহিত থাকে, তাই চৈতন্যের অন্ধকার গুহায় সেই মানসোত্রী থেকে যাত্রা করে।"[২২] বাঙালীর যুগবাহী সংস্কৃতি থেকে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পরিশীলিত প্রতিভা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিচিত্র উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। প্রতীচ্য থেকেও আহরণ করেছেন অনেক, কিন্তু এহো বাহ্য।

—"পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমাদের মত একটি সৌন্দর্যসম্মত সূক্ষ্মনেত্র বিচিত্র অলংকারশাস্ত্র আছে? কবিতার সৌন্দর্যকে এত কারুকার্যমণ্ডিত করা অন্য কোন ভাষায় সম্ভব? অলংকৃত করাই কবিতার কাজ, একালে এবং চিরকালই। সুতরাং চিত্রকল্প বিদেশ থেকে আসেনি, হৃদয় থেকে এসেছে, কিন্তু তার জ্ঞানটা আধুনিক।"[২৩] রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের চিত্রকল্প বিস্ময়করভাবে সংহতি ও বিভূতিতে উৎকর্ষ লাভ করেছে। বাস্তবিকই এটা কোনপ্রকার বহিরাগত অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা থেকে আসেনি। একজন সমালোচক বলছেন, —"রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প তাঁর নিজস্ব, সুতরাং তাঁকে চিত্রকল্পবাদের প্রচলিত কোন শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করলে সেটাতে বিবেকের পরিচয় দেওয়া হবে না।"[২৪]

h কবিগুরু ভাবের অ্যাবষ্ট্রাকশন্‌কে নিয়ে তন্নিষ্ঠ থাকলেও, প্রকাশ-ব্যাকুল প্রকবিসত্তা গানে ও সুরে, কবিতায় গল্পে নাটকে ভাবকে রূপায়িত ক'রে মুক্তি

পেয়েছে। এই প্রকাশ-ব্যাকুলতা থেকেই বিমূর্ত-কল্পনা এক সময় কবির পাণ্ডুলিপিতে লেখা কাটাকুটি করতে করতেই অজস্র ছবি হ'য়ে ধরা পড়েছিল। তাঁর গানের সুরের আস্বাদ, আনন্দ ও চিত্রের রূপাস্বাদ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ধরা প'ড়ে হ'লো কবিতা ও সংগীত।—"কাব্য-স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্র ও সংগীতের মিলনের কথা বলেছেন। কাব্য সম্পর্কে কথাটি বিশেষ মূল্যবান। চিত্রশিল্পে শুধু চিত্র আছে। তার আবেদন রঙ্‌ ও রেখার মধ্য-বর্তিতায়, জ্ঞানে ও প্রজ্ঞাময় আনন্দে। সংগীতেও তাই,—কিন্তু সুরের প্রাধান্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায়। অথচ কাব্যে, বা আরও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে চিত্র ও সংগীত এই দুয়েরই অবস্থান। সাহিত্য যে চিত্র প্রদর্শন করে তা নির্মাণ করতে হয় ভাষায়।"[২৫] আর একজন সমালোচক অনুরূপ বক্তব্যে বলেন—"কবিতায় শব্দের ধ্বনিগত (sound) শক্তি যেমন সংগীতধর্ম সৃষ্টি করে তা সে মৃদু বা প্রখর যাই হোক না কেন—তেমনি শব্দের অর্থশক্তি (meaning) একই সঙ্গে পাঠক মনে কাজ করে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে থাকে। সংগীত ও চিত্র উভয়ে একযোগে কবিতাকে রূপ দেয়, প্রথমটির পেছনে রয়েছে শব্দালংকারের ভূমিকা, দ্বিতীয়টিতে অর্থালংকারের।"[২৬] আধুনিককালে গতানুগতিক অলংকাররীতি অপেক্ষা চিত্রকল্প ও প্রতীকবাদকে আরও সূক্ষ্ম আরও শ্রেষ্ঠতর তাৎপর্যে বিবেচনা করা হয়েছে।

কবিগুরুর গানের ভাবসংবেদন সুরের আধারে ও ভাষার আধারে সহৃদয় শ্রোতার কাছে অনুভববেদ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য হ'য়ে ওঠে। গানের সুর শ্রোতাকে আবেগে আনন্দে আপ্লুত করে। কিন্তু এটাই পরম কথা নয়, শ্রোতা গানের সুরকে ভাষাশ্রয়ী ক'রে একটি পরিপূর্ণ সত্তাচেতনাকে চোখে দেখতে সক্ষম হয়। "তুমি কোন্‌ কাননের ফুল কোন্‌ গগনের তারা, তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন স্বপনের পারা"—এই প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক রূপোপাদান ও পিলুবারোয়াঁর সুর শ্রোতাকে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে নিয়ে যাবে। একটা কথা—এই পিলুবারোয়াঁর সুরকে যদি ভাষার সঙ্গ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, এবং কেবলমাত্র কবিতা হিসেবেই তার ভাষায় সুরধর্ম ও অনিবর্চনীয় আনন্দ কতখানি থাকা সম্ভব? আমরা বিশ্বাস করি—সুর ছাড়া-ও এখানে সুর আছে, সে হলো ভাষার সুরধর্মিতা।—"সংগীতের যেমন সুর, এখানে তেমনি ছন্দ, ধ্বনি সুষমা, বাক্যে শব্দযোজনার, পদস্থাপনের বৈচিত্র্য।"[২৭] আর আছে ছবি, রঙে রেখায় বিমোহন আলিম্পন।

নিঃসন্দেহে কবির সাংগীতিক চেতনার অবিচ্ছেদ্য রূপোপাদান হলো চিত্রকল্প বা ইমেজারি। চিত্রকল্পের সংবৃত অনতিরেক কারুকর্মে তাঁর কবিতা এত বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলে-ও কবি সেই রূপ বা ফর্মকেই প্রাধান্য দেন নি। গানের নির্দিষ্ট পরিসরে সংহত মহিমায়, সংবেদ্য প্রসাদে ও ঔজ্জ্বল্যে তিনি ভাষা-প্রতিমাকে ধরলেন অধিক সাফল্যে। এই সাফল্যের অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতাকে গান ক'রে নিলেন এবং এখানে "এক একটা চিত্রকল্প শায়ক সুতীক্ষ্ণ বাক্‌সংযমে পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তঃশ্রুতিকে প্রায় একটি সর্বান্বয়ী জ্যোতিরিন্দ্রিয়ের (Sixth sense) কোঠায় নিয়ে গিয়ে পৌছে দেয়।"[২৮]

এই চেতনানুষঙ্গ একটি অনির্বচনীয় অবস্থাকে সৃষ্টি করে দেয়, যার নাম প্রতীক। বর্তমানে বহু প্রচলিত রূপক উপমাদি সাদৃশ্যমূলক অলংকারের অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় প্রতীক ও ইমেজারি। "দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব বা চকিত উৎপ্রেক্ষিত দৃষ্টিমাত্রই ইমেজ নয়। সমগ্র জীবনের চেতনাবহ না হলে পুনঃ পুনঃ অনুরাগ রঞ্জিত না হ'লে তার চিত্রকল্প হয় না, যদি মূল প্রয়োগ-সম্মত অর্থে তাকে গ্রহণ না করি।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপক উপমা প্রতীক হিসেবে সহস্র উপাদান স্থির তত্ত্বে নিয়ন্ত্রিত, এবং "ফুল পাখি চাঁদ মেঘ শিশির এরকম প্রত্যেকটি শব্দের পেছনে বা বস্তুর পেছনে রবীন্দ্রনাথের যে আবেগের চাপ পাই, যে বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসের শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের বিরহ বেদনা।"[৩০] চিত্রকল্প ও প্রতীকের সংগে রূপকের পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। কবির কৈশোর রচনা থেকে শেষলেখা পর্যন্ত সমস্ত রচনায় কাব্যবোধ, আবেগের তেজ (লুইস যাকে বলেছেন intensity) ও মহিমায় অনেক স্থির সাধর্ম্যকল্পনা বা চিত্ররূপের বিষয় বারবার প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। টমসন সাহেব একটি সাধারণ তালিকা করেছিলেন এই বিষয়গুলি নিয়ে; যেমন: 'Silence, soul, heart, song and speech, lonely, dense, deep, the skirts of the sky or the forest, tears, sighs, bride, caresses, love, death—these are the words with which he weaves and reweaves an endless garland of sad-pretty fancies।"[৩১] এই তালিকাটি নিতান্তই সাধারণ ও অসম্পূর্ণ। সীমাহীন চিন্তা ও কল্পনাকে এবং অতীন্দ্রিয় মিষ্টিক দার্শনিক প্রজ্ঞাবোধকে কবি রবীন্দ্রনাথ রূপে

রূপে সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁর সংগীতেও সেই সহস্র বিষয়ের ছবি ও প্রতীক এসেছে। এসেছে প্রবল intensity নিয়ে এবং সেইসঙ্গে freshness & evocativeness ধর্ম নিয়ে। ইমেজারির অনিবার্য লক্ষণ হিসেবে লুইস এদের উল্লেখ করেছেন।

কবিগুরু বলেন, "কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা, তুলনা, রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়"[৩২] সাধারণতঃ চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যও অনীপ্সিত হ'য়ে উঠেছে। প্রতীকের বৈশিষ্ট্য কবির সত্তা-চেতনাকে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত। দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক বোধ ও স্বজ্ঞার সঙ্গে তার সম্পর্ক হ'লেও তাকে বস্তু-রূপাবয়বের সংলগ্ন হ'তে হয়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন— "রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে ছবি আঁকে, গোটা কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমাত্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে।"[৩৩] —দেখা গেছে কালিদাসের কাব্যে মেঘ ও ফুল চূড়ান্ত প্রতীক স্বরূপে বিকশিত। সেকস্‌পীয়র-এর কাব্যে প্রতীক হয়ে এসেছে রাত্রি ঝড় মেঘ গুহা ভূত পাখি ইত্যাদি। মেঘ, সমুদ্র, ফুল প্রভৃতি নিয়ে শেলী অসামান্য চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। শেলীর কাব্যে প্রতীক ও চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য উপাদান ছিল। জীবনের বিপুল ঘনীভূত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কাব্যমানসে দৃশ্যমান পটভূমি রচনা ক'রে যায়। শ্রেষ্ঠ কবিগণ মনের সেই দৃশ্যপটকে শব্দে বাক্যে সমর্পন ক'রে দেন। বায়রনের বিক্ষুব্ধ কবি-চেতনার অনুষঙ্গ হয়েছিল সমুদ্র, পর্বত, জলপ্রপাত ইত্যাদি। ওয়াড়স্বার্থের প্রশান্তস্থির মনীষার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছিল অরণ্য ও দিনান্ত আকাশের নির্জন তারা। এলিয়ট প্রতীক ও চিত্রকল্প গড়েছিলেন পতিত জমি, শোণিতাধার ইত্যাদি নিয়ে। এভাবেই প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির সত্তাচেতনার বৈশিষ্ট্য-গুলো কৌতূহলের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপাতী জীবনোপলব্ধি ও বহুকোষ-কবিকল্পনার সঙ্গতিকে পর্যালোচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীতের ভেতরেই তাঁর চিত্রকল্প ও প্রতীক রচনার সাফল্যের পরাকাষ্ঠা খুব সতর্কভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি।

তিন

টমসন নির্ধারিত প্রতীক ও বিষয়গুলো রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় নয় ব'লে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রচিন্তাকে আমরা গুণগতভাবে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে প্রত্যেকটি বিভাগের বিষয়গুলোকে বাহ্য ও সূক্ষ্মভাবে সাজাতে পারি। রবীন্দ্র-সংগীতে প্রযোজিত এই রীতিটি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পক্ষেও সমান প্রযোজ্য হ'তে পারবে। কেননা, কবিগুরুর গান ও কবিতার ভেতরে মৌলিক বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমান অনেক বেশি। তাছাড়া, আমরা কবিগুরুর গানকে কবিতা হিসেবেই মূল্য দিয়ে, কিংবা কবিতার চেয়ে বেশী ক'রে দেখতে চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রকল্পকে আমি সাধারণ গুণের বিচারে চার প্রকার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে চাই :—(১) শব্দ ও ধ্বনি-চিত্র (২) দৃশ্য ও রূপ চিত্র (৩) ভাব ও রস চিত্র (৪) মিশ্ররূপ চিত্র। এই বিষয়সূচী করার জন্য কোনো স্থিরীকৃত মত অনুসরণ করিনি। সীমাশূন্য দৃষ্টান্তগুলোকে সীমার মধ্যে এনে এভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি মাত্র।

(এক) শব্দ ও ধ্বনি-চিত্র

শব্দ ও বর্ণমিল, অনুপ্রাস, ছন্দস্পন্দন, গীতাত্মক অনুষঙ্গ প্রভৃতির শাব্দিক কারুকৌশলে অত্যাশ্চর্য ইমেজারি রচিত হ'তে পারে। অবশ্য কেবলমাত্র শাব্দিক ধ্বনিই আসল নয়, তার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কেরও মরফিম্ হ'তে হবে। সাধারণ শব্দালংকার থেকে বেশী অর্থবহ না হ'লে চিত্রকল্পই হবে না। দৃষ্টান্ত :

আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে
পূর্ণিমা চাঁদ মাঠের পারে ওঠার কালে।
তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিনী
তারি কাঁপন লাগল কি ওর মুগ্ধ ভালে। (প্র ৪)

(দুই) দৃশ্য, বর্ণ বা রঙ্ নিয়ে রূপ-চিত্র :

এই প্রসঙ্গের বিষয় অন্তহীন। প্রথমতঃ মহাজাগতিক নিসর্গরূপ, গ্রহ সূর্যাদি ও আকাশ, মেঘ ঝড় দিন রাত্রি ও সময়, ঋতুতে প্রকৃতির রূপ, কানন পুষ্প, প্রাণীপাখি, নদীপর্বত ইত্যাদির রূপ, রঙ্, দৃশ্য। দ্বিতীয়তঃ, মানব জগৎ, নারীরূপ প্রসঙ্গ ইত্যাদি। বাহ্য ও প্রত্যক্ষতঃ রূপোপাদান দিয়ে রচিত এসব চিত্রকল্প সুগভীর তাৎপর্য ও সত্যকে উদ্ভাসিত করবে। রিচার্ডস বলেছেন

"The visual image is a sensation or a perception, but it also stands for, refers to, something invisible, something 'inner'.[৩৪]

(তিন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়বেদী রূপবিভূতি এবং তত্ত্ব প্রসঙ্গে ভাব ও রসচিত্র :

এ প্রসঙ্গটি পূর্ববর্তী দুটো শ্রেণী থেকে পৃথক। কারণ, পূর্বোক্ত চিত্রকল্পের বিষয়গুলো মুখ্যত বাহ্য উপাদানে নির্মিত, এটি সম্পূর্ণতঃ সূক্ষ্ম ও অনির্বচনীয় উপাদান সম্ভূত। মানব কল্পনা, বোধ, বুদ্ধি ও উপলব্ধির দ্বারা রচিত সীমাশূন্য জগৎ কবির বর্ণালিম্পনে ধরা পড়ে। এভাবে এই তত্ত্বচিন্তায় আসে ঈশ্বরের অনুধ্যান, মানুষের রোমান্টিক ও মিষ্টিক কল্পনা, রূপক প্রতীক চিন্তা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তাচেতনা ও উপলব্ধি, প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বোধ, গান ও সুরের রসচেতনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানবোধ ইত্যাদি। রিচার্ডস্-এর মতে 'ইমেজ' বাহ্যদৃষ্টির সীমা পার হ'য়ে সর্বদা গভীরে প্রবেশ করে এবং ইন্দ্রিয় চেতনায় স্মৃতির সঙ্গে সূক্ষ্ম সংযোগ গ'ড়ে তোলে ('its character as a mental event connected with sensation)। ইন্দ্রিয়বেদী চিত্রকল্প বিষয়ে স্মৃতি-সংবেদন ব্যাপারটি রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে।

(চার) বিমিশ্র রূপচিত্রন (mixed imagery) :

মূর্ত বিমূর্ত বস্তু কল্পনা, রূপ অরূপ, প্রকৃতি, নারী, ইন্দ্রিয় চেতনার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ের জ্ঞান ও আবেগের রূপায়ন।[৩৫] সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার অনেকটা অতিরেক হ'য়ে চিত্রকল্পে রূপায়িত। "রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে বিরাট চিত্রশালা, রসিক মাত্রকেই একথা স্বীকার করতে হবে। এই চিত্রধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান গুণ। পূর্ণলক্ষণের অলঙ্কার রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর, তার চেয়ে বেশী সংসৃষ্টি, এবং সবচেয়ে বেশী অপূর্বসুন্দর সংকর।"[৩৬]

সূত্রাকারে বিবৃত চারটি বিষয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সীমাতিশায়ী কাব্যবিষয়কে গানেরও উপাদান ক'রে কবি যে পরমাশ্চর্য সৃষ্টিলীলা রচনা করলেন, তাকে বোঝা বা বুঝিয়ে বলা সহজসাধ্য নয়। প্রতি ভাগে কয়েকটি বিভাগ নিয়ে এই প্রাসঙ্গিক রূপোপাদান সম্পর্কে পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। কবিগুরুর রচিত পূজা পর্যায়ের গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। অবশ্য সব পর্যায়ের গানেই চিত্রকল্পের অধিষ্ঠান। তবে পূজা পর্যায় অপেক্ষা প্রেম-

প্রকৃতি-বিচিত্র পর্যায়ের গানে অধিক পরিমানে ইমেজারির রূপায়ন দেখা যায়। ঔপপত্তিক নিয়মের বাঁধাধরা অনুসৃতি রবীন্দ্রনাথ করেন নি, অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের মতো তিনি গানগুলোতে কেবলই ছবি এঁকে গেলেন। যে গানগুলো সুরে গাওয়া হবে এবং যে গানগুলোকে সুরে না গেয়েও নতুন কাব্যাঙ্গিকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে কারও দ্বিধা থাকবে না, এমন সব রচনায় চিত্রকল্প কত সহজেই প্রাতিস্বিক হ'য়ে উঠেছে।

চার

তথ্যগত বিশ্লেষণ : প্রথম শ্রেণীর চিত্রকল্প

প্রধানতঃ বর্ণমিল বর্ণগুচ্ছের ধ্বনি ও ধ্বনি-তরঙ্গের উপাদানে রচিত চিত্রকল্প কতখানি বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা পেয়েছে দেখা যেতে পারে। এরা শ্রুতি-ইন্দ্রিয় নির্ভরে চিত্ররূপ হ'লেও দৃষ্টি, স্পর্শ, মন-এর সঙ্গেও অনেকস্থলে সম্পর্কিত। তাই এরা প্রথমতঃ ধ্বনি-চিত্র হ'য়েও অনেকস্থলে দৃশ্য-চিত্র ; বিষয় ও বস্তুকে অবলম্বন ক'রে ছন্দিত। "ধ্বনি তরঙ্গ থেকে চিত্ররূপের আভাস যে কল্পনায় সঞ্চারিত হয় তাতে সন্দেহ নেই।"—শ্রীযুক্ত শিবনারায়ন রায় এই কথাটি ব'লে ধ্বনি-চিত্র প্রসঙ্গে জেরাল্ড হপকিন্সের যে কবিতাটি ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করছি। "জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতা এ জাতীয় ধ্বনি-চিত্রের জন্য বিখ্যাত। তাঁর 'দি লেড্‌ন্‌ একো অ্যাণ্ড দি গোল্‌ডেন একো' কবিতাটি থেকেই একাধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা চলে :

O ! is there no frowning of these wrinkles,
ranked winkles deep
Down ? no waving off of these most mournful
Messengers,
Still messengers, sad and stealing messengers of grey ?

প্রথমে বিচিত্র সমাবেশে 'র' ধ্বনির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ জরার অমসৃণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে, তারপর ডীপ ডাউন-এ পাচ্ছি ব্যর্থকাম গুরুভার প্রয়াসের ইঙ্গিত, তারপর ওয়েভিং-এর 'ভ', অফ্‌ এর নরম 'ফ' পরের অফ-এর কঠিন 'ফ' যেন এক শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস, পরিশেষে অন্তে মধ্যে এবং সূচনায় 'স' ধ্বনির অনুপ্রাসে এবং ষ্টীল ও ষ্টীলিং-এর হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরে জরার কায়াহীন দূতদের বিষণ্ণ সশঙ্ক পা টিপে টিপে ফিসফাস চলা ফেরার ছবি স্পষ্ট।"[৩৭] কবিতার

শব্দশক্তিতে ও ধ্বনি পরম্পরায় কবিকল্পনা যে বাস্তবিকই ছবি হয়ে দেখা দেয়—এটা সুনিশ্চিত।

এখানে এলিয়টের বিখ্যাত কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত করেও এই ব্যাপারটি বুঝতে পারি।

"Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water."

(The Waste Land/Chap V)

কবিতায় কতগুলি শব্দের সমাহার ; এবং শব্দের ধ্বনিগুলো পরস্পর সংস্থাপিত, অথচ কবির তত্ত্ব-চিন্তন এবং মানস-প্রতিমা শব্দশক্তির সাশ্রয়ে সামূহিক প্রত্যক্ষণ (পারসেপশন) হ'য়ে দাঁড়ায়। কাব্যাংশটিতে জল পাথর রাস্তা পাহাড় শব্দগুলো পাঠকের মানসপটে আধুনিক সভ্যতার তাৎপর্য নিয়ে ছবি হয়ে ওঠানামা করছে। পাথর, পাহাড় বাঁকাপথ ও জল কয়েকবার পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়ে নৈসর্গিক চিত্রটিকেও উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে। রিচার্ড্স কবিতাটিকে 'A music of ideas and a poetic cryptogram' বলেছেন। কবি এবং সহৃদয় পাঠকের মনে বিষয় ভাবনা—সাংলগ্নিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কবি যা ভাবেন ও চান, পাঠকও সেভাবেই ভাববেন ও চাইবেন। তখনই শব্দে ও ধ্বনিতে তার রূপ রূপায়িত হবে। সামান্য শব্দ সজ্জীকরণে রবীন্দ্রনাথ কেমন অসামান্য চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেন দেখতে পাই। একটি দৃষ্টান্ত :

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
-যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে।

অসংখ্য ভাবনা হয়েছে সংখ্যাতীত পাখি ; পূর্ণিমার মায়াবী আলোকের মধ্যে ভাসতে ভাসতে তারা সিন্ধুপারের পথে কেবলই চলেছে—অসামান্য চিত্রকল্প।

ধ্বনি-চিত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণার বিবরণ হিসেবে উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপিত করেছি। লক্ষ্য করবো, রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় শব্দধ্বনির অনিবার্য ক্রিয়া আছে। অথচ, রীতিসম্মত প্রয়োগ-সচেষ্টতা নেই। ছবি আঁকবার ইচ্ছা নিয়ে কলম ধরা নয়, এ স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রসংগীতের ধ্বনি-রূপায়নের প্রয়োগকলাও

অধিক সিদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে উঠেছে কবির সুগভীর মননশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা। বাংলা ভাষার স্বরধর্ম রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তাঁর কাব্যে তা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পাই, গানেও সেই সিদ্ধি, কিংবা অধিক কিছু। কাব্যতত্ত্বের বহিরঙ্গ করণকৌশল ব্যাপারে প্রতীচ্য অপেক্ষা আমাদের অলংকারশাস্ত্র অধিক উৎসাহ দেখিয়েছে। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'ধ্বনির রঙ দিয়া অর্থ' আঁকা এবং 'অর্থের আশ্রয়ে কাব্যের চিত্রধর্ম'—কথাগুলোতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা বোধহয় প্রাচ্য কবিরত্ন মহাকবি বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ নিয়েই সম্যক পর্যালোচনা হ'তে পারে।[৬৮]

চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত : ধ্বনি-শিল্পের বৈচিত্র্যময় প্রসঙ্গ

প্রকৃতি, মানব এবং বিচিত্র বিষয় ও উপাদানের ধ্বনি-চিত্র।

মেঘ ও পাখি : গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে। (প্র ২৭)

মেঘ, বৃষ্টি ও পাতা :
মরো মরো পাতায় পাতায় ঝরো ঝরো বারির রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কি উৎসবে।

দিগন্ত ও ডমরু : আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু
ডমরু রব হয়েছে ওই শুরু। (প্র ৬৮)

মেঘ আকাশ, পাতা ও নূপুর :
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে (প্র ৭২)

শব্দবৈভব অল্পই ; কিন্তু সহজ অথচ অনিবার্য শব্দগুলোর সাংলগ্নিক ধ্বনির শক্তিতে মেঘ, আকাশ, দিগন্ত, বৃষ্টি, পাতা ইত্যাদি অসামান্য আলিম্পন হ'য়ে উঠেছে। একটি বা একাধিক চরণে এক বা একাধিক নৈসর্গিক চিত্রকল্প।

কানন ও কপোত : শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে রে। (প্র ১১)

সাতবার 'ক', একবার 'খ' ব্যঞ্জনবর্ণের মোট আটবার ধ্বনিবৃত্তি গ্রীষ্মের কর্কশ মধ্যাহ্নকে উদ্ভাসিত করেছে এখানে। কপোতের কাতরতায় সার্বজনীন

তাৎপর্য আভাসিত করছে। কেবল প্রাণিজগৎ নয়, মানবজগতেও শুষ্ক প্রকৃতির দাহনজ্বালা। নাই রস নাই, দারুণ দহন বেলা।

আরও ছবি :

চরাচর ও বিজলি : চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া—(প্র ২৯)

ঝঞ্ঝা ও মঞ্জীর : ঝঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে (প্র ১১২)

মেঘ ও বন : ঘন ঘন রিমঝিম, রিমঝিম, রিমঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ,
শাল পিয়ালে তাল তমালে নিবিড় তিমিরময় পুঞ্জ।

নায়িকার কঙ্কণ ও শিখী : তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া (প্র ২৭)

নায়িকার অনুভবের ধ্বনি-চিত্র :

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি করো খেলা
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছল ভরে।
(প্রে ১২৩)

তারা ও কঙ্কন : তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী (প্র ৪)

বট ও বিচিত্র কাঁপন : ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট (প্র ১০৭)

মেঘ ও বর্ষণ ধ্বনি : মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম।

হাওয়ার ধ্বনি : আজি পূবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে (প্র ১৩৬)

শিশিরের ডাক : মালতীর বনে বনে ওই শোন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়—আয় আয় আয় (প্র ১৫৯)

রঙ্ ও ধ্বনি : প্রজাপতি রঙ্ ভাসালো নীলাম্বরে
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে (প্র ২৪০)

ভাষা-প্রতিমার প্রাণ-চাঞ্চল্য যে কতখানি এবং সে সূক্ষ্ম প্রাণসত্তা কতখানি ব্যাপ্ত ও গতিশীল—কবিগুরু তাঁর ধ্বনির শিল্পে তা ধ'রে দিয়েছেন কত সহজ ও অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টায়। প্রজাপতিদের পাখার বহু বৈচিত্রী রঙের রামধনু নীলাকাশে

ভাসমান; প্রজাপতিরা আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়—এই সহজ সরল নিসর্গচিত্রটিকে কবি সূক্ষ্ম আলংকারিক তাৎপর্যে অসামান্য বাক্-প্রতিমায় রূপায়িত করলেন—প্রজাপতি রঙ্ ভাসালো নীলাম্বরে। তেমনি মৌমাছিদের ধ্বনি ওড়ানোর চমৎকার বক্তব্যটি। প্রজাপতির পাখার রঙ্ এবং মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি—এই কারণ-কার্য-পরম্পরা ঠিক রেখেই তিনি রঙ্ ও ধ্বনিকে ভিন্ন তাৎপর্যে বোঝালেন। নীলাম্বরে রঙ্ ভাসানো এবং বাতাসে ধ্বনি ওড়ানো বক্তব্যগুলি ভাষণ-শিল্পের সিদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয় আমাদের। কবিগুরুর এই সিদ্ধির অজস্র পরাকাষ্ঠা ছড়িয়ে আছে তাঁর গানগুলোতে।

আকাশের ও ফাগুনের হতাশা:

আকাশের প্রাণ করে হু হু হায় (প্রে ২৫০)
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের সনে (প্র ১১৯)

বর্ষা ও ঝিল্লি: থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ
ঝিল্লি ঝনক ঝন নন, হে শ্রাবণ (প্র ১০৯)

ভ্রমরের ধ্বনি: ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণ গুণিয়ে (প্রে ৩২৬)

বকুল ঝরা: ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল (প্র ১১৯)

বাঁশির ধ্বনি: রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান (পূ ২০)
ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে (প্রে ১৭৫)

মহাকবি দান্তে ধ্বনি বিচার ক'রে শব্দের জাতি ভাগ করেছিলেন: দ্রুত-বিলম্বিত, কোমল-কঠিন, লঘু-গম্ভীর, মসৃণ-কর্কশ। ভাববাহী শব্দ-ধ্বনির চিত্রী-করণেও এই জাতি বা অবস্থার পর্যালোচনা করা সম্ভব। যেমন: 'ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট'—লঘু কোমল কিছু দ্রুত ধ্বনির ছবি। 'ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল' কম্পিত বিলম্বিত মসৃণ ধ্বনির ছবি। 'তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিংকিনি'—দ্রুত কঠিন কিঞ্চিৎ অমসৃণ ধ্বনির ছবি ইত্যাদি। অক্ষর ও ধ্বনি-চিত্র কেবলমাত্র শাব্দিক রূপনির্মিতি নয়। দেখা যাচ্ছে, শব্দাতিরেক ব্যঞ্জনা ও তার চিত্রীকরণ অর্থাৎ বস্তু ও ভাবগত উভয় বিষয়কে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। কেবল সাউণ্ড বা ধ্বনি সৃষ্টিতে কিছু সার্থকতা নেই, তার অর্থগত রসস্ফূরণ হওয়া চাই। শব্দ বা অক্ষর নির্ভরে ভাবের ও সুরের নিয়ন্ত্রনে ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপকল্প কত সাবলীল ও প্রসাদশ্রী হ'তে পারে তা উদ্ধৃতি-গুলি দেখে বোঝা যাবে।

পাঁচ

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্প

দৃশ্য বা রূপ চিত্র: দৃশ্যের রূপায়নিক কল্পনা সহস্র আধারে বিকশিত হয়েছে দেখা যাবে রবীন্দ্রসংগীতে। কেবল রবীন্দ্রসংগীতে নয়, রবীন্দ্রকাব্যের আষ্টেপৃষ্ঠে হাজার হাজার দৃশ্যময় বর্ণময় উজ্জ্বল চিত্রকল্প সংলগ্ন হ'য়ে আছে। সুগভীর ভাব-এর সঙ্গে ইমেজারিগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও সৌন্দর্য দেখলে অবাক হ'য়ে যাই। রঙ, রূপ, রেখা দিয়ে কবিগুরু তাঁর কাব্যে বিশ্বরূপের দৃশ্যপট সাজিয়ে গেছেন। বিশ্বচরাচর, প্রকৃতি ও মানব-জগতের বস্তুময় ও দৃশ্যময় (visual) লীলার রূপকে নিখুঁত শিল্পীর মতো বাণীর বর্ণে প্রতিমায়িত করেছেন। এই দৃশ্যরূপ চিত্রনির্মাণে আছে কবির অসীম সত্তাচেতনা, আবেগ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ; আছে দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-চেতনাবোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-শক্তির সক্রিয়তা ; আছে বিষয় ও বিষয়ীর নিঃশেষ বিমিশ্রণ। গ্রহ নক্ষত্র সূর্য তারা চাঁদ গিরি নদী বন ফুল প্রাণী পাখি নারী শিশু ইত্যাদি উপাদান ও দৃশ্য জগতের অন্যান্য উপাদান তাঁর রচনায় জীবন্তরূপে এবং অসীম তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত।

রেখা-রঙ্-দৃশ্য-রূপ-সীমা নিয়েই কবির মূর্তি-নির্মাণ প্রয়াস ; কিন্তু সীমাবদ্ধ চিত্রপট অলৌকিক রহস্য তুলিকা স্পর্শে সীমা ছাড়িয়ে হ'য়ে উঠেছে অনির্বচনীয় অদৃশ্য রূপলোক। এই রহস্য-মায়াপুরী রবীন্দ্রনাথের ঐন্দ্রজালিক শব্দ-যাদুতে অংকিত। দৃশ্যচিত্র কবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। কবিতায় তার প্রকাশ ও বিকাশ গুরুতর হ'তে পারে। কেননা, দৃশ্যচিত্র কবিতার বড় পরিসরের পটভূমি পায় ; পায় আবেগ ও রঙের স্বচ্ছন্দ বিলাস ; গানে তারা হয় ঘন-নিবদ্ধ, সূক্ষ্ম ও বিমিশ্র। গানে সংক্ষিপ্ত অথচ সূক্ষ্ম তাৎপর্যমাণ্ডিত হয় শব্দের রেখা-রঙে-নিবদ্ধ ইমেজারি। গীতবিতানের প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের প্রায় সবগুলো গানেই বিপুল সংখ্যক সার্থক চিত্রকল্প, দৃশ্যে দৃশ্যে সম্পূর্ণ। পুজার গানে ভাবের আবেগ (intensity) কবিকে তত্ত্বে নিয়ে গেছে প্রায়শঃই। তবুও আত্মমগ্ন শিল্পীর সামান্য রেখাতেই তারা হ'য়ে উঠেছে কখনো কখনো বিমোহন চিত্রশালা।

সূর্য তারা আকাশ দিগ্-দিগন্ত বন পুষ্প পথ নদী ঝড় পাখি ঋতুরূপ ইত্যাদি নিয়ে চিত্রকল্প দৃশ্য-চিত্রকল্প প্রসঙ্গটি সীমাহীন। কয়েকটি মূল্যবান বিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের দৃশ্য-রচনালীলার বিশিষ্টতা অনুধাবন করা যাচ্ছে। রঙ্ নিয়ে দৃশ্য রচনা করা চিত্র-শিল্পীর মৌল বৃত্তি অপেক্ষিত ; ভিসুয়াল

আর্ট অংকনে তাকে বাস্তবদৃশ্য ও কল্পনার সাহায্য নিতে হয় এবং ক্যানভাস ও বিবিধ উপকরণে তাঁর শিল্পচর্চা সহজসাধ্য হয়। অক্ষর, শব্দ ও ভাষা-উপকরণে কাগজের পাতায় রূপ-ভাব-রসের ছবি অংকন করার ব্যাপারটি অধিক গুরুতর। সেজন্যই চিত্রশিল্পীর সঙ্গে কবির তুলনা চলে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মিল পাওয়া গেলেও কবির স্থান অনেক উর্ধ্বে।

শ্রীনন্দলাল বসু বলছেন—"জার্মানিতে প্রস্তুত বিচিত্র রঙের জৌলুষদার কালি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয়।...তদুপরি রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি এমনই অভ্রান্ত আর এতবেশী পরিশীলিত যে, বর্ণ-সঙ্গতিতে তাঁর কোথাও কোন দুর্বলতা দেখা যায় না। বিভিন্ন পর্দায় দুটি ঘোর রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার করেছেন। গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢ়তর কালিমা।" ৯ অন্তঃপাতী রূপসন্ধানী কবি বাণীতে জগৎ নির্মাণ ক'রে মধ্যবয়স থেকে প্রাণস্পন্দিত ছন্দের বেগে হঠাৎ রঙের তুলি হাতে ক্যানভাসে নবতর রসের ব্যঞ্জনাকে চিত্রায়িত করলেন। "প্রায় ১০।১২ বছরের মধ্যেই (১৯৩৫।২৬ সাল থেকে ১৯৩৭।৩৮) যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত ৫০ বৎসরের বাংলা-দেশের সমস্ত নাম-করা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন তার চেয়ে বেশী।"[৪০]

ষাটবছর বয়সের পর 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়কর অঘটন-ঘটন ঘটিয়েছিল। রঙ্ দিয়ে হাজার হাজার বিচিত্র চিত্র তিনি এঁকেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর সৃজ্যমান কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনায় বাকৃপতি-রূপে অসীম ইচ্ছাকে চালনা ক'রে তিনি সৌন্দর্য-জগতের অফুরন্ত কথার ছবি এঁকে গেছেন। ছবি আঁকতে গিয়ে কবি নিজস্ব অভ্রান্ত রুচির মাধ্যমেই রঙের প্রয়োগ ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আর্ট-রীতির শিল্পগত প্রথানুসরণ তিনি করেন নি। তাঁর সাহিত্যে এই অভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতির সূক্ষ্ম ও অভিনব প্রয়োগ প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীত থেকে আমরা এই শব্দের প্রতিমা লক্ষ্য করবো। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রঙ লইয়া বসিলে চলে না। নানা রকমের মিশ্ররঙ্, সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন।"[৪১]

তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো :

"প্রকৃতির বর্ণিকাভঙ্গে সৃষ্টির রূপবৈচিত্র্য যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে এমন আর কিছুতেই নয়। সব জিনিষের রঙ্ এক হলে চার দিকের সেই এক রঙা

তুচ্ছতায় আমাদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, জীবনের কোন স্বাদই থাকতো না। আমাদের পরম ভাগ্যে প্রকৃতিতে আকাশ নীল এবং পৃথিবী সবুজ, সোনাঝুরি সোনালী এবং পলাশ লাল, হংসা শুক্লা এবং ময়ূরাশ্চিত্রিতাঃ। এই প্রকৃতিকেই তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় নতুন করে ধরেছেন—কাজেই সেখানে তাঁর সৃষ্টিতেও রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—আকাশে রঙের ঝড় উঠেছে। এবং তাঁর নিজের চিত্তও রঙের সেই ঐক্যতান উৎসবে মেতে উঠেছে, তাঁর হৃদয় শতবর্ণের ভাবোচ্ছ্বাসকে কলাপের মতোই বিকাশ করেছে।"[৪২] শ্যাম, সবুজ, লাল, সাদা ইত্যাদি আভিধানিক শব্দ রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। শব্দের শ্রেণীতে চিত্রধর্ম কত সহজ-প্রকাশ্য এবং ব্যঞ্জনাধর্মী তা উদ্ধৃতির সাহায্যে বোঝা যাবে। মনে হবে, কোনো রঙদারী বাউল সুরে সুরে রঙ্ ছড়িয়ে দিয়ে রঙ্ উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বিশ্বময়। "রাঙা হল বসনভূষণ রাঙা হল শয়ন-স্বপন। মন, হল কেমন দেখ্ রে, যেমন রাঙা কমল টলোমলো।" দৃষ্টান্ত:

শ্যামল, শ্যাম, নীল :

বেশে : পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ (প্র ৭৯)
আকাশে : নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে (প্র ৯৪)
কাজলে : সেজেছিস নয়ন-পাতে নীলিমার কাজল পরে (প্র ১০২)
মায়ায় : শ্যাম কান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টি জলে (প্র ১০৪)
সাগরে : সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে (প্র ৩৮)
মেঘে : নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর (প্র ৫৫)
আঁধারে : পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে (প্র ১০০)
দিগন্তে : পূব দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম লেখা (প্র ১২৫)
নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো (প্র ২৬২)
বনে : প্রিয়ার আঁচল দোলে, নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে (প্র ১২৪)
দেহে : শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ত্রস্ত এল (বি ৭৫)

লাল, রক্ত, রক্তিম :

নিঠুর তুমি তাকিয়ে ছিলে মৃত্যু-ক্ষুধার মতো তোমার রক্ত নয়ন মেলে (প্র ২০)

ফিরে রক্ত অলক্তক ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে (প্র ১০৪)

ওরে পলাশ, রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলাস
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলো রঙিন তানে (প্র ২০৫)

হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি, স্বপ্ন ভাঙার রক্ত ছবি (প্র ২৩০)

রক্ত রঙে জাগল প্রলাপ অশোক গাছে (প্র ২৪০)

দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে

রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই (প্রে ২৬)

দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম আসন, সে তোমারে কিছু বলে

(প্রে ৪৮)

সে তখন স্বপ্ন কায়া বিহীন, নিশীথতিমিরে বিলীন—

দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা (প্রে-প্র ১৯)

স্বর্ণ, সোনা, সোনালী :

রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে (প্র ১৭৯)

মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করবো বিলীন (প্রে ১৯)

নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে (প্র ২০৫)

হৃদ্-গগনে সোনার মেঘের মেলা (প্রে ১৪৬)

এমন উষা আসবে আবার সোনার রঙিন দিগন্তে (প্রে ১৬৬)

সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী (প্রে ২২২)

ঐ দেখ গোধূলির ক্ষীণ আলোতে, দিনের শেষে সোনা ডোবে

কালোতে (প্রে ৩৪৬)

লুটিয়ে হিরণ-কিরণ পদ্মদলে সোনার রেণু লুটেছি (প্র ১৪৯)

সাদা, শ্বেত, ধবল, রূপালী :

নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা (প্র ১৪৩)

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া (প্র ১৪৫)

আহা শ্বেত-চন্দন তিলকে আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে (প্র ১৫০)

শ্যামল পাতার থরে থরে আখর রূপালি (প্র ১৬০)

সন্ধ্যা, আঁধার, কালো, ছায়া :

সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে দেয় কি দেখা প্রদীপ রাজি (বি ৭৩)

সিন্ধুপারের হাসিটি কার আঁধার বেয়ে আসছে আজি (ঐ)

কালো আভার কাঁপন দেখো তাল বনের ঐ গাছে গাছে (প্র ৬০)

নামিল শ্রাবণ-সন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে (প্র ১২৮)

অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা (প্র ১৩৪)

দীঘির কালো জলের পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে (প্র ৬৬)

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে (প্র ১২৬)

আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, হায় (প্র ১২৪)

তোমার দুখানি কালো আঁখি পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যুথীর মালা (প্রে ৩৯)

মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ
(বি ৭৫)

এমনি করে কালো কাজল মেঘ/এমনি করে কালো কোমল ছায়া
(বি ৭৫)

হলুদ, পীত, বসন্তী :

পূব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমা লেখা,
পীত ধড়াটিতে অরুণ রেখা (প্র ১২৫)

ঝরা পাতা গো বসন্তী রঙ দিয়ে,
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ (প্র ২৮৩)

একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া
(প্রে ৬৯)

সবুজ :

সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জালিস্ দীপালি (প্র ১৬০)

তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে (প্র ১৬৭)

ধূসরিমা, ধূমল :

হিমের ঘন ঘোমটা খানি ধূমল রঙে আঁকা (প্র ১৭২)

এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ (পূ ৬০৪)

রঙের মিশ্রণ :

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া (পূ ৫২৫)

সবুজ নীলে সোনায় মিলে যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে গভীর বাণী (পূ ২৬২)

নীলিম, নীলিমা :

আজি দিগন্ত সীমা/বৃষ্টি আড়ালে হারালো নীলিমা (প্রে ১১১)

পূব দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিম লেখা (প্র ১২৫)

গোপনস্বপনে ছাইল অপরশ আঁচলের নবনীলিমা (প্র ১২৩)

'রঙে রঙে রাঙা হল'। বিশ্ব চরাচর, নিসর্গপ্রকৃতি, মানবজগৎ এবং মানুষের চিত্ত চেতনা ভাব সর্বত্র, সর্বব্যাপ্ত এই রঙের লীলা। রঙের নেশায় মাতোয়ারা হলো কবিচিত্ত।

এই রঙ-অনুষঙ্গে নিবিড় নিবিষ্টতায় কবির কলম এঁকে চলল—

মেঘ রঙে রঙে বোনা আজ রবির রঙে সোনা
আজ আলোর রঙ যে বাজলো পাখির রবে।
আজ রঙ সাগরে তুফান ওঠে মেতে
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের খেতে,
সেই রাতের স্বপন ভাঙা আমার হৃদয় হোক না রাঙা
তোমার রঙেরই গৌরবে।

বিশ্বপ্লাবী রঙের অভিব্যঞ্জনা বাকৃরূপের নির্ভরে উদ্ভাসিত। অতঃপর কবির আকাঙ্ক্ষা:

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে,
ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙিন উত্তরীয় পরো পরো পরো তবে
(প্রে ১৩২)

রূপশৈলী কবির কলম বর্ণাঢ্য বিমিশ্র উপাদানে ভরিয়েছে তাঁর সাহিত্যের ক্যানভাস। মূর্ত-বিমূর্তের রঙ্‌লীলা, ঐন্দ্রজালিক রূপরেখা, ভাবের সাতরঙ্-দিগন্তিকা:

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙে রঙ করা (প্রে ২৪৫)
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল (প্র ১৯৭)

কিংবা ওরে পলাশ ওরে পলাশ
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলাস—
আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলো রঙিন তানে (প্র ২০৫)

কিংবা মাধবীর মধুময় মন্ত্র, রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত (প্র ২৪৫)

এবং বিশ্বপ্রকৃতি স্বাভাবিক লীলায় 'রঙের ঝরণা হয়ে ঝরো ঝরো ঝরছে' (প্র ২৫৮) যখন, ফাগুন হাওয়ায় ও গোলাপ-জবা-পারুল-পলাশ-পারিজাতের বুকে রঙের পাগল-ঝোরা ঝরছে (প্র ২৮২) যখন, তখন কবির চরম কোনো সিদ্ধান্ত এভাবে কল্পিত হতে বাধ্য:

সেইখানে মোর পরাণখানি যখন পারি বহে আনি,
নিলাজ রাঙা পাগল রঙে রাঙিয়ে নিতে থরে থরে।
বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ায় উতল পথের চিহ্ন ধরে
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরবো তোমায় কেমন করে
কোন আড়ালে লুকিয়ে রবে তোমায় যদি না পাই তবে,
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে। (প্র ২৮২)

কবির রূপমনন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ভাবে ও রসের সীমানায় এসে পৌচচ্ছে; এ তো শুধু রঙ দিয়ে চিত্রপট রচনা নয়, এ রঙের ধ্বনি দিয়ে ভাবের রূপ গড়ে তোলা; পটভূমিকা হলো কবি ও পাঠকের কিংবা শ্রোতার মন। সেখানে উভয়ত্র গড়ে উঠছে বিমোহন শব্দের চিত্রশালা—ধ্বনির শিল্প।

উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে নাই বা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি (প্রে ১১২)

কিংবা অতীতমুখী কম্পিত কল্পনা ছবি হয় কবি ও রসজ্ঞের মনে।—

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈল শিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে (প্র ৭১)

রঙে আল্পনায় ছায়ায় মায়ায় আলোয় ভাবের রেখাঙ্কন, এমন বৈভবে, প্রসাদে ও সৌন্দর্যে ভ'রে গেছে গানগুলো। 'চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায় ভাবনার প্রাঙ্গনে (প্রে ২২৮), কিংবা 'অন্তরে কালোছায়া পড়ে আঁকা বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা (প্র ২৩৪), কিংবা প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপ—'জটার গভীরে লুকালে রবিরে ছায়া-পটে আঁকো এ কোন ছবি রে (প্র ৯১), কিংবা প্রকৃতির জীবন্ত দেহের বসন ভূষণ আঁকা ছবি, রূপক উপমা উৎপ্রেক্ষায়। অঞ্চল, আঁচল, উত্তরী প্রভৃতি বায়ুভরে আন্দোলিত অসামান্য দৃশ্যপট:

হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা
হিমের ঘন ঘোমটা খানি ধুমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যা প্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা। (প্র ১৭২)

'সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো (প্র ৯১), 'হাওয়ায় কাঁপে অঞ্চল' (প্র ১৫১), কিংবা বিভিন্ন রঙের উত্তরী 'ওড়ে গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো (প্র ২০৮), আর 'বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসন প্রান্ত' (প্র ২০১), এবং কার আসার সংবাদ এসে গেছে অধীর পবনে উত্তরীয়ের আন্দোলনে মালতীর চঞ্চলতায়, আর তখনই 'কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকে আঁচলে' (প্রে ৫২)। অনেক অনেক আশ্চর্য ছবি।

আরো আশ্চর্যের কথা, কবি তাঁর নিরালম্ব ভাব ও অপ্রত্যক্ষ উপাদানে কম্পোজিশন করলেন 'কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপায় মেশা'। কিংবা সুরে সুরে রঙে রসে জাল বোনায় কবি ব্যস্ত হলেন—আর এদিকে 'যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে' সে ও কবির' চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি' আঁকতে লেগে যায়। কে কার ছবি আঁকবে। আশ্চর্য ছবি!

'প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাসপরে (প্র ২৪০)

রঙ কি ভাসে ? প্রজাপতিরা রঙের বর্ণালী হ'য়ে আকাশে ভাসছে। অদ্ভুত ছবি। ধ্বনিকে কি ওড়ানো যায় ? বাতাসের স্রোতে ধ্বনিকে কি ভাসতে দেখা যায় ? এ ছবি এত প্রত্যক্ষ যে ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়াতীত ছবি, কেবলই ছবি। একজন ভাবুক ও রসজ্ঞ গানে সুরে ভাষায় ছবিতে পেতে পারে এমন এক একটি পরিপূর্ণ রূপ ও রসের প্রতিমা, এক একটি বর্ণোজ্জ্বল রবীন্দ্র সংগীত।

প্রকৃতির বহিরঙ্গ প্রতিটি উপাদান কবির গানে অসামান্য রূপবৈভবে প্রোজ্জ্বল হয়েছে ব'লে তারা কবিতার সকল উপাদানগত মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। রূপ-নির্মান-ব্যাপারটি ভাব-রসের উদ্বোধন ঘটায় পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের হৃদয়ে-মনে। রবীন্দ্র-সংগীতের কবিতার পাঠ্যগুণ যদি পরিপূর্ণ মূল্য পায়, তাহলে সুগায়কের কণ্ঠে গীত হওয়ার সময় সুর-সহ এদের কাব্যাবেদন কতখানি চরমে যেতে পারে, গভীরভাবে ভাবতে হবে। একে উপলব্ধির সাধনা বলা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত-কলা এবং যাঁহারা উহা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা।'

চিত্রকল্প একই সঙ্গে 'ধ্বনির শিল্প' হয়েও সজীব, তীব্র ও উত্তেজক (লুইস কথিত তিন লক্ষণ) হ'য়ে উঠতে পারে। একটি আশ্চর্য রবীন্দ্রসংগীত দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করছি। বর্ষা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রাজকীয় বর্ণাঢ্য বর্ণনা—

পুব সাগরের পার হতে কোন এলো পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু
ডমরু রব হয়েছে আজ স্বরু।
তাই শুনে আজ গগন তলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উল্লাসী। (প্র ৬৮)

ঝঞ্ঝার তীব্র বাতাস, হাওয়ার ধ্বনি, স্রোতের কল্লোল, দিগন্তে মেঘগর্জন, মেঘের তীব্র বেগে ছুটে-চলা—এসব স্বাভাবিক নিসর্গচিত্র। কিন্তু তুলনা-করণ হয়েছে যে উপাদানগুলির সঙ্গে সে যে কতখানি গুরুতর, ভেবে বিস্মিত হ'য়ে যাই। ঝড় যেন পুব সাগরের প্রবাসী, হাওয়ার ধ্বনি যেন সাপ খেলাবার বাঁশি, মেঘের ধ্বনি যেন ডমরু রব, চকিত বিদ্যুৎ-লেখাগুলি ক্ষিপ্ত নাগনাগিনীর ছুটে চলা। সমস্ত বর্ষা প্রকৃতি হ'য়ে উঠেছে সাপুড়ে ও সাপ-খেলানোর ভয়ানক অদ্ভুত রসের পটভূমি। এমন অনেক আশ্চর্য জীবন্ত রবীন্দ্রসংগীত দেখতে পাবো আমরা। বিভাব অনুভাব ব্যাভীচারী সংযোগে আমাদের মনে নানা রসের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে দিয়ে অলৌকিক আনন্দের জগতে পৌঁছে দেয় আমাদের।

নৈসর্গিক বর্ণাঢ্য রূপময় ছবিতে আঁকা হয়েছে সূর্য চন্দ্র তারা দিগন্ত মেঘ বাদল ঝড় গোধূলি রাত্রি বন ফুল পাখি ইত্যাদি। চিত্রকল্পবাদী এজরা পাউণ্ড কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কাব্য-জীবনের চরমতম এক একটি সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা এক একটি সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টির মাধ্যমেই বিবেচিত হ'তে পারে। বিপুল রবীন্দ্ররচনায় তেমন কোটি কোটি সার্থকতার ও সিদ্ধির পরিচয় চিহ্নিত হ'য়ে আছে। চিত্রকল্পের তাত্ত্বিক ও রীতি-সম্মত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এজরা পাউণ্ড 'a precise concrete experience'-এর সঙ্গে আরও অনেক বেশী কিছু সম্ভাবনা ও তাৎপর্য নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই শিল্পতত্ত্ব ও জটিল চিত্র-তত্ত্বের তাৎপর্য ও পার্থক্য বুঝে নিতে পেরেছিলেন। তিনি একস্থানে বলেছেন—"কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত। ভাব হইতে ভাবান্তরে তাহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর-

সঙ্গম পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কবি কেবলমাত্র স্থির আকৃতি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না। গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।" চিত্রকরের ছবি ও কবির চিত্রকল্পের মূলে আছে ইমাজিনেশন্। ক্রোচে বলেন—কল্পনার চক্ষু আছে, চর্ম চক্ষুর যা নেই। প্রকাশেই কবিত্ব। গভীর ভাব বাক্-প্রতিমায় প্রকাশিত হবে Communication হিসেবে কেবল নয়, communion হিসেবে। এজরা পাউণ্ডও এই মতের পরিপোষক। তাঁর মতে চিত্রকল্প কেবল বাহ্য আলেখ্য নয়, বৌদ্ধিক ও আবেগাত্মক উদ্ভাসন এবং ভাবের সর্বাত্মক সংহত প্রকাশ।[৪৪]

চিত্রশিল্পীর রঙ-রূপায়ন ভাব ও কল্পনার সীমায় যতদূর যায়, কবির কল্পনার শব্দচিত্র বা রস-সংস্কারের রূপায়ন যায় তারও অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোতে ভাবের চরম রূপ দিতে গিয়ে ভাষা-প্রকরণে যে কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন তাতে তাঁর সিদ্ধি সর্বশেষ বিন্দুতে উন্নীত হয়েছে।

ছয়

তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্প

ইন্দ্রিয়বেদী ও রসের চিত্র ভাষণ-শিল্পের সীমা ছাড়িয়ে বার বার তত্ত্বের গভীরে নিয়ে যায়। যদিও বাক্শিল্পেই চিত্রকল্পের অবলম্বন, তথাপি বাচ্যাতীত ও ভাষার অতীত সৌন্দর্যই সবেগে সংলগ্ন হয় একত্রে। এ অর্ধনারীশ্বর মিলনের সংবাদ রবীন্দ্রসংগীতের সর্বত্র প্রচারিত। এভাবেই বিপুল বিস্তারী রবীন্দ্র-বাক্প্রতিমার সম্মুখীন হ'তে হয় আমাদের। এখানে ভাষা-প্রকরণ ও সাফল্যের পরিমাণ বুঝবার জন্য দিনান্ত প্রকৃতির কয়েকটি চিত্রকল্প নিয়ে তুলনা-মূলক আলোচনা করেছি। লুইসের নির্দ্ধারিত তিন লক্ষণ—সজীবতা, তীব্রতা উত্তেজকতা এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে তীব্রতা (ইনটেন্সিটি) লক্ষণটিকে লুইস বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৪৫] প্রতীকবাদী কবি ইয়েটস্ আবেগ-উত্তেজক ও ভাব-উত্তেজক এই দুই প্রকার প্রতীক বা সিম্বলের উল্লেখ করেছেন। তিনি আবেগ অপেক্ষা বৌদ্ধিক বা আইডিয়ার পদ্ধতির প্রধান সমর্থক ছিলেন। সেজন্যই বোধকরি তাঁর প্রতীকগুলো বুদ্ধির মূল ধ'রে নাড়া দেয়। প্রতীকের সূক্ষ্মতা ও ভাষণ-চিত্রকল্পে আইডিয়াকে সৃষ্টি

করতে তিনি অযথা অলংকার-বাহুল্য ও দুর্বোধ্যতা বর্জন করেছিলেন। কবি মালার্মের রচনারীতির বিমিশ্র লক্ষণ, সুরঝংকার ও প্রতীকীচিত্রণ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও প্রতীক-সৃষ্টিতে তাঁর ভাব ও ভাষার সংযম ও সারল্য লক্ষ্য করবার মতো। জীবনের গভীর সমুদ্রের রত্ন-সন্ধানী ছিলেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও। উপলব্ধির অতলান্ত নিবিড়তা ও রম্যতা তাঁর রচনায় পরিস্ফুট, যা আমাদের আবেগ ও আইডিয়াকে একই সঙ্গে আন্দোলিত করে। প্রতীক ও চিত্রকল্প রচনায় কবি রবীন্দ্রনাথের পর্যাপ্ত স্বাতন্ত্র্য আছে। ভাষণ-শিল্পের একান্ত সরলীকরণও যেমন আছে, তেমনি আছে গম্ভীর বৈদগ্ধ্যভঙ্গি ও তেজোদ্দীপ্ততা। ভাষা-প্রকরণে একই সঙ্গে ভাবাবেগ ও বৌদ্ধিক মননের সংঘট্ট—এই ক্ষমতাই তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপমা রূপক প্রতীক চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে কিংবা তুলনা করতে গিয়ে প্রথাগত কিংবা নব্য রীতিনীতির মানদণ্ড হাজির করা-কে হাস্যকর বাহাদুরী ব'লে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বহিরাগত কোনো প্রভাবের খবর নেই। তবে লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে কবির রচনার সঙ্গে কারও রচনার মিল-গরমিল দেখাটা অসঙ্গত কাজ নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সঙ্গে সুগভীর রসজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞতার সংযোগ না ঘটলে কোনো শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতিভা ও কৃতির বিচার যথার্থ হয় না।

লুইস কথিত সজীবতা ও তীব্রতা রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করলেও কবির প্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধির প্রকাশনায় উত্তেজকতা সংক্রামিত হয় নি। অন্ততঃ আপতিক পরিভাষা-গত উত্তেজকতার বোধও আমরা রবীন্দ্ররচনায় অকাম্য মনে করি। একটা উদাহরণ নিলেই কথাটি বোধগম্য হতে পারে।

দৃষ্টান্ত : ওলো শেফালি ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি,
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতার থরে থকে আখর রূপালি।
তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে। (প্র ১৬০)

এখানে ইন্দ্রিয়বেদী অসামান্য শব্দকল্পে চারিত্রিক সংযম ও সৌকুমার্য্য কতখানি সঞ্চারিত, তার সন্ধান না করেও আমরা চিত্রকল্প ও উপমায়, সজীব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আত্মহারা হই। স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির

ক্রিয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার ব্যাপার নেই। অথচ 'বিবশ বাতাসের' সঙ্গে আমাদের উৎফুল্ল আত্মার সংঘট্ট হয়েছে অতি সহজে। রূপে রূপে রূপোত্তমা শেফালির সুরম্য অঙ্গ থেকে বিচ্যুত অঞ্চলে মুগ্ধ মধু গন্ধের সংযোগ থাকবেই। এই বাস্তব রূপকল্পনা ও বাহ্যেন্দ্রিয়বেদী প্রতিমায়ন যতটা মনকে উদ্দীপিত করে, তার থেকে বেশি করে পরবর্তী সংবাদে। তা হ'লো, বুকের খসা গন্ধ-আঁচল গোপন কাননবীথির বাতাসের স্তরে স্তরে পাতা হ'য়েছে এবং বাতাসটি সেজন্যও বোধ করি বিবশ। বাহ্য ইন্দ্রিয় ও রূপকল্পনা তাৎক্ষণিক রূপান্তরে হ'য়ে উঠেছে রূপাতীত ('তারার বাণী'), অদৃশ্য ('গোপন কাননবীথি') ও অনুভববেদ্য ('বিবশ বাতাসে')। আমার তো মনে হয়, বিশাল বঙ্গ-সাহিত্যে গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে ইত্যাদি জাতীয় শব্দসৃষ্টি ও সুকুমার চিত্ররচনা রবীন্দ্ররচনা ছাড়া অন্যত্র দৃষ্ট হবে না। বস্তুত রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীতে এভাবে শব্দ-বৈভবের সীমাহীন সমারোহ কেবলই বিস্মিত করে আমাদের।

বিস্ময়কর আরও কিছু দৃষ্টান্ত: বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে (প্রে ৪৮), নয়ন হানে আকাশপানে—চাঁদের হিয়া গলে গেল প্রে ২৯৫), বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলো ছলো (প্রে ৫০), কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে (প্রে ৫২), চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও (প্রে ৩৬৪), নয়নকোণে হেসেছিল সে (প্রে ৩৬৭), যার চোখের ঐ আভাস দোলে নদী ঢেউ-এর কোলে কোলে (প্র ১৯৩), দোদুল তমালেরই বনছায়া তোমারই নীলবাসে নিল কায়া (প্র ৩৪), প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে। মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে (প্র ২৪০)।

অজস্র অপরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়—যেখানে তন্ময় ও মন্ময় কবিসত্তার সর্ববিধ প্রতিক্রিয়াগুলি সূক্ষ্ম ও অতি-সূক্ষ্ম বাক্-প্রতিমায়নে বা চিত্রকল্পে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চাঁদের হিয়ার গলে যাওয়া, বাতাসে ব্যথা পেতে দেওয়া, নদীর ঢেউতে চোখের আভাস দুলে যাওয়া, নয়ন-কোণে হেসে যাওয়া ইত্যাদি সূক্ষ্ম ও অভিনব ব্যাপারগুলির বুদ্ধি ও বিশ্বাসসম্মত কথন-রীতি বাংলাসাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন কেবল রবীন্দ্রনাথই। অতি সহজেই সে-সব অবাক-করা বাক্‌রীতি ধরা পড়ে গেছে তাঁর সংগীতগুলোতে। বাস্তবিকই এ সব রচনার কোনো তুলনা আমার জানা নেই।

চিত্রকল্পের আন্তর্জাতিক কিংবা বৈদেশিক প্রভাব ও গুরুত্ব নিয়ে নব্য কবিরা বহু চিন্তায় আচ্ছন্ন। চিত্রকল্পের প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও শোনা যায়। অথচ কবিগুরুর এই সহজ-সাধারণ পদ্ধতির অসাধারণ গুরুতর চিত্রকল্প-রীতির প্রভাব বর্তেছে ক'জন যোগ্য উত্তরাধিকারীর উপর? ক'জন পেরেছেন রবীন্দ্র-প্রবর্তিত তীক্ষ্ণ-শায়ক-সন্ধানী মর্মভেদী অপরূপ বিমোহন কাব্য ও গদ্যভাষা কিংবা 'কড়া লাইনের খাড়া লাইনের তীরের মতো বর্ষার ফলার মতো কাঁটার মতো বিদ্যুৎ রেখার মতো' গদ্যরীতির যোগ্য অনুসঙ্গী ও অনুসন্ধিৎসু হতে? বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যুগবাহী গতি ও বিকাশের সফল ধারা অতলান্ত রবীন্দ্র-প্রতিভা-সাগরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত হ'য়ে যে অসামান্য প্রকর্ষ ও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রে চলেছে—সেই প্রোজ্জ্বল বিশ্ববন্দিত ভাষাশিল্পের সাধনামগ্ন কোথায় সেই যোগ্য প্রজন্ম?

সাত :

একটি প্রসঙ্গ :

দিনান্ত গোধূলির বিষণ্ণতা : প্রত্যয় ও প্রতিমা

আমরা কেবলই দেখতে পাই, রবীন্দ্রসংগীতে কবির উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের চরমতম তীব্রতা ও গাঢ়ত্ব বাণীর চিত্ররূপে ধরা পড়েছে। অসামান্য চিত্রকল্পের সমারোহ একটি গানে :

কেন আমায় পাগল করে যাস্ ওরে চলে যাওয়ার দল
আকাশে বয় বাতাস উদাস পরাণ টলোমল।
প্রভাত তারা দিশাহারা শরৎ মেঘের ক্ষণিক ধারা
সভা ভাঙ্গার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল।
নাগ-কেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা
গোধূলি সে রক্ত আলোয় জ্বালে আপন চিতা।
শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতা, আমলকী বন মরণ মাতা
বিদায় বাঁশির সুরে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্চল। (প্রেম ১৭৩)

সন্ধ্যার পরিবেশ রচনার নৈসর্গিক উপাদানগুলো মানবিক চেতনার সঙ্গে আবেগঘনতা প্রাপ্ত হয়েছে, এবং হয়েছে অসামান্য নস্টালজিয়ার ছবি। প্রধান প্রধান উপমান উপমেয় ইত্যাদিতে তুলনা-করণ: ধূলি-ঝরা নাগ-কেশর,

গোধূলি, শেষ দিগন্তের গোধূলি রঙ্ ও চিতার রঙ্। আত্যন্তিক বিদায় বিষণ্নতা প্রকাশ করতে কবি সমধর্মী অনেক উপাদানসহ সূর্যাস্তকে পরিচ্ছন্ন, নিবিড় ও উত্তেজক রঙে মিশ্রণ ক'রে যেভাবে এঁকেছেন, তার কম্পোজিশন বহু-বিচিত্র ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পর্যাপ্ত রূপকল্পকে সংলগ্ন করা কঠিন ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। অথচ এখানে তা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

দিনান্তের আর একটি চিত্র :

আমার গোধূলি লগন এলো বুঝি কাছে গোধূলি লগন রে
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে।
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া নদীর উপরে পড়ে এলো হাওয়া
ওপারের তীর ভাঙা মন্দির আঁধারে মগন রে। (পৃ ১৪১)

বস্তুময় নিসর্গের উপরে অতীন্দ্রিয় বিমূর্ত বর্ণালেপ 'বিবাহের রঙ'। দিন-শেষের সমাপন অবস্থাটি এখানে দার্শনিক তাৎপর্যে জীবন-নায়িকার প্রেয় ও শ্রেয়োবোধকে ব্যঞ্জিত করে দিয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক ভাব-লোককে রূপলোকে ধ'রে নেওয়া হলো। মাঝখানে আছে সুর ; বাণী ও ভাবের উপযোগী সুরের তান। এই অসামান্য প্রতিভা গদ্যেও কিভাবে সুর-ধ্বনি ও ধ্বনির শিল্প সৃষ্টি করেছে, একটি দিনান্ত প্রসঙ্গ নিয়ে বোঝা যেতে পারে। উদাহরণ :

"কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে, কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান-নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহ বেশে কে সাজিয়ে দিলে? কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।" (ছিন্ন পত্র নং ১৫২ নাগরনদীর ঘাট)

সরল করুণ বিপ্রলম্ভের মাধুর্যে ভরে গেছে এই অসামান্য রচনা, আর নিসর্গ রূপের (সন্ধ্যা) মহিমান্বিত নারীত্ব-আরোপ। সোনালী সন্ধ্যা ও সোনার

চেলিপরা বধূ মূর্ত ও বিমূর্তের সমবায়ের বাক্‌প্রতিমা। উলম্যান স্টিফেন-এর কথায় "Every image is ultimately based on some kind of association between two terms."[৪৬]

সাদৃশ্য-মূলক অলংকারের উপমেয় উপমানের বিষয় ও ভাবগত সমবায়ে হয় 'চিত্রভূমিকা-ভেদ'। উপমান উপমেয় লক্ষ্য ক'রে উদ্ধৃত গদ্য ও সংগীতটির রূপকল্প ও চিত্রভূমিকা নিম্নরূপ লেখা যায় :—

গদ্যে : রূপকল্পের সমবায় (মূর্ত+বিমূর্ত) ধূসর পৃথিবী, নীল আকাশ, অসীম সন্ধ্যা।

মিশ্ররূপঃ (কম্পোজিশন)—সোনার চেলি পরা বধূ, সোনালী সন্ধ্যা।

সংগীতে : রূপকল্পের সমবায়।

বিমূর্ত : চিতার রঙ্‌, গোধূলির রঙ্‌, বীণার তান, বাঁশির সুর, দিগঞ্চল, মরণ মাতন,

মূর্ত : চলে যাওয়ার দল (পথিক), প্রভাত তারা, শরৎ মেঘ, নাগ কেশর, আমলকি বন, শীতের হাওয়া,

কম্পোজিশন : গোধূলির রঙ, ধূলি ঝরা নাগ কেশর, চিতার রঙ, বিদায় বাঁশির সুর, শেষ বীণার তান, ঝরাপাতা, মরণ মাতন।

প্রাসঙ্গিকক্রমে এলিয়টের একটি চিত্রকল্পের ভূমিকা ও তাৎপর্য অনুধাবন করছি। এলিয়টের প্রুফ্রকের প্রেমগীতির বহুশ্রুত একটি ইমেজারিতেও এভাবে দিনান্তের সূর্যাস্ত বিবৃত হয়েছে। বিষণ্ণ নিসর্গ-ছবির সঙ্গে মিশে আছে বীভৎসতা ও জুগুপ্সার রস। যেমন :

Let us go then you and I
When the evening is speard out against the sky
Like a patient etherised upon a table.

(Love song of J. Alfred Prufrock).

অপারেশান-টেবিলে ইথার প্রযুক্ত শায়িত রোগীর মতো দিনান্তের আকাশে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামলো। এই ছবিটি অত্যাশ্চর্য বৌদ্ধিক চেতনা-সমৃদ্ধ। উপলব্ধিরও গাম্ভীর্য আছে। পাঠক যন্ত্রনার সংগে চোখ বা মন দিয়ে দেখতে পেল নিসর্গ ও মানবসত্তার বিমিশ্ররূপ। কিন্তু এ ছবিতে মাধুর্য, প্রসাদ ও আনন্দের সঞ্চার নেই। বুদ্ধিকে নাড়া দেয়, হৃদয়ে আকুলতা জাগায় না। কঠিন কর্কশ বাস্তবকে উপস্থাপিত করে, সৌন্দর্যের রম্যতা এনে দেয় না। অথচ

রবীন্দ্রনাথের সোনার চেলী পরা বধূর ভাবানুষঙ্গ আমাদের ভাবায়, কাঁদায়ও ঘটে।

বাংলা কাব্যের রূপশৈলী কবিগণ দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিগুরুর মতো এত বিষয়ের ও ভাবের গভীরে যেতে পারেন নি। তাঁদের কাব্যের ছবিতে এসেছে সহজ বর্ণবিলাস, ইন্দ্রিয়-ভোগস্পৃহার তরল দীপ্তি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাংশ—"মেঘের কোণায় রঙ লেগেছে আলতা পাটি শিম" কথায় প্রভাত বা সন্ধ্যার রূপ পাওয়া যায়। রূপের চকিত উজ্জ্বলতা মেলে তাঁর বহুপদ পংক্তিতে, কিন্তু ভাবের গভীরতা আনে না। সেই ভাষণ-শিল্পের বৈদগ্ধ্যে ও বর্ণবিলাসে জীবনের সংস্পর্শ লাগে নি।

রবীন্দ্রসংগীতটিতে ('কেন আমায় পাগল করে যাস') নিসর্গের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে, শরৎ মেঘে হারিয়ে যাওয়া, শুকতারা, উদাস বাতাস, তারপর পাতা ঝরানোর শীত এলো, আমলকি বন মরবে, এমন সময়ে নাগকেশর ধূলোয় ঝরবে এবং দিগন্তের আকাশে মৃত্যুর মতো সন্ধ্যা নামবে। সূচনা ও শেষ, জীবন ও মৃত্যুর এই অভিব্যঞ্জনা বাক্-প্রকরণে ফুটে উঠেছে। গোধূলির রঙ, চিতার রঙ, সভা ভাঙ্গার শেষ তান ও বিদায় বাঁশীর সুর এই অনুষঙ্গগুলো শ্রোতা ও পাঠকের সামগ্রিক ইন্দ্রিয়চেতনাকে (দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্পর্শ মন প্রভৃতি) উদ্বোধিত করলো। ছবি, সুর ও কথা একই সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যে চিত্রকল্প রচনা করেছে, আমরা তাকে বলতে পারি সংগীতময় চিত্রকল্প। বোধ-করি, রবীন্দ্রনাথই কেবল পেরেছেন চিত্রকল্পের মনন-প্রখরতার সঙ্গে হার্দ্যিক মাধুর্য সম্পৃক্ত করতে।

আধুনিক বাংলাকাব্যের কথাস্থপতি জীবনানন্দ দাশ সুররিয়ালিষ্ট কবিদের মতো অতীন্দ্রিয় আলোছায়াময় মগ্ন-চৈতন্যের গভীরে ডুব দিলেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক বাংলা-কাব্যে জীবনানন্দই শ্রেষ্ঠ ভাষা-রূপকার। অসীম রূপোল্লাস ও অনুভূতির ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতায়। দিনান্তের একটি সম্পূর্ণ ছবি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করছি।

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল,
পৃথিবীর সব রঙ্ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন,
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল,

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী, ফুরোয় এ জীবনের সব লেনদেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

বাণী-বৈদগ্ধ্য ও ভাষানুষঙ্গে জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা উপভোগ্য ও উপলব্ধিগম্য। সরল ঋজু ভাষার মধ্যে ধ্বনির অন্তরঙ্গ স্পর্শ লেগে আছে ব'লে আমাদের চেতনা ও অন্তরকে নাড়া দিয়ে যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বৌদ্ধিক চেতনার রূপায়ণে কবিতা বাঁধলেন। বিষ্ণু দে কবিতায় আনলেন সুরধর্ম। বিষ্ণু দে সুর-ধর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করতে রচনার মধ্যে গীতানুষঙ্গগুলোকে (কোমল গান্ধার সিম্ফনি সোনেটা মালকোষ প্রভৃতি শব্দ) প্রয়োগ করলেন। যেমন :

সূর্যাস্তের দীপ্তিতে রঙিন
আমাকেও করে দিলে বাসনার আশ্চর্য সিম্ফনি (উর্বশী ও আর্টেমিস)

একটি বিষয়ক্রম অনুসরণ ক'রে এখানে শ্রেষ্ঠ রচনাংশ উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। গভীরভাবে অনুধাবন করলে রবীন্দ্রসৃষ্ট রচনায় চিত্রকল্প বা প্রতীকের বাহ্যরূপ ও তাৎপর্য অন্যান্যদের রচনাগুলি থেকে যথেষ্ট পৃথক ব'লে প্রতিভাত হবে। অন্যান্যদের রচনায় বাগবৈদগ্ধ্য, চকিত উজ্জ্বলতা, মোহমাদকতা রোমান্টিকতা ইত্যাদি পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে দেখা যায়। কিন্তু রচনার সমস্ত প্রকরণ-কৌশলের সঙ্গে স্পষ্টীকৃত সুরধর্ম আমাদের স্পর্শ করে না। রসের দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। এসব কবিতা ও গদ্যে আছে একরকম রসাভাস। অন্ততঃ রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে সহজে একথা মনে করা যায়। কবিতায় বিভিন্ন ভাবের রসনিষ্পত্তি সম্ভব, কিন্তু গানে বীভৎস, অদ্ভুত কিংবা ভয়ানক রস চলে না ; চলা উচিতও নয়। ছিন্নপত্রের এই গদ্যে যদি পুরবীর সুর বসানো যায়, তবে তা ততখানি অসঙ্গত হবে না ; কেননা উদ্ধৃত রচনাংশটিতে ভাবরূপের সঙ্গে সুরধর্মের প্রচণ্ড সম্পর্ক আছে এবং ভাষায় অঙ্কিত সন্ধ্যা বধূর বিভিন্ন উদ্দীপক ছবি পাঠক মনে অনিবার্য আবেগে সুর জাগায়। সহৃদয় পাঠকের আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির ক্রিয়া সূচিত করবে ভাষার সূক্ষ্ম গুণ। কানের ভেতর দিয়ে মর্মে যাবে এবং প্রাণকে আকুল করবে। এই আকুলতাই অন্যনামে সুরধর্ম। এই সুরধর্মের স্পর্শ রবীন্দ্রোত্তর জীবনানন্দের ওপর স্পষ্টতঃ সব থেকে বেশি। পরবর্তী অন্যান্য কবিদের মধ্যে রচিত কারও কারও ওপর এর প্রভাব সাধারণতঃ আংশিকভাবেও পড়েছে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে দেখতে পাই, সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় রবীন্দ্রপ্রভাব দূর-সঞ্চারী। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের রীতির প্রত্যক্ষ

কিংবা অপ্রত্যক্ষ ভাবানুবর্তন সমানে বয়ে এসেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কারও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবা সম্ভব নয়। কবি মোহিতলাল বলেছেন,—

"বস্তু-জগতের বৈচিত্র্যকেই ভাব-সংগীতের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বাংলা-ভাষাকে যে রূপদান করিয়াছে, সে রূপের প্রভাব অজেয়; বাংলাভাষা সেই সংগীত-রসে বিগলিত হইয়া এমন একটি সৌষ্ঠব ও নমনীয়তা লাভ করিয়াছে যে, অতঃপর সর্ববিধ সাহিত্য-গঠনকর্মে ভাষার এই রূপ শিল্পী মাত্রেরই বরণীয় হইতে বাধ্য।"[৪৭]

এখানে একটা বিষয় দেখা দরকার, রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রকল্প ও রবীন্দ্র-কাব্যের চিত্রকল্প—প্রযুক্তিগত, আঙ্গিকগত ও ভাবগত সুসমঞ্জস ও সদৃশ কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের চিত্রকল্প খুব সূক্ষ্ম বিচারে পৃথক ব'লে মনে হয়। কবিতার আঙ্গিকে রূপায়িত চিত্রকল্প সুরের বা গীতলয়ের মুখাপেক্ষী নয়; তার স্বাধীনতা ও শক্তির ক্ষমতা বেশী থাকা স্বাভাবিক। সংগীতে ভাষার সঙ্গে সুরের আবশ্যিক সন্নিপাত; একথা ভেবেই কবি সুরের সমানুপাতে সংহত সুতীক্ষ্ণ বাক্-প্রতিমার রূপ দিয়েছেন তাঁর গানগুলোতে। কবিতার সঙ্গে গানের প্রকাশ-রূপের পার্থক্য কতখানি, অন্যান্য কবিদের রচনা তুলে বিচার করেছি, এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মধ্যে দিনান্ত ব্যাপারটির আরও তুলনা উপস্থাপিত করছি।

কবিতার দৃষ্টান্ত:

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস, রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় উৎকণ্ঠিত পাখি

(বর্ষশেষ)

এখানে চিত্রকল্প যেন জীবন্ত। চিত্রকল্পের বস্তুনিষ্ঠ ও রসবাহী উদাহরণ এরকম অসংখ্য দেখা যাবে।

উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চি রেখা।

(বর্ষশেষ)

'জ্বলদর্চি রেখা' বক্তব্যটি অসীম শক্তিতে চিত্রকল্পের ধ্বজা তুলেছে। সুকঠিন সংহত বাণী গাম্ভীর্যে ও তীব্রতায়, শব্দ ও অর্থধ্বনির নিবিড় কঠিন ও অনুপম সমন্বয়ের চিত্র-রূপায়ন। এবং

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হলো যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার,

দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার

এলো তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে। (বলাকা)

এখানে অতুলনীয় কবিবিবক্ষার সন্ধ্যার জীবন্ত উদ্ভাষণ দেখি। আমাদের আকর্ষণ করে তত্ত্বের গাম্ভীর্য, মননের তীক্ষ্ণতা এবং ভাবপোষোগী ভাষার বৌদ্ধিক প্রকরণ-শৈলী। কিন্তু গানে আছে মনন অপেক্ষা প্রাণের স্ফূরণ। ভাবনা অপেক্ষা হৃদয়ের উত্তাপ বেশী। এটাই স্বাভাবিক। কবিতায় জীবন্ত বাক্‌বৈদগ্ধের উত্তাপ অনিবার্য ও আবশ্যকীয়। গানে থাকবে বাণীর লাবণ্য ও প্রসন্ন করুণতা। কবিতা বহুর, সকলের। গান একেলার, হৃদয়ের জিনিস এটা। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের ক্ষেত্রগুলিতে সচেতনভাবেই কর্ষণের পৃথক প্রযত্ন নিয়েছিলেন। ভাষা, অলংকার, ছন্দঃস্পন্দন ইত্যাদির মাধ্যমে উভয়স্থলে তিনি তাঁরই মনোমত ফল ফলিয়েছেন।

সেজন্য কবিগুরুর গানের সর্বাপেক্ষা গুরুতর মৌল বিশিষ্টতা যা আমাদের একান্তই সুখি ও তৃপ্ত করে, তা হ'লো—বিপুল বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি, প্রসন্ন মধুর আত্মোদ্‌ঘাটন ও পরম নিশ্চিন্ত সান্ত্বনার আনন্দ।

কাব্যাংশগুলির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই গানাংশগুলির আবেদনের বিশিষ্টতা সহজে বুঝে নিতে পারা যায়।

মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ। (পৃ ৬০৪)

কিংবা: যখন বেলাশেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায় মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন,
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন।
(পৃ ২০১)

আট

আমাদের শ্রেণী-নির্দেশিত তৃতীয় পর্যায়ের চিত্রকল্প রবীন্দ্রসংগীতে সংখ্যা-হীন। সেখান থেকে সাধারণ ও গূঢ়ার্থ-প্রতীতি চিত্রকল্পের আরো কিছু

দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখতে পারি। দেখবো যে, সমগ্র রবীন্দ্ররচনা যদি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ী-ভূত কাব্য-সিদ্ধি হতে পারে, তবে তাঁর রচনার স্বাভাবিক প্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রয়েছে চিত্রকল্প। তাঁর প্রায় দু'হাজার গানের সবগুলোকেই সম্পূর্ণ সফল চিত্রকল্প বলা না গেলে-ও অনেকক্ষেত্রে বাক্-প্রতিমা-রচনার সহজ-সংস্কার অক্ষরে, শব্দে, পংক্তিতে কিভাবে প্রত্যয়িত হ'তে পারে তার দৃষ্টান্ত প্রতিটি গান থেকেই নেওয়া যায়। এখানে কয়েকটি বিষয় সংকলন করছি :

তারা : আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ-হারা,
বসে-রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে।
(পৃ ৫৮)

'তারা' নিয়ে কবির চিত্রকল্প-রচনা কিংবা প্রতীক-রচনার কাজ খুব বেশী তাঁর সংগীতে। আকাশ থেকে খসল তারা (প্র ১৫৬), কেন তারার মালা গাঁথা (পৃ ৫২১), রাতের তারা চোখ না বোজে (পৃ ৫৫৮), আমার প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা (পৃ ৫৬৩), দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায় (প্র ১৫৯) প্রভৃতি বিভিন্ন গানের পংক্তিতে দেখতে পাই তারার মনন ও আন্তর-রূপায়ন। আবার বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও তারার চিত্ররূপ তাঁর গানে বিবৃত হয়েছে অনেক।

যেমন : আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রা বিহীন গগনতলে
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গ-সভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রন (বি ৭৭)

কাব্যগ্রন্থে এই তারার ছবি :

"আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তাপসী তমস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র" (শাপমোচন : পুনশ্চ) চরম উপলব্ধি কিংবা সূক্ষ্ম কবি-সত্তার ব্যাকুল আত্ম-প্রকাশকে এভাবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তাঁর উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদির মধ্যে সেই সহজ ও গভীর আত্মপ্রকাশকে দেখতে পাই। তাঁর প্রতিটি চিন্তা কবিতার মধ্যে যতখানি গাম্ভীর্যে রূপায়িত হয়েছে, গানে তা অনেক হাল্কা, স্বচ্ছন্দ ও সজীব মনে হয়। যেমন :

সূর্য : বাজল তূর্য আকাশ পথে সূর্য আসেন অগ্নি-রথে (বি ৩৯)

চাঁদ : অধীর হ'য়ে মাতল কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ (প্র ২২১)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে উছলে পড়ে আলো (প্র ৯৪)

চাঁদ ও ভাবনা : পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে

যেন সিন্ধু-পারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে (প্র ৬)

চাঁদের, ফুল ও গন্ধ : আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে

তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে (প্র ৫)

সৌর জগতের নৈসর্গিক উপাদানগুলো সামগ্রিক দায়িত্বে কবি-চিত্তকে উদ্বোধিত করছে মহনায় ভাবে, রসে ও আনন্দে। কবি বলেছেন—

আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ

তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

নৈসর্গিক উপাদানের সঙ্গে কবির রোমান্টিক ও মিষ্টিক চেতনার সম্পর্ক নিবিড়। যাহা কবি-বিবক্ষার উপমেয় উপমান ইত্যাদি থেকে সূক্ষ্ম অর্থদ্যোতনাকে পৃথক করা যাবে না। সেজন্য মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ-চিত্রণের মিশ্রণ, মানবের চেতনা উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়-বেদিতার কথালেখ্য সংবৃত, সরল ও অনতিরেক বাক্প্রতিমায় দেখতে পাই।

পাখি : মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি

ওরা ঘর ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ও গাঁথি গাঁথি (প্র ৬১)

মেঘের কোলে কোলে বকের পংক্তি ঘর ছাড়া মনের কথার মালার সঙ্গে উৎপেক্ষায় হয়েছে অসামান্য ছবি। ঠিক একই রকম চিত্রকল্প কবিতার রূপাবয়বে হয়েছে শক্ত সমর্থ ও প্রচণ্ড গতি-সম্পন্ন।—বিদ্যুৎ বিশীর্ণশূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় উৎকণ্ঠিত পাখি।

নীড়ের উপমায় মূর্ত-বিমূর্তের ছবি গানের সুললিত ভাষণ-শিল্পে বিধৃত।—

পাখি, নীড়, দিনান্ত :

পান্থ পাখির রিক্ত কুলায় ব'নের গোপন ডালে

কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।

বাসায় ফেরা ডানার শব্দ নিঃশেষে সব হলো শুদ্ধ

সন্ধ্যা তারার জাগলো মন্ত্র দিনের বিদায় কালে। (প্রে ১২৬)

পান্থ, পথ, কান্না, তৃণ : ছিন্ন বাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চলে

কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে। (প্র ১৬৮)

ঝড়[৪৮], প্রলয় :

ঝড়ের প্রতীকী ও তাত্ত্বিক ভাবানুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের একান্তই নিজস্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এর ব্যাপক দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতা ও গানে রয়েছে।

ঝঞ্ঝন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে (প্র ১২২)
আকাশ কোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি (পূ ২০৫)
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি (প্রে ৩২৩)
আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার (প্র ৯৫)

মাটি : হেথা মন্দ মধুর কানাকানি জলেস্থলে শ্যামল মাটির ধরাতলে (বি ১১)

ফুল : প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরিষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,—এসেছে কি? (বি ৮১)

ডাল : ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে (বি ৮১)

দিগন্ত : নীলদিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, বসন্তের সৌরভের শিখা জাগল।

গগন, গান, স্মৃতি :

আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়া, কতদিন পরে এসেছ ছুটিয়া,
নীল গগনের হারানো স্মরণ গানেতে সমুজ্জ্বল (বি ৮২)

কোন্ রমনী : ইন্দ্র পুরীর কোন রমনী বাসর প্রদীপ জ্বালো (প্র ৯৪)

ব্যথার রঙ্ : ধেয়ানের বর্ণ-ছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে (বি ৮৩)

মিশ্র সংবেদন : আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুম কোরক খোঁজে,
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও যে।
আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে,
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম আসন
সে তোমারে কিছু বলে। (প্রে ৪৮)

আমাদের নির্ধারিত চতুর্থ পর্যায়ের চিত্রকল্প (মিশ্র চিত্রকল্প) বক্ষ্যমান এই বিষয়গুলোতে বিপুলভাবে উদাহৃত হলো। সেজন্য নতুন ক'রে আর দৃষ্টান্ত তুলে দেবার দরকার নেই। এমন অনেক গান আছে, যার প্রতিটি পংক্তিতে কিংবা সব পংক্তি নিয়ে সমগ্র গানটি সম্পূর্ণ মিশ্র চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। এরকম

কয়েকটি গান—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, প্রাঙ্গনে মোর শিরিষ শাখায়, যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে, আমি শ্রাবণ আকাশে ওই, তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো, মধু গন্ধে ভরা, পূব সাগরের পার হতে প্রভৃতি প্রকৃতি, প্রেম ও বিচিত্র পর্যায়ের অনেক কাব্য-সংগীতে পূর্ণায়ত চিত্ররূপের প্রকাশ ঘটেছে। এত বিপুলসংখ্যক বাক্-প্রতিমার প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে গেলে ভিন্ন এক বিশাল পরিসরের পরিকল্পনা করা দরকার। সে সঙ্কল্প মনে রেখে এই আলোচনাটির ছেদ টানতে চাই।

নির্দেশপঞ্জী

(এক : উপমালোক)

১-২। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলংকার চন্দ্রিকা পৃ: ১, ২

৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য (১৩৬৩) পৃ: ১

৪। রবীন্দ্ররচনাবলী—১৩শ খণ্ড (শতবার্ষিকী) পৃ: ৭৩৮

৫। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যধর্ম : সাহিত্যের পথে পৃ: ৭৬

৬। Dr. Suniti Kr. Chattopadhyay—Viswa-Manah Vak-Pati : Sahitya Academy Centenary Vol.—P. 120 and 126.

৭। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলংকার চন্দ্রিকা—পৃ: ৪৬—"সাদৃশ্যমূলক অলংকারের প্রকারভেদ মানেই সাধারণী উপমার চিত্রভূমিকা ভেদ।"

৮-৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য—পৃ: ২৬, পৃ: ২৭

১০। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃ: ১৮২

১১। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা—পৃ: ২০১।

১২। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতবিতান শতবার্ষিকী—পৃ: ১৮৩

১৩। রবীন্দ্রনাথ—পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী : সংগীতচিন্তা পৃ: ২০১

১৪। অ্যাবারক্রম্বি বলেন—"Words which can transport the experience alive into our minds, and make it veritably our experience as well as the poets."—Poetry : Its music and meaning, Page 48

১৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য—পৃ: ১ দ্রষ্টব্য। অলঙ্কারের তুলনা-করণ হয় সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক, "এখানে সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যের বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগ, হয় অন্বার্থক, না হয় নঙ্-রূপে। বিরোধ বা বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যেরই অপরদিক মাত্র।"

১৬। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের তাৎপর্য—রবীন্দ্র রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৭৩৯।

১৭। গান ও সুর শব্দ দুটির রূপক উপমাদি অলংকার বিষয়ে নানাভাবে পঞ্চম পরিচ্ছেদে

(গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ) আলোচিত হয়েছে। সেজন্য এখানে শব্দ দুটির প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হোল না।

১৮। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২৭, ১২৮

১৯। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলংকার চন্দ্রিকা পৃঃ ১৩৬ দ্রষ্টব্য।

২০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ৯৬

(দুই : চিত্রকল্প)

১। রবীন্দ্রনাথ—জীবন স্মৃতি : প্রভাতসঙ্গীত।

২-৩। জন্মদিনে—৫ নং কবিতা।

৪। রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য : কাদম্বরী চিত্র দ্রষ্টব্য।

৫। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য পৃষ্ঠা ৪।

৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ১২৭

৭-৮। দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় পৃঃ ৩৩, ১২৪, ১৪৪, ৩৩—"ইমেজারী আন্দোলনের গুরু পাউণ্ড বললেন মূর্ত চিত্রকল্প ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার চলবে না। ছন্দ ব্যবহার করতে হবে in the sequence of musical phrase, not in the sequence of metronome. (Ezra Pound—"A Retrospect")

৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ভারতকোষ (তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ৩৫৮

১০। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য পৃঃ ৫

১১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ৭

১২। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—কাব্যবিচার পৃঃ ১২৭

১৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ৭-৯

১৪। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের পথে পৃঃ ৪৯

১৫। বুদ্ধদেব বসু—কবি রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৬

১৬-১৭। Croce—Aesthetics, Page 20, 25

১৮। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের পথে পৃঃ ১৮

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৮৬

২০। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—রাগ ও রূপ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২৪-১২৫

২১। শার্ঙ্গদেব—গানের আসর : দেশ ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬

২২-২৩। অরুণ কুমার বসু—রবীন্দ্র বিচিন্তা পৃঃ ১৭-১৮

২৪। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প : রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৪৪

২৫। ক্ষুদিরাম দাস—চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী পৃঃ ১

২৬। গুণময় মান্না—রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তন রেখা পৃঃ ২১৩

২৭। ক্ষুদিরাম দাস—চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী পৃঃ ১-২

২৮। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্প (অচলায়তন) পৃঃ ১৪৪

২৯। অরুণকুমার বসু—রবীন্দ্র বিচিন্তা পৃঃ ১৬

৩০। বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্য চর্চা পৃঃ ১৪২

৩১। Edward Thomson—Tagore: Poet and Dramatist—P. 37.

৩২। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের তাৎপর্য—রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩শ খণ্ড) পৃঃ ৭৩৯

৩৩। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্বগত পৃ· ২৯

৩৪। I. A. Richards—The Principle of Literary Criticism P. 119

৩৫। লুইস ইন্দ্রিয়বেদিতা ও আবেগ সংক্রান্ত ইমেজারী প্রসঙ্গে বলেছেন—"Poetic Image is a more or less sensuous picture in words, to some degree metaphorical, with an undernote of some human emotion in its context, but also charged with and releasing into the reader a special poetic emotion or passion" (The Poetic Image, Page 22)

৩৬। শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলংকার চন্দ্রিকা—পৃঃ ৪৩-৪৪

৩৭। শিবনারায়ণ রায়—সাহিত্যচিন্তা পৃঃ ১৫৭

৩৮। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ উল্লেখনীয়:

(ক) রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনা—বিশ্বভারতী পত্রিকা—অশোকবিজয় রাহা।

(খ) রবীন্দ্রনাথের বাক্ প্রতিমা: রবীন্দ্রায়ণ, চতুরঙ্গ, উত্তরসূরী—অমলেন্দু বসু।

৩৯। নন্দলাল বসু—রবীন্দ্রায়ণ (১ম খণ্ড) পৃঃ ৭

৪০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৩৯

৪১। রবীন্দ্ররচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃঃ ৫৪

৪২। অশোকবিজয় রাহা—রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বভারতী শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৬২) পৃঃ ৩৬

৪৩। দার্শনিক মনীষী জন রাস্কিন নীল রঙকে আনন্দের উৎস বলেছেন—"Blue colour is ever lastingly appointed by the Diety to be a source of delight"—Lectures on Architecture & Painting 1853.

৪৪। Ezra Pound—"Image is not a pictorial representation but presents an intellectual and emotional complex in an instant of time—an unification of desperate ideas"—Literary Essays.

৪৫। লুইস বলেন—"By intensity we mean, I presume the concentration of the greatest possible amount of significance into a small space"—The Poetic Image p. 40,

৪৬। Ullman Stephen—Style in the French Novel. p. 211 (1956)

৪৭। মোহিতলাল—আধুনিক বাংলাসাহিত্য পৃঃ ১৩১

৪৮। অমলেন্দু বসু—সাহিত্যলোক পৃঃ ৭৭, ৮৬

তালে তালে সাঁঝ সকালে রূপসাগরে ঢেউ লাগে,
সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ্ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে, কান্না হাসির গান সেধে নে,
ডাক দিল শোন মরণ-বাঁচন-নাচন সভার ডঙ্কাতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাব্যছন্দ ও সুরের ছন্দের রসভঙ্গিমা

কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে

রবীন্দ্রসংগীতের বাক্-প্রকরণের বিপুল বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে অন্তর্লীন অথচ গুরুতর যে প্রত্যক্ষ উপাদানটি আযুক্ত, সে হলো কাব্য-ছন্দের ও সুরছন্দের তান, তাল ও লয়। এই উপাদানটি কবিতা ও গানকে গদ্য-রচনা থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে, ও গদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।[১] গান ও কবিতা মানুষের চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঞ্জাত। মানুষের রসবোধের সঙ্গে তীব্র সাংগীতিক চেতনা থেকে ছন্দোবদ্ধ কবিতার সূচনা; সর্বাগ্রে গদ্যের সৃষ্টি হয় নি। অথবা এর পেছনে প্রচ্ছন্ন কোন কারণ সক্রিয় থেকে মানব-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল? চরাচর সূর্য চন্দ্র তারা সৃষ্টি-বিলয়, জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছু নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। নিয়মটাই ছন্দ, নিয়মের লীলাই হল নৃত্য। বিশ্বের অনুতে অনুতে সেই নৃত্যের ছায়া কাঁপছে যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে; আর সেই নৃত্যের অমিতবিত্ত মানব চিত্তকে পূর্ণ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এই দার্শনিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কি দেখছ?
নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।
সেই ছন্দে বস্তুর বিপুলভার হাল্কা হয়ে যায়।

সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো মেচে
বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন
সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। (রক্তকরবী)

ভাবময় মানব-সত্তার বিশাল মহিমা তাকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য করেছে, ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট, শক্তিহীন হয়েও সে শক্তির আকর। নন্দিনী মানব-চেতনার প্রমুক্ত-প্রতীক, দেহে রূপে শক্তিতে ভাবে নিয়মছন্দিত মনুষ্যত্ব। কবিগুরু এভাবে বিশ্বছন্দ, বিশ্বনৃত্য, বিশ্বসংগীত তাৎপর্যগুলি মানব-চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। বিজ্ঞানসম্মত বিচারে দেখতে পাই, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়া, হৃৎস্পন্দন, দেহের রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদির মধ্যেও এই নিয়ন্ত্রণ। নিয়মটাই জীবন; নিয়মবদ্ধ এই দেহ-জীবনের সঙ্গে মনোময় জ্ঞানময় প্রাণময় সত্তাগুলিও ছন্দে ছন্দে নিয়মিত। মানুষের অলৌকিক আনন্দ কিংবা বেদনার ভাব একদিন মানুষের নিয়মিত চেতনা থেকে জন্ম নিয়েছিল ভাষার রূপ নিয়ে; আর সেই ভাষা জন্মের মুহূর্তেই নিল ছন্দোময় রূপ। অর্থময় ভাষাটা তখনও সম্পূর্ণতা পায়নি। কবি বলছেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রি দিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে,
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

(ভাষা ও ছন্দ)

পরিব্যাপ্ত ভাব-অর্থ, পরিস্ফুট তত্ত্ব ও হৃদয়াবেগ ভাবছন্দ ও বাক্‌ছন্দের সৌষ্ঠবের উপর নির্ভর করে। "রসানুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মনের রসের উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃ-স্পন্দনে।"[২] ছন্দের মধ্য দিয়েই সংগীত আযুক্ত হলো ভাষা ও ভাবের সঙ্গে, তখন থেকেই ভাষার সম্পূর্ণতা। এই ছন্দযুক্ত ছান্দশ ভাষায় অভিভূত হয়েছিল দেবদ্বেষী অসুরগণ। "ছাদ্যতে ইতি ছন্দঃ"। বাক্য ও অর্থের সীমাকে সম্প্রসারিত ক'রে অতিরিক্ত বস্তু এনে দিয়ে বাক্‌-অর্থের সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে ছন্দ।

"মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নবসুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দরগতি।"

কবিগুরুর ছন্দ-চেতনাকে বিশিষ্ট তত্ত্ববোধের সঙ্গে ভাবতে হয়। তাঁর গানে সেই ছন্দ-চেতনার প্রয়োগ সাধারণ কাব্যনির্মিতি থেকে ভিন্ন হয়েছে কেন, তাও লক্ষ্য করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে সকলের আগে সুর বলেই গণ্য করেছেন। গানের ছন্দ, গানের সুরই। অ-গীত গানের স্বরলিপি হয়ে কাজ ক'রে যায় ভাষার সুরের তান, লয় ও তাল। এই সুরমূর্চ্ছনাই কাব্যছন্দে যাকে বলা হয় মাত্রাস্পন্দন ও ঝোঁক। কারলাইল সুর ও ছন্দঃস্পন্দনেই কবিতার অর্থ ও সার্থকতা খুঁজেছেন।[৩] এখানে কবিতার সংগীত বা সুরকে শব্দ-ধ্বনির স্পন্দন ও ছন্দঃস্পন্দনকে বুঝতে হবে।

—"রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন।"[৪]

কাব্যছন্দ ও সংগীতের তান ও লয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কর্ণেন্দ্রিয় কত যে সূক্ষ্ম সচেতন ছিল তাঁর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলো পড়লে তা জানা যায়। আবার তাল ও তানের চরমতম বোধ ও তাদের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কবি গতানুগতিক বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে কাব্যে ও গানে স্বভাব-গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য মুক্তির ঘোষণা করেন। তাঁর উক্তি হলো — "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটাই লয়। এই লয় জিনিষটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি, তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"[৫]

বৈদিক সামিকযুগে গান ও আবৃত্তির ছন্দতাল একই প্যাটার্নে চলতো। তবে কাব্যছন্দের চেয়ে গানের তালের ব্যাপকতা ছিল। মার্গতালের দীর্ঘমাত্রিক চাচপুট, চচ্চৎপুট ইত্যাদি তাল গানের লয়ের পরিধিকে বাড়িয়ে দিত। মার্গ-সংগীতের পর দেশী-সংগীতের উদ্ভব হয়। এতে কাব্যগুণ বেশী হওয়ায় তার ভাষার অবয়ব অনুযায়ী ছন্দ নির্দিষ্ট হয়। "ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কাব্যের যে সমস্ত চন্দ গানে প্রযুক্ত হত তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—আর্যা, হয়লীল,

দ্বিপদী, ক্রৌঞ্চপদা, গাথা, দ্বিপথ, কলহংস, তোটক, বৃত্ত, দন্ডক, চচ্চরী, পজ্ঝটিকা এবং মঙ্গল। বলাবাহুল্য, এছাড়া বহুছন্দের প্রয়োগ-ও স্বীকৃত হতো। বিংশশতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ এই স্বীকৃত পদ্ধতিকেই আবার প্রয়োগ করলেন এবং সেই চিন্তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন।"[৬] কবি কালিদাস রায় গীত্যার্ধাছন্দে গীতগোবিন্দের একটি গীত উল্লেখ করেছেন :

চন্দন চর্চ্চিত। নীলকলেবর। পীতবসন বন। মালী
কিবা কেলিচঞ্চল। মনিকুণ্ডল দুলে। হসিত গণ্ডে বিভা। ঢালি

তৎকালে গীত-শাস্ত্রজ্ঞ কবিগণ কাব্যের ছন্দকে স্বরছন্দ বা তাল হিসেবে প্রয়োগ করতেন। আবার দণ্ডক, তোটক বা পঞ্চচামর ছন্দের প্যাটার্নে গানও করতেন গীত-কুশলীরা। দক্ষিণ ভারতের গীতপদ্ধতিতে কাব্যছন্দ আজও প্রচলিত। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের এই ছন্দ-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা বাংলা বা হিন্দিতে প্রয়োগ করার অবকাশ হয়নি। "বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সুপ্রাচীন ছন্দচিন্তাকে আবার স্বকীয় পরিকল্পনায় সর্বসমক্ষে মেলে ধরলেন।"[৭] কবির একটি গান—"কাঁপিছে দেহলতা থর থর" এগারো মাত্রা হিসেবে, কিংবা তোটক ছন্দে "মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নীপকুঞ্জতলে" প্রভৃতি গানগুলোতে এই প্রাচীন রীতির ছন্দের প্রয়োগ দেখতে পাই।

এখন দেখতে হবে কবিতার বাক্‌ছন্দ ও গানের লয় মানুষের ভাব ও কল্পনার কতখানি আবশ্যিক উপাদান, অথবা তাদের নিজস্ব এক স্বতন্ত্র শক্তির মূল্য আছে। আমরা জানি যে কবিতার অর্থ না বুঝলেও "the recurrent beats and pauses, the rapid march or the languid movement" আমাদের উৎসাহিত করে; যেমন করে সোনেটা বা সিম্ফনি to moods the martial excitement or pensive melancholy[৮]. ছন্দের গুরুত্ব সম্পর্কে এ কথাগুলো ব'লে হাড্‌সন্ যে সংজ্ঞাটি নির্দেশ করেছেন তা হ'লো— "metre is a powerful aid in the emotionalisation of thought, and that the various metrical forms in which the poet most naturally and appropriately embodies his feeling, are also, of all possible forms, the most potent to excite the reader's feeling to a sympathetic response."[৯]

রবীন্দ্রসংগীতে শব্দ-মিল, বিষম-শব্দ-প্রয়োগ, বিশেষণ, লগ্ন-শব্দবন্ধ (Syntactical), উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতি রচনা-নির্মিতি ছন্দঃস্পন্দনের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত। কিশোর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের শব্দ-ধ্বনি ছন্দঃস্পন্দন ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। My Reminiscences গ্রন্থে তিনি বলছেন—"I can not tell how often I read that Gita-Gobinda, the sound of the words and the lilt of the metre filled my mind with pictures of wonderful beauty, which impelled me to copy out the whole of the book for my own use."

শব্দধ্বনি, সুরস্পন্দন, স্বর ও যুক্ত বর্ণের ধ্বনি সহযোগে কাব্যরস-সিদ্ধির যে প্রকরণ-কৌশল কবিগুরু নানা স্থান থেকে আহরণ করেছেন, তাঁর কবিতা ও গানে তারই প্রয়োগ দেখি। তাঁর গদ্যে কোথাও কোথাও গীতিকাব্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি এমন নয়, লিপিকাকে গানে রূপ দেবার সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন।[১০] পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌বিভূতি ও ছন্দ-নির্মাণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। সহজ স্বতঃস্ফূর্ত তাল ও শব্দ-ধ্বনিতে তাঁর ছন্দের পরিচয় আছে। যেমন:

হাতের ধরা, ধরতে গেলে। সকল ভাবনা, ডুবানো ধারায়, করিব স্নান। ক্লান্ত তড়িত বধূ, তন্দ্রাগতা। বাইরে দূরে, যায় রে উড়ে, হায়রে হায়। রাতের বায়, কোন মায়ায়, আনিল হায়, বন ছায়ায়, ভোর বেলায় (প্র ১৪৭); সর্বত্র ধ্বনি-মিলের ও ছন্দের মূর্ছনা। আরও দৃষ্টান্ত: দুঃখের যজ্ঞ অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম, মাধবী বনের মধু গন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়, বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হলো, আধো ঘুমের প্রান্ত-ছোঁয়া বকুল মালার গন্ধ, বর্ষণ হর্ষ ভরা ধরণীর বিরহ বিশংকিত করুণ কথা, ইত্যাদি।

শব্দ ও বাক্যে মিলের ধ্বনি, ছন্দঃস্পন্দন ও সুরের লয় এখানে সক্রিয়। গদ্যে এ-গুণ থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দ-লয়ের যে সাফল্য, তাঁর সংগীতে তা অধিক সাফল্যে প্রযুক্ত হয়েছে। ছন্দ-তন্ময় কবি সুরের লয় ও তান দিয়ে তাঁর কবিতা ও গানের শব্দের মালা গাঁথছিলেন। সেই স্পন্দন থেকে শব্দ পৃথক করা অকল্পনীয় ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে এক মনীষীর মূল্যবান উক্তিটি উদ্ধার করতে পারি: "How much the power of poetry depends upon the nice inflections of rhythm alone may be proved by taking the finest the passages of Milton and Shakespeare, and merely putting them into prose, with the

least possible variation of the words themselves. The attempt would be like gathering up dew-drops, which appear jewels and pearls on the grass, but run into water in the hand, the essence and the elements remain, but the grace, the sparkle and the form are gone" (James Montgomary—Lectures on Poetry, p III).[১১]

কথাটি অনুসরণ ক'রে বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের বাণীবন্ধে প্রধানতঃ সরল স্বচ্ছ দীপ্তি, ভাব ও অনুভবের মহিমা এবং সুন্দর অবয়ব চোখে পড়লেও তার সঙ্গে লয় ও তানের ছন্দ এমনভাবে আশ্লিষ্ট যে, সকল ইন্দ্রিয়ে তার কতখানি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তা কখনো আর আলাদা করে দেখার অবসর থাকে না; কিংবা সেটা বিশ্লেষণের জ্ঞান থাকে না। কাজেই রবীন্দ্র-সংগীতের ছন্দ-বিশ্লেষণ ব্যাপারটি তাঁর সামগ্রিক রচনা-নির্মাণ ব্যাপার থেকে আলাদা করা সহজ নয় বলে মনে করি। তাঁর সমস্ত কাব্য-প্রতীতির সাংলগ্নিক ব্যাপার, এই অসামান্য ছন্দ-বোধ, যার প্রভাব প্রাচ্য ছা'ড়িয়ে পাশ্চাত্যে গিয়েও ঠেকেছিল। রবীন্দ্রভক্ত এজরা পাউণ্ড, ইয়েট্‌স্‌ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সূক্ষ্ম ছন্দঃস্পন্দন ও সুরস্পন্দন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথের কাছে ছন্দের তত্ত্ব বোঝার চেষ্টাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তী একটি সাক্ষাৎকার-কথোপকথনকে তাঁর বইতে প্রকাশ করেছেন। পাউণ্ড বলেন—"লিরিক অর্থাৎ লঘুচারী অথচ রূপে ভরা, ভাবের ভাস্কর্যে ভরা গীতিকাব্য, বাদ্যযন্ত্রের সংগত বাদেও আদিম সংগীত-ভাবাশ্রয়ী যার ছন্দ, যার মধ্যে বেদনা অক্ষরের অন্তর্ধ্বনিতে পদান্তে পূর্ণ হয়ে উঠে একটি বিশিষ্ট অনুভূতির মণ্ডলী সৃষ্টি করে, এবং তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্য ও পরিবেশকে ভাবের উজ্জ্বলতায় অব্যবহিত দেখা যায়, সেই সর্বাতীত কারুসৃষ্টির স্রষ্টা জগৎ শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।" তিনি আরও বলেন—"গীতিকাব্য যে কোথায় পৌছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তাঁর তুলনা নাই, সুর বাদ দিয়েও ছন্দে মিলের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে গঠনের সৌকর্যে এবং ভাষার ভাবে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতি কবিতার সম্রাট শিল্পী।"[১২]

[একদা এই রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে সংকীর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কারণে রবীন্দ্র-অখ্যাতিতে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-সৃষ্ট সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি ও তাদের

ভাষা-নির্মিতির মহিমা ম্লান হয়ে যায়নি। দেশে বিদেশে রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতের যথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে, আজও হচ্ছে। এখানে এ প্রসঙ্গের প্রয়োজন নেই।]

শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শব্দের উচ্চারণ ও আবৃত্তির সময় মৌলিক স্বরান্ত, যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের প্রতিটির কাল-পরিমাণ বা প্যাটার্ন[১৩] ধরতে হয়। বাংলা ভাষার সিলেব্‌ল্‌ প্যাটার্নের সমস্যা নেই, মুক্ত ও যুক্তস্বরের পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষর, মাত্রা, ধ্বনি ও ঝোঁকের তারতম্য আছে, এই লক্ষণের জন্য ছন্দের তিনটি রীতি গড়ে উঠেছে। ছন্দের তিন রীতিতেই ধ্বনি ও মাত্রা ভিত্তিক দল-স্পন্দন (Syllabic Rhythm) এবং পর্বস্পন্দন (Foot Rhythm) হলো কবিতার প্রাণ। "The first and the most obvious peculiarity which every one notices in poetry is its metre— the marked rhythm or beat of the sound of its words ; for this seems to put it most distinctly apart from all other ways of using language."[১৪]

দল ও পর্ব, পর্বান্ত বা চরণে মিল ও অনুপ্রাস এবং ছন্দঃস্পন্দনের কারুকর্ম রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছেন। তবে কবিতা বা গানের কারুসৌন্দর্য তাঁর ভাবসৌন্দর্যকে কখনো অতিক্রম করে যায় নি।[১৫] সূক্ষ্ম শ্রুতি-চেতন কবি তাঁর গানের ছন্দ ও মিলের যে করণ-কৌশল দেখিয়েছেন তাতে তাঁর দুটো উজ্জ্বল সত্তার প্রভাব ছিল। প্রথমতঃ তিনি শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভার অধিকারী ; দ্বিতীয়তঃ তিনি সুরজ্ঞ, গায়ক, সুরস্রষ্টা ও গীত রচয়িতা। সেজন্য কাব্য-ছন্দের আদর্শ ও সুর-শিল্পের লক্ষণ দুটো মিশে গিয়ে তাঁর কাব্য-সংগীত রচিত। আবার এই ছন্দ বা প্যাটার্নকেই কবি যথাসর্বস্ব বলেন নি। সব কিছুর মূলে আছে রস। তিনি বলেন—"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে। ছন্দটা ঐ রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"[১৬]

সংগীতের দ্বাদশ শ্রুতির অনুসরণে স্বর-স্থানের নির্দেশ করা হয়েছে প্রাচীন মতে, পরবর্তীকালে শ্রুতি সংখ্যার পরিবর্তন করেন মনীষিগণ। "প্রকৃতপক্ষে সংগীত স্বরের কম্পনের (Vibration of sound) অথবা বর্ণের কম্পন সংখ্যারই (Number of colour vibration) সমষ্টি মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা

মনোবৈজ্ঞানিকরাও বর্ণকম্পন স্বীকার করেছেন।"[১৭] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা প্রতি সেকেণ্ডে স্বরের শব্দ-তরঙ্গ সংখ্যায় হিসেব করেছেন; এই পরিমাপ-পদ্ধতি গানের প্রয়োগে কতটা উপযোগী, ভারতীয় সূক্ষ্ম-চেতন মনীষিগণ সেকথা ভাবতে পেরেছেন। তবে একথা স্বীকার্য যে, এই শব্দ-তরঙ্গের বিস্তারে ও ছন্দে প্রাচ্য রাগরাগিণীর একটা কাঠামো বা মেল গড়ে উঠেছে। স্বরের সীমাতিশায়ী প্রমুক্ত বিহারলীলা তখনই সার্থক হয়েছে, যখনই সে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র তালের সীমায় এসে ধরা পড়লো। নিয়মটা বন্ধন নয়, নিয়মটাই শান্তি, গতি ও মুক্তি। কবিতায় এত সূক্ষ্ম শব্দ-ধ্বনির বিস্তারলীলা নেই, তবে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌যন্ত্র একটা নিয়ম স্বীকার করে নেয়, নইলে কানের কাছে তার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ সূচিত হবে। এই নিয়মের নাম হলো দল বা মাত্রাস্পন্দন, পর্বস্পন্দন, ধ্বনিমিল, সাস্তমিল ইত্যাদি।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রীরা সকল প্রকার গানে তালের অপরিহার্যতা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। নৃত্য-গীত-বাদ্যের ক্রিয়াকালের পরিমাপ রক্ষা না করলে কোন রঞ্জকতা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হবে না। সেজন্যই তালের গুরুত্ব। ভরতাচার্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—'কালেন নর্তনো গানো বাদনো ক্রিয়ানং মানঃ তালঃ।' এই ত্রৌর্যত্রিক সংগীতে ক্রিয়া বা তালের সূক্ষ্ম শৈলী ও জটিল বিন্যাস থেকে তালের দশপ্রাণের কথা বলা হয়েছে। শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে এই দশপ্রাণের ব্যাখ্যা আছে। তালের দশপ্রাণ হলো— কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি, প্রস্তার। শাস্ত্রীয় ও প্রাচীন লোকায়ত সংগীতরীতি সম্পর্কে অনেক গুরুতর বিশ্লেষণ করেছেন প্রাচীন সংগীতবিশেষজ্ঞ ও কলাবন্তগণ। সংগীতের মৌলবৈশিষ্ট্য ও রাগরূপের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণে এইসব বিদগ্ধ-মনীষীদের প্রচেষ্টা ও অবদান চিরস্থায়ী হয়েছে। যাইহোক, কয়েক শতাব্দীর ভারতীয় সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাল পদ্ধতি ও লয়কারীর নিবিড় গুরুত্ব ও প্রভাব একালেও সর্বস্বীকৃতি পাচ্ছে। গানের চিরকালীন ইতিহাসে তালের উপযোগিতার কথাটি কবিতার ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচিতব্য হয়ে পড়ে এইজন্য যে, তাল ও ছন্দোবোধ মানুষের স্বভাবগত। এবং গানের তাল ও কবিতার ছন্দ—দুটির চরিত্র প্রায় এক।

গানের নিয়ন্ত্রণে আছে সম্, ঠেকা, সুর-ফাঁক, মীড়, গমক, লয়, গতি, ইত্যাদি। গানের সুরে তাল যেমন কাজ করে, কবিতার ছন্দেও স্পন্দন, ঝোঁক, বল্, লয়, ধ্বনি ইত্যাদিও তেমনই। "By accent we refer to

the prominence given by stress and pitch together."[১৮] ঝোঁক ও সমুত্থান (Stress & Pitch) গানে ও কবিতায় প্রায় একই পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়।

গানে ও কবিতায় তাল ও ছন্দের নিয়ম-শাসন, গঠন, গতি, উপযোগিতা, রস ও রঞ্জকতা সৃষ্টিতে প্রধান দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কালে কালে কত চিন্তন ও বিশ্লেষণ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার ছন্দ ও গানের তাল প্রসঙ্গে এখনও রয়ে গেছে অনেক জিজ্ঞাসা।

ইংরেজী ভাষায় প্রতিটি শব্দের ঝোঁক বা accent আছে, যার জন্য ইংরেজী ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। একথা মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড় শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত ক'রে তরঙ্গিত ক'রে তোলে না।"[১৯] বাংলা কাব্যসংগীতে শব্দের এই ছন্দ-তরঙ্গের ঘাটতি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কবিতায় ছন্দের তান-পূরণে অভাব থেকে যেতেও পারে, অক্ষরের তান দিয়ে তার পরিপূরণ করা যায়, ঝোঁকের ও লয়ের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস প্রলম্বিত ক'রে সে স্থানটি পূরণ হয়। গানের কথায় বেশি-কম বিষয়ে কোন সমস্যা নেই। সুর দিয়ে কথার সমস্ত গরমিল ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়। ধ্বনিকে বিলম্বিত ক'রে বা শ্বাসের প্রশ্বনকে টেনে নিয়ে কবিতার পদবন্ধে পর্বের ফাঁক পূরণের উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিন মাত্রার পর্বস্পন্দনের অভাব-পূরণের ব্যাপারটিকে কবি প্রাকৃত ছন্দের ছন্দোনৃত্য বলেন। আমার মনে হয়, কবি সুরের দাবী মেনেছেন অক্ষর-মাত্রায় ফাঁক বা অভাব পূরণের ব্যাপারে। ছন্দঃস্পন্দনের সঙ্গে সংগীতের তান সম্পৃক্ত। কবি উদাহরণ দিয়েছেন :—

আমি— | যদি— | জন্‌ম— | নিতেম |
কালি— | দাসের | কালে— |

গতানুগতিকভাবে একে চার মাত্রায় ভাগ করা যেতো। কিন্তু কবি ভিন্ন রূপে কেন নিলেন, তার যুক্তি দিয়েছেন—"তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার চার সিলেব্‌ল্-এ ভাগ কর, সেটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ'ছন্দে তিন মাত্রার ভাগটাই মূলকথা। এছন্দে আমি গান রচনা করেছি, তার সবগুলোতেই দাদ্‌রা তাল. সব সময়েই তিন মাত্রার ভাগ হয়।"[১৯(ক)]

এবারে পূর্ববর্তী সমস্ত আলোচনা ও মন্তব্য ইত্যাদি থেকে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ব্যক্ত করা যাচ্ছে ; এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি রকম প্রতিভাত হচ্ছে, তার সাধারণ সূত্রগুলো নিম্নরূপ বিবৃত করা গেল।

প্রথমতঃ ছন্দ কথাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের তত্ত্ব ও দার্শনিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বিশ্বছন্দ বলেছেন, সৃষ্টি স্থিতির মর্মকেন্দ্রে যে নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ, তাকে রোমান্টিক কবিপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা দরকার। মানব-মনে তার তত্ত্ব কিভাবে প্রকাশ পায়, ভাব প্রবাহকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই ভাব-ভাষার আক্ষরিক শক্তি নাদ-ব্রহ্মরূপে কিভাবে ছন্দিত, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকগণ তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন। রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল ভাবের সুষমা ও রসস্ফূর্তির বেগকে ছন্দ সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে শ্রোতা ও পাঠককে উদ্দীপিত করে সুনিশ্চিতভাবে।

দ্বিতীয়তঃ ছন্দ শব্দধ্বনির বিভিন্ন রূপাবয়বে প্রতিফলিত ; শব্দে ও মিলে (Rhyme), পর্বে ও চরণে সান্তমিলে, অনুপ্রাসে ছন্দের স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। রবীন্দ্রসংগীতের মিল প্রভৃতি অধ্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দবেগের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি।

তৃতীয়তঃ কবিতার দলস্পন্দন হিসেবে ছন্দের বৈয়াকরণিক প্রয়োগ রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর কবিতা অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যে নিষ্পন্ন ও সার্থকতাপ্রাপ্ত।[২০] গানের ছন্দ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দকেই স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন—"অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি,…ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া…গান লিখিতে বসিলাম।"[২১] এজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কাব্যসংগীতে ছন্দ-পতন-দোষ নেই ; কোথাও কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম আছে মাত্র।

চতুর্থতঃ গানের তাল, সুরের লয় যে নিয়ন্ত্রণ-ক্রমে নিয়মিত, কবিতার ছন্দেও ঠিক সেই নিয়ম। রবীন্দ্রসংগীতে কবিতার ছন্দের প্যাটার্ন ও সুরের তালের চলন ও স্পন্দন পরস্পরকে সহযোগিতা ক'রে সুন্দর হয়েছে। কবির মত—"ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে।" "কবিতায় যেটা ছন্দ সংগীতে সেইটাই লয়। কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই।"[২২]

পঞ্চমতঃ সুরের লয় ও তালের বৈচিত্র্য নেই যে সব গানে, তাদের ঢালা-সুরের গান বলা হয়েছে। এরকম অনেক গানে কাব্য-ছন্দরীতি কবি গ্রহণ করেন নি। বাক্‌রূপে ছন্দঃস্পন্দন না এনে শাস্ত্রীয় সুর-বিস্তার-নির্ভর গানের মতো সাধারণভাবে বাণীর কাঠামো রচনা করেছেন। এরকম অনেক গানের বাণীবন্ধ অসামান্য হ'য়ে উঠেছে। এসব গানকে ছন্দের বিচারে ত্রুটি না ব'লে ছন্দহীন উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলা উচিত। কবি অনেক সময় সুর-সম্পর্ক ছাড়া শুদ্ধ বাণীরূপের মূল্য দিতেন না। প্রবাহিনী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—"সবগুলিই গান, সুরে বসানো। সেজন্য কোন কোন পদে ছন্দের বাঁধন নাই।"[২৩] গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গেও সেই কথা বলেছেন—"গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে।"[২৪] ওই মালতী লতা দোলে, আঁধার অম্বরে—গানগুলির প্রসঙ্গে তাঁর অনুরূপ উক্তি— "এই গানগুলি কবিতা নয়, এগুলি গান। পাঠসভায় এদের স্থান নয়, গীতসভায় এদের আহ্বান, সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো-নেভা প্রদীপের মতো।"

ষষ্ঠতঃ রবীন্দ্রসংগীতে গদ্যরীতির ছন্দের চাল অনেক গানে আছে। মিলহীন, ছন্দঃস্পন্দন-শূন্য গদ্যাঙ্গের গানের নমুনা বেশী দেখতে পাবো গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোতে। নৃত্য-নাট্যের সংলাপ ও কথোপকথনে তিনি সুরসংযোগ করেছেন। সুরের সংলগ্ন হওয়ায় নিশ্চল বাণীদেহে চাঞ্চল্য এসেছে। কবির গীতি ও নৃত্যনাট্যে সংগীত ও আবৃত্তি সহ নাচের সৃষ্টিতে ছন্দো-মুক্তির পরীক্ষানিরীক্ষা লক্ষ্য করি। বাল্মীকিপ্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধ প্রসঙ্গে কবি গতানুগতিক কাব্যছন্দের সঙ্গে এদের ভিন্ন কৌশলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বলেছেন। চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে তাঁর উক্তি—"এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে যায়। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।"

রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলা ও গ্রাম্য গানগুলোতে যে বেগবান চল্‌তি ভাষার স্বরছন্দ দেখেছিলেন, তাকেই তিনি নানাভাবে তাঁর কবিতায় ও গানে এনে বসিয়েছেন। প্রাকৃত বাংলার স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তাগুলো বিশেষ গবেষণা সাপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা সম্পর্কে উল্লিখিত এই সূত্রগুলি অনুধাবন করে একটা কথা স্পষ্টীভূত হচ্ছে এই যে, কবি তাঁর কবিতায় বা গানে ছন্দঃস্পন্দনকে সুরের তালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। গীতবিতান খুললেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কাব্যছন্দের প্যাটার্নে মাত্রা ও ধ্বনি হিসাব করলে তবলার ঠেকার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। উদাহরণ নিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গটি দেখবো। দাদরা, কাহারবা, তেওরা, ঝাঁপতাল ইত্যাদির মাত্রামাপ বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের পদবন্ধের মাত্রামাপের সঙ্গে যথাক্রমে তিন, চার, সাত, পাঁচ হ'য়ে মিলে যাচ্ছে। এসব উদাহরণসহ আলোচনা করেছি। কবি আঠার মাত্রার তাল তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। তেরো ও সতের মাত্রার তাল রবীন্দ্রসংগীতে নেই।[২৫] গানের তাল-বৈচিত্র্য কবিতায় অবিকল আনা যায় না। রবীন্দ্রসংগীতে কবিতার চরিত্র আছে, সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতের সুরে গুরুতর কালোয়াতীপূর্ণ তানলয়ের কারবার নেই। সহজ চেতনায় সুর ও ভাষণের সৌষ্ঠবে ছন্দ, তান যতটা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা পাওয়া উচিত, ততটা আছে। সাধারণভাবে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ-সুষমা হলো কাব্য-ছন্দের সুষমা। এবং এই তান-সুষমা থাকার জন্য রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও তার সংলগ্ন সুরের বেগ শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে পৌছে দেয়। একথা ভেবেই রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোরীতি বিচার করা উচিত। কার্যতঃ রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ-বিচারে আমি সেভাবেই নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাবের মাধ্যম অনুসরণ করেছি। এই আলোচনায় প্রথাগত সংজ্ঞা-বিচার-পদ্ধতির অনুসৃতি থাকলেও কাব্যছন্দ ও সুরছন্দের সামঞ্জস্য দেখাতে গিয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করেছি। ছন্দ সম্পর্কে বহু চিন্তা-মনন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও বিতর্কও সমতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে বিতর্কসৃষ্টির চেষ্টা নেই আমার। রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোবোধকে এই কয়েকটি রূপকল্পে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রসংগীতেরই অসামান্যতাকে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রস্তাবনাগুলি :—

এক : কবিতার পর্বস্পন্দন ও মাত্রামূল্য এবং গানের তানলয়ের মাত্রামূল্য রবীন্দ্রসংগীতে একই প্যাটার্নে কতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা চলে। কবিতার ছন্দের বাঁধুনি ও সুরের তালের ছন্দ অবিকল সংলগ্ন হয়ে গেছে।

দুই : বিভিন্ন প্রয়োগ-শৈলীতে ছন্দের রূপ ও বিচিত্র লয়-প্রকরণ আছে রবীন্দ্রসংগীতে।

তিন : স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য-ছন্দের অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্ত তিনরীতির প্রয়োগে সীমাহীন সাফল্য লক্ষ্য করা যাবে।

চার : প্রচলিত ছন্দের তিনরীতির বহির্ভূত রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ছন্দ-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের প্রয়োগে।

অতঃপর এই প্রস্তাবনাগুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়।

দুই

প্রথম প্রস্তাবনা :

বাক্‌ছন্দের মাত্রা-স্পন্দনে ও সুরের তালের মাত্রায় অর্থাৎ গানে ও কবিতায় সম-ছন্দের প্যাটার্ন বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ ও গানের মাত্রা বা তাল একই বা অবিকল চেহারায় রূপায়িত হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এভাবে কবিতার তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রার পর্বস্পন্দন এবং গানের দাদ্‌রা, কাহার্বা, ঝম্পক বা ঝাঁপতাল, তেওরা তালের লয়-ঝোঁক ইত্যাদির সাধর্ম্য বা মিল লক্ষ্য করা যায়।

তিন মাত্রিক পর্বস্পন্দন ও সুরের তাল :

বাংলা তিন রীতির ছন্দে তিন মাত্রার পর্ব স্বীকৃত নয়। চার মাত্রার পর্বই হ্রস্বতম পূর্ণ পর্ব বা পর্বাঙ্গ। কবিতায় তিন মাত্রিক পর্ব না হলেও সুরে ছয় মাত্রার দাদ্‌রা তালের লয়কে অর্ধ-লয় তিন মাত্রায় করা যায়। কবিতার অবয়বে তিন-এর ছন্দ কি রকম ?

(কবিতায়) বসন্ : ত বায় | সন্ না : সী হায়্ | চৈৎ ফা : গুণের |

(গানে) তোমার। সঙ্ গে | বেঁধেছি | আমার | প্রা •• | ••ন্ |

পড়বে | না মোর্ | পা য়ে র্ | চি ন্ হ | এ ই বা | টে •• |

চার মাত্রার ছন্দ, লয় (কবিতায় ও গানে)

(মাত্রাবৃত্তে) মনে পড়ে | দুই জনে | জুঁই তুলে | বাল্যে

নিরালায় | বন ছায় | গেঁথেছিনু | মাল্যে

(গানে) ধনেকৃথ | নে০০০ | শবৃবরী | শিহরিয়া | উ০ঠে০ | হা০০য় |
ধরবায়ু | বয় বেগে | চারিদিক | ছায় মেঘে |

পঞ্চমাত্রিক পর্বস্পন্দন ও ঝম্পক বা ঝাঁপতাল

পাঁচ মাত্রায় পর্বস্পন্দন রবীন্দ্রনাথকে বেশি অনুপ্রাণিত করে। ৩+২ মাত্রা ভাগের পর্ব তাঁর কবিতায় ও গানের ছন্দে বেশি দেখা যায়।

ঘুমের : দেশে | ভাঙিল : ঘুম | উঠিল : কল | স্বর ;
পঞ্চ : শরে | দগ্ধ : করে | করেছ : একি | সন্না : সী | ;
যেমন : আছ | তেমনি : এস | আরকো : রোনা | সাজ ; ইত্যাদি।

কবি বলেন—"এ ছন্দে পাঁচ মাত্রার ভাগ ক'রে থামতে চায় না।" (ছন্দ পৃঃ ১৫৫)। এই ৩+২ মাত্রার পর্বস্পন্দন গানের ক্ষেত্রেও কবিকে অনুপ্রাণিত করে ; ফলে ঝাঁপতালের ২+৩ ঝোঁককে উল্টে নিয়ে ৩+২ (ধিধিনা | ধিনা) তালে নতুন ঝম্পক তাল সৃষ্টি করলেন | সুরের তাল অপেক্ষা কবিতার ছন্দ কবিকে প্রধানতঃ প্রভাবিত করে বলেই গানের ভাষাও ৩+২ ক্রমহ্রাসমান পর্বাঙ্গ রীতিতে রচিত হয়েছে দেখতে পাই। যেমন :

শ্রাবন্ : ঘন | গহন্ : মোহে | গোপন্ : তব | চরন্ : ফেলে |
নিশার্ : মত | নীরব্ : ওহে | সবার্ : দিঠি | এড়ায়ে : এলে |

এ'রকম মাত্রাস্পন্দন তাঁর আরও অনেক গানে আছে—

ঝড়ের : রাতে | তোমার : অভি | সার,
পেয়েছি : ছুটি | বিদায় : দেহো | ভাই,
নিবিড় : অমা | তিমির : হতে | বাহির : হল | জোয়ার : স্রোতে ;
বিরস : দিন | বিরল : কাজ | প্রবল : বিদ্ | রোহে ;
বাহির : পথে | বিবাগী : হিয়া | কিসের : খোঁজে | গেলি ;
বাইরে : দূরে | যায়রে : উড়ে | হায়রে : হায় ; ইত্যাদি।

উল্লিখিত গানগুলির কবিতার ছন্দ ৩+২ পর্বিক এবং গানগুলিতে সুর প্রয়োগও ৩+২ ঝম্পকতালে নিবদ্ধ করা। ১০ মাত্রার পূর্ণ ঝাঁপতাল বা ২+৩ অর্ধ ঝাঁপতালের অনুরূপ কাব্যছন্দ তাঁর গানে বেশি নেই। ৩+২ কাব্যছন্দের 'তিমিরময় নিবিড় নিশা' গানটিকে সুরে ২+৩ তালে বসিয়েছেন কবি। যেমন :

তিমি : রময় | নিবি : ড়নিশা | না ০ : হিরে ০ | না ০ : হি দিশা |

কিন্তু কবিতার ছন্দের মাত্রাস্পন্দন গানটির অবয়বে স্পষ্ট এভাবে (৩+২)

তিমির : ময় | নিবিড় : নিশা | নাহিরে : নাহি | দিশা

একেলা : ঘন | ঘো ০ র : পথে | পান্থ : কোথা | যাও

এরকম কাব্যছন্দ ও সুরের তালের গরমিল বেশি দেখা যায় না। ছন্দ ও তালকে সমান্তরাল পথে চালিত হতেই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায় রবীন্দ্রসংগীতে।

ষষ্ঠ মাত্রিক পর্বস্পন্দন ও তাল কবিতায় ও গানে

রবীন্দ্রকবিতায় ষষ্ঠ মাত্রিক ছন্দঃস্পন্দন বেশি আছে। যেমন—

সেদিন বরষা | ঝরঝর ঝরে | কহিলা কবির | স্ত্রী ; আর কতদূরে।

নিয়ে যাবে মোরে | হে সুন্দরী ; ভোর থেকে আজ | বাদল ছুটেছে।

আয় গো আয় ; বহু দিন হলো | কোন্ ফাল্গুনে,

এ নহে মুখর | বন মর্ মর | এ যে অজাগর | গরজে সাগর ; ইত্যাদি।

গানে ৬ মাত্রার দাদরা তাল সম্ ও ফাঁক ৩+৩ মাত্রায় বিভক্ত।

(সুরে) প্রতিদি | ন হায় | এসে ফি | রে যায় | কে ০০ | ০ সখি |

কবিগুরু ৬ মাত্রাকে অভিনব ষষ্ঠী তালে সৃষ্টি করলেন। ২+৪ কিংবা ৪+২ মাত্রায় নিবদ্ধ দ্রুত ও বিষম ঝোঁকের চমৎকার ছন্দ।

জয় : করে তবু | ভয় : কেন তোর | মুখে : হাসি তা |

এ ০ : বার এ ০ | ল ০ : স ০ ময়্ | রে ০ : ০ তো ০ র্ |

সুরে ২+৪ ছন্দের তাল কবিতার ছন্দে অবশ্য ভিন্ন পর্বস্পন্দনে চিহ্নিত।

—জয় করে তবু | ভয় কেন তোর | যায় না,

—এবার এস | সময় রে তোর | শুকনো পাতা | ঝরা

যায় বেলা যায় | রৌদ্র হল | খরা |

সপ্ত মাত্রিক কাব্য ছন্দ ও তেওরা তালের লয়।

পাঁচ মাত্রার পর্বস্পন্দন ও ঝম্পকতালের মাত্রা-লয় যেমন ঐক্যমুখী হ'য়ে রবীন্দ্রকবিতায় ও গানে এসেছে, সপ্তমাত্রিক কবিতার পর্বস্পন্দন ও সাত মাত্রার তেওরা তালের প্যাটার্নও রবীন্দ্রকবিতা ও গানে অনেক আছে। বেলা যে পড়ে এল জলকে চল, এমন দিনে তারে বলা যায়, খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে কবিতার ক্রমহ্রাসমান তিন-দুই-দুই পর্বছন্দ লক্ষ্য করি।

—পুরাণো : সেই : সুরে | কেযেন : ডাকে : দূরে | কোথা সে : ছায়া : সখি |

—খাঁচার : পাখি : ছিল | সোনার : খাঁচা : টিতে | বনের : পাখি : ছিল |

গানের কাব্যছন্দ এবং সুরের তেওরা তালের লয় একই রূপকল্পে বাঁধা—

—জড়ায়ে : আছে : বাধা | ছাড়ায়ে : যেতে : চাই | ছাড়াতে : গেলে : ব্যথা |
—হৃদয়ে : মন : ত্রিল | ডমরু : গুরু : গুরু | ঘন মে : ঘের : ভুরু |
—ধ্বনিল : আহ : বান | মধুর : গম্ : ভীর | প্রভাত : অম্ : বর |
—মাত্রি : মন্ : দির | পুণ্ণ্য : অঙ্ : গন | করম : হোজ্ : জল |

সাত মাত্রার ছন্দ কবিতায় ও সুরের লয়ে ললিত ও সুলোলিত ঝংকার সৃষ্টি ক'রে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ ক'রে যায়। 'হৃদয়ে মন্দ্রিল' গানটি ৩।২।২ লয় অপেক্ষা ৩।৪ মাত্রার লয়ে বিন্যস্ত ও দোলায়িত, ভাব-ভাষার উপযোগী সুর ও লয়ের গাম্ভীর্যে। গানের কথার ছন্দ ও সুরের ছন্দ এক রেখে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানে সুর বসানো। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—সংস্কৃতে এ ছন্দ বেশি প্রচলিত নেই। কবিগুরু প্রত্নরীতির উচ্চারণ ভঙ্গিতে সপ্তমাত্রিক কাব্যছন্দ ও তেওড়ার তালে সুরে বসালেন জাগো জাগো রে জাগো সংগীত, মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, বিখ্যাত গান দুটিকে।

আরও কিছু তালের লয় ও কবিতার ছন্দ।

আট মাত্রার বিষমপদী তাল রূপকড়া (৩+২+৩), নয় মাত্রার নব তাল, একাদশ মাত্রায় একাদশী, আঠারো মাত্রায় নব পঞ্চতাল কবিগুরুর নতুন সৃষ্টি। এরকম তালের ছন্দ কবিতায় চলে না। রবীন্দ্রকবিতা ও কাব্যসংগীতে এমন ছন্দ নেই। তবে নয় মাত্রার কাব্য ছন্দ ও নবতাল আংশিকভাবে দেখি—

নিবিড় : ঘন : আঁ ০ : ধারে | জ্বলিছে : ধ্রু : তা ০ : রা ০ |
মনরে : মোর : পা ০ : থারে | হোসনে : দিশে : হা ০ : রা ০ |

নয় মাত্রার ছন্দের প্যাটার্ন রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যসংগীত নিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি এই গানগুলিতে কাব্যছন্দ বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন যা আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। ৫ | ৪, ৩ | ৬, ৩ | ৩ | ৩ মাত্রার পর্ববন্ধ কবিতায় পরীক্ষিত হ'লেও গানের সুরে নিবদ্ধ করেছেন সেই ছন্দ সেই লয়।

(কবিতায়) ব্যাকুল : বকুলের ফুলে | ভ্রমর : মরে পথ ভুলে (৩ | ৬)
যে কাঁদনে হিয়া : কাঁদিছে | সে কাঁদনে হিয়া : কাঁদিল (৬ | ৩)
আঁধার : রজনী : পোহাল | জগৎ : পুরিল : পুলকে (৩ | ৩ | ৩)
দুয়ার মোর : পথ পাশে | সদাই তারে : খুলে রাখি (৫ | ৪)

(সুরে)　ব্যাকুল | বকুলের ফুলে | ভ্রমর | মরে পথ ভুলে।
যে কাঁদনে হিয়া | কাঁদিছে | সে কাঁদনে হিয়া | কাঁদিল |
আঁধার | রজনী | পো ০ হা | লো ০০ |
জগত | পুরিল | পু ০ ল | কে ০০ |
দুয়ার মোর পথ পাশে | সদাই তারে খুলে রাখি |

কবিতার ছন্দে ও গানের তালে মিল থাকলেও গানের সুরের তালে কিছু স্বাতন্ত্র্য এসেছে। আসাটা স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ ও গানের তালের ছন্দ ভিন্ন প্যাটার্নে রূপ নেয়; কেননা গান সর্বদাই কবিতা নয়—কখনো কখনো কবিতা। বিশেষ ক্ষণেই কবিতা ও গানের কবিতা একাত্ম হয়ে যায়; ছন্দঃস্পন্দন, মিল, ঝোঁক এক হয়ে যায়। আবার কবিতার ছন্দের অবয়বে সুরও সংশ্লিষ্ট হয়, ছন্দ ও তাল একই লয়ে বাজতে থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এ কেবল রবীন্দ্রসংগীতেই কিছু দেখতে পাই—অন্যত্র নয়। এই যে সামান্য কিছু মিলের উদাহরণ আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি—এটা কোনো মতবাদ বা থিওরি হিসেবে নয়। এ কেবল এক অনুসন্ধানের চেষ্টা।

দশ মাত্রার ঝাঁপতাল ও সুরফাঁকতাল কাব্য-ছন্দে স্বভাব-জ হ'তে দেখি না। তবে ৫+৫ পর্বের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় চমৎকার চলে। এবং ১০ মাত্রার বড় পর্ব অক্ষরবৃত্তের মহাপয়ার ছন্দে প্রযুক্ত হয়। ১০ মাত্রার তাল বৈচিত্র্যে কবিতার ছন্দে চলে না। তবে রবীন্দ্রনাথ ১০ মাত্রার কাব্যছন্দ একটি রচনায় দেখিয়েছেন—

বাজিবে : সখি বাঁশি : বাজিবে
হৃদয় : রাজ হৃদে : রাজিবে (৩+৪+৩)

গানটির কাব্যছন্দ ও পর্বস্পন্দন ৩।৪।৩ মাত্রার লয়ে বিধৃত হলেও কবি গানটিকে তেওরা তালের সুরে বসিয়েছেন—

I বাজিবে। সখি। বাঁশি I বাজিবে। ০০। ০০।
I হৃদয়। রাজ। হৃদে I রাজিবে। ০০। ০০। (৩।২।২)

রবীন্দ্রসৃষ্ট একাদশী তালের (১১ মাত্রার) সুরের ছন্দের প্যাটার্ন ভিন্ন রকম হলেও প্রাচীন বাংলায় একা বা একাবলী ছন্দ এগারো মাত্রার ছিল। যেমন:

চামেলীর ঘনছায়া। বিতানে
বনবাণী বেজে ওঠে। কী তানে =৮+৩

কবি দেখিয়েছেন, একাদশী তালের সাদৃশ্যে কবিতার ছন্দ হতে পারে।

কবিতায় : কাঁপিছে দেহলতা। থর থর।

চোখের জলে আঁখি। ভর ভর। =৭+৪ লয়ের ছন্দ

গানে :

কাঁপিছে দেহ লতা থর থর I চোখের জলে আঁখি ভর ভর ৩।৪।৪

কবি বলেন—"সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম।...এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব।" (ছন্দ : পৃষ্ঠা ২২)

গানের সুরে দ্বাদশ তালের চৌতালের ছন্দ। কবি বলেন—"এই বার-মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন নয়। এই তো বার মাত্রা" (ছন্দ পৃ: ২৬)। কবি উদাহরণ দিলেন গানে :

বনের পথে পথে বাজিছে বায়। নুপুর রুনুঝুনু কাহার পায় (১২।১২)

কবি বলেন—"লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তাল-ওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।" (ছন্দ পৃ: ২৬)

এভাবে দেখা যাচ্ছে, কবিতার 'সংগীত-ধর্মের' ও সংগীতের 'কাব্য-ধর্মের' অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত্য ছিল না। গতানুগতিক কাব্য-ছন্দ ছাড়া সংগীত-উপযোগী ছন্দকেও তিনি কবিতায় আরোপ করেছেন। ছন্দ-মুক্তির বিশেষ প্রয়াস তাঁকে নতুন তাল আবিষ্কারে (ছয়টি নতুন তাল) অনুপ্রাণিত করেছে। এখানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে দুজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করি। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা বলেন—"গানের কাব্যাংশকে মর্যাদা দিতে হলে ছন্দের গতি এমন করতে হবে, যাতে সুর সংযোজনার পরে কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ না হয়। সংগীতের গতি সাবলীল রাখবার জন্য এবং কাব্যাংশকে মর্যাদা দেবার অনুপ্রেরণায় তিনি নিত্য নতুন পথের অনুসন্ধান করেছেন, নতুন তাল কয়টির সৃষ্টির উৎস-স্থল হলো সেই একই প্রেরণা।"[২৬] কবিতার ছন্দকে গানে সঠিক রূপায়িত করার কারণ হিসেবে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলছেন—"গীত রচয়িতা (রবীন্দ্রনাথ) আগে গানের কথাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে সুর যোজনা করেছেন। এই কয়টি গানে কথার বাঁধুনি ও ছন্দের গতি এমনভাবে মিশে আছে যে, তাকে সুর যোজনার সময় কোন রকমে বদলান সম্ভব হয়নি।"[২৭] উক্ত দুটি মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের ছন্দ-চিন্তা সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি। গানের সুর ও সুরবিস্তারে ওস্তাদি-খবরদারি দীর্ঘকাল চ'লে আসছে। রবীন্দ্রনাথ গানের সুরকে কথায় সম্পৃক্ত করলেন ; আর সুর ও কথাকে ছন্দের ও লয়ের নির্দিষ্ট বন্ধন থেকে অনেক মুক্ত করে আনলেন। তিনি বলেন—"আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব, তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে" (ছন্দ পৃঃ ২৮)। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা ভাষায় কবিতা ও কাব্যসংগীতে বাক্‌ছন্দ ও সুরছন্দের সন্নিপাত এবং এমন দীর্ঘায়িত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কেউ করতে পারেন নি, এখানেই কবিগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব।

তিন

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা :

রবীন্দ্রনাথ সুরের তানলয়কে নিবিড় নৈকট্যে ও মিল-সংগতিতে ভাবতে পেরেছিলেন ব'লে ছন্দ-প্রকরণে এমন বিস্ময়কর সফলতা লক্ষ্য করি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দের কিছু রূপ-প্রকরণের শৈলী ও বৈচিত্র্য উল্লেখ করছি।

(ক) কবিতার ছন্দকে গানে রূপ দেবার সময় লয়ের বা তালের মাত্রা বদল করেছেন কবি। কেন করলেন ? প্রথমতঃ কবিতার ছন্দকে সুরে মানতেই হবে এমন বাধ্যতা নেই ; সুরে কবিতাকে যেকোন রকম ছন্দে দাঁড় করানোর অসুবিধে নেই। দ্বিতীয়তঃ—"গানের সুরের সাহায্যে অন্য তালের ভিতর দিয়েও সেই ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়।···গানের কথার রসকে আরও সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাই হলো সুরের কাজ।"[২৮] তৃতীয়তঃ কবিতার ছন্দোধৃত বাণীর ভাব ও রস-সংস্কার বদলে দিতে, কিংবা বৈচিত্র্য আনতে ছন্দ বদল করার আবশ্যকতা আছে। দৃষ্টান্ত :

কাব্যে ছয় বা তিন মাত্রা : হৃদয়। আমার। নাচেরে। আজিকে।

গানে হলো চার মাত্রা : হৃ ০। দয় I আ ০। মা র I না চে। রে ০ I

কাব্যে সাত মাত্রার পর্ব :

যদি) বারণ কর তবে। গাহিব না

যদি) বিরলে মালা গাঁথা। সহসা পায় বাধা।

তোমার ফুল বনে। যাইব না

গানে হলো আট মাত্রার লয়ের ছন্দ :

যদি I বা ॰ । র ণ । বর । তবে I গা ॰ । হিব । না ॰ । ॰ ॰ I

(খ) রবীন্দ্রনাথ কবিতায় স্বাভাবিক ছন্দ-প্যাটার্নকে গানের সুরে ভিন্ন ঝোঁকে নিয়ে এলেন। কবিতার চরণে প্রথম পদের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক (stress) পড়ছে, কিন্তু গানে সেই ঝোঁক বা সম্ পড়ছে দ্বিতীয় অক্ষরে।

দৃষ্টান্ত :

কবিতায় : তুমি তো সেই। যাবেই চলে। কিছু তো না। রবে বাকি।

গানে : তু। ´মি ॰ তো। ´সেই যা। ´বে ই চ। ´লে ॰ কি।

´ছু ॰ তো। ´না ॰ র। ´বে ॰ বা। ´কি ॰ তু।

কবিতায় : দখিন হাওয়া। জাগো-জাগো। জাগাও আমার। সুপ্ত এ প্রাণ।

গানে : দ। ´খিন হাও। ´য়া ॰ ॰ জা। ´গো ॰ ॰ জা। ´গো ॰ ॰।

কাব্যের ছন্দঃস্পন্দন বা ঝোঁক গানের স্বরস্পন্দন বা ঝোঁক স্থানান্তরে পড়েছে। ফলে এই ঝোঁক বা সম্ সুরের বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কবিতার ছন্দ সুরে রক্ষা পায়নি।

(গ) ভিন্ন লয়ের গান ও ঢালা গান

সুরের ছন্দের অতি বিলম্বিত লয় কবিতায় ধরা যায় না, কিন্তু কাব্য-সংগীতে তার প্রয়োগ চলে। সূক্ষ্মভাবে ভাবলে বোঝা যায়, ধীর ও বিলম্বিত লয়ের কাব্য-সংগীত উচ্চারণ করার সময় একটি স্বরসংস্কার সক্রিয় হয় প্রচ্ছন্ন চেতনায়। ভাষা ও ভাবের গতির মতো মনে মনে সুরের গতিও একত্রে মিলে যায়। 'ধীরে ধীরে বও উতল হাওয়া'—গানটি আবৃত্তি করতে গেলেও কথাগুলিতে ধীর লয়ের চাল গড়ে ওঠে। গানের সুরেও সেই গতি—

ধী ॰ ॰ রে। ধী ॰ ॰ রে। ধী ॰ ॰ রে।

বও ॰ ওগো। উতল হা। ওয়া ॰ ॰।

ছন্দের অতিবিলম্বিত চাল কবিতায় সুসহ না হলেও ছন্দের অতি দ্রুত চাল কবিতায় বেশ চলতে পারে; গানের সুরের লয়ে এই অতিদ্রুত চাল অধিক প্রযোজ্য ও সুষমাময়। রবীন্দ্র-সংগীতে কাব্য-ছন্দের দ্রুত চাল প্রযুক্ত হয়েছে এমন গানগুলো : শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, এক সূত্রে বাঁধিয়াছি

সহস্রটি মন, হে ভৈরব শক্তি দাও, শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, ইত্যাদি।

কেবল সুরনির্ভর তান-প্রধান রবীন্দ্র-সংগীত—যাতে কাব্য-ছন্দ, মিল, অন্ত্যমিল অনুপস্থিত মনে হলেও, এই সব ঢালা-সুরের গানের পদবন্ধে মাত্রা ও পর্বস্পন্দন আছে। এমন গানগুলো—বন্ধু রহো রহো সাথে, বাজে করুণ সুরে, সখি আঁধারে একেলা ঘরে, এসো শরতের অমল মহিমা, অশ্রু ভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে, বেদনা কি ভাষায় রে, নীলাঞ্জন ছায়া, তুমি কিছু দিয়ে যাও ইত্যাদি গানে তালের বন্ধন-মুক্তি ঘটেছে। এইসব ঢালা-গানে সুরের যথেচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ্যচারী সঞ্চরণ ও ভাবের চমৎকার গতি-বিহার আমাদের পুলকিত করে।

(ঘ) তাল-বৈচিত্র্য ও তাল-ফেরতা—

অনেক গানের ভাবের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ বাণীদেহকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুরছন্দে লীলায়িত করেছেন। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন স্তবক-বন্ধে কিংবা বিভিন্ন কলিতে দাদরা, কাহারবা, তেওরা, ঝম্পক, ষষ্ঠী, ঝাঁপতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তাল প্রয়োগ ক'রে সুরের বেগ সৌন্দর্য ও অসামান্য বৈচিত্র্য এনেছেন। এরকম গান হলো—

: নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ ঘুচাও সকল বন্ধ,
: মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নীপকুঞ্জ তলে
: ক্ষণে ক্ষণে শুনি অতল জলের আহ্বান,
: ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে, পরাণ মম জাগে
: হে নিরুপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে করিও ক্ষমা
: বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে,
: আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
: আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে,

(ঙ) গদ্যছন্দ রবীন্দ্রসংগীতের বাক্-প্রকরণে সহজ চলিষ্ণুতা এনে দিয়েছে

দৃষ্টান্ত : দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো
: এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা
: হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব
: যদি হায় জীবন পূরণ নাহি হল তব অকৃপণ করে,

: ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা

: ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে

: ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোর ম্লান স্মৃতি

: বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে ইত্যাদি।

উদ্ধৃতি নিয়ে এই গদ্য-ভঙ্গিম গানগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এদের ছন্দ-লয়, অন্ত্যমিল প্রভৃতি ও কাব্যছন্দের সাধারণ ঝোঁক বা স্পন্দন নানাভাবে বিদ্যমান। লক্ষ্য করা যাবে, কোনো কোনো গানের অমিত্রাক্ষর পংক্তির পর্ববন্ধগুলিতে নিয়মিত ও চমৎকার মিল-স্পন্দন। বাহ্যতঃ অমিত্রাক্ষর কিংবা গদ্যরীতির রচনা হয়েও ছন্দঃস্পন্দন ও মিলের অনিবার্য প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি এই অসামান্য গানগুলি। মিল, অন্ত্যমিলও স্পষ্টীভূত।

আরও দৃষ্টান্ত : মিলনের পাত্রটি। পূর্ণ যে বিচ্ছেদ। বেদনায়

অপূর্ণ হাতে তার। খেদ নাই আর মোর। খেদ নাই

বহুদিন বঞ্চিত। অন্তরে সঞ্চিত। কী আশা

চক্ষের নিমেষেই। মিটল সে পরশের। তিয়াষা

পর্বে পর্বে চমৎকার পর্বান্ত মিল ও ছন্দঃস্পন্দন ভ'রে আছে এই গান-গুলিতে। অমিত্রাক্ষর হয়ে প্রকৃতপক্ষে মিলের শিল্পের গুণে অভিনবত্ব লাভ করেছে রচনাগুলি। মিল ও মিলহীন পংক্তিতে ছন্দঃস্পন্দনের দৃষ্টান্ত :

দুকূখের বরষায় | চোকূখের জল যেই : নামলো

বোকূখের দরজায় | বন্ধুর রথ সেই : থামলো

কিংবা ঘুমের ঘন | গহন হতে। যেমন আসে | স্বপ্ন

তেমনি উঠে | এসো — | এসো— |

শমী শাখার | বক্ষ হতে | যেমন জ্বলে | অগ্নি

তেমনি তুমি | এসো — | এসো— |

ঈশান কোণে | কালো মেঘের | নিষেধ বিদা | রি— |

যেমন আসে | সহসা বিদ্ | যুৎ —

তেমনি তুমি | চমক হানি | এসো হৃদয় | তলে

এসো—তুমি | এসো —তুমি | এসো— | এসো—। (প্রে ৬৫)

শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলছেন—"ছন্দবদ্ধ রচনা যাতে আমরা মিল আশা করি, অথচ শিল্পিতার গুণে মিলের অভাব অনুভব করিনা, অমিত্রাক্ষর কথাটা শুধু

সেখানেই প্রযোজ্য। আর তারই সার্থক উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের স্বরাশ্রিত কবিতার মধ্যে হয়তো একমাত্র এই 'ঘুমের ঘন গহন হতে' গানটি। এবং এটি আন্তরিক মূল্যেও গরীয়ান।"[২৯] 'একমাত্র' কথাটিতে তথাগত ত্রুটি আছে মনে হয়, মিলহীন ছন্দঃস্পন্দিত গান ঐ একটিই নয়। গীতবিতানে ছন্দোবৈচিত্র্যে ও নানা-বিশিষ্টতায় এরকম গান আরো আছে। যেমন: অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে, এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা এশুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন ইত্যাদি। রবীন্দ্রসংগীতের বহু মিলনহীন পদবন্ধে ছন্দের তান লয় অনুভব করি। কাব্যছন্দের নিখুঁত মাত্রারীতির হিসেব ও ছন্দঃস্পন্দন গানে আশা করা চলে না, অথচ গানের স্বাধীনতা অনেক বেশী। তবুও গদ্যছন্দ আবিষ্কার ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভাবের শিল্পের সঙ্গে ছন্দতান ও লয়ের মূল্য বৃদ্ধি করেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোতে কবিতা ও সংলাপ দিয়ে নতুন ধরণের ছন্দের পরীক্ষা করলেন। সংলাপে ও আবৃত্তি-যোগ্য কবিতাতে সুর সংযোগ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যে শিল্পের নতুন সম্ভাবনা এনে দিলেন।

দৃষ্টান্ত: আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা।
অরণ্যের পিতৃ মাতৃহীন ফুল। এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু।
তারপরে ধূলি সজ্জা। তার পরে ধরণীর চির অবহেলা (চিত্রাঙ্গদা)

গদ্য কবিতা হিসেবে রচনাটির মধ্যে ছন্দের স্পন্দন অস্পষ্ট নয়। কিন্তু—
কি যে ভাবিস তুই অন্যমনে নিষ্কারণে। বেলা বহে যায়,
বেলা বহে যায় যে। আঙিনা হয়নি যে নিকোনো। তোলা হলো না
জল। পাড়া হল না ফল। কখন বা চুলো তুই ধরাবি।

কিংবা: ওমা ওমা ওমা ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র। এখনি এখনি এখনি।
ও রাক্ষুসি, কি করলি তুই, কী করলি তুই। মরলি নে কেন।

এ গদ্য সংলাপ গতানুগতিক গদ্য রচনা নয়, ভাষণ-শৈলীর নতুন এক সম্ভাবনা। গদ্য কবিতায় তবু ছন্দ না থাকলে চলে; কিন্তু এই সংলাপ-ভঙ্গিম রচনায় সুরের ছন্দ প্রচ্ছন্ন হয়ে বাজছে, কান না পাতলেও শোনা যায়।

চার

তৃতীয় প্রস্তাবনা

গানে কাব্যগত ছন্দের তিন রীতির প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে কিনা, প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কোন সংশয় আসে না। কেননা, রবীন্দ্রসংগীত একাধারে কবিতা ও গান, কোন কোনটিকে বলা চলে কবিতার থেকেও উৎকর্ষতর। গানের কথাবস্তুতে ছন্দের রীতির আধিপত্য আজ পর্যন্ত কেউ বরদাস্ত করেন নি; সামান্য কিছু কথা নিয়ে সুরবিস্তারকেই বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে এ-যাবৎ। রবীন্দ্রনাথও একসময় গানে কথাবস্তুর গুরুত্ব স্বীকার করেন নি; তিনি ভাবতেন—"সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি, তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই আবশ্যক। কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায়, তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে।"[৩০] ১৩০১ সালের এই বক্তব্যটি সমকালীন অনেক অনেক বক্তব্য-এর সঙ্গে একরূপ হলেও পরে কিন্তু এই মত বদলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সুরের সঙ্গে কথার গুরুতর সম্পর্ককে তিনি মান্য করেছিলেন। সেজন্যই তাঁর কাছে ছন্দের উপযোগিতা নানাভাবে দেখা দিয়েছিল। তিনি প্রথম জীবনে ধ্রুপদাঙ্গের গান লিখেছিলেন সুরের নির্ভরে, যেখানে কাব্যছন্দ খুব বেশী প্রয়োজন হয়নি—কেননা সে সব গানের কথাবস্তু সামান্যই। কিন্তু মধ্য ও পরবর্তী জীবনে তিনি যে গান লিখলেন, সেগুলো মূল্যবান কাব্যসংগীত, ছন্দ সেখানে গুরুতরভাবে আবশ্যিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৩০৩ সালের পর তিনি গানের ছন্দ ও সুরের ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন।[৩১] এবং কবিতা ও সংগীতে ছন্দের প্রয়োগ যতদূর চলে, কবি তা ভেবে গেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ প্রসঙ্গে বলছেন—"তাল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলা যায়। তাছাড়া ছন্দের সমাদর তাঁর সকল কবিতায় ও গানে পাই।" তিনি আরও বলেন—"হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে রচনায় ও ছন্দ-মাধুর্যে তাঁর গান শতগুণে উন্নত, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।"[৩২]

আমরা বাংলা কাব্যের তিনরীতির ছন্দকে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য থেকে উদ্ধার করতে পারি। এই ছন্দের দায়িত্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীত কতটা নিকটবর্তী ছিল, তাও অনুধাবন করা যায় সহজে।

(এক) অক্ষর বৃত্ত বা যৌগিক রীতির পয়ার ছন্দ।

এই গুরুত্বপূর্ণ পয়ার জাতীয় ছন্দটির দীর্ঘ পর্বিক মাত্রা ও তানের ধ্বনি, সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট শব্দের মাত্রার রূপ, বিলম্বিত লয়, অসাধারণ শোষণ-শক্তি, স্থিতিস্থাপক ধর্ম, প্রবহমানতা ইত্যাদি ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য অন্যরীতির ছন্দগুলি থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে এই অক্ষরবৃত্তের রীতির ছন্দ বহু-ব্যবহৃত।

মধ্য দিনে যবে গান। বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল বেণু তব। বাজাও একাকী
প্রান্তর প্রান্তের কোণে।
রুদ্র বসি তাই শোনে।
মধুরের স্বপ্নাবেশে। ধ্যান মগণ আঁখি

গানটিতে পয়ারের চৌদ্দ মাত্রিক দ্বিপর্ব চাল অক্ষুণ্ণ আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ এক পর্বিক আট মাত্রার ধরা যায়। গানটির পঞ্চম চরণে আছে চৌদ্দ মাত্রার স্পন্দন, কিন্তু মগণ শব্দটি একটি মাত্রা বৃদ্ধিতে নিয়মের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেও সুরের লয় যথাযথ করেছে। এখানে মগণ শব্দটি 'মগ্ন' হলে মাত্রা সংখ্যা ঠিক থাকতো। কিন্তু 'ধ্যান-মগণ-আঁখি' পদবন্ধটিতে 'মগণ' শব্দটি অধিক উপযোগী হয়ে উঠেছে ধ্বনির সঞ্চরণে। গানের এ'ছন্দটি কাব্যগত ছন্দের মূল্য অপেক্ষা কেন বেশী অনুভব করা যাচ্ছে,—এর উত্তরে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাক্-প্রকরণে তাঁর অন্তঃপাতী সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে দিয়েছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—"তাঁর লেখা থেকে বোঝা গেল, অক্ষর সংখ্যার সমতা ও-ছন্দের ভিত্তি নয়, এবং ওটি আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ।" তিনি আরও বলছেন—"বস্তুত রবীন্দ্রনাথই এই যৌগিক ছন্দটিকে দৃশ্যমান অক্ষর সংখ্যার সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শ্রূয়মান ধ্বনির আকাশে মুক্তি দিয়েছেন।"[৩৩] প্রত্যেক ছন্দের মধ্যে ধ্বনির কতখানি গুরুত্ব তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত নিয়েই এ বিষয়ের আরও পর্যালোচনা করতে পারি।

যৌগিক ছন্দের (অক্ষর মাত্রিক) আরও কিছু উদাহরণ :

বেঁধেছ প্রেমের পাশে। ওহে দয়াময়
তব প্রেম লাগি। দিবানিশি জাগি। ব্যাকুল হৃদয়

এই গানটির আরম্ভ অক্ষরবৃত্ত রীতিতে, কিন্তু গানের কয়েকটি চরণে কবি মাত্রা-স্পন্দন ঠিক রাখতে চান নি সুর-ছন্দের জন্যই বোধ করি।

হৃদয়ে হৃদয় আসি। মিলে যায় যেথা।
হে বন্ধু আমার।
সে পুণ্য তীর্থের যিনি। জাগ্রত দেবতা।
তাঁরে নমস্কার।
বিশ্বলোক নিত্য যাঁর। শাশ্বত শাসনে। (পৃ ৫০১)

পুরো গানটিতে যৌগিক অক্ষরমাত্রা ছন্দের ৮+৬ প্যাটার্ন অক্ষুণ্ণ। যুক্ত ব্যঞ্জন, রুদ্ধ দল ইত্যাদির সমাবেশে পয়ারের গুরুত্ব এখানে পরিস্ফুট। এরকম—সর্ব খর্বতারে দহে তব রুদ্র দাহ, এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন ইত্যাদি অনেক গান আছে।

মহাপয়ার (৮+১০): হে মোর দুর্ভাগা দেশ। যাদের করেছ অপমান।
অপমানে হতে হবে। তাহাদের সবার সমান।

আসলে এটি একটি কবিতার গীতিরূপ। এই মহাপয়ার কাব্যসংগীতে বিশেষ উপযোগী হ'তে পারে না। কবিতার কাঠামোতে এই ভারি ছন্দের যোগ্য জায়গা। ৮+১০ অর্থাৎ ১৮ মাত্রার পংক্তির কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছেন মাত্র। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ মাত্রার পর্ব হিসেবে দশ মাত্রাকে চরম ধরেছেন। পয়ার, মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক বা মুক্তবন্ধ, ইত্যাদি ছন্দের প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ এই যৌগিক রীতির ছন্দটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বলাকায় চরণে চরণে ২ থেকে ২২ মাত্রা পর্যন্তও প্রয়োগ করেছেন। বলাকা কাব্যে মুক্তক ও মুক্তবন্ধ ছন্দের বিস্ময়কর লীলা দেখা যাবে। প্রথম প্রস্তাবনায় সুরের ছন্দ ও কাব্যছন্দের সমপ্যাটার্ন বোঝাতে যে উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করেছি এখানে সেরকম দু একটি পুনরাবৃত্ত হলো।

পয়ার (৮+৮): বর্ষ গেল বৃথা গেল। কিছুই করিনি হায়
অসীম আশ্বাসে তাই। পুলকে শিহরে কায় (পৃ ৪৪৪)

পয়ার (৮+৮): শুনেছে তোমার নাম। অনাথ আতুরজন
এসেছে তোমার দ্বারে। শূণ্য ফেরে না যেন (পৃ ৪৫১)
তোমারেই করিয়াছি। জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে কভু আর। হব নাকো পথ হারা (প্রে ১২১)

মহাপয়ার (৮+১০) : দুঃখের তিমিরে যদি। জলে তব মঙ্গল আলোক
মৃত্যু যদি কাছে আনে। তোমার অমৃতময় লোক (পৃ ১৯৩)
: অন্তরের বাণী তুমি। বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র। পরিপূর্ণ করি দিবে কবে (প্র ১৯৫)

(খ) সরল কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

এই ছন্দে বোধকরি রবীন্দ্র প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফূর্ত। নব্য ও প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্তে বহু রবীন্দ্রসংগীত রচিত। এরকম ছন্দের বহু গান নিখুঁত ছন্দের কবিতা হিসেবে পাঠ চলতে পারে বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। সম ও অসম মাত্রার পর্ব, সংশ্লিষ্ট শব্দে ধ্বনির বিস্তৃতি, মধ্য লয়, চরণে চরণে মাত্রা ও পর্বসংখ্যার বৈচিত্র্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এই ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায়। ছন্দটি সংগীতের পক্ষেও বেশী উপযোগী। কবিতা ও গানের বাণীতে এই ছন্দ বহুল ব্যবহৃত হয় বলেই মোহিতলাল এর নাম দিয়েছেন গীতিছন্দ।

চতুর্মাত্রিক প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত : গহন তি। মির নিশি। ঝিল্লি মু। খর দিশি
: রাত্রি প্র। ভা-তিল। উদিল র। বিচ্ছবি।

মাত্রাবৃত্তের চতুর্মাত্রক পর্বস্পন্দনে কথ্যরীতির ক্রিয়া, প্রস্বর ইত্যাদিতে একটি নৃত্য-ভঙ্গিম বৈশিষ্ট্য আসে। বহু রবীন্দ্রসংগীতে এই চলিষ্ণুতা দেখা যায়। দৃষ্টান্ত :

ওগো বধূ। সুন্দরী। তুমি মধু। মন্‌জরী।
পুলকিত। চম্পার। লহ অভি। নন্দন।
কিংবা : ছাড়ো ঘুম্। মেলো চোখ। অবসাদ। দূর হোক্
আশার অ। রুণা লোক। হোক অব্। ভু দয় রে

নৃত্যনাট্যের সংলাপেও চতুর্মাত্রক গতি-ভঙ্গিম ছন্দ কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন।

রৌদ্ র হ। তে ছে অতি। তিথ নো 0।
আঙিনা 0। হয়নি যে। নি কো নো 0।
কথন বা। চুলো তুই। ধরাবি 0। (চণ্ডালিকা)

পঞ্চমাত্রক পর্ব :—"পঞ্চমাত্র পর্বিক ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা এমন অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে যে, তারপর থেকে ও-ছন্দটি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, বাংলার কবি সমাজেরই প্রিয় ছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ এটি বাংলা

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান, এবং এ ছন্দ উদ্ভাবনের সমস্ত কৃতিত্ব-টুকু একা তাঁর প্রাপ্য"।[৩৪] রবীন্দ্রসংগীতে পঞ্চমাত্রিক অসম ছন্দের প্রচুর উদাহরণ আছে। ঝম্পক তালের মাত্রার সাম্য এখানে কত স্বাভাবিকভাবে এসেছে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

দৃষ্টান্ত : ডাকিল মোরে। জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে। বিভাস বাজে। প্রভাত হল। আঁধার রাতি।
: স্বপনে দোঁহে। ছিনু কি মোহে। জাগার বেলা। হল
: যাবার আগে। শেষ কথাটি। বোলো
: আধেক ঘুমে। নয়ন চুমে। স্বপন দিয়ে। যায়
শ্রান্ত ভালে। যূথীর মালে। পরশে মৃদু। বায়
: তোমার গীতি। জাগালো স্মৃতি। নয়ন ছল। ছলিয়া
বাদল শেষে। করুণ হেসে। যেন চামেলী। কলিয়া
: আমারে করো। তোমার বীণা। লহগো লহ। তুলে
উঠিবে বাজি। তন্ত্রী রাজি। মোহন অঙ্। গুলে
কোমল তব। কমল করে। পরশ করো। পরান 'পরে।
উঠিবে হিয়া। গুঞ্জরিয়া। তব শ্রবণ। মূলে

ষন্মাত্রক পর্ব রবীন্দ্রসংগীতে কম নেই। দৃষ্টান্ত :

আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, এবার অবগুণ্ঠণ খোলো, এসো নীপবনে ছায়া বীথি তলে, নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর, কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন দিয়ে যাও, হে সন্ন্যাসী হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য ইত্যাদি।

: হিম গিরি ফেলে। নীচে নেমে এলে। কিসের জন্য।
কুন্দ মালতী। করিছে মিনতি। হও প্রসন্ ন। (প্র ১৮৭)
: এপথে আমি যে। গেছি বার বার। ভুলিনি তো এক। দিনও
আজিকে ঘুচিল। চিহ্ন তাহার। উঠিল বনের। তৃণ

প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত :
দে 0 শ দে 0 শ। নন্ দিত করি। মন দ্রিত তব। ভে 0 রী 000।
ভুবনেশ্বর। মো 0 চন কর। বন হে ধন সব। মো 0 চন্ কর।

সপ্তমাত্রক পর্ব ও ছন্দ রবীন্দ্রসংগীতে :

সপ্তামাত্রক ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ভারতচন্দ্র ছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী প্রচলন নেই। ভারতচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ একে আনলেন বাংলায় এবং বিপুল পরিমাণে।— "হৃদয় আজি মোর। কেমনে গেল খুলি। জগৎ আসি হেথা। করিছে কোলাকুলি।" (প্রভাতসংগীত)। প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেছেন— দুঃখের বিষয়, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে এই সপ্তমাত্র পর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। অন্যান্য কবিদের রচনাতেও খুব সুলভ নয়।"[৩৫] পাঁচ ও ছয়মাত্রার পর্বের ছন্দ-প্রাবল্যে এ ছন্দ কিছুটা উপেক্ষা পেয়েছে সত্য, বিশাল রবীন্দ্রকাব্যে এদের সংখ্যা অনুপাতে কম মনে হলেও গানে এদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। পূর্বে লিখিত উদাহরণগুলো এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরাবৃত্ত হলো।

কবিতায় :—বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল, এমন দিনে তারে বলা যায়, খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে ইত্যাদি কবিতায় সাত মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

গানে :— জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, জীবনে যত পূজা হলো না সারা, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, এমন দিনে তারে বলা যায়, ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর ইত্যাদি।

(প্রত্নমাত্রাবৃত্তে) : জাগো জাগো রে জাগো সংগীত,
মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গানের কাব্যছন্দকে সুরছন্দের নয়, দশ, এগার মাত্রার তালের রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর যুক্তিটা মেনে নিয়েও আমরা নিম্নলিখিত গানগুলোর প্রথম পর্বে সুনির্দিষ্ট সপ্তমাত্রক পর্ব স্পন্দন লক্ষ্য করেছি। অনেক ছান্দসিকের মতে দশমাত্রার পর আর কোন মাত্রা বাড়ানো যাবেনা কোন পর্বে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ৯, ১১ মাত্রক কাব্যছন্দের সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাইহোক, সাধারণ কাব্যছন্দের সাত মাত্রার পর্ব-স্পন্দন লক্ষ্য ক'রে এদের এই দলে রাখা যায়। যেমন :

(প্রথম পর্বে সাত মাত্রা)

—দুয়ারে দাও মোরে। রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ। কাজে হে (পূ ১১০)

—বাজিবে সখি বাঁশি। বাজিবে
হৃদয় রাজ হৃদে। রাজিবে
বচন রাশি রাশি। কোথা যে যাবে ভাসি। (প্রে ১১৫)

—কাঁপিছে দেহলতা। থর থর
চোখের জলে আঁখি। ভর ভর (প্র ৩৫)

—একদা তুমি প্রিয়ে। আমারি এ তরুমূলে।
বসেছ ফুল সাজে। সে কথা যে গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী। নিরবধি সে ভোলেনি। (প্রে ২৯৩)

শেষ গানে ৭+৮ মাত্রায় ভাগ করা যায়। এখানে সাত মাত্রার প্রথম পর্বটির পরেই আট মাত্রার বড় পর্বটি কবিতার ছন্দ হিসেবে অধিক উপযোগী বলে মনে হয়েছে। ছন্দের গতি ও স্পন্দনে স্বরধর্মের সঞ্চার আবশ্যিক। এই গানটিতে ৭+৮ মাত্রার সংলগ্ন পর্বটিতে এক বিলম্বিত লয়ের কাজ আছে বলেই আটমাত্রার পর্ব এখানে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রীতির ছন্দে অক্ষরের মাত্রা-সংখ্যা বা পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা-সংখ্যাবিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এখনও করা যায় নি।

আমরা আরও কয়েকটি গানের কাব্যছন্দ নিম্নরূপ বিবৃত করছি।

—উদয় গিরি হতে। উচ্চে কহো মোরে।
তিমির লয় হল। দীপ্ত সা—গরে

—সুনীল সাগরের। শ্যামল কি—নারে।
দেখেছি পথে যেতে। তুলনাহী—নারে

—যখনি চলে যাই। আসিব বলে যাই।
আলোছায়ার পথে। করি আনাগোনা—।

গানগুলোর প্রত্যেক পর্বে ৩,২।২ কিংবা ৭ মাত্রার পর্ব স্পষ্টীকৃত। ধ্বনি-প্রধান ছন্দ ব'লেই কোন কোন পর্বান্তর্গত অক্ষরকে একমাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে সাত মাত্রার চলনকে ঠিক রাখার অসুবিধা নেই।

এ তিনটি উদাহরণের দ্বিতীয় পর্বগুলোতে কাব্যছন্দের একমাত্রার সংকোচ

অপূর্ব কৌশলে সুরধর্ম বা সুরের ছন্দকে সৃষ্টি করছে। ছন্দের অভাবটা সুরধর্মে পূরণ হয়, তাতে এক ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন সুষমা। বৃদ্ধিটাই বরং দোষের ; কাব্য-ছন্দের মাত্রার ঘাটতি গানের বাণীতে সুরের ছন্দের দ্বারা পূরণ করার মধ্যে নির্দিষ্ট প্রকরণ আছে। 'তুলনাহীনারে' পর্বটির হী অক্ষরটিকে সুরে বাড়িয়ে নিয়ে পর্বের নির্দিষ্ট সপ্তমাত্রার স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হলো। গান না হয়ে এগুলো কবিতা হলেও এদের এই সৌন্দর্যটুকু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আরও দৃষ্টান্ত :

কাঁদালে তুমি মোরে। ভালোবাসারি ঘায়ে। নিবিড় বেদনাতে।
পুলক লাগে গায়ে ; চরণ রেখা তব। যে পথে দিলে লেখি।
চিহ্ন আজি তারি। আপনি ঘুচালে কি। ইত্যাদি।

সপ্তমাত্রক ছন্দের এত উদাহরণ সংকলন করলাম এইজন্যে যে, রবীন্দ্র-সংগীত যদি রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি পায়, তাহলে সপ্তমাত্রক ছন্দের দৃষ্টান্ত যে বিরল নয়, এর থেকে প্রমাণ হবে। রবীন্দ্র-সংগীতে এই ছন্দ আরও অনেক লক্ষ্য করেছি। সংগীতের বাণীদেহে অনেক জায়গায় নির্দিষ্ট ছন্দঃস্পন্দনের পারম্পর্য ও রীতি রক্ষা পায় নি। একই গানের অন্তরা বা সঞ্চারি অংশেও বিভিন্ন মাত্রার পর্ব এসেছে। উদাহরণ—না না গো না করো না ভাবনা। স্থায়ী ও আভোগ অংশ বাদ দিলে অন্য অংশগুলোতে সপ্তমাত্রক পর্ব স্পষ্টীভূত।

যখনি চলে যাই। আসিব বলে যাই।
আলোছায়ার পথে। করি আনাগোনা
দোলাতে দোলে মন। মিলনে বিরহে
বারে বারেই জানি। তুমিতো চির হে ইত্যাদি।

অষ্টমাত্রক-পর্ব :

অষ্টমাত্রক পর্ব মাত্রাবৃত্তে না থাকার কারণ হলো, চতুর্মাত্রক পর্বে ভাগ হয়ে তার স্থিতি নেবার ঝোঁক খুব বেশী! প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—"আটমাত্রার পর্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই।" দৃষ্টান্ত :

—ফাগুনের পূর্ণিমা। এলো কার লিপি হাতে। মাধবীর মঞ্জরী। মনে আনে বারে বারে। এই গানটিকে চার মাত্রার পর্বে ভাগ করা চলে—ফাগুনের। পূর্ণিমা। এলো কার। লিপি হাতে। মাধবীর। মঞ্জরী। ইত্যাদি।

আজি) ক্ষুব্ধ নীলাম্বর। মাঝে

সুদূর দিগন্তের। সকরুণ সংগীত। লাগে মোর চিন্তায়। কাজে

কাব্যসংগীতে আট মাত্রার পর্ব থাকার অসুবিধে নেই, ধ্বনিলয়ের সৌষ্ঠবে তার উপস্থিতি অনিবার্য। দৃষ্টান্ত :

এলো যে শীতের বেলা। বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো। লও গো ভরে

কিংবা : হেরিয়া শ্যামল ঘন। নীল গগনে
সেই) সজল কাজল আঁখি। পড়িছে মনে
অধর করুণ মাখা। মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাক। বিদায় ক্ষণে

এরূপ অনেক গানে অক্ষরবৃত্ত রীতির ছন্দে আটমাত্রার পর্ব আছে। সাধারণতঃ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে আটমাত্রার পর্ব স্বীকৃত নয়। সংগীতের অষ্টমাত্র-পর্বিক বাণীদেহে স্বচ্ছন্দ ধ্বনি-স্পন্দন ও চমৎকার দীর্ঘ লয়ের বিকাশ; আটমাত্রার পর্বকে চারমাত্রায় ভাগ ক'রে নিলে ভাবছন্দের বিঘ্ন ঘটতে পারে, কেননা গম্ভীর ধীর লয়ের মূর্চ্ছনা ছোট পর্বের চটুল ঝোঁকে পড়ে গুরুত্ব হারাতে পারে। আশ্চর্যের কথা, উপরে উদ্ধৃত আট মাত্রার পর্বগুলোতে চার মাত্রার পর্বে বিভাগ না করারই অলিখিত নির্দেশ লক্ষ্য করি। যাইহোক, সংগীতের ভাষণ-শৈলী তার নিজস্ব একটা মূল্যের অধিকার পায়, কারণ এরা কেবল কবিতা নয়—সুরসংগতিতে ঐশ্বর্যশালী। প্রচলিত ছন্দোরীতির নিয়মকানুনের বাধা লঙ্ঘন করতে সংগীতের পক্ষে কোনো বাধা নেই। সেজন্যই বোধকরি, রবীন্দ্র-সংগীতের কবিতা নিয়ে ছন্দচিন্তা ও ছন্দ-নিরীক্ষার বিপুল সুযোগ রয়ে গেছে।

নয় মাত্রার পর্বস্পন্দন :

এই বোধ নিয়েই মাত্রাবৃত্তের নয় বা দশ মাত্রার পর্ব রবীন্দ্রসংগীতে লক্ষ্য করতে পারি। নয় মাত্রা কিংবা এগারো মাত্রায় পর্ব-স্পন্দন যথার্থ কিনা পণ্ডিত মহলে বিতর্ক উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও তাতে যোগ দিয়ে যুক্তি খাড়া করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তন্ময়ভাবে তাঁর কবিতায় ও গানে সুরছন্দের প্যাটার্ন নিয়ে মগ্ন ছিলেন, একথা স্বীকার করতে হয়। তাঁর ছন্দ-চেতনা কতটা সূক্ষ্ম, সমর্থ ও যথার্থ ছিল, তা কারও অজানা নেই।

নয় মাত্রার পর্ববন্ধে রবীন্দ্রসংগীত পাওয়া যায় না। একটি গানকে এই-ভাবে ভাগ ক'রে দেখা যাক্।

মধুর বসন্ত এসেছে। মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয় সমীরে। মধুর মিলন রটাতে।
কুহক লেখনী ছুটায়ে। কুসুম তুলিতে ফুটায়ে।
লিখিছে প্রণয় কাহিনী। বিবিধ বরণ ছটাতে। (প্র ২৭০)

এখানে প্রথম পর্বটিতে বসন্ত শব্দটি মাত্রাবৃত্তরীতিতে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেতে পারে; অক্ষরবৃত্তে নয়। প্রতি পংক্তিতে তিন অক্ষরের পদগুলি যেন ক্রমে বেঁধে বসানো। তিনটি পদ অর্থাৎ নয় মাত্রায় পর্বেই ছন্দ-যতির সাড়া মেলে; যদিও সঠিকভাবে এমন মাত্রাবিন্যাস সর্বগ্রাহ্য হবে না। এখানে আদৌ কোনো ছন্দের অস্তিত্ব কেউ স্বীকার নাও করতে পারেন। আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে এই যে, আট চরণের কবিতাটিতে তিন অক্ষরের ৪৮টি শব্দ (দুটি অতি পর্ব ছাড়া) নিখুঁতভাবে গাঁথুনি-করা। তবে ছন্দ থাকবে না কেন? মাত্রা-সংখ্যার গণনা কোনো রীতিতে মিলছে না ব'লে? অক্ষরবৃত্ত রীতিতে বিজোড় সংখ্যার পর্ব থাকে না; সেজন্য এই গানটির ছন্দকে নয় মাত্রার পর্ববন্ধে মাত্রাবৃত্ত কিংবা অভিনব কোনো নামে আখ্যা দিলে কেমন হয়। মজার কথাটি এই যে, এই গানে আমার প্রস্তাবিত নয় মাত্রার পর্বকে আবার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্বাঙ্গে খণ্ডিত করার সুযোগ পাওয়া মুস্কিল।

(গ) স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ:

স্বরবৃত্ত বা লৌকিক বা বলপ্রধান ছন্দের প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে মাত্রাবৃত্ত রীতির ঠিক পরেই। এ ছন্দে পর্ব মুখে প্রস্বর বা ঝোঁক এবং প্রতিপর্বে চার মাত্রার ধ্বনি থাকাটাই মৌল-ধর্ম। যেমন:

আগুনের। পরশমণি। ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন। পুণ্য কর। দহন্ দানে।

দুটো চরণের প্রথম পর্ব দুটো অতিপর্বের মতো, যদি ও তাদের একমাত্রা ঘাটতি আছে। এ'রূপ অতিপর্বের প্রয়োগে সম্পূর্ণ গানে অভিনবত্ব এসেছে।

ভরা থাক) স্মৃতি সুধায়।
বিদায়ের) পাত্রখানি।

মিলনের) উৎসবে তায়।

ফিরায়ে) দিও আনি।

অতিপর্ব, মিল ও প্রস্বরের চমৎকারিত্ব এখানে দেখতে পাই।

: ওরে) কি শুনেছিস। ঘুমের ঘোরে

তোর) নয়ন এলো। জলে ভরে

এতদিনে। তোমায় বুঝি। আঁধার ঘরে। পেলো খুঁজি।

: কার) চোখের চাওয়ার। হাওয়ায় দোলায়। মন

তাই) কেমন হয়ে। আছিস্ সারা। ক্ষণ

চমৎকার ছড়ার ছন্দের ঢঙ্ এবং উচ্চারণে ও মিলে খাঁটি প্রাকৃতজ বাংলার আটপৌরে চরিত্রের প্রভাব। আরও দৃষ্টান্ত :

: আয়রে আয়রে। সাঁঝের বা 0। লতাটিরে। দুলিয়ে যা 0।

ফুলের গন্ধ। দেবো তোরে। আঁচলটি তোর। ভরে ভরে।

: (মোর) স্বপন তরীর | কে তুই নেয়ে

(আমায়) ভুলিয়ে দিয়ে | যা

(তোর) দুলিয়ে দিয়ে | না

(তোর) সুদূর ঘাটে | চলরে বেয়ে।

: কে যেতেছিস। আয়রে হেথা। হৃদয় খানি। যা না দিয়ে।

বিম্বাধরের | হাসি দেব | সুখ দেব | মধুমাখা | দুঃখ দেব।

হরিণ আঁখির | অশ্রু দেব | অভিমানে | মাখাইয়ে।

দ্রুতলয়ের ছড়ায় ছন্দের মধ্যেও ভাষণ-বৈশিষ্ট্যের জোরে একটা চমৎকার ছন্দের দোলা দুলিয়ে দিয়ে যায়, ভুলিয়ে দিয়ে যায়। হাসি দেব, সুখ দেব, পর্বগুলির মাত্রা ও লয়ের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণ-শিল্পে কথ্যরীতির উচ্চারণ-ভঙ্গিমা, চলতি ভাষার ক্রিয়াপদ, চলতি শব্দ ও পদবিন্যাস এমনই যে, তাতে একটি সহজ বেগ ও চলিষ্ণুতা এসেছে। মাত্রাবৃত্ত অপেক্ষা স্বরবৃত্ত ছন্দের ঢঙে বৈশিষ্ট্যটি অধিক প্রতিফলিত। উপরের দৃষ্টান্তগুলোতে এই লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আরও দৃষ্টান্ত :

: পাড়ায় পাড়ায় | খেপিয়ে বেড়ায় | কোন খেপা সে।

খোলা হাওয়া | লাগিয়ে পালে | টুকরো করে | কাছি

: ডুবতে রাজি | আজি আছি | ডুবতে রাজি | আছি

: সোনার হরিণ | চাই (তোরা)। যে যা বলিস্ | ভাই
চমকে বেড়ায় | দৃষ্টি এড়ায় | যায় না তারে | বাঁধা
: একলা বসে | বাদল শেষে | শুনি কত | কী
এবার আমার | গেল বেলা | বলে কেত | কী

ক্রিয়াপদের চলিতত্বে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দের প্যাটার্ন এত স্বাভাবিক হয়েছে। ছন্দের চটুল ভঙ্গিমা গানে এনে দিয়েছে চাপল্য ও কমনীয় ভঙ্গি। পর্বে কোথাও বেশী যুক্তাক্ষর বা রুদ্ধদল থাকলেও প্রস্বরের বেগে তারা হাল্কা হয়ে সহজ-গতি হয়েছে। সংগীতের ছন্দের বেগ ও চলিতত্ব ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে একটি হলো বিশেষ ধরণের সাংগীতিক অনুষঙ্গের প্রয়োগ। মাত্রাবৃত্তে এরকম শব্দ-অনুষঙ্গের ব্যবহার আছে। ছড়ার ছন্দের লৌকিক রস-ভঙ্গির অনুসরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বানিয়ে প্রয়োগ করেছেন। যেমন:

আমরা) নূতন প্রাণের। চর হা হা
আমরা থাকি। পথে ঘাটে। নাই আমাদের। ঘর হা হা
আমার) ঘুর লেগেছে। তা ধিন্ তা ধিন্
তোমার) পিছন পিছন। নেচে নেচে। ঘুর লেগেছে। তা ধিন্ তা ধিন্

মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দেও এই জাতীয় শব্দের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: মম চিত্তে। নিতি নৃত্যে। কে যে নাচে।
তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ। ইত্যাদি।

পাঁচ

চতুর্থ প্রস্তাবনা: রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দোবৈচিত্র্য

এভাবে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রসংগীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকরণ-শৈলী লক্ষ্য করেছি। বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ-মহিমা উদ্ঘাটিত করতে একা রবীন্দ্রসংগীতই যথেষ্ট; রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ-শৈলী রবীন্দ্রনাথের ছান্দসিক প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে সুন্দর কথা বলেছেন—"আমার অনুমান, মায়ার খেলা থেকে

প্রবাহিনী পর্যন্ত তাঁর গানগুলিতে কাব্যের ছন্দোবন্ধন শুধু অক্ষুন্ন তা নয়, রীতিমত বিস্ময়কর এইজন্য যে গানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছন্দ লিখেন নি, ছন্দ সৃষ্টিও করেছেন। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের অনেক নতুন ভঙ্গি, মিলের অনেক সূক্ষ্ম কৌশল, অনুপ্রাসের অন্তর্লীন চাতুরী বাংলা কবিতায় এই সব কারুকর্মের উত্তম উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আমাদের গীতবিতানের, আর বিশেষভাবে গীতাঞ্জলি পর্বের পর্যায়ের শরণাপন্ন হতেই হবে। কিন্তু উত্তর জীবনের সবগুলি গানকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি না, কেননা তাদের মধ্যে ব্রাত্য অনেক; ছন্দমিলের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা।"[৩৬]

রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দোবৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় নি। প্রায় দু'হাজার সংগীতের এরকম সাধারণ রীতি-সম্মত আলোচনা এবং আরও সূক্ষ্ম প্রকরণ-শৈলীর ব্যাপক ও গুরুতর আলোচনা হওয়ার অবকাশ আছে। বিশ্লেষণে দেখা যাবে—সংস্কৃত, প্রাকৃত বাংলা, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার এবং নানাবিধ মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দের বিচিত্র রূপবল্ল রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে[৩৭] রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দের কিছু বিশেষত্ব ও মৌলধর্ম ধ'রে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় তূনক ও তোটক জাতীয় ছন্দের অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রভাব গানেও পড়েছে।

যেমন: শুভ) কর্ম প | থে ধর | নির্ভয় | গান |

সব) দুর্বল | সংশয় | হোক অব | সান্

তোটক ছন্দের অন্তর্নিহিত গতিবেগ গানের সুরের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়েছে। গানের স্বরলিপিটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তোটকের পর্বস্পন্দন গানের সুরের অনেকটা কাছাকাছি। তোটক ছন্দে লিখিত গান—'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' 'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া' গান দুটোর গীতছন্দ ও তানলয় ভিন্নরূপ, যথাক্রমে আট মাত্রার কাহারবা ও ছয় মাত্রার দাদরা তাল। "কিন্তু গানের ছন্দ এমনভাবে গঠিত যে, তাতে কবিতার ছন্দের সঙ্গে বিরোধ ঘটে না"।[৩৮]

এ প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানবার আগে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে পারি। কবিগুরু সারাজীবন কবিতা ও গানের সৃষ্টিকার্যে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ছিলেন। ছন্দের সামগ্রিক জ্ঞান, সূক্ষ্ম শ্রুতি-চেতনা, সুর-জ্ঞান, মাত্রা ও তানলয়ের নানাবিধ রীতি-সম্মত ধারণার তিনি অধিকারী ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর ছন্দ-জিজ্ঞাসা এত যুক্তিগ্রাহ্য যে, ছন্দশাস্ত্রের পণ্ডিতগণও তা

দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে খ্যাতিমান মনীষিগণের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে সুরজ্ঞ দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে এমন কি বিদেশী কবি এজরা পাউণ্ড, ইয়েটস্ প্রমুখের সঙ্গেও ছন্দ নিয়ে তাঁর বহু কূট-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এসবের থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ছন্দকে প্রায় সবল সময় গানের সুরের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতেন। অন্ততঃ সংগীত রচনা করার সময় কিংবা গানে সুরযোজনা করার সময় তিনি বিশেষ একটি ছন্দ-চেতনার আয়ত্বাধীন হয়ে পড়তেন। তখন সুর-ছন্দের প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবে আসতো, কিন্তু তাঁর কাব্যমানস সমানে ক্রিয়া ক'রে যেতো কবিতার ছন্দ ও গানের তালকে একই রূপকল্পে বেঁধে দিতে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের ছন্দ-বিশ্লেষণ করেছেন ঐ একই মেজাজ নিয়ে। গীতকার ও সুরকার হিসেবে গানের বাণীর ছন্দ ও সুরের তালের তান বিষয়ে সূক্ষ্ম বোধ ও বিচার-চিন্তা নিয়ে তিনি প্রয়োগ-শৈলীর মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। অধিকাংশ স্থলে তাঁর পর্যালোচনার যথার্থ যুক্তি আমাদের বিস্মিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর আলোচনার সঙ্গে মত-পার্থক্য দেখা দিলেও তা গুরুতর কিছু ব্যাপার নয়। যেমন—"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া" গানটি সম্পর্কে কবি বলেছেন—"এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হলো।"[৩৯] আমার মতে মাত্রাবৃত্তের ছয়মাত্রার পর্বস্পন্দনে চমৎকার কাব্যছন্দ আছে এই গানটিতে, তাতে সুরের তালের কর্তৃত্ব অনিবার্য নয়। ছন্দোলিপি এ'রকম হতে পারে :

অমল ধবল | পা 0 লে লেগেছে | মন্দ মধুর | হাওয়া
দেখি নাই কভু | দেখি নাই 0 0 | এমন তরণী | বাওয়া
কোন সাগরের | পার হতে আনে | কোন সুদূরের | ধন

এখানে প্রথম চরণে দ্বিতীয় পর্ব এবং দ্বিতীয় চরণে দ্বিতীয় পর্ব ব্যতিক্রম হিসেবে ধরছি। আর সব যথাযথ। রবীন্দ্রনাথ গানেও একে দাদ্‌রা তালে বসিয়েছেন ; ছয় মাত্রার প্যাটার্ন ঠিক আছে। যেমন—

| অমল | ধবল | পা 0 লে | লে গে ছে |
মন্‌দ | মধুর | হা 0 ও | য়া 0 0 |

কি কাব্যছন্দে, কি সুরের ছন্দে কোনটির ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না স্পষ্টতঃ। কবিতা হিসেবেও গানটি গৌণ নয়।

'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা'— গানটির পর্ববন্ধে অক্ষরবৃত্ত চালের 'দশ+আট' মাত্রায় ইঙ্গিত ক'রে তিনি বলেছেন— "দেবতা শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে সেটা কি রাখ না। যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক, তাহলে দেখবে দেবতা ও খোলো দ্বার মাত্রায় অসমান হয় নি।"৪০ অর্থাৎ কবির মতে চরণ দুটিকে এ'ভাবেই ছন্দোলিপি করা যায়—

নিভৃত প্রাণের দেবতা 0 | যেখানে জাগেন একা | (১০+৮)
ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার | আজ লব তাঁর দেখা |

গানটির কাব্যছন্দ আমি ভিন্নরূপে ছন্দোলিপি করতে চাই। এখানে ভিন্নরূপে ছন্দের প্যাটার্ন গঠনের অবকাশও আছে বলে আমার মনে হয়েছে। কেননা পুরো গানটিতে একই রকম ছন্দঃস্পন্দন আছে; ব্যতিক্রম মাত্র একটি পর্বে। গানটির ছন্দোলিপি মাত্রাবৃত্তরীতিতে করা গেলে এ'রকম দাঁড়ায়।

নিভৃত প্রাণের | দেবতা
যেখানে জাগেন | একা
ভক্ত সেথায় | খোলো দ্বার
আজ লব তাঁর | দেখা
সারাদিন শুধু | বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে | চাহিরে
সন্ধ্যা বেলার | আরতি
হয়নি আমার | শেখা

পূরবী রাগিণীর সুরে একতালের বারো মাত্রার ধীর লয়ে বসানো গানটিকে গাইবার সময় তার ছন্দঃস্পন্দন যেভাবেই মনে বাজুক না কেন, কেবল কবিতা হিসেবে তার ছন্দঃস্পন্দন বিচার করতে গিয়ে আমি স্বাধীনভাবে এই গানটিকে মাত্রাবৃত্তরীতিতে ছন্দোলিপি করেছি। শব্দগুলির অবস্থান ও সংলগ্ন-ছন্দঃস্পন্দন অনুভব ক'রেই এভাবে কাব্য-ছন্দের প্যাটার্ন ধরা যায়। ছন্দচিন্তার শেষ সিদ্ধান্ত আজও স্থিরীকৃত হয়নি। কাজেই নানা মুনির নানা মত দেখা দিলেও ছন্দোভাবনার ক্ষেত্রে ক্ষতি নেই কিছু। এই গানটিতে প্রত্যেক পংক্তির পর্ববন্ধ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার, দ্বিতীয় পর্বটি অপূর্ণ। এ'রকম ছন্দোলিপি করার কোন বাধা নেই। কান পাতলে এ'রকমই পর্ব-স্পন্দন আসে। গান বলেই গীতবিতানে তাকে রাখা হয়েছে এক লাইনে; কিংবা কবি লিখেছেন এক

লাইনে—'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা'। আমি একে দু চরণে লিখেছি।

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি, আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে—গান দুটির ছন্দকে কবি প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব'লে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—"হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিন মাত্রার দানা পাকায়। এমন কি যেখানে হসন্তের ভিড় নেই, সেখানেও তার ঐ এক চাল।" কবির মত অনুসরণ করলে ছন্দটি যেভাবে দাঁড়ায় :

রূ প্ সা | গ রে 0 | ডু ব্ দি | য়ে ছি ("তিন মাত্রায় জমে উঠল")। 'আমার মিলন লাগি' গানটির সম্পর্কেও সেই কথা— "বাংলা প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর-গণনা ক'রে তাদের মাত্রা নয়", কিন্তু বাংলা প্রাকৃত বলতে রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত বলপ্রধান ছন্দকেই নির্দেশ করেছিলেন। যদি তাই হয়, চার মাত্রার পর্ব-স্পন্দনকে তিন মাত্রার চালে ধরলেন কেন? পরন্তু বাংলা তিন রীতির ছন্দের লয় ও গতির চরিত্র বিচার ক'রে বিশেষজ্ঞগণ মোটামুটি স্থির করেছিলেন যে, পর্ববন্ধে হ্রস্বতম পর্বের মাত্রা হবে চার; অর্থাৎ চার মাত্রার কমে পর্ব হবে না। অবশ্য ছন্দচিন্তার এখনও সীমা নির্দিষ্ট হয়নি। স্বতঃসিদ্ধ ব'লে স্থির হয়ে যায়নি এর গবেষণার গতি। আরও অনেক ভাবনা প্রকাশ হতে পারে এখনও, ভাবীকালেও।

কবি ছড়ার ছন্দের "চার চার সিলেব্‌ল্ ভাগ করাকে" (ছন্দ পৃঃ ২১৭) স্বীকার করেন নি। এর যুক্তি তিনি যথেষ্ট দিয়েছেন। ব্যাকরণ-ঘটিত ছন্দ-চিন্তা নিয়ে গবেষকরা যখন ব্যতিব্যস্ত, কবি তখন রীতি ও নিয়ম ছাড়িয়ে অনেক দূরে অগ্রসরমান। রূপ-প্রকরণে শুধু ভাবে ও সংস্কারে বাঙালীর যে ছন্দ-চেতনা, কবি তাকে গভীরভাবে বুঝতে ও ধরতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান কথাটি উদ্ধৃত করছি—

"বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটি পদার্থ আছে।...সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত-কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে।...তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন ঠুন শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই, সেখানে হসন্তের ঝংকার

বদ্ধ। আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"[৪২]

উপরে লিখিত দুটো গান চতুর্মাত্রক ছড়ার ছন্দে স্পষ্টতঃই ভাগ করা চলে। যেমন :

আমার্ মিলন্ | লা গি তু মি | আস্ ছ ক বে | থে কে
তোমার্ চন্দ্র | সূ র্য তোমার্ | রাখ্‌বে কোথায়্ | ঢেকে
এবং রূপ্‌ সাগরে | ডুব্‌ দিয়েছি | অরূপ্‌ রতন্ | আশা করি।
ঘাটে ঘাটে | ঘুর্‌বো না আর্ | ভাসিয়ে আমার্ | জীর্ণ তরী।

এমন রীতি-সম্মত ছন্দোবন্ধকে নিয়ে কবি ভিন্নভাবে কেন ব্যাখ্যা করেছেন তার পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

অনেক সংগীত নিয়ে কবি এভাবে ছন্দ-নির্মিতির মৌলিক গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে তাঁর মতামত যতখানি গুরুতর ও বিস্ময়কর, তেমনি তাঁর কাব্যসংগীতগুলি নিয়েও তাঁর ছন্দচিন্তা বিশেষভাবে গুরুত্বলাভ করেছে। নতুন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রতিপাদনে তাঁর অসামান্য গানগুলি তাঁকে উৎসাহিত করেছে। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল মায়া মমতা অর্পণ করেছিলেন তাঁর সংগীতগুলোতে। কাজেই ভাবের সীমাহীন মহিমায় ও দ্যুতিতে, বাক্-শিল্পের ঐশ্বর্যে ও রূপ-সুষমায়, ছন্দতান-লয়ের স্পন্দনে তাঁর কাব্যসংগীতগুলোকে তিনি ঐশ্বর্যময় রূপময় ও প্রাণময় ক'রে গেছেন। এই কাব্যসংগীতে বিস্ময়কর ছন্দপ্রকরণ সংযোজনা ক'রে তিনি একজন তুলনা-রহিত ছান্দসিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

নির্দেশপঞ্জী

১। Hudson—An Introduction to the study of literature p. 73

২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র পৃঃ ১২৭

৩। Carlyle—"For my own part, I find considerable meaning in the old vulgar distinction of poetry being metrical, having music in it"

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ২

৫। রবীন্দ্রনাথ—সংগীত ও ছন্দ ; ছন্দ পৃঃ ২৩

৬-৭। রাজ্যেশ্বর মিত্র—গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ২৩, পৃঃ ২১/২২

৮-৯। Hudson—An introduction to the study of literature p. 74

১০। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা পৃঃ ২০৫

১১। উদ্ধৃতি : Hudson—An Introduction to the study of literature p. 74

১২। অমিয় চক্রবর্তী—সাম্প্রতিক পৃঃ ৬৫-৬৬

১৩। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গতির রূপ বা প্যাটার্নকে রূপবন্ধ বলেছেন।

১৪। L. Abercrombie—Poetry : Its music & meaning p. 11

১৫। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১৭২

১৬। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ১৬

১৭। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—রাগ ও রূপ (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৬

১৮। Abercrombie—Poetry : Its music & meaning p. 17

১৯-১৯(ক)। রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ (১৯১২) পৃঃ ২১৬/২১৭

২০। প্রবোধচন্দ্র সেন—গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১৮৩ ; ১৭২

২১-২২। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতের মুক্তি : সংগীত চিন্তা পৃঃ ৬৫-৭১

২৩-২৪। রবীন্দ্রনাথ—দিলীপ রায়কে লেখা : ছন্দ পৃঃ ১৯১+পাদটীকা

২৫। প্রফুল্লকুমার দাস—রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৫

২৬। শুভ গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীতের ধারা পৃঃ ১৭৯

২৭-২৮। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত পৃঃ ২০৪, ২০০

২৯। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৫০

৩০। রবীন্দ্রনাথ—আর্যগাথা : আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ১১৯

৩১। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত পৃঃ ২০৬

৩২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান পৃঃ ১২৯, ১৪৩

৩৩। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৩৬, ৩৮

৩৪-৩৫। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৭০, ৭৯

৩৬। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১০০

৩৭-৩৮। প্রবোধচন্দ্র সেন—গীতবিতান শতবার্ষিকী : বাণী ও বীণা

৩৯-৪১। রবীন্দ্রনাথ—সবুজপত্র (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) দ্রষ্টব্য।

আজি অকারণ মুখর বাতাসে যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মর স্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংগীতাখ্য শব্দানুষঙ্গে সুরের তরঙ্গ প্রহত আবহভূমি

এক

বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী

রবীন্দ্র-রচনায় গীতাত্মক ক্রিয়াপদ ও শব্দানুষঙ্গের বিপুল সমাবেশ দেখে একথা মনে করা যেতে পারে যে, কবি গীতিকবিতা ও কাব্যগীতির বাণীদেহ রচনার সকল প্রকার আবশ্যিক করণ-কৌশল ও রূপনির্মিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ-ভাবে অবহিত ছিলেন। ভাব ও ভাষার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অবস্থা ও তাদের সামূহিক সৃষ্টিলীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানগুলো সংগ্রন্থন ক'রে তিনি কিভাবে কাব্যমানসীকে তিলোত্তমা-রূপে গড়েছেন আমরা দেখেছি। গীতিকবিতার ও সংগীতের সূক্ষ্ম রস-ব্যঞ্জনা শব্দানুবর্তী হ'তে বাধ্য। আলোকার্থীকে আলোর জন্যে তেল সল্‌তে দীপাধার সংস্থান করতে হয়। কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পর্কেও সেই কথা। যথাযোগ্য বাচ্য বা ভাষার নির্ভরে অনির্বচনীয় রসে এই যে সংক্রমণ, এ যেন প্রদীপ অবলম্বিত সেই আলোর উত্তরণ। কাব্যের সর্বশেষ অবস্থা সূক্ষ্ম রসের ও পবিত্র আনন্দের। রস ও আনন্দের আর এক নাম সংগীত-চেতনা। রবীন্দ্রকাব্য ও কাব্যসংগীতে এই সাংগীতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ এসেছে প্রত্যক্ষতঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব থেকে। এ কোন্ ব্যক্তিত্ব?

কবি মোহিতলাল বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সংগতিমূলক এক অপূর্ব গীতি-

প্রবণতা ; ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি। সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি ভাবৈক পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গদ্যে হোক পদ্যে হোক তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত এই সংগীত পাঠককে আবিষ্ট করে ; তাহাতে জগতের কোন কিছুতেই উচ্চনীচ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সত্যমিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্বাত্মীয়তার প্রীতিকল্পনায় ধূলিও পরম বস্তু হইয়া উঠে।"[১] রবীন্দ্রকাব্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তাঁর কাব্যের যে কোন ভাব, আদর্শ বা তত্ত্ব যে-ভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন, তার সুরধর্মিতা চিত্তহরণ করবেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীতের গুণ অধিক ব'লে তার রস সাধারণ-কাব্য অপেক্ষা অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রকারের রচনায় কবিগুরুর তীব্র সুর-মনস্কতা বারংবার পাঠক-চিত্তকে নিবিড় গীতরসে উদ্‌বোধিত করে। তেমন ভাবের সঙ্গে ভাষারও যোগ্য নির্মিতি। সেই ভাব ও রসসমৃদ্ধ রচনার সাংগীতিক সুর-চেতনা পাঠককে দিব্যানন্দ দান করে। রবীন্দ্রকাব্যকে যদি প্রচলিত কাব্য-রীতির কবিতা অপেক্ষা অতিরিক্ত গুণ আরোপ করতে হয়, তাহলে তাঁর কাব্য সংগীতকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে। মানুষের ভাষা যে পর্যন্ত যায়, সুর তার অনেক উর্ধ্বে যায়। চরমতম অনুভবের শেষতম অবস্থার নাম সুর বা সংগীত। কবি সুরহীন কথাবস্তুকে চতুর্দিক থেকে সুরেলা ক'রে দেবার জন্য নানাবিধ প্রযত্ন করেছেন। ছন্দ, ভাষা, অলংকার, উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতির নির্মাণ-প্রকরণে সেই প্রহত সংগীত মূর্চ্ছনার আবহ-ভূমি সৃষ্টিলাভ করেছে শুনতে পাই। এবং সেই অভিনব সৃষ্টিতে সংযুক্ত হয়েছে কবির আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ গাঢ় অনুভূতির পরম্পরা-বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথ যেন সৌভিকের বিস্ময়কর যাদু দিয়ে তাঁর কাব্যে ও সংগীতে শব্দের সূক্ষ্ম লীলার খেলা প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীত পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পাঠককে ও শ্রোতাকে একটি অনির্বচনীয় অলৌকিক মায়ার জগতে পৌঁছিয়ে দেয়। সংগীতের ও কাব্যের শ্রোতা এবং পাঠকের সঙ্গে গায়ক ও কবির একটি সহজাত সংস্কারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ; কেন না তাঁরা সকলেই রসজ্ঞ ও সহৃদয়বেদ্য সামাজিক। এঁদের চেতনা ও অনুভবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাই কাব্য ও কাব্যসংগীতের শ্রেষ্ঠতম কাজ। এদের মাধ্যমেই সহৃদয় সামাজিকের

রসাস্বাদ ও রসাভিব্যক্তির ব্যাপারটি বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে নিষ্পন্ন হ'য়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্য কবি শেলীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক্।

"Poetry in a general sense, may be defined to be the expression of the imagination", and poetry is connate with the origin of man. Man is an instrument over which a series of external and internal impressions are driven like the alteration of an ever-changing wind over an Aeolian lyre, which move it by their motion to ever-changing melody. But there is a principle within the human being, and perhaps within all sentient beings, which acts otherwise than in the lyre, and produces not melody alone but harmony, by an internal adjustment of the sounds or motions thus excited to the impressions which excite them. It is as if the lyre could accomodate its chord to the motions of that which strikes them, in determined proportion of sound, even as the musician can accomodate his voice to the sound of the lyre.[২]

বাদিত যন্ত্রের ধ্বনি ও সুরকে লয়-ছন্দের ঐক্য না দিলে তার রসস্ফূরণ ঘটবে না। প্রতিটি চৈতন্য-সমৃদ্ধ মানুষ তার কল্পনা, অনুভূতি, আনন্দ-বোধ ইত্যাদিকে আত্মার অভিপ্রায়ের সঙ্গে ঐক্য-সূত্রে মিলিয়ে নিচ্ছে। সাহিত্য ও সংগীত সেই বিরাট চিত্তচেতনাকে বাণী ও সুরে রূপায়ন ক'রে যায়। এই রূপায়ন-ক্রিয়ার কিছু স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির অনুস্যুতি আমরা দেখতে পাই। মহাকবিদের কাব্য-ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এক অন্তরঙ্গ কারণ-পরম্পরার মাধ্যমে; কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে ও কাব্যে যে বিশিষ্ট বাক্‌নির্মিতির কৌশল দেখিয়েছেন, তা একান্তই তাঁর প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যে সফল ও সুন্দর। সেই বিশেষ পদ্ধতির অন্তঃপাতী প্রেরণাকে সাংগীতিক প্রেরণা বলা চলে। সাংগীতিক অনুভবকে স্বতঃউৎসারিত করতে ভাষার সুরধর্মের সাহায্য নিয়েছেন কবি। কাব্যসংগীতের ভাব ও সুরের বিন্যাস যেমন হওয়া আবশ্যিক, ঠিক তেমনই পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করতে কবি সচেষ্ট হয়েছেন উপযুক্ত অনুষঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যে। এই দুর্ঘট সৃষ্টির পেছনে কবির

বহুকোষ প্রাণসত্তা উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং অপূর্বঘটন-পটু কবিসত্তাও আত্যন্তিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল শ্রেয়োসন্ধানে।

কবি রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময়কর প্রতিভা দেশজ ও অতীত ভাব-সংস্কারের অনুবর্তী কিনা কিংবা প্রচলিত সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যকলা এবং সংগীত-ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল কিনা ভাববার অবকাশ হয়তো আছে[৩]; কিন্তু স্ব-ক্ষেত্রে এমন স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সমুন্নত মহিমা, এমন ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি-সাহিত্যিক পৃথিবীতে কমই এসেছেন। মোহিতলাল এই কবি-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে বলেছেন— "এতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও সংগীতই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। কেবল সংগীতবিদ্ বলিয়া নয়, এহেন সংগীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও স্থিরমত বা বদ্ধ সংস্কার থাকিতে পারে না; অবন্ধনই তাঁহার স্বভাব, সংগীতাত্মক সুষমাপ্রীতিই তাঁহার প্রাণের একমাত্র বন্ধন, আর কোন ধর্মই তাঁহার নাই।"[৪] রবীন্দ্রনাথের "সংগীতাত্মক সুষমাপ্রীতি" কথাটির দ্বারা মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীতবিদ্। রাগরাগিণীর সুরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কার ও উপলব্ধি এবং সংগীতের অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিল ঘনিষ্ঠভাবে। কেবলমাত্র সংগীতের বোধ ও জ্ঞানার্জনই নয়, তিনি সুকণ্ঠ গীতশিল্পী হিসেবে গানের প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারের প্রতিভাধর মনীষী সন্তানেরা বহুমুখী জ্ঞানানুশীলনে অক্লান্তভাবে ব্যাপৃত থেকেছেন। পরিবারের সাহিত্যের হাওয়ার সঙ্গে সংগীতের সহাবস্থান ছিল। সেজন্য বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানাভাবে বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্ফূরণ হতে থাকে। এবং অচিরাৎ সংগঠিত হতে থাকে এক পূর্ণাঙ্গ কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিস্ময়কর সুর-মনস্কতা ও সাংগীতিক-সত্তা। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথক কোনো প্রেরণা ছিল না। তাঁর কবিতা ও সংগীতের চরিত্রও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

তাঁর সংগীতে গীতাত্মক শব্দপ্রয়োগ, অনুরূপ ক্রিয়া ও রাগরাগিণীর নাম বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে গানের ভাবের প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। রবীন্দ্রনাথ একথা ভেবেই তাঁর অনেক কাব্যের নাম সরাসরি গীতাখ্য করেছিলেন। যেমন, সন্ধ্যাসংগীত, শৈশবসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান,

কড়ি ও কোমল, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, পূরবী, শেষসপ্তক, সানাই ইত্যাদি। আবার প্রতিটি কাব্যের অন্তর্গত অনেক কবিতাকেও সংগীতাখ্য নাম দিলেন। কাব্যের বিষয়ক্রম বা কাব্যান্তর্গত কবিতাগুলোতে সংগীতানুষঙ্গ পর্যাপ্তভাবে ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এসেছিল। এ সব থেকে বুঝতে পারি কবির সুতীব্র উপলব্ধির সন্নিপাত হয়েছে তাঁর রচনার মধ্যে উক্তি ও প্রযুক্তিতে। প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির (Content & Form) অদ্বৈত সাধনেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি। সম্ভবতঃ, এই সমন্বয়-কৃতির শ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতকে বিজ্ঞাপিত করতে কোনো বিতর্ক নেই।

কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা-বিশেষকে সংগীত আখ্যা দেবার কারণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন—"সঙ্গীত আখ্যা দিবার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কিনা সন্ধান করা প্রয়োজন। সঙ্গীত অর্থে সাধারণতঃ গানই বুঝায়। কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণ্ঠগেয় গীত নাই। অথচ তাহাদিগকে সঙ্গীত বলা হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে লিরিক বলে, তাহার অনুবাদ করা হয় গীতিকাব্য। লিরিক শব্দটির মূল হইতেছে গ্রীক। Lyre বা একশ্রেণীর বীণাযন্ত্র সাহায্যে গ্রীকরা সুর করিয়া ছন্দোময় পদ আবৃত্তি করিত বলিয়া ক্রমে অন্তর-বিষয়ী কবিতা মাত্রকে লিরিক নামে অভিহিত করা হয়, সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ সঙ্গীত করিলেন।"[৫]

কবিতাকে গীতি (গীতিকবিতা) আখ্যা দেবার কথা বাদ দিলেও প্রত্যক্ষ-ভাবে সাংগীতিক শব্দ শেষসপ্তক, মূলতান, সানাই, মীড়, মূর্চ্ছনা, ঝংকার, কোমল, গান্ধার ইত্যাদি শব্দ বারংবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির কোন্ বিশেষ ইচ্ছাটি নিহিত আছে, তা দেখতে হবে। গীতিকবিতার শেষতম রসবিন্দুতে কবি তদ্‌গত থাকলেও তাঁর অকল্পনীয় লোকোত্তর স্বজ্ঞা ও সৌন্দর্য-চেতনা আরও উচ্চতম কোটিতে উত্তরণ করেছে। সংগীত সেই উচ্চতম স্থান। কবির সংগীত-চেতনাই হল সর্বনিয়ন্ত্রী। কবি বলেছেন, তাঁর সংগীত তাঁর প্রকাশ-লীলা, সংগীত তাঁর কাছে এত সূক্ষ্ম (etheral) যে, অন্যকিছু তার কাছে লাগে না। বলেছেন— "আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে সুর ভেসে উঠে তাই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়।"[৬] এক অন্তঃপাতী গীতরসে কবি আত্মলীন ছিলেন। তাছাড়া ছিল পারিবারিক পরিবেশ, যেখানে সর্বদাই গানের হাওয়া প্রবাহিত ছিল। আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে কবির সংগীত, নাটক, নৃত্যের নিরলস

পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। সংস্কার, অর্জন, প্রতিভা, অধ্যবসায় ও সাধনা, সব কিছুর মূলে ছিল তাঁর সংগীত। রবীন্দ্রনাথ সেই চিত্ত-স্থান থেকেই তাঁর বিশাল সৃষ্টি-লীলাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কাজেই শুধু কবিতায় নয়, তাঁর গদ্য নাটক গল্প ও গদ্য-সংলাপে সংগীতাখ্য শব্দ বা সংগীত শব্দানুষঙ্গ পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়ে এসেছে। কবিতাকে তিনি শুধুমাত্র বাক্‌নির্মিতি এবং বাক্ ও অর্থের সম্পূর্তি বলে ভাবতেন না। তিনি বলেছেন— "কবিতায় আছে অগীত সংগীত"।[৭] সেই অগীত সংগীতকে স্পষ্টীভূত ক'রে তোলার ইচ্ছা সচেতনভাবে সক্রিয় হয়েছে। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-সংগীতের সহস্র সহস্র গীতাত্মক শব্দ প্রয়োগে এই অন্তঃপাতী যুক্তিটাই গোপনে গোপনে কাজ করে গেছে। শ্রেষ্ঠ কবিদের স্বভাবে এরকম প্রবণতা সর্বজনীন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গীতাখ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হামেশাই, দু'একটি উদ্ধৃতি তুলছি—

সেতারের তারে ধানশী/মিড়ে মিড়ে উঠে বাজিয়া
গোধূলির রাগে মানসী/সুরে যেন এল সাজিয়া (স্ফুলিঙ্গ ৩০)

চৌদ্দটি পদের মধ্যে আটটি হলো গীতাত্মক পদ,—সেতার, তার, ধানশী, মীড়, রাগ, সুর ইত্যাদি।

তখন ঝিকিমিকি বেলা করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এলো (পত্রপুট)

একটিমাত্র মূলতান রাগিণী অনুষঙ্গটি ভাবপ্রবাহে গোটা কবিতাটির প্রকৃতি ও বৃত্তি নির্ণয় ক'রে দিচ্ছে। এরকম সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখতে পাবো। এভাবে বাংলাকাব্যের সংগীতধর্মের অন্তর্বাহী প্রবাহকে প্রত্যক্ষ গোচর ও উপলব্ধিগম্য ক'রে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানকে যুক্তবেণীর রসসঙ্গমে মিলিয়ে দিয়েছেন। একসময় পাশ্চাত্যেও এই প্রবণতার উজ্জীবন হয়েছিল। এজরা পাউণ্ড কবিতার তিনধর্মের উল্লেখ করেন, কথ্যরীতি (logopeia), মন্ত্রধর্ম (melopeia) ও সংগীত ধর্ম (phonpeia)। ভেরলেন তাঁর Art Poetique-এ সকলের ওপরে সংগীত সত্য একথা ঘোষণা করলেন। মালার্মে কবিতা ও সংগীতকে একাকার ক'রে নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। কাব্যের সংগীতধর্ম সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট মতবাদগুলো বাংলাদেশেও এসে লেগেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপর এদের যথেষ্ট প্রভাব কার্যকর হয়নি, কেননা রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও আত্মস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলো

একান্তই ছিল তাঁর নিজস্ব ও দেশজ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো বহু-বিস্তারী বিরাট মহীরুহের গায়ে বহিঃপ্রভাবের হাওয়া এসে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু গভীরভাবে সন্ধান চালিয়ে যে সার সত্যটি সর্বাগ্রে আমরা খুঁজে পাই, তা হ'লো রবীন্দ্রপ্রতিভার মৌল প্রেরণায় প্রাচ্য-চেতনা ও ভারতীয়ত্বই প্রাধান্য পেয়ে গেছে। প্রভাবের ব্যাপারটি রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ্লেষণে অনিবার্য হয়ে ওঠে না। আমার ভাবতে ভালো লাগে যে, চিরকালের জন্য স্বয়ম্ভূর মতো সৃষ্টি ও লীলার রূপ হয়ে আছে আস্ত একটা রবীন্দ্রপ্রতিভা।

পাশ্চাত্য রীতিগুলি বরং রবীন্দ্রসমকালীন ও পরবর্তী বঙ্গকবিকুলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা বিশ্বকাব্য-চেতনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন এবং প্রয়োগ-পরীক্ষাও করেছেন। বাংলা কবিতার প্রগতিতে তার প্রয়োজনও ছিল। চিত্রবাদী জীবনানন্দ অনুপ্রাণিত হলেন এই পাশ্চাত্য-রীতিতে, বেশী হলেন বিষ্ণু দে প্রমুখ। কাব্যে ও গানে সংগীতাত্মক শব্দানুষঙ্গের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য সংগীতময় আবহ ও নির্দিষ্ট সুরেলা পটভূমিকা রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বঙ্গীয় কবিদের ওপর কাজ করেছে একান্ত নীরবে। যেমন দেখা যায়, বিষ্ণু দে এজরা পাউণ্ডের ফোনপিয়া (সংগীতধর্ম) কে মনে রেখে রবীন্দ্রনাথেরই বাণীভঙ্গিকে স্পষ্টীভূত করলেন :

"কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে গোষ্ঠী চক্রে প্রাণ পায়,
কানাড়া কিংবা মেঘমল্লারে বা মালকোশের লম্বিত বাহুতে,
কোমল গান্ধার, জাগো বহুর বাড়বে।" (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

রবীন্দ্রনাথ গানের কথায় সুরকে সংলগ্ন হতে হচ্ছে ব'লে কথা সুরের কতটা উপযোগী হচ্ছে, তা তিনি পরিকল্পিত প্রযত্নে নির্মাণ করেছেন। ভেবে ভেবে সুরোপযুক্ত কথা বসাতে গেলে কাব্যসংগীতের গগনচুম্বী হর্ম্যের শত সহস্র বাতায়নগুলো খোলার সময় পেতেন না কবি। সুরের গুরুর দীক্ষা নেওয়া ছিল তাঁর, ভাবতে হয়নি তাঁকে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার সহস্র উৎস, অফুরন্ত ধারায় নির্গত হয়েছে কবিতা, গান ও অন্যান্য সাহিত্য।

এ্যাবারক্রম্বি কাব্যে প্রযুক্ত শব্দ ও শব্দধ্বনির একটি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রশক্তি (Magic incantation) র কথা বলেছেন। সেই মায়াময় মন্ত্রতেজোদ্দীপ্ত শব্দগুলোর সূক্ষ্ম অংশগুলো পরাগের মত মহৎ কাব্যভাষায় সংলগ্ন থাকে। রবীন্দ্রকাব্যসংগীতের ভাষায় সেই সুরের মন্ত্রতেজোদ্দীপ্ত পরাগ-স্পর্শ লেগে

আছে। সেখানে বাক্‌রূপেই অনাহত এক সুরতরঙ্গের বিস্ময়কর আবহ এবং অশ্রুত এক ঐকতান ধ্বনিত হতে শোনা যায়। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে সংগীতানুষঙ্গ প্রয়োগ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণসূত্র নির্ণয় করতে পারি।

প্রথমত: কাব্যদেহে গীতাত্মক বা গীতধর্মী শব্দ উপস্থিত থাকলে সেখানে অগীত সংগীত প্রত্যক্ষ রূপ পায়; শুষ্ক পটভূমিকায় বা পরিমণ্ডলে সুরের আবহ স্বতঃউৎসারিত হয়। রবীন্দ্রসংগীতের প্রত্যেকটির বাণীদেহে এ জাতীয় শব্দ ক্রিয়াপদ আবশ্যিকভাবে এসেছে। বলা যায়, বিভিন্ন রূপোপাদানের মতো এরাও কবির অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য।

দ্বিতীয়ত: কাব্যরস ও কাব্যফলশ্রুতিতে যে সংগীত-রসের উপাদান, সেই সূক্ষ্ম অভিব্যঞ্জনাকে প্রত্যায়িত করতে গীতাত্মক শব্দ যথেষ্ট কার্যকরী। অন্তরের সূক্ষ্ম দুর্নিরীক্ষ্য ভাব-তাড়নাকে প্রকাশ করাই যদি সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হয়, তবে তার প্রকাশের জন্য কিছু ভাষণ-কৌশল অবলম্বন করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই মত।[৮] এ প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন—

"In a poem which is neither didactic nor narrative and not animated by any other social purpose, the poet may be concerned solely with expressing in verse—using all his resources of words, with their history, their connotations, their music—this obscure impulse."[৯]

তৃতীয়ত: গীতানুষঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে যেভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা সংগীতের ভাব ও রসের সঙ্গে নিবিড় সংলগ্ন। বাক্‌শিল্পের বিস্ময়কর শৈলী ও কৃতি-তে রবীন্দ্রসংগীত তুলনারহিত। ভাষণ-শিল্পের অন্যতম একটি উপাদান হয়ে কাজ করেছে গীতানুষঙ্গগুলো। অলংকার, অনুপ্রাস, মিল, চিত্রকল্প, বিশেষ্য-বিশেষণ বিন্যাস ইত্যাদিতে গীতধর্মী শব্দ ও ক্রিয়ার ভূমিকা আবশ্যিক হয়েছে।

চতুর্থত: রবীন্দ্রসংগীতের ভাববাহী ভাষণ-শিল্পে গীতানুষঙ্গগুলোর স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে বলে ধরবার কারণ নেই। কেন না, রবীন্দ্রসংগীতের আনন্দ ও রসস্ফূর্তিতে যে বিস্ময়কর সমগ্রতা আছে, তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে সন্ধান করা দুষ্কর।

রবীন্দ্রসংগীতের গীতানুষঙ্গগুলোকে স্পষ্টত: কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। রূপোপাদান হিসেবে সেগুলোকে ব্যাকরণ-গত বিষয়সূচীতে বিন্যস্ত করলে এরকম দাঁড়ায়:

এক) সংগীতাখ্য শব্দ, বাদ্যযন্ত্রের নাম, রাগরাগিণীর নাম।

দুই) সংগীতাখ্য ক্রিয়া, যৌগিক ও ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, নামধাতু।
তিন) সংগীতাখ্য বিশেষণ বৈচিত্র্য, উপমাদি অলংকার ও চিত্রকল্প।

রবীন্দ্রনাথ গানের মতো কবিতাকেও এই বিশিষ্ট সুরচেতনায় নির্ণীত করতে গিয়ে তাঁর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন, পূর্বে একথা বলেছি। ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানকে দুটো উপায়মাত্র ধরেছিলেন। অবশ্য দুটোর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন। হয়তো এই ভাবসূত্রেই কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করতে বা সুর যোজনা করতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাছাড়া কবিতার রস ও গানের রাগরাগিণীর প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি নিরতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"সংগীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী হইয়া উঠে। তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পূরবী না গাহিয়া যান—যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা আপনি নামিয়া আসিবে।"১০

রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তি—"বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ"—এখানে পূরবী, বীণ, রাগিণী, বাজে ইত্যাদি গীতধর্মী অনুষঙ্গ আছে। দিনাবসানের বিষণ্ণতা মানবচেতনাকে অনিবার্যভাবে স্পর্শ করে, সেভাবেই পূরবী রাগিণী প্রকল্পিত। দিনশেষের সন্ধি-প্রকাশ রাগ হিসেবে পূরবী কোমল, গম্ভীর ও করুণ। কোমল ঋষভ ও ধৈবত এবং কড়ি ও শুদ্ধ মধ্যম এই রাগিণীর সুরের রসব্যঞ্জনাকে সৃষ্টি করে। 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ' কথাটিতে সুর-প্রয়োগ ছাড়াই সুরজ্ঞ রসিক কথাটির মধ্যে পূরবী রাগিণীর সুরানুষঙ্গ ভাবতে পারেন। কিন্তু যিনি সুরজ্ঞ নন, তিনিও কথাটিতে শব্দধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে দিনাবসানের বিষণ্ণতাকে অন্তরে উপলব্ধি করবেন। মনীষী কান্টের মতে প্রত্যেক চেতন-সমৃদ্ধ মানুষের মধ্যে বাহ্য কিংবা প্রকৃতি থেকে জ্ঞান লব্ধ হয়ে পরে তাৎক্ষণিক মানসিক জ্ঞানে রূপ গ্রহণ করে। দিনাবসানের জ্ঞানটিই তার মধ্যে ভাবের রসে আস্বাদ্য হয়, প্রতীতি হয়। গানের সুরও তেমনি অনুকরণজাত। এ্যারিস্টটল ও ক্রোচের মতে এই অনুকরণ-বৃত্তি থেকে সুরের বোধ আসে। ব্যাপারটি অবশ্যই জটিল মনস্তত্ত্ব-

কেন্দ্রিক। এই সূক্ষ্ম সম্পর্ক-সূত্রেই কবিতা ও গানের প্রকৃতি একাকার। এই পংক্তিটির গীতধর্মী অনুষঙ্গগুলি রসিকচিত্তে পূরবী রাগিণীর ভাব সঞ্চার ক'রে দেয়। সুর ছাড়াই বাণীদেহে শব্দধ্বনির ও ভাবধ্বনির সাংগীতিক মূল্য এখানেই। ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে :—

"Sound subjectively the sense of impression of the organ of hearing, objectively the vibratory motion which produces the sensation of sound."[১১]

আজি পরজে বাজে বাঁশি
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশ বিহ্বল সুরে। (প্রে ২৩৩)

কিংবা : বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো, কাঁদন ভরা হাসি হেসেছি। (প্র ২০১)

কিংবা : সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে
আজি পূবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে। (প্র ১৩৬)

উদ্ধৃত কথাগুলির আবৃত্তির সঙ্গে শ্রুতি-ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তায় অতীন্দ্রিয় ভাবোদ্রেক অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাষণ-শিল্পের এই সূক্ষ্ম অন্তর্বাহী বেগ ও দীপ্তি মনকে সুরের রসে রসার্দ্র করে। সেজন্য গীতধর্মী শব্দের ভূমিকাও যথেষ্ট। কিন্তু এহো বাহ্য ; শব্দাতিরিক্ত রস-স্বরূপকে জ্ঞাত হওয়াই আসল জ্ঞান ও প্রতীতি।

অতঃপর আমাদের বিষয়ীভূত বহিরঙ্গ বাক্‌শিল্পের বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া দরকার। পূর্বে উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রসংগীতের সংগীতাত্মক অনুষঙ্গগুলোকে ব্যাকরণসম্মত ভাগ করা চলে। নিম্নলিখিত বিষয়-শ্রেণীতে এই রূপোপাদানকে একত্র ক'রে ধরতে চেয়েছি। প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীত থেকে এদের সংগ্রহ নিয়ে বিরাট এক তালিকা করা যায়। এ'রকম বিশ্লেষণাত্মক সংকলন অনেক শ্রম-সাপেক্ষ। এখানে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে এ প্রসঙ্গটির পরিচয় নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করা গেল।

গীতাখ্য অনুষঙ্গ : বিষয়-শ্রেণী

পূর্বোল্লিখিত বিষয়-শ্রেণীর বিশদ পরিচয়।

এক : ক্রিয়া—

(ক) গীতধর্মী মুখ্য ক্রিয়াগুলো—বাজ্, গা, নৃত্, নাচ্, ধ্বন্ ইত্যাদি

(খ) শব্দানুষঙ্গে ও গীতধর্মী ক্রিয়াতে যুক্ত অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ; যেমন : গেয়ে যাও, নেচে যায়, বাঁশিতে ডেকেছে, সুর জাগালে

(গ) ধ্বনি ও অনুকারাত্মক ক্রিয়া : টংকারো, ঝংকারিয়া, ঝনঝন ঝনিল ইত্যাদি

(ঘ) নামধাতু : ঝংকারিবে, মন্দ্রিল, গুঞ্জরিয়া ইত্যাদি

দুই : শব্দ—

(ক) সাধারণ গীতাত্মক শব্দ—গান, সুর, গীত, সংগীত, তান, তাল, ইত্যাদি

(খ) বাদ্যশ্রেণীর নাম—বীণা, বাঁশি, সেতার, একতারা ইত্যাদি

(গ) রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ ও নাম—ভৈরবী, ভেঁরো, ইমন, পূরবী, পরজ, ললিত, কেদারা, বিভাস, মুলতান, মল্লার, বেহাগ, বাহার ইত্যাদি। লোকসংগীত—সারিগান, বাউল, আগমনী প্রভৃতি শব্দগুলোর ব্যবহার

(ঘ) ধ্বন্যাত্মক গীতবর্মী শব্দের অনুষঙ্গ— ঝন ঝন ঝংকারো, গাও গুনগুন, ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে ইত্যাদি

তিন : অলঙ্কার—

(ক) সুরকে উপমেয় হিসেবে ধরে তার সঙ্গে বিচিত্র উপমান—আগুন, আলো, আসন, নদী, স্রোত, পথ, জাল, বরষা, ধারা, ফুল —গানকে উপমেয় হিসেবে ধরে বিচিত্র উপমান—খেলা, তরী, পাল, মালা, পাখি, লিপি, বাতায়ন, ফেলা, আল্পনা, বেদনা ইত্যাদি —বিভিন্ন উপমায় বীণা ও বাঁশি শব্দের বিপুল প্রয়োগ।

(খ) বিশেষণ বিচিত্র : আধখানা গান, গভীর সুর, শেষ গানেরই রেশ, চিরনূতনের সুর, বাঁশির ব্যথা, কাতর গানে ইত্যাদি

উপরে নির্দেশিত এই বিষয়গুলির বিপুল দৃষ্টান্ত অনুধাবন ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীতের গীতাত্মক অনুষঙ্গের পর্যালোচনা করা চলে। রবীন্দ্র-সংগীতে পূজা প্রেম প্রকৃতি বিচিত্র স্বদেশ ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানগুলোর প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ ক'রে যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম, সেই বিপুল উপাদানের কিছু দৃষ্টান্ত নির্ভর ক'রে আলোচনায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি।

দুই

ক্রিয়া সম্পর্কিত গীতানুষঙ্গ

√বাজ·········এই ধাতুর প্রয়োগ রবীন্দ্রসংগীতে সর্বাধিক। সাধারণ ও তাৎপর্যার্থে এই ক্রিয়া অধিকাংশ সংগীতে ব্যবহৃত। যেমন: (পূজা পর্যায়ের গানে) আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে (৯), ভুবনবীণা যেথায় বাজে (১০), এ বাঁশীতে বাজে দূরে (১২), কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর (১৪), বাজবে বীণা সোনার সুরে (২৩), বাজায় বাঁশি রাখাল যত (৪৪), তোমার নামে বাজায় যারা বেণু (৫৩), অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে (৫৬), তোমার বীণা নিত্য বাজে, সুরে সুরে বুকে বাজে, সুর বাজালে বেজে উঠুক সুরে, বাজালে যে সুরে, বাজাক্ ঝংকার, চরণধ্বনি বাজে, আনন্দগান বাজে, বাজে বলে বাজাও তুমি, ব্যথা যখন বাজায় আমি বাজি সুরে, ইত্যাদি। (প্রেম পর্যায়ের গানে) তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ (৪), আভাস বাজিবে (১৯৪), ডানার ধ্বনি বাজে (২৩৫) ইত্যাদি। (প্রকৃতি পর্যায়ে) কলগীত সুললিত বাজে (১), বাজিবে কিঙ্কিণী (২৬), ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা (২৭), পাথায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা (১৯৭) ইত্যাদি।

এরকম পর্যাপ্ত প্রয়োগ প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে লক্ষ্য করেছি। উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে সাধারণ ভাবের অনুষঙ্গে এবং গূঢ়ার্থক ভাব প্রকাশে। তা'ছাড়া শব্দ ও যন্ত্র ইত্যাদির অনুষঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে 'বাজ' ক্রিয়াটি; যেমন: বাঁশরি বাজাতে চাহি, বীণা বাজাও হে মম অন্তরে ইত্যাদি।

বাজ্ ক্রিয়াটি কেবলমাত্র বাদ্য-ক্রিয়া বোঝাতে প্রযুক্ত হয় নি; তার প্রয়োগ সুগভীর কাব্য-ভঙ্গিতে—এই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গভীর দুঃখে, বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎর্সনা যে, গান বাজিবে, আভাস বাজিবে, ক্রন্দন বাজিবে, ব্যথা যখন বাজায়, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে অসামান্য রসসম্মত প্রয়োগ। আর সেই সঙ্গে বাজ্ ক্রিয়া নিজ শক্তিতে গড়ে তুলেছে এক সুরেলা পরিবেশ।

এ'রকম অন্যান্য ক্রিয়া: গা, নাচ্, নৃৎ, ধ্বন্ প্রভৃতির প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য।

√গা : তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে (পৃ ৮), হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান (পৃ ২৩), মনে করি অমনি সুরে গাই (পৃ ৪), গাহুক গগনে, তব প্রেম গাহিবে, গান গাইতে হবে বন্দনাতে, যমুনা বিলাপ গাহে, হেথা যে গান গাইতে আসা, গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে, তারে ভোলাব গান গেয়ে, সুর দিয়েছ তুমি আমি তোমার গানতো গাইনি, তুমি গাইতে যে সব গান সঙ্গে তারই গাইত আমার প্রাণ, গাও বীণা গাওরে ইত্যাদি।

√নাচ্ : নাচে আগুন তালে তালে, সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ, ভাঙ্গা গড়ার তালে নেচে যায়, নাচ্‌রে নাচ্‌রে রঙ্গে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু, নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ, নেচে নেচে ঘুর লেগেছে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন ইত্যাদি।

অন্যান্য ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে গীতানুষঙ্গ

গীতাত্মক ক্রিয়া বা অনুরূপ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এ'রকম অনেক ক্রিয়ার মূল্য এই প্রসঙ্গে স্বীকৃত হওয়া দরকার। সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ইত্যাদিও গীতধর্ম সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। পদবন্ধে সাধারণভাবে ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহৃত হয়েও গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গের সঙ্গলাভ করতে উদ্যত হয়ে আছে বলে মনে হবে. এবং অনেকক্ষেত্রে প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে ও তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সংগীতচেতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে কিছু কিছু ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, কোনো কোনো পংক্তিতে বিশিষ্টতা বোঝানোর জন্যে। যেমন—নতুন সুরে গান উড়ে যায়, বীণাতে মোর কাঁদিয়া উঠে, ভাবনা কাঁপায় সুরে, গান দুলিছে, সুর যে পালায় ইত্যাদি চরণগুলিতে উড়ে যায়, কাঁদিয়া উঠে, কাঁপায়, দুলিছে, পালায় ক্রিয়াপদগুলি গান, সুর, বীণা প্রভৃতি গীতানুষঙ্গের সংলগ্ন হয়ে অসাধারণত্ব পেয়েছে। এরকম আরও

আসা : হেথা যে গান গাইতে আসা (পৃ ২২), গান তোমার চলে এলো (পৃ ৩৯)

উঠ্‌ : আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি, মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি, সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে (পৃ ৫৮)

উড়া : নতুন সুরে গান উড়ে যায় (বি ২৮),

কর : কেমন করে গান কর হে গুণী (পূ ৪), সপ্তসুর করুক বিশ্ববিহার (পূ ২১)

কাঁদা : বীণাতে মোর কাঁদিয়া উঠে তোমারি ভৈরবী (পূ ৭১)

কাঁপা : ভাবনা কাঁপায় সুরে (প্র ১৯৮), আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে (পূ ৮৮)

খোঁজা : সুরে সুরে খুঁজি তারে (পূ ২৯) কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই (পূ ৪), ফিরি তোমার সুরের খোঁজে (পূ ১১)

গেল : কি যেন গেয়ে গেল (প্রে ১৯২)

গল্ : কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া (পূ ১৪০),

গাওয়া : বৃথা গেয়েছি বহু গান, হেথা যে গান গাইতে আসা হয়নি সে গান গাওয়া (পূ ২২), গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র।

চাওয়া : আমার কেবল গাইতে চাওয়া (পূ ২২)

চল্ : গানটি তোমার চলে এল আকাশে (পূ ৪৩)

চাহ : শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান (পূ ৮৫)

চেনা : গানেতে চেনালেম সে চির চিনারে (প্রে ৩৮)

ছড়ান : সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে (প্রে ৩৮)

ছুট্ : সে সুর ছুটে আসে (পূ ৩০)

জাগ্ : সকল আঘাতে তব সুরে উঠে জাগিয়া (পূ ১০৭) তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে (পূ ৭) গগনে কোন গান জেগেছে (পূ ৭৬)

ঝরা : তোমার সুরের ধারা ঝরে (পূ ৩), পড়ুক ঝরে সুরের ধারা (পূ ৯৮)

টানা : সকল দিকে আমায় টানে গানে গানে (পূ ১৮)

ডাক্ : বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও (পূ ৫৭)

দাও : সুর দিয়েছ তুমি আমি তোমার গান তো গাইনি (পূ ৫০) কেমন যে তান দেওয়া (পূ ২৮)

ঢাল : দাও সুরের ঢালা ঢেলে (পূ ৩০)'

দাঁড়াও : মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও (পূ ২৪)

দুল্ : গান দুলিছে নীল আকাশের হৃদয় উথলা (প্র ২৫৮)

ধর্ : স্বরে স্বরে স্বর মিলিয়ে আনন্দ গান ধর্না, তোমার গানে ধরা দিতে (পৃ ১০)

নেওয়া : কণ্ঠে নিলেম্ গান (পৃ ৩১) গানটি শুধু নিলেম গলায় (পৃ ২০)

পায় : আমার স্বরগুলি পায় চরণ (পৃ ১৯)

পালায় : স্বর যে পলায় (পৃ ২৯)

পান্ : গানের ধারা পিয়েছিলে (পৃ ৩২)

পড় : স্বরের ধারায় পড়ুক লুটে (পৃ ১০)

ফিরিয়ে : গান ভোলা তুই গান ফিরে নে (পৃ ১০)

বহন্ : বইব গানের ডালা (পৃ ১), সে স্বর বাহি চলিতে চাহি (পৃ ৭)

বাঁধ : সপ্তম স্বরে বাঁধ তবে তান (প্রে ৩৬৪), বীণায় বেঁধেছি গানগুলি (পৃ ২৮)

ভর : তোমার স্বরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত (পৃ ২), যে স্বর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে (পৃ ২৯)

ভোলানো : ভোলাব গান গেয়ে (পৃ ৩১)

ভুল : স্বর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে (পৃ ২৫)

ভাসা : আমার যত কথা ছিল ভেসে যাবে তোমার স্বরে (পৃ ৪৭)

মেলানো : তোমার স্বরে স্বরে মেলাতে (পৃ ১২), এলে তোমার স্বর মেলিয়া (পৃ ১৬)

রচ্ : তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা (প্রে ৪০) রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার (ঐ)

লহো : তুলে লহো নীরব বীণাখানি (পৃ ৫২৮)

লেখা : যেমন তোমার বসন্ত বায় গীতলেখা যায় লিখে (পৃ ৯)

লাগ্ : আমার লাগে নাই সে স্বর (পৃ ২২), স্বরের আগুন লাগিয়ে দিলে (পৃ ৬), এ গান লাগাবে বুঝি কাজে (পৃ ২৮)

শুন্ : গাহিছে শুন গান (পৃ ২৬১), তোমায় স্বর শুনায়ে (পৃ ৩৮), শুনিয়েছিলেম গান (পৃ ৫)

সাধ্ : আজ কেবলি স্বর সাধা (পৃ ২২)

সাজ : খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী (পৃ ২৭)

হারানো : স্বর যে হারাই অকূল পারে (পৃ ৮)

হয় :   গান হয়নি গাওয়া (পৃ ১৩৮), বেসুর হয়ে বাজে (পৃ ৭)

নামধাতু :   গীতাত্মক শব্দ ও ধ্বনি-বৃত্ত শব্দের ক্রিয়া-রূপ—

ঝংকারিয়া উঠিল আকাশ ঝঞ্ঝা রবে (পৃ ৫৭৮), দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা, ঝংকারিয়া উঠে যে তাই রাতের বেলা (বি ১০৭), অরুণ বীণা যে সুর দিল রণিয়া, সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া, নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া (বি ১৪০), চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে (প্রে ৩১৯), হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু (প্রে ১০৩), ঝংকারিবে মঞ্জীর রুনুঝুনু (প্র ২৬), চিত্ত বীণায় দাও যে নাড়া, গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া (পৃ ৬১) ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ গীতাত্মক ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে :

ঝরো ঝরো বাজে (প্র ৬৬), শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন্ সন্ (প্র ৬৮), পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায় (কাল মৃগয়া), ঝিল্লি ঝাঁঝর বাজায়ে (প্রে ১৫০), বাজে গুরু গুরু শংকার ডংকার (বি ৮৬), নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি (প্রে ১০৫), রিনিকি ঝিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে রিনিঝিনি ঝিন্নি রে (প্রে ১৪০), কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে (প্রে ১২৩), মঞ্জীর বাজুক রিনরিন রিনরিন (প্রে+প্র ৯৮)

তিন

শব্দ সম্পর্কিত সংগীতানুষঙ্গ

রবীন্দ্রসংগীতে গীতানুষঙ্গ ও গীত-ভাবাত্মক শব্দকে আমরা নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি—

ক : সাধারণ আবশ্যিক শব্দ—সুর তান গান গীত সংগীত নৃত্য নাচন

খ : বাদ্য যন্ত্র সম্পর্কিত—বাঁশি বীণা একতারা শঙ্খ ইত্যাদি

গ : রাগ রাগিণীর নাম—পরজ পূরবী ভৈরবী বসন্ত বাহার বেহাগ

এই শব্দগুলির প্রয়োগ হয়েছে সাধারণভাবে, গূঢ়ার্থ প্রকাশে, অলংকার ও

উপমা হিসেবে, রাগরাগিণীর নির্দেশ ইত্যাদিতে। কেবলমাত্র সংগীতে নয়, রবীন্দ্রকাব্যের সীমাহীন প্রশস্ত পথের ধারে আলোর মতো ফুটে আছে এই সব সুরেলা শব্দগুলো। এ শব্দ-শক্তি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গন্ধ স্পর্শ স্বাদ শ্রুতি ইত্যাদি এনে দিয়েছে। আবার সূক্ষ্মভাবে মনন ও হৃদয়ের কাছেও সংক্রমণ করছে। কবির কথা যেন এই—'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো' (প্রে ৯০)। শব্দের এই অর্থগত আবেদনের সঙ্গে সুরের সঞ্চার হয়ে গিয়ে প্রায় সমস্তটাই একটি নির্বিশেষের আকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্র-চেতনা সেই নির্বিশেষ স্তরের সম্পূর্ণ পটভূমিতে গিয়ে বিচরণ করেছে। সেই অনুপ্রেরণা দেখতে পাই প্রতিটি গানে প্রযুক্ত অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে। অনেক শব্দ, অনেক ক্রিয়া এই অনুষঙ্গেরই চমৎকার পরিপ্রেক্ষিত। গানের বিবিধ ভাব ও রসের উপযোগী হয়ে এরা ব্যবহৃত। সাধারণভাবে এবং গূঢ়ার্থক রস-ব্যঞ্জনার উপযোগী হয়ে এই বাক্‌প্রকরণ হয়েছে কখন সরল কোমল, কখনও বা ঘন এবং গম্ভীর। এইভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্প-বিশ্লেষণে এই শব্দানুষঙ্গগুলোর ভূমিকা ও মূল্য অনুধাবন করা যায়।

(ক) সাধারণ আবশ্যিক গীতাত্মক শব্দ :

গান, গীত, সংগীত, গীতি, গীতিকা, গাথা, তান, তাল, তার, নাচ, নাচন, নৃত্য, ঝংকার, লহরী, নূপুর, নাটে, সুর, লয়, মঞ্জীর, ইত্যাদি।

তাছাড়া ধ্বন্যাত্মক গীতধর্মী শব্দ-অনুষঙ্গও প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন: গুনগুন, গুঞ্জন, ঝন ঝন, তা ধিন তা ধিন, তাতা থৈ থৈ, রুনুঝুনু ইত্যাদি। কেন বাজাও কাঁকন কন কন, কাঁকন কন কনিয়া, গুনগুনিয়ে গাইরে (ক্রিয়া রূপে)।

উল্লিখিত শব্দানুষঙ্গগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত : (পূজা পর্যায়ে) বজ্রগানে (৮), বেলা শেষের তান (২০), সংগীত দাও আনি (৩৯), সুরে সুরে তালে তালে (১৩৪), গানে সুরে গলিয়া (১৪০), নব নন্দন তানে চির বন্দন গানে (১৪৫), প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর (১৭৭), তারে তারে ঘন ঘন ঝনঝন ঝননন ঝননন পিনাক টংকারো (২৩৩), নৃত্য গীত কাব্যছন্দ (৫৩২), ইত্যাদি। (প্রেম পর্যায়ে) নূপুর গুঞ্জন, তালে তালে বাজয়ে সে কঙ্কণ (৪), গান দিয়ে দ্বার খোলাব (৯০), গীতি উচ্ছ্বাস (৫৪), স্বরতরঙ্গ গানে (১৩৫), ঝংকৃত বনগীতি (১৪০), নাচের লহরীতে (৮২), মঞ্জীর ধ্বনি (২২৭),

নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে (২০০), মঞ্জীরে গুঞ্জর তান (২৭২)। (প্রকৃতি পর্যায়ে) বাজিবে কঙ্কণ বাজিবে কিঙ্কিণী, ঝংকারিবে মঞ্জীর রুনু-ঝুনু (২৬), শতেক যুগের গীতিকা (২৭), ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর, বর্ষণ গীত, থামাও রিনিকি ঝিনিকি বরিষণ, এসো মঞ্জীর গুঞ্জর চরণে, এসো গীত মুখর কলকণ্ঠে, বীণাতান রন রন ঝংকৃত, ঝন ঝন ঝনিল মঞ্জীরে, নৃত্য গীত কলনে, শূন্যে বাজায় ঘন ঘন ইত্যাদি।

(বিচিত্র পর্যায়ে) নৃত্য রসে চিত্ত মম, বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে, নাচের ঘূর্ণী তালে, থৈ থৈ নর্তন নৃত্যে, নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তা ধিন তা ধিন, কল্লোল গাথা, সাম্যগান, মঙ্গল গীত, রুদ্রতালের নূপুর, তা তা থৈ থৈ, কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে ইত্যাদি।

সাংগীতিক শব্দানুষঙ্গ প্রয়োগে রবীন্দ্র কাব্য-চেতনা যেভাবে সিদ্ধিলাভ করেছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রসংগীতে গান নাচ তাল তান প্রভৃতি শব্দগুলি সুরতরঙ্গের মুখ্য উপাদান নয়, কিন্তু শব্দগুলির প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যেই সুরধর্ম সঞ্চারিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত আছে কবির গভীর উপলব্ধির সুর। উপলব্ধিই দূরায়ত জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্কার থেকে সুরধর্ম নির্দেশ করছে। চেতন-সমৃদ্ধ মানুষের মানসিক ব্যাপারটি বড়ই বিচিত্র। তার সমস্ত কিছু মানসিক ও অনুভূতির ব্যাপারগুলির সঙ্গে বিষণ্ণ সুরের অন্তর্গুঞ্জন মিশ্রিত। রাগ-রাগিণীর সঙ্গে মানুষের সুরচেতনার নিকট-সম্পর্ক এ কারণেই সম্ভাবিত। রবীন্দ্রসংগীতের গীতধর্মী শব্দের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রস-চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করি।

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ গানের শব্দ রচনায় কেন বেশী সচেতন ছিলেন, তা এই শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করে বোঝা যায়। অন্য কবিদের পক্ষে যা আয়াসসাধ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রকাব্যে ও সংগীতে শব্দকে সুর খুঁজতে হয় নি। অবশ্য কবিতার পক্ষে শব্দের সুরধর্ম আবশ্যিক নয় বলে এলিয়ট উক্তি করেছেন। তাঁর উক্তি হ'লো—

"It would be a mistake, however, to assume that all

poetry ought to be melodious, or that melody is more than one of the components of the music of words. Some poetry is meant to be sung ; most poetry, in modern times, is meant to be spoken, and there are many other things to be spoken besides the murmur of innumerable bees or the moan of doves in immemorial elms." (The music of poetry 1942).

রবীন্দ্রসংগীতের শব্দের সাংগীতিক পরিমণ্ডলের ভেতর দিয়ে অসংখ্য মৌমাছিদের গুঞ্জন কিংবা প্রাচীন এল্‌ম গাছে ঘুঘু পাখিদের কাতর কুজন ছাড়াও অনেক কিছু বক্তব্য, তাৎপর্য ও ভুয়োদর্শন বিবৃত হয়েছে। একথা বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে ভাব ও রস-তত্ত্ব এবং দার্শনিক প্রত্যয় প্রভৃতি মিলে একটি আশ্চর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ভারতীয় রাগরাগিণীর স্বরের মধ্যে যে শাব্দিক ধ্বনির পারম্পর্য সংরক্ষিত, তার থেকে রবীন্দ্রনাথ উপাদান সংগ্রহ করেছেন—সাংগীতিক সংস্কার হিসেবে। ধ্বনির শ্রুতি-পারম্পর্যকে কবিতার বাক্‌প্রকরণে এত সহজে তিনিই ধরতে পেরেছিলেন। শুধু একটা উদাহরণ নিয়ে বুঝতে চাই।

মমচিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে।
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ,
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে।
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

এই কথাগুলোর ভাবগম্ভীর অর্থ-বৈভবের সঙ্গে নৃত্য-চটুল ধ্বনি, শব্দ ও ছন্দ সংযুক্ত হয়েছে। সুষম মাত্রার পর্ব-স্পন্দনে, এবং তা তা থৈ থৈ শব্দগুলোর পুনঃপুনঃ ব্যবহার এখানে এনে দিয়েছে নৃত্যরসভঙ্গিমা, কাজেই রবীন্দ্রনাথ কাশ্মিরী খেম্‌টা তালে (ধি গ্ না। ধা তি না) তালে গানটির সুর দিলেন—

সা সা রা | ।‌ রা রা | রা । জ্ঞা | । রা সা | রা । পা | । মা গা।
চি ত্ তে 0 নি তি নৃ ত্ তে 0 কে যে না 0 চে 0 তা তা
পা মা পা | মা জ্ঞা রা | মা জ্ঞা মা | জ্ঞা রা সা | রা জ্ঞা রা | । সা সা
থ ই থ ই তা তা থ ই থ ই তা তা থ ই থ ই ম ম

সুর প্রযোজনা সরল। ভাবের সুষমা ও ব্যঞ্জনা প্রকাশে সুরবিন্যাস এভাবেই প্রযুক্ত হওয়া সমীচীন। রবীন্দ্রসংগীতে ভাষণশিল্প ও ভাবব্যঞ্জনার গুরুত্ব রক্ষা করেই সুরসংযোজনা হ'য়েছে—একথাটা বলাই বাহুল্য মাত্র।

(খ) বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত শব্দানুষঙ্গ :

রবীন্দ্রসংগীতে বাদ্যযন্ত্রের নাম কিংবা অনুরূপ সংগীতাখ্য শব্দ বিপুল সংখ্যক। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের পরিভাষায় বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাম চারটি শ্রেণীতে ধরা হয়েছে।[১২] রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নাম সেভাবেই শ্রেণীভুক্ত করা গেল :

(১) শুষির : বায়ুর দ্বারা বা ফুঁ দিয়ে বাজে যে যন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে এ জাতীয় শব্দ—বাঁশি, শঙ্খ, তূর্য, বিষাণ, ইত্যাদি।

(২) তত : তাঁত বা তার সংযোগে বাদিত যন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে উল্লেখযোগ্যভাবে এসেছে—বীণা, সেতার, একতারা, পিনাক, তানপুরা ইত্যাদি।

(৩) আনদ্ধ বা বিতত : চর্মাচ্ছাদিত বাজন-যন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে আছে—ঢাক, ভেরী, মাদল, ডঙ্কা, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, নাকাড়া, মুরজ (খোল) ইত্যাদি।

(৪) ঘন : আঘাতযোগে বাদিত ধাতু-নির্মিত যন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতে আছে—ঘণ্টা, নূপুর, মঞ্জীর, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর,

এ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে বজ্র, কাঁকন, কঙ্কণ, তার প্রভৃতি শব্দ গীতাত্মক অনুষঙ্গ হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে বাঁশি ও বীণা শব্দের ব্যবহার সর্বাধিক। বাঁশি শব্দ আবার অনেকগুলো প্রতিশব্দে ব্যবহৃত, যেমন : বাঁশি, বাঁশরি, বাঁশুরি, বেণু, বেণুকা, মুরলী ইত্যাদি। আমাদের বিশ্লেষিত প্রায় দু হাজার রবীন্দ্রসংগীতের চারটি পর্যায় থেকে বাঁশি ও বীণা শব্দ দুটির মোটামুটি সংখ্যাগত একটা হিসেব নিম্নরূপ উপস্থাপিত করা গেল—

শব্দ : বাঁশি ও বীণা—

:	পূজা পর্যায়ের গানে	বাঁশি	(প্রায়)	৫৫,	বীণা	(প্রায়)	৬০
:	প্রেম পর্যায়ের গানে	বাঁশি	„	৭৫,	বীণা	„	৪০
:	প্রকৃতি পর্যায়ের গানে	বাঁশি	„	৪৫,	বীণা	„	৩৫
:	বিচিত্র পর্যায়ের গানে	বাঁশি	„	২০,	বীণা	„	১০

(১) শুষির যন্ত্র সম্পর্কিত।

এই জাতীয় যন্ত্রগুলোর মধ্যে বাঁশি শব্দের সর্বাধিক গুরুত্ব রবীন্দ্রসংগীতে আছে। শব্দটি নিয়ে কবি কেবলমাত্র সুরের অনুষঙ্গ রচনা করেন নি, সৃষ্টি করেছেন ভাব গম্ভীর উপমা, ইমেজারী ইত্যাদি।



বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে, —
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

জ্যৈষ্ঠ
১৩১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশি : বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি

বাঁশি :—(পূজা পর্যায়ের গানে) হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি (১১), কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি, বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে (১৯), রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলা শেষের তান (২০), আমার হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী, সে যে তোমার বাঁশরী (৩৬), ছায়ায় বসে বাজায় বাঁশি রাখাল যত (৪৪), তোমার নামে বাজায় যারা বেণু (৫৩), অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে (৫৬), যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা-গীতে শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে (৯৯), সুরে সুরে বাঁশি পুরে তুমি আরো আরো দাও তান (১০৯), ভেঙ্গে এলেম খেলার বাঁশি (১৪৮), বেদন বাঁশি উঠল বেজে (২০৮), বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি (২২২), শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান (২৪৭), তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে, আমার বাঁশির শূন্য হৃদয় (৩৮৬), যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে (৪৪০), আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে (৫৭০) ইত্যাদি।

(প্রেম পর্যায়ের গানে) ছুটির বাঁশি বাজলো, বাঁশি কি আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে (৪৮), অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসি খানি, বকুল ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় (৫৬), অঙ্গে বাজিছে বাঁশি (৫৮), আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে (৫৯), বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া তার ভাষা কেউ বোঝে (৯২), ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে (১৭৫), বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু গালা (১৭৬), মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায় (২০২), বাজাও বেণু বুকের কাছে বাজাও বেণু দূরে (২২০), মধুর মুরলী বাজে মম অন্তরে থাকি থাকি (৩৩৮), সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়, আমার একটি কথা বাঁশি জানে বাঁশিই জানে, কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে, বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে (২৯৪), দূরে বাজায় অলস বাঁশি (৩০১), বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই (৩০৫), মনোরথের পথে পথে বাজলো বাঁশুরি (৩১৯) ইত্যাদি।

(প্রকৃতি পর্যায়ের গানে) উঠে মোহন বাঁশুরি বাজি (৩), হে রাখাল

বেণু তব বাজাও একাকী (১৬), আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা (২৭), এ কী হাসির বাঁশির তান (৫০), বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি (৫২), সাপ খেলাবার বাঁশি (৬৮), রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু (১৪২), বাজুক বঁধুর বাঁশি (১৬২), বিদায় বেলায় একী হাসি ধরলি আগমনীর বাঁশি, সুর ভোলা ঐ ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে (২৩১), গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা (১৯৪) ইত্যাদি। (বিচিত্র পর্যায়ের গানে) তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে (১৩), আমার এ যে বাঁশের বাঁশি মাঠের সুরে আমার সাধন (১৫), পথের বাঁশি কেবল বাজে (৪৫), তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি (৬৫), দূরে ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে (৭২), পারের বাঁশি উঠছে বেজে (৭৩), তার হাতে দিও মোহন বেণু (৮৮), শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি (১৩২), শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি (১০২), ইত্যাদি।

উপরের দৃষ্টান্তগুলোতে দেখলাম বাঁশি শব্দটি বিচিত্র প্রতিশব্দ নিয়ে পরিব্যাপ্ত—বাঁশি, বাঁশরি, বাঁশুরি, বেণু, বেণুকা, মুরলী ইত্যাদি শব্দ নিয়ে এদের উপাদান-গত বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। অন্যান্য ইমেজারির প্রতিচ্ছবি গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্য-সৌন্দর্যে প্রকাশিত। বাঁশির উপাদানগত স্বরূপ যেভাবে দেখা যায়: সোনার বাঁশি, বাঁশের বাঁশি, বজ্রের বাঁশি, কবির বেণুকা ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য উপাদানের হলো, সাপ খেলাবার বাঁশি।

চিত্রকল্প:

পূব সাগরের পার হতে কোন্ এলো পরবাসী
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরুগুরু
ডমরু রব হয়েছে ওই সুরু।
তাই শুনে আজ গগন তলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী। (প্র ৬৮)

বর্ষার সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণের এমন জীবন্ত সার্থকতা, এমন বর্ণাঢ্য সতেজ রঙের বিলাস এবং অন্তরঙ্গ সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের বৈভব রবীন্দ্ররচনাতেই সম্ভব। সাপ খেলাবার বাঁশি ও তার কার্য-কারণ (হাওয়ার সন সন শব্দ, মেঘের ডাক, জলের ধারার উল্লাস, ডমরুরব, নাগ নাগিনীর উল্লাস ইত্যাদি) অসামান্য আলংকারিক উপাদানে বিভূষিত হয়ে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়ের মূল ধরে নাচিয়ে দেয়। বাক্‌প্রতিমা বা ইমেজারির এমন প্রত্যক্ষ উদ্ভাসন রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় সর্বত্র দেখতে পাবো।

বাঁশিতে চেতনা-আরোপিত (personified) বিচিত্র অবস্থাগুলো—নীরব বাঁশি, ব্যাকুল বাঁশি, ব্যথার বাঁশি, করুণ বাঁশি, শ্রান্ত বাঁশি, অলস বাঁশি, শান্ত বাঁশি ইত্যাদি।

আরও বিশেষণ, ও উপমার যোগে—হৃদয় বাঁশি, দুঃখের বাঁশরি, ব্যথার বাঁশরি, মধুর বাঁশরি, মরণের বাঁশি, মোহন বেণু, পথের বাঁশি, পিছের বাঁশি, আগমনীর বাঁশি, মিলন বাঁশি, বিদায় বাঁশি, পারের বাঁশি, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সর্বনাশার বাঁশি।

রবীন্দ্র কাব্যচেতনার একটি প্রত্যক্ষ ও গুরুতর প্রযুক্ত বিষয় হলো সর্বনাশ, প্রলয়, রুদ্র, দুঃখ, ঝড়, অন্ধকার প্রভৃতির প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বরানুভূতির কাব্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। 'সর্বনাশ'-কে এমন ললিত মধুর ও আন্তরিক ক'রে বিবৃত করা অন্যত্র দেখি না,—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রকাব্যে ও কাব্যসংগীতে এ রকম অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাই ; এবং ভাবের সঙ্গে শব্দ-ধ্বনির সমন্বয়ে চমৎকার আস্বাদ ও রসস্ফূর্তি অনুভব করি। এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই 'সর্বনাশ' বিশিষ্ট সাংগীতিক আবহে ভেসে এলো :

হায় হায়রে হায় পরবাসী হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি—
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপ বজ্রে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি। (বি ১০২)

অথবা : বেদনা তোর বিজুল শিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস্ সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে পথে হবে বাহন—
শেষ করে দিস আপ্‌নারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে। (প্র ৫৭)

করুণ অলস নীরব শান্ত ও শ্রান্ত বাঁশির চেতনাপ্রাপ্তি এখানে বড় প্রত্যক্ষ ও চমৎকার। আবার এখানেই উপচরিত বিশেষণ বা Transferred epithet এর উদাহরণগুলি পাওয়া গেল। বাঁশির কাজ কি ? ফুটোর পরে ফুটো যে বাঁশি, যেখানে বাঁশির সুর, বাঁশির ধ্বনি, বাঁশির স্বর, বাঁশিতে তান ও বাঁশির গান। গীতানুষঙ্গ শব্দ বাঁশ, বীণা, রাগ রাগিণী ইত্যাদি ব্যবহারের পেছনে কবির অভিজ্ঞতা ও জীবন-প্রত্যয় আবেগের সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে বলেই এত সিদ্ধি। এলিয়ট বলেছেন—"and various feelings inhering for the writer in particular words or phrases or images, may be added to compose the final result."[১৩]

এভাবে বিশ্ব-বিমোহন সুরে ও গানে রবীন্দ্রনাথের বাঁশের বা সোনার বাঁশি কিংবা কবির বেণুকা অক্লান্ত অখণ্ডভাবে বেজে চলেছে :—

ভালবাসি ভালবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

বাঁশি রবীন্দ্রসংগীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হলেও শুষির যন্ত্র হিসেবে শঙ্খ, তূর্য, বিষাণ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিছু দৃষ্টান্ত :

শাঁখ, শঙ্খ : আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে (পূ ১৬৪), শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে (পূ ২৬৪), দূরের শঙ্খ উঠলো বেজে (পূ ৩৩৬), হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ (পূ ৩০৬) দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ উঠে বাজি (পূ ৩৮০), অভয় শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর (পূ ৪৫৫), আনো তব প্রলয়ের শাঁখ (প্র ১৪), হৃদয় মাঝে মধুর বাজে কি উৎসবের শাঁখ (প্র ৫০), ইত্যাদি।

পূজা পর্যায়ের গানে শঙ্খ শব্দের প্রয়োগ বেশী ; এবং ভক্তি ভাবোপযোগী গাম্ভীর্যও এনেছে এই শব্দ। প্রেম-সংগীতে এই শব্দের প্রয়োগ বেশী নেই, প্রকৃতি-সংগীতে শাঁখ শব্দটির ব্যবহার দেখি। কবিগুরু শঙ্খ বানানটি (ঙ

বর্ণ যোগে) সর্বত্র ব্যবহার করেছেন ; শংখ বানান পাওয়া যায়না তাঁর রচনায়। অন্যান্য শুষির যন্ত্রের প্রয়োগ ; দৃষ্টান্ত :

তূর্য : দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে (পৃ ৩৭৩)

বাজলো তূর্য আকাশ পথে সূর্য আসনে অগ্নি-রথে (বি ৩৯)

বিষাণ : মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়ে (পৃ ৫৭৮), তুঃ "এমন সময় ঈশান তোমার বিষাণ উঠেছে বাজিয়া" (সুপ্রভাত)

(২) তার যন্ত্র সম্পর্কিত

রবীন্দ্রসংগীতে তাঁত বা তার সংযোগে বাদিত যন্ত্র হিসেবে যা পাওয়া যায়,—বীণা, সেতার, একতারা, তানপুরা, পিনাক। রবীন্দ্রসংগীতে বীণা শব্দের বিপুল ও প্রযত্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। বাঁশি শব্দের মতো বীণা শব্দেরও ব্যঞ্জনা-গর্ভ এবং অতি-সমৃদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন— "বেণু ও বীণা রবীন্দ্রবাণীর বোধকরি সবচেয়ে বড় সিম্বল। বেণু রূপকের জন্য কবি বৈষ্ণব পদাবলীর কাছে ঋণী। বীণার রূপক তাঁহার নিজস্ব।"[১৪] কথায় কথায় অনেকে এই ঋণের উল্লেখ করে থাকেন সুযোগ পেলেই, কিন্তু আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে— ঐতিহ্য ও অতীত কবিব্যক্তিত্বে প্রেরণার কারণ হ'য়ে থাকে। অসাধারণ অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষম প্রজ্ঞা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সৃজন ও সিদ্ধি, গ্রহণ ও নির্মাণ, প্রভাব ও প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাপার সম্পূর্ণতঃ। এই মহান ক্রান্তিকারী প্রতিভাকে জানার ও বোঝার জন্যে এ জাতির অনেক তপস্যা লাগবে। রবীন্দ্রপ্রতিভার যথাযোগ্য বিচার ও মূল্যায়নের অধিকার লাভ করাও পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু কবে হবে সে মূল্যায়নের কাজ ?

বেণু, বাঁশি ইত্যাদি শব্দানুষঙ্গ বৈষ্ণবপদে এত বিশিষ্টতায় ও বৈচিত্র্যে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। শব্দশক্তিকে কবি তাঁর বিশাল সাহিত্যে নানা বিশিষ্টতায় ও বৈচিত্র্যে প্রয়োগ ক'রে বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্য স্বকৃত। সুভাষিত হিসেবে, উপমা ও রূপকল্প-রূপে সাধারণ ও গূঢ়ার্থ ভাব-প্রকাশে, ঐতিহ্য-ভাব-বিকাশে এবং চেতনা-আরোপিত বীণা শব্দের প্রয়োগ বাঁশি শব্দের মতই পর্যাপ্ত। প্রায় দেড় হাজার গানের মধ্যেই (পূর্বে সংখ্যাগত হিসেব উল্লেখ করেছি) বাঁশি শব্দের ব্যবহার প্রায় দুশোর মতো, বীণা শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেড়শ।

বীণা : বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে।

বীণা : (পূজা পর্যায়ের গানে) অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে (১), সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে (৩), নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা (২), ভুবন বীণা যেথায় বাজে (১০), তোমার বীণা যেমনি বাজে, সেই বীণাটির গভীর তানে (৩৫), নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী (৩৯), সুর উঠেছে অরুণ বীণার তারে তারে, স্নেহ প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণার পুলকে (৭৩), বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনিভাবে (৮৬), পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে যে অমৃত গান (৯২), গাব তোমার সুরে দাও সে বীণা যন্ত্র (৯৭), রক্ত ধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার (১০৮), উৎসববীণা মন্দ মধুর (১৪৫), অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে (১৫৮), সে ঝড় যেন সেই আনন্দে চিত্তবীণার তারে (২২২), তারের বীণা ভাঙলো হৃদয়বীণায় গাহিরে (২৫৩), মৌন বীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে (২৭২), মরণবীণায় কি সুর বাজে (৩১৫), বাজে বাজে রম্যবীণা[১৫] বাজে (৩২১), কর্ম তখন বীণার মতো বাজবে মধুর মূর্চ্ছনাতে (৩৪৪), অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে (৩৪৭), যেথানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে (৩৪৮), তোমার ভুবনবীণার সকল সুরে (৩৫২), তোমারি নামে উঠিল বাজিয়া কিরণবীণা বাজি, (৫০৫), সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে (৫২২), বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র (৪২৫), জমলো ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে (৫৩১), কান্নার গান বীণায় এনেছি যে (৫৩১), শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি (৫৩৭), আজ মরণবীণার অজানা সুর নেবে সেধে (৫৮৬), ইত্যাদি।

(প্রেম পর্যায়ে) তাই কি বীণায় লাগালি যতনে নূতন তার (৩), আমারে করো তোমার বীণা (৩৩), ক্লান্তি বিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার, রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার, সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার (৪০), মম মৌনী বীণার তারে তারে এসো সংগীতে (৬৬), সভা ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল (১৭৩), আমি বাজাব স্বর্ণবীণা (১৮৭), বাজে করুণ

সুরে পদ্মবীণা (১৯৭), বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে (২০১), যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার তানে তানে (২১৬), মর্ত্যলোকের বীণাতারে রাগিণী দেয় ছেয়ে (২৩৮), পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপানি (২৩৯), মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে বাজে (৩১৮), পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে (৩২৮), বীণাবাদিনীর শতদল দলে (৩৬১), ইত্যাদি

(প্রকৃতি পর্যায়ে) বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে, শ্বেতভুজে শ্বেতবীণা বাজে (১), বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা (১৮), আনো বীণা মনোহারিকা (২৭), আজি বনের বীণায় কি সুর বাঁধা (৬৭), অলখ তারে বাঁধা অচিন বীণা (৭৬), শ্রাবণের বীণা বাজে (৮৪), দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ (১৩৬) 'গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে (১৪৪), আকাশবীণার তারে তারে (১৪৬), দেহের বীণার তারে তারে আয় আয় (১৮৮), পাথায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা (১৯৭), শুদ্ধ বীণার তারে তারে সুরের খেলা ডুব সাঁতারে, আকাশ বীণার সোনার সুরে (২৭১), ইত্যাদি

(বিচিত্র পর্যায়ে) বাজে আলো হৃদয় বীণার মাঝে (৪৬), তোমার বীণা বাজায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া (৫৪), বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে (১০৬), দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা (১০৭), অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া (১৪০)

দৃষ্টান্তগুলো থেকে বীণার উপাদান ও গুণগত রূপ দেখা গেল যেভাবে :— বীণা, বীণার তার, বীণার যন্ত্র, তারের বীণা, স্বর্ণবীণা, সোনার বীণা, সোনার বীণার তার, রম্যবীণা, উৎসববীণা, শ্বেতবীণা, ইত্যাদি। উপমা ও রূপক হিসেবে বিচিত্র উদাহরণ : চিত্তবীণার তার, হৃদয়বীণা, প্রাণের বীণা, প্রাণবীণা, দেহবীণার তার, প্রাণের বীণাযন্ত্র, পরাণবীণা, হৃদয় বীণার তন্ত্র, জীবনের বীণ, দেহমন বীণাসম বাজে, মরণবীণা, ভুবন বীণা, বিশ্ববীণা, অরুণবীণা, অগ্নিবীণা, আকাশ বীণা, কিরণবীণা, দিনের বীণা, আঁধার বীণা, অরূপবীণা, পদ্মবীণা, মর্ত্যবীণা (মর্ত্যলোকের বীণা তারে), কর্মবীণা (কর্ম তখন বীণার মতো), মিলনবীণা, বনের বীণা, শ্রাবণের বীণা, বেদনার বীণাপানি, আশাবীণা, শ্রাবণের বীণাপানি ইত্যাদি

ঐতিহ্যগত-ভাবে বীণাধারিণী সরস্বতী বা শারদা সম্পর্কিত ঐশ্বর্য-বৈভব-পূর্ণ বর্ণনা দেখতে পাবো—'আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব, অতিনির্মল অতিনির্মল অতিনির্মল উজ্জ্বলসাজে, ভুবনে শারদলক্ষ্মী বিরাজে। নব ইন্দু লেখা অলকে ঝলকে অতি নির্মল হাস বিভাস আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে শ্বেতভুজে শ্বেতবীণা বাজে (প্র ১)

এবং কবি এই বীণাপানিকে দেখেছেন যেভাবে,—বেদনার বীণাপানি, বিরহের বীণাপানি, শ্রাবণের বীণাপানি। কখনো বলেছেন, 'বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলমল'। বীণা সম্পর্কিত রূপকল্প বা ইমেজারি বর্ণাঢ্য বাক্‌প্রকরণ-শৈলীতে বিকশিত :

চিত্রকল্প :

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল, যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের নূতন দ্বার,
তেমনি আমার নবীন রাগের নবযৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার।
যে বাণী আমার কখনো কারেও হয়নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।
আজি অকারণ মুখর বাতাসে যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মর স্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার। (প্রেম ৪০)

উদ্ধৃত কাব্যসংগীতে বীণা ও বীণার তার শব্দানুষঙ্গে সুরের আবহ ও সুরের অন্তর্গুঞ্জন খুব বেশী স্পষ্টীভূত হয়েছে। এবং বীণা ও বীণার তার, রাগিণী, নৃত্যকলা, সুর-ছন্দ ইত্যাদি শব্দ-প্রকরণে ইমেজারি বা বাক্‌প্রতিমায় যে দিব্য-উল্লাস লক্ষ্য করেছি, এক কথায় বলা যায়—আশ্চর্য। এই প্রসঙ্গে আরও অনেক ছবি :

সভা ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল,
কিংবা অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে

বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভরে। (পৃ ১৫৮)

কাফি কানাড়ার সুরে আরোপিত এই কাব্যসংগীতের রসসৌন্দর্য এক কথায় তুলনারহিত।

সাধারণ গুণগতভাবে এবং চেতনা-প্রাপ্ত বীণার প্রকৃতি বা অবস্থাগুলো কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন—নীরব বীণা, মৌনবীণা, মোনীবীণার তন্ত্র, মৌনী বীণার তার, চকিত বীণার তার, মর্মরবীণা, স্তব্ধ বীণা, বীণা মনোহারিকা, ক্লান্তি বিহীনা নবীনা বীণা ইত্যাদি। এবং এই বীণার কাজ যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে বাণীবন্ধে :—বীণার তান, বীণার গান, বীণার সুর, বীণার ধ্বনি, বীণার তারে গান, প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণা, কান্নার গান বীণায় এনেছি যে, ইত্যাদি। গীতাত্মক শব্দের আত্যন্তিক অনুপ্রেরণা কবির সমস্ত সত্তাকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে, তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ কাব্যসংগীতের ছত্রে ছত্রে। বাঁশি শব্দের মতো বীণা শব্দটিও কবির বিশিষ্ট চেতনা, অনুভব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কবি বলছেন :

প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে,
অমনি ফোটে তারা ;
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা।

অন্যান্য তার যন্ত্রের প্রয়োগেও বৈচিত্র্য দেখি। তার যন্ত্রের মধ্যে সেতার, একতারা, পিনাক প্রভৃতির বিশিষ্ট-প্রয়োগ কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখতে পারি।

একতারা : রবীন্দ্রকাব্যে একতারা শব্দটি ভাবসমৃদ্ধ আনুষঙ্গিকতা নিয়ে বিশেষভাবে ব্যবহৃত। বীরভূমের বাউলদের সঙ্গে তাঁর ভাবগত সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল। এবং বাউলদের একতারা তাঁর কাব্যে, গানে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

পঁচিশে বৈশাখ দেখা দিল/আর এক কালান্তরে/ফাল্গুনের প্রত্যূষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।/তরুণ যৌবনের বাউল/সুর বেঁধে দিল
আপন একতারাতে,/ডেকে বেড়াল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে/
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপাসুরে।

রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত একতারা শব্দ :

একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে (পূ ১২), একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা (পূ ২৫৫); যখন তোমার গানে আমি জাগি, আকাশে চাই তোমার লাগি, আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায় (পূ ৩৪৬), একতারাতে আধখানা গান গাওয়া (প্রে ১০০), একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে, কে জানে (প্রে ১৩৪), চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে (প্রে ৩১৯), বাদল বাউল বাজায়রে একতারা (প্র ৭২)।

সেতার : আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি (প্রে ১০০), তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে (প্রে ২২১), বেতার সেতার দুটো (বি ১১৯), এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার (বি ১১) ইত্যাদি।

তানপুরা তম্বুরা : যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায় (বি ১৩), সতের পুরুষ গেছে ভাঙ্গা তম্বুরা রয়েছে মঞ্চে ধরি বেসুর বিধুরা (বি ১১৯)

পিনাক : ঝনন্ন পিনাক টংকারো (পূ ২৩৩), পিনাকেতে লাগে টংকার (পূ ২৩১)। প্রাচীন তত যন্ত্র হিসেবে পিনাক পরিচিত। অভিধানে বলা হয়েছে শিবের ধনুরাকৃতি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। শব্দটি কবির বিশিষ্ট রুদ্র-ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত। কবিতায় এরকম শব্দ বহুবার ব্যবহৃত, সংগীতে তেমন বেশী দেখা যায় না।

তার : তার শব্দটি যন্ত্র-নিরপেক্ষভাবে এবং যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : প্রাণের তার, বীণার তার, পাছে ছিন্ন তারের জয় হয় (প্রে ২৭), গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে (প্রে ২৭৫) ইত্যাদি।

সেতার শব্দটি নিয়ে কবি চমৎকার ভাব-গম্ভীর চিত্রকল্প রচনা করেছেন। যেমন :

তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে,
ছিন্ন যবে হলো তার ফেলে গেলে ভূমি পরে।
নীরব তাহারই গান আমি তাই জানি তোমারি দান—
ফেরে সে ফাল্গুন হাওয়ায় হাওয়ায় সুরহারা মূর্চ্ছনাতে (প্রে ২২১)।

স্বরধ্বনির আবহ বা স্পর্শ-কাতর গীতি-পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথের গানে এই সব শব্দ-শক্তির নির্ভরে বিস্ময়করভাবে সৃষ্টি লাভ করেছে। শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য বলেন—"সুর অথবা সংগীত, বীণা অথবা কোন গানের চরণ কবি রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশঃই টানছে, পূজা পর্যায়ের প্রথম থেকে ৬০ সংখ্যক গানের প্রায় প্রত্যেকটিতেই হয় সুর নয় বাণী, হয়তো সংগীত নয়তো বীণা হয়ত বাঁশি অথবা তান—এমনিভাবে সাংগীতিক পরিমণ্ডলের আভাস পাচ্ছি,—রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তিনি বেরোতে চান না, তাই বার বার ঘুরে ফিরে একই অভিজ্ঞতায় ডুব দিতে চান।"[১৬]

৩) আনদ্ধ বাদন-যন্ত্র সম্পর্কিত

চর্মাচ্ছাদিত বাদনযন্ত্র (আনদ্ধ বা বিতত) রবীন্দ্র-সংগীতে দেখা যায়—তবলা, ভেরী, মাদল, ঢাক, ডঙ্কা, ডম্বরু, ডমরু, দুন্দুভি, মৃদঙ্, মৃদঙ্গ, কানাড়া, মুরজ ইত্যাদি।

তবল বা তবলা : তবলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবলার "বাঁধিবোলের দাসত্ব" তিনি অস্বীকার করেছেন। সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-প্রকাশে গানের যে মূল্য, তাতে ওস্তাদি তালের বন্ধন যথেষ্ট ক্ষতিকর। গানের তানের সহজ সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথ একটি মুক্তির সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। যদিও তবলার নূতন তাল প্রবর্তনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তা'সত্ত্বেও সংগীতের মুক্তির সপক্ষে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সংগীতানুষঙ্গ হিসেবে তবলা শব্দটির ব্যবহার রবীন্দ্রসংগীতে প্রায় নেই বললে চলে। এই শব্দটির মাধ্যমে গুরুতর ভাব ও রস-প্রকাশ করার রস-সংস্কার ও উপযোগিতা নেই বলে তবলা শব্দটি রবীন্দ্রসাহিত্যে আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ হাসির গানে দু-এক জায়গায় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন :

বেতার সেতার দুটো তবলাটা ফাটাফুটো। সুর-দলনীর করি এ নিয়ে যজনা,—আমরা কজনা।

ভেরী : শুনছ নাকি জলে স্থলে জাদুকরের বাজল ভেরী (প্র ১৮২), ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, বাজল ভেরী (বি ৫৪), বাজুক

বক্ষে বজ্রভেরী অকৃপণ প্রাণের সে উৎসবে (পূ ১৮৫), যখন আসে পরম লগন তখন গগন মাঝে তারার ভেরী বাজে (পূ ৩৪০), আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী (পূ ৫৬৩), আহ্বান আসিল মহোৎসবে, অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে (প্র ৫৩),

ডঙ্কা : বজ্র ভীষণ গর্জন রব প্রলয়ের জয় ডঙ্কার (পূ ২৩৭), ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন সভার ডঙ্কাতে (বি ৫)

ডম্বরু, ডমরু : ডম্বরু গম্ভীর স্বরে (প্র ১৬), ডমরু রব হয়েছে ওই গুরু (প্র ৬৮), হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু (প্র ১০৩), আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু (প্র ১১২), জীবন মরণ নাচের ডমরু বাজাও (বি ২),

দুন্দুভি : দুন্দুভি যে উঠলো বেজে বিষম কলরোলে (প্র ২১), দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় (প্র ৬০),

মৃদঙ্গ, মৃদঙ্ : গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে (প্র ৩৬), মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার (প্র ৯০), তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে (বি ৬), জাগাক তারি মৃদঙ্গ রোল (বি ২০),

মাদল : বাদল মেঘে মাদল বাজে (প্র ৩৭), গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে (প্র ৫৮),

নাকাড়া : নাকাড়া বাজে কানাড়া বাজে বাঁশিতে (বি ১৪০),

মুরজ (খোল) : আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা (প্র ২৭),

ধ্বনির চিত্র-প্রতিমা

উদ্ধৃত বাদ্য-অনুষঙ্গগুলি কবির বিচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভাবের পরিপ্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রকৃতি-গানে, বিশেষ ক'রে বর্ষার গানে ডম্বরু, ডমরু, মাদল, মৃদঙ, মৃদঙ্গ, ভেরী শব্দের আবশ্যিক প্রয়োগ হয়েছে। মেঘের শব্দের অনুকৃতিতে অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে এই সব বাদ্যগুলোর আওয়াজ। শব্দ গভীরার্থ-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। শব্দগুলো নিয়ে উপমা ও রূপক অলংকার হয়েছে। যেমন: মরণ বাঁচন নাচন সভার ডঙ্কা, জীবন মরণ নাচের ডমরু, বাদল মেঘের মাদল, সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু, মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার ইত্যাদি।

বাদ্যের আওয়াজ ও তার পরিবেশানুগ চমৎকার চিত্ররূপ :

অম্বর প্রান্তে যে দূরে ডম্বরু গম্ভীর স্বরে

জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে আসন্ন বৈশাখী,

হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী। (প্র ১৬)

অথবা: আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু

ডমরুরব হয়েছে আজ সুরু।

তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে

অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী। (প্র ৬৮)

বাদ্য-শব্দের বা আওয়াজের ধারণা (আইডিয়া) ও সংস্কার এখানে চিত্র-প্রতিমা হয়েছে। বৈশাখের খর মধ্যদিনের তৃষাতপ্ত প্রান্তরের কোণে আসন্ন কালবৈশাখীর বার্তা ডম্বরু-ধ্বনিতে আভাসিত। কিংবা ভরা বর্ষার ঘনঘটায় প্রোজ্জ্বল চিত্র-সমারোহ, দিগন্তব্যাপী বজ্রের গর্জন-ধ্বনি, চকিত বিদ্যুৎ-লতার ছুটে চলা—যেন অগ্নিবরণ নাগনাগিনীর বন্ধনহীন তীব্র গতি। অসামান্য চিত্ররূপায়ন।

(৪) ধাতু যন্ত্র সম্পর্কিত

রবীন্দ্রসংগীতে আঘাত-যোগে বাদিত ধাতু-নির্মিত (ঘন) যন্ত্রের নাম ও শব্দানুষঙ্গগুলি, যেমন—ঘণ্টা, নূপুর, মঞ্জীর, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর, কঙ্কন, করতাল ইত্যাদি।

ঘণ্টা: ঘণ্টা শব্দ সংস্কার-গত একটি উচ্চ-ভাবনার প্রকাশ ঘটায়। মন্দির, পূজা প্রসঙ্গে ও আধ্যাত্মিক ভাবের সংবেদনে ঘণ্টা-ধ্বনির প্রেরণা ও প্রভাব। পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে ঘণ্টা শব্দ সেজন্যেই ব্যবহৃত। যেমন: সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে (পূ ২০১)

নূপুর, মঞ্জীর: এই শব্দ দুটি রবীন্দ্রসংগীতে ব্যাপকভাবে ভাব ও সুরতরঙ্গের প্রহত আবেদন এনে দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত: আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন (প্রে ৪), আমার পরাণে যে গান বাজিছে তাহারি তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জীরে (প্র ৩৪), কোথায় সোনার নূপুর বাজে (প্র ১৪৬), দিক-ললনার নৃত্য চঞ্চল মঞ্জীর ধ্বনি (প্র ২২৭), বাজে মম মঞ্জীর রাজি (প্রে ২৬২), দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জর তান (প্র ২৭২), ওই কি নূপুর ধ্বনি বন পথে শুনা যায় (প্রে ৩০৫), যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে ফাগুন মাসে বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে (প্রে ২২২),

ঝংকারিবে মঞ্জীর রুনুঝুনু (প্র ২৬), ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর (প্র ৫৫), নূপুর মধুর বাজে (প্র ৭২), রাজার পুরে তমাল গাছে নূপুর শুনে ময়ূর নাচে (প্র ৭৪), ঝঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা (প্র ১২২), অম্বর প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে (প্র ২০৬), চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে (প্র ২৭১), কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে (বি ১৩১), তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুণি (প্র ১৯৮), নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে (২০৫), কার নাচনের নূপুর বাজে জানিনা যে (প্র ২১৯), এস মঞ্জীর গুঞ্জর চরণে (প্র ১৮৯) ইত্যাদি।

কঙ্কণ, কাঁকন : নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে (প্র ২৩০), বাজিবে কঙ্কণ বাজিবে কিঙ্কিণী (প্র ২৬), তালে তালে দুটি কঙ্কণ কন কনিয়া, (প্র ২৭), বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে (প্র ৪৮), তারি সোনার কাঁকন বাজে (প্র ১৫১) ইত্যাদি।

মন্দিরা : আনো সাথে তোমার মন্দিরা (প্র ২৬), কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে (বি ৫)।

কাঁসি : অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন (পূ ২০) ইত্যাদি।

নূপুর, মঞ্জীর শব্দ নিয়ে বাক্‌প্রকরণে সৌন্দর্য পরিস্ফুট, উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে শব্দগুলি ব্যবহৃত। নূপুর ও মঞ্জীর যে বিশেষণে প্রস্তুত,—ঝঞ্জন মঞ্জীর, কার নাচনের নূপুর, কনক নূপুর, সোনার নূপুর, ঝিল্লির মঞ্জীর, কচি পাতার নূপুর ইত্যাদি। চমৎকার সুভাষিত—আমার পরাণে যে গান বাজিছে তাহার তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জীরে, তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুণি ইত্যাদি।

সুন্দর চিত্রকল্প :

নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে, আহা (প্র ২৭১)

নূপুরের গুঞ্জরণের চাঞ্চল্য শব্দ-ধ্বনি ও অনুপ্রাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হলো। শব্দ-শক্তির উদ্ভাসন মনের পটে নৃত্য-পরা বনাঙ্গনাকে স্পষ্টীভূত ক'রে দিয়েছে।

একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্‌সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান

দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জর তান।

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান। (প্রে ২৭২)

ভাবের অসামান্য গাম্ভীর্য, ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে বাক্-প্রকরণের এই চিত্রকল্পটি অসাধারণত্ব পেয়েছে। কবি এই গানটির সঙ্গে সুর সংযোজনাও যেভাবে করেছেন তাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ের সুরের পারম্পর্যে উতলা অপ্সরীর দুটি পদতলে বাঁধা মঞ্জীরের দ্রুত ও বিলম্বিত তালের ধ্বনি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে সহৃদয় রসিকের চক্ষুতে ও চিত্তে; এবং উৎসারিত করেছে ভাবের ও সুরের কল্লোল।

মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায় করবি স্নান—
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে
ঢেউ দিল ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
···শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান।

(গ) শব্দ: রাগরাগিণীর নাম ও অন্যান্য শব্দানুষঙ্গ—

রবীন্দ্রসংগীতের গীতাত্মক অনুষঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হলো রাগরাগিণীর নামের শব্দ। রবীন্দ্রসংগীতের কথাবস্তুর মধ্যে তাঁর বিরাট বিচিত্র অনুচিন্তার উদ্বোধ হয়েছে নানাভাবে। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি প্রভৃতি নানাজাতীয় ভাবের সংগে সুর-সঞ্চারের কৌশল আবশ্যিকভাবে দেখা গেছে। ভাবের সঙ্গে ভারতীয় রাগরাগিণীর গঠনকলার নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রসংগীত ভাবের বিশাল সমুদ্র। মানুষের সমস্ত সুপ্ত বা প্রকাশ্য ভাব, অনুভাব এবং শোক হর্ষ আনন্দ দুঃখ বীরত্ব উৎসাহ ভয় সান্ত্বনা ইত্যাদি অবস্থাগুলো রবীন্দ্রসংগীতের সীমাহীন কথাবস্তুর মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রসংগীতের গুণ বিচার ক'রে তাকে গীতিকাব্যের তুল্য-মূল্যায়ন করেছি উত্তর ধারায় পরিচ্ছেদগুলোতে; এবং এও দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, আন্তর-অনুভব, সেন্টিমেন্ট বা ইমোশনগুলিকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে দেবার উপাদান হিসেবে ও উপায় হিসেবে কবিতাকে যদি ধরা হয়,—তাহলে কাব্যধর্মী সংগীতকেও সেই মূল্যের উপাদান হিসেবে ধরতে হবে। ইমোশনের

প্রকাশ কখনো দুরূহ, জটিল বা অস্পষ্ট হতে পারে না। তার পূর্ব-অবস্থা যাই হোক, প্রকাশের পথটি সহজ। সংগীতের কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে সেই আন্তর-অনুভবগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের সংগীত, কাব্য বা অন্যান্য রচনার মধ্যে ভাবের মহিমা ও শক্তির স্ফূরণ আছে। রবীন্দ্রসংগীতে আছে ভাবের সেই অতুলনীয় মহিমা ও শক্তি। এখানে রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রসাদ ও দীপ্তিকে বাক্-প্রকরণে ধ'রে দিয়েছেন। সেই ভাব ও ভাষার সঙ্গে সুরের সংযোগে সৃষ্টি লাভ করেছে বিচিত্র ভাব ও সুরের ইন্দ্রজাল। শাস্ত্রীয় সংগীতে সুরেরই দায়িত্ব ছিল বেশী, ভাব-প্রকাশের জন্য কথার দায়িত্ব সেখানে প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ রাগরাগিণীর সুরের সঙ্গে বাণীর বন্ধন স্থাপন ক'রে দিলেন। অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় সুরের সঙ্গে শব্দানুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবের রসস্ফূর্তি ঘটালেন। রবীন্দ্রসংগীতে সেই রাগরাগিণী প্রভৃতি শব্দের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে অব্যক্ত, গূঢ় ও ইঙ্গিতময় ভাবপ্রকাশে সাহায্য করেছে। সুরের ধ্বনি ও চিত্রকল্প উদ্ভাসনে এই শব্দ অনুষঙ্গগুলো বারংবার আবর্তিত হ'য়ে রবীন্দ্র-সংগীতগুলোকে মহিমান্বিত করেছে। রাগরাগিণীর নাম ও শব্দানুষঙ্গ ব্যবহার ক'রে কবিগুরু তাদের প্রকৃতিগত স্বরূপ ও রস-আবেদন উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। কিছু দৃষ্টান্ত :

রাগরাগিণী :

(পূজা পর্যায়ের গানে) সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে শুনাও তাহারে আগমনী সংগীতে (ভূমিকা), বিশ্ব হৃদয়-পারাবারে রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে (১২), শুনি তোমার আকাশ পারের তারার রাগিণী, তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে (১০৩), সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে (৩৪৭), সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে (৫৮৭) ইত্যাদি।

(প্রেম পর্যায়ের গানে) আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই, রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার (৪০), এলো যে ডাক ভোরের রাগিণীতে (১৬৫), ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে (১৭৫), বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে (২০১), ছিন্নতারে থেমে গেল যে রাগিণী (২০৬), ফাগুন হাওয়ায় কেঁদে ফেরে পথ-হারা রাগিণী (২১৭), মর্ত্যলোকের বীণা-তারে রাগিণী দেয় ছেয়ে

(২৩৮), গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে (২৬২), রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে (২৭৩), ইত্যাদি।

(প্রকৃতি পর্যায়ের গানে) না-শোনা কোন রাগরাগিণী শূন্যে ঢালে (৪), নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী (২৬), প্রাণের রাগিণী আজি এ গগনে (৭৮), শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিণী (১১২),

মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে (১২০), লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি নিশীথ রাতের রাগিণী বহি (১৩৫), সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে (১৩৬), আমার মনের রাগ রাগিণী রাঙা হলো রঙিন তানে (২০৫), মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিণীরে (২১৫), ইত্যাদি।

রাগরাগিণী শব্দানুষঙ্গের অনুরূপ শব্দ হ'লো মীড়, শম, ধ্রুবপদ, ধুয়ো, তাল, তান, স্বর ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত : যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে (পূ ৩৩৫), যেন আমার গানের শেষে ক্ষমিতে পারি শমে এসে (পূ ৫৯৪), মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন (প্রে ১৯), তাহারি তালটি শিখো (প্রে ৩৪), মীড় দিয়েছ কোন বীণাতে (প্রে ৩৮), মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে (প্রে ২২১), বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর (পূ ১৬১), সপ্তম সুরের তান (প্রে ৩৬৪), আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো (প্রে ২৬), হেথা সারে-গামা-গুলি সদাই করে চুলোচুলি, কড়ি কোমল কোথায় গেছে তলাইয়ে, চৌতালে ধামারে কে কোথায় ঘা মারে (বি ১১৭) ইত্যাদি।

রাগ : রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও রাগাঙ্গ শব্দ ভিন্নার্থে ও নিজস্ব অর্থে প্রযুক্ত। যেমন : তব শুভ সংগীত রাগ (পূ ৪০৬), বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে (পূ ২৪৮), মদির রাগ লাগিল তার গায়ে (বি ১৪০), গতি রাগের সে ছিল গান (বি ৫৭), ওর বাঁশিতে করুণ কি সুর লাগে, বিরহ মিলন মিলিত রাগে (বি ৮৪), ইত্যাদি।

দেশী সংগীতের নাম ও শব্দ : আগমনী ও সারিগান। যথা : আগমনীর নাচের তালে (প্রে ১৬৮), সুরে বেজেছে তার আগমনী(পূ ১৩০), আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী (প্র ১৪৬), বিদায় গাথা আগমনী কত যে (প্র ১৬৫), বিদায় বেলায় একি হাসি ধরলি আগমনীর বাঁশি (প্র ১৮০), তারি সুদূর সারিগানে

বিদায় স্মৃতি জাগায় প্রাণে (প্রে ২৮০), সারিগান উঠিল অম্বরে (বি ১০৯), তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে (প্র ৩৮), ইত্যাদি।

রাগ-রাগিণীর নাম:

রাগরাগিণীর নাম ও তাদের প্রকৃতিগত স্বরূপের পরিচয়ে রবীন্দ্র-বাক্‌শিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষঙ্গ পরিস্ফুট। রবীন্দ্রসংগীত রাগ ও মিশ্ররাগের সুরে রচিত। দেখতে পাই যে, শতাধিক শুদ্ধ ও মিশ্র রাগরাগিণীর সুর রবীন্দ্র সংগীতে প্রযুক্ত হয়েছে। আরও দেখতে পাই—তাঁর গানের কথাবস্তুতে বহু রাগরাগিণীর নাম এসে পড়েছে এবং সেই রাগরাগিণীর প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী তিনি বাণীসংস্থানও করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌রূপে রাগ-রাগিণীর নিয়মিত স্বভাব ও প্রকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অনেক রাগরাগিণী বিশেষভাবে তাঁর খুব প্রিয় ছিল। হামেশাই তারা এসেছে তাঁর গানে। এছাড়া অন্যান্য রাগরাগিণীর নামও তাঁর গানে ব্যবহৃত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত:—

ভৈরব: তমাল বিতানে উঠে রব ভৈরব তানে (প্র ১)

ভৈরবী: বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী (পূ ৭১, পূ ৩৩৮), সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী (প্রে ১৬৬), বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী (প্রে ১৬৯), শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে (প্রে ২৪৯), চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে (প্র ২৩৭)

পূরবী: এখন কি শুনি পূরবীর সুরে দূরে বাঁশি বাজে (পূ ১৪১), পূরবীতে করুণ বাঁশরি দ্বারে বাজবে মধুর স্বর (পূ ৫৯৯), বিজনে সে কথা গাঁথি কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে (প্রে ৩৭)

বসন্ত: বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে (প্রে ২২২), মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর (প্রে ১৯০), বসন্তগান পাখিরা গায় বাতাসে তার সুর ঝরে যায় (প্র ২২৫), বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক (প্র ২৪৮) —বসন্তকালে বসন্তরাগ? যমক অলংকার নাকি? রইলো তাহার বাণী রইলো ভরা সুরে—কথাটির দ্বারা বসন্তকালে বসন্ত রাগের উল্লেখ হয়েছে ভাবা যায়।

বসন্ত পঞ্চম : বনের বীণায় ছন্দ জাগে বসন্তপঞ্চমের রাগে (প্র ২৫৮)

বিভাস : প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে প্রভাত হলো আঁধার রাতি (পৃ ৫২৯), বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে (পৃ ৫৩৪)

ললিত : ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলি দলে (প্র ১৬৭), বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে (প্র ২০১)

ললিত বসন্ত : বাঁশরী বাজাই ললিত বসন্তে (প্রে ২২২)

মূলতান : পথের বাঁশি যায় কি কয়ে বিকাল বেলায় মূলতানে (পৃ৫৮২)

ছায়ানট : আজ শরতের ছায়ানটে শেষ রাগিণীর মিলন ঘটে (প্রে ৪), ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে (প্রে ২৬৮), মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে (প্র ১৫৫)

বেহাগ : দেখি তার বিরহীমূর্তি বেহাগের তানে (প্রে ২৩৬), উঠিছে আলাপ মৃদুমধুর বেহাগ তানে (প্র ১)

সাহানা : কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী (প্রে ১১২), ধরো সাহানাতে মিলনের পালা (প্রে ৩১৮), সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত (প্রে ২৭১)

পরজ : আজি পরজে বাজে বাঁশি যেন হৃদয়ে বহু দূরে আবেশ বিহ্বল সুরে (প্রে ২৩৩)

মল্লার : পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে (প্র ১), সজল মল্লার গানে গানে (প্র ৪৫), মল্লার গান প্লাবন জাগায় (প্র ৫৪), মল্লার গানে তব মধু স্বরে দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে (প্র ৭৯), আনো তব মল্লার মন্দ্রিত বীণ (প্রে/প্র ৯৮)

মেঘমল্লার : ভূর্জ পাতায় নবগীত করো রচনা মেঘমল্লার রাগিণী (প্র ২৭), মেঘমল্লারে কি বল আমারে কেমনে কব (প্র ৯১), মেঘমল্লারে সারাদিন মান করে ঝরনার গান (প্র ১২৯), মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাসৃষ্টি (বি ১২০)

মেঘ : যেন মেঘরাগিণী কি সুর দুলালো কর্ণমূলে (প্র ১১০)

ভূপালি : আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি (প্র ১৬৯)

সোহিনী : সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের দেহের বীণার তারে তারে (প্র ১৮৮)

হিন্দোল : আজ আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে (প্র ১৮৯)

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাহার, কেদারা, পঞ্চম প্রভৃতি রাগরাগিণীর নাম তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন। কিছু হাসির গানে ও লঘু রসিকতার ছলে সময় ও প্রকৃতি অক্ষুন্ন রেখে কবি রাগরাগিণীর নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন:

ভোঁরো: মোদের ভোঁরো রাগে প্রভাত রবি রাগে মুখ আঁধার (বি ১২০)

বসন্তবাহার: আধখানা যেমনি লাগাই বসন্ত বাহারে, মলয় বায়ুর ধাত ফিরে যায় তৎক্ষণাৎ আহারে (ঐ)

বেহাগ: অমাবস্যার রাত্রে যেমনি বেহাগ গাইতে বসা, কোকিলগুলোর লাগে দশম দশা (ঐ)

জয়জয়ন্তী: শুক্লা কোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি, অমনি মরি মরি, রাহু লাগায় বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার (ঐ)

একত্রে: ভৈরব রামকেলী পূরবী কেদারা উচ্ছ্বসি যায় খেলি, ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়া গানে গানে (প্রে/প্র ৯৩), চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাবো যে তাহারে ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে (প্রে ৩৮), কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে (প্রে ৩৭), বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে জলেস্থলে (পূ ৫৩৪),

এই অনুষঙ্গগুলোর দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। রাগরাগিণীর জাল, রাগিণীর মরীচিকা, প্রাণের রাগিণী, মনের রাগরাগিণী, তারার রাগিণী প্রভৃতি চমৎকার অলংকারের দৃষ্টান্ত। আর আছে আশ্চর্য ছবিগুলো:

আজি পল্লী বালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুল ফুলের দুলে
যেন মেঘ রাগিণী রচিত কি সুর দুলালো কর্ণমূলে। (প্র ১১০)
সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা সাগর বেলার অধীরবায়ে বনের ছায়ে।
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয় মাঝে
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে। (প্রে ২৪৯)

রাগরাগিণীর মূর্তি কল্পনা বহুকালের। প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসরণ ক'রে প্রাচীন কলাবন্তরা ও চিত্রশিল্পীরা রাগরাগিণীকে দেবদেবী বা মানবমানবীর

সদৃশ ক'রে এঁকেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীকে একইসঙ্গে রূপ ও অরূপের সমন্বয়ে গম্ভীর বর্ণাঢ্য সজীব ও অনুভববেদ্য চিত্ররূপ দিয়েছেন বাণীতে : শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে, মাঠে মাঠে পুলক জাগে ছায়ানটের নৃত্য রাগে, যেন মেঘরাগিণী কি সুর দুলালো কর্ণমূলে, ইত্যাদি।

রাগরাগিণীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বেদনার অন্তর্গুঞ্জন, যা রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই ধরতে পেরেছিলেন। এখানে বেদনা বা দুঃখ অলৌকিক আনন্দময় পরিণতি লাভ করেছে, সে জন্যই তা এত সুন্দর। শেলী বলছেন Our sweetest songs are those, that tell of saddest thought। রবীন্দ্রনাথ বলেন —'বিরহ মধুর হলো আজি মধুরাতে, গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে। এরকম : বীণাতে মোর কাঁদিয়া উঠে তোমারি ভৈরবী, অশ্রুজলের ভৈরবীরে, পুরবীতে করুণ বাঁশরি, বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে, দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে, বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

এই দুঃখের ভেতর দিয়েই জীবনের সুগভীর তাৎপর্যকে, সত্য ও আনন্দকে অবধান করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সেই সত্যানুসন্ধান ও আনন্দস্বরূপের প্রকাশ-ক্রিয়া চলেছে। বাক্‌শিল্পে তারই প্রত্যক্ষ উদ্ভাসন।

চার

গীতানুষঙ্গে উপমা ও অন্যান্য অলংকার,

রবীন্দ্ররচনায় উপমা একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। কালিদাসের উপমা-খ্যাতি প্রচলিত—"উপমা কালিদাসস্য"। আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথও সুবিশাল উপমার জগৎ নির্মাণ করেছেন। শব্দকে নিয়ে তাঁর উপমালোক, অন্য পরিচ্ছেদে বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছি। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীতের দুটি অত্যাবশ্যক ও গুরুতর শব্দ—"গান" ও "সুর" কে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। শব্দদুটি রবীন্দ্রসংগীতে বিপুল প্রভাব ও রস-সঞ্চার ক'রে প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলেছি, গীতাত্মক শব্দের প্রভাবে কাব্য-দেহে বা সংগীতের বাণীতে যে সুরের আবহ এবং সুরেলা পরিমণ্ডল সৃষ্টি লাভ করে, আলোচ্য শব্দদুটির প্রযুক্তি থেকে তা বিশেষভাবে প্রণিধান করা যায়। সুর ও গান শব্দ দুটি ছাড়াও গীত, সংগীত প্রভৃতি শব্দ নিয়ে বিশিষ্ট বাক্‌প্রকরণ

রবীন্দ্রসংগীত থেকে পর্যালোচনা করা যায়। গান, গীত, সংগীত শব্দগুলোকে একার্থক ধরে নিতে পারি।

গান : উপমালোক ও মূর্ত সংরাগ

(পূজা পর্যায়ের গানে) সংগীত সৌরভে (ভূমিকা), গানের ডালা (১), গানের তারা (২), গীত লেখা (৯), গানের তরী (১৬), গানের বেদন (১২), গানের খেলা (১৯), গানের ঝরণাতলা (৩০) গীতসুধা রস (৯৫), গানের কুসুম (১৮২), গানের পালে (৫৬০), গানের পরশ (৬০৩) গানের আগুনজ্বালা (১), গানের লিপি (২৯),

(প্রেম পর্যায়ের গানে) গীতসুধা (১), গানের রতনহার (৩), গানের বন্ধন (৪), গানগুলি মোর শৈবালেরি দল (৭), গানের ডালি (৭), গানের স্রোত, গানের প্রদীপ (৮), গানের ভেলা (২০), গানের ভরা উঠলো ভরে (২২), গানের সাগর (২২), গানের আল্‌পনা (৮০), গানের নূপুর (১৬৬), গানের তরণী (২৮২), গানের খেয়া (২৩১), গানের টানা জাল (২৩৮), ইত্যাদি।

(প্রকৃতি পর্যায়ের গানে) গানের পত্রপুটে (৫), গানের ভার (১৮), গানের তুফান (৪১), গানের পাখা (৬০,২১৮), গানের পালা (৭৭), গানের হংস বলাকাপাঁতি (১২৫), গানের ঢেউ (২৫৪), গানের কল্লোলিনী (২২৩), গানের বোঝা (২৫৯), গানের মুকুল (২৬৩), ইত্যাদি।

(বিচিত্র পর্যায়ের গানে) গানের পালা (১৫), গানের পদ্মবন (২০), গানের ভেলা (২৩), গানের ভাষা (৩১), গানের পাথ্‌না (৫৯), গানের লেখা (১৩০), ইত্যাদি।

গানকে উপমেয় ধরে উপমানের বিচিত্র শব্দসম্ভার হলো : ডাল, তারা, লেখা, লিপি, তরী, ঝরণা, ঝরণাতলা, সুধা, সুধারস, কুসুম, তাল, রতন হার, হার, বন্ধন, শৈবাল, ডালি, প্রদীপ, পরশ, সৌরভ, বেদন, ভেলা, ভরা, ভার, বোঝা, সাগর, আল্‌পনা, নূপুর, তরণী, তুফান, খেয়া, টানাজাল, পত্রপুট, পাখনা, পালা, হংসবলাকা পাঁতি, ঢেউ, কল্লোলিনী, মুকুল, পদ্মবন ইত্যাদি।

মানব জগৎ, নৈসর্গিক জগৎ, বিশ্ব চরাচরের বিষয় এখানে ভিড় করে এসেছে। গান শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌শিল্পের এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ অনুধাবন করলে পুলকিত হওয়া যায়। গানের ছত্রে ছত্রে গান শব্দ

নিয়ে উপমা-প্রয়োগ ও তার অভিব্যঞ্জনার উদ্ভাসন আমাদের বিস্ময় জাগায়। কিছু দৃষ্টান্ত :

হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে সারে সারে (পূ৩), বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া (পূ ৯২), সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীতসুধারসে এসো (পূ ৯৫), গানের ঝরণাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে (পূ৩০), গানগুলি মোর শৈবালেরই দল (প্রে৫), তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা (পূ ১)।

রবীন্দ্রসংগীতে এভাবে দেখতে পাবো, গান শব্দকে উপমেয় ধরে এই বিচিত্র উপমানের প্রয়োগ ও তার বিদগ্ধ বাকৃশৈলী। আবার গান, গীত শব্দকে উপমান হিসেবে ধরেও অলংকার। যেমন :

(গান : উপমান) আলোকের গান (পূ ২৭০), কিরণ সংগীত (পূ ৩২০), সে বাণী যেন গানেতে লেখা (প্রে ২৫৩), সোনার গান (প্র ১৪৮), আলোর সংগীত (প্রে ২৫৪), মেঘলা গানের বাদল অন্ধকারে (পূ ২৪), ইত্যাদি।

সুর : উপমা ও ভাবগম্ভীর বিমূর্ত সংরাগ

'সুর' শব্দটি রবীন্দ্রসংগীতে গান শব্দের মতো বিপুল পরিমাণে প্রযুক্ত হয়েছে। সংগীতে সুরের পরিমণ্ডল বা আবহ সৃষ্টিতে এই শব্দটির গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত হ'য়েছে দেখতে পাই। সুর শব্দ নিয়ে বিশেষণ, উপমা ও রূপক ইত্যাদির ভাষণ-প্রকরণ রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্য।

উপমালোক : সুর

(পূজা পর্যায়ের গানে) সুরের গন্ধ (১), সুরের ধারা (৩), সুরের আলো, সুরের হাওয়া, সুরের সুরধুনী, সুরের জাল (৪), সুরের আগুন (৬) সুরের ধারা, (১০), সুরের ফুল (১৬), সুরের আসন (২৪), সুরের পথ (২৫), সুরের পথের হাওয়া (২৫), সুরের রঙ্ (সুরের রঙের রঙিন নাটে), সুরের ধারা (২৯), সুরের খেলা (২২৪), সুর পরিষদ (২৩৭), সুরের রস (৩৪৭), সুরের দেহ (৬১৭), সুরের সোহাগ (৩১২), সুরের সুতো (৬০৩), ইত্যাদি।

(প্রেম পর্যায়ের গানে) সুরের হোমানল (১), সুরের অর্ঘ্য (২৪), সুরের রূপ (৬৮), সুরের সান্ত্বনা (৮০), সুরের আবরণ (১৪৬), সুরের প্রাণের বেদী (১৬৮), সুর যুবতী (২০৭) সুরের প্রতিধ্বনি,

সুরের বাঁধন, সুরের লেখা (২৩৮), সুরের তরী (২২৪), সুরের রেখা (২৫৩), সুরের দূতী (৩১৮), সুরের প্রবাহ (৩৩২)।

(প্রকৃতি পর্যায়ের গানে) সুরের ঢেউ (১০), সুরের হার (১৬), সুরের ক্ষেত (১২৬), সুর তরঙ্গ (১২০), সুরের সংকেত (১২৭), সুরের মালা (১৭৭), সুরের আবীর (২০৫), সুরের ধারা (২০২), সুরের খেলা (২২৮), সুরের বান, সুরের প্লাবন (২৩৬),

(বিচিত্র পর্যায়ের গানে) সুরের ছন্দ (২), সুর সুরধুনীর ধারা (২০), সুরের কাঁপন (২৩), সুরের ভুবন (২৭), সুর নদীর কূল (৪৬), সুরের দান (৯৪), ইত্যাদি।

উপমেয় সুরের সঙ্গে বিচিত্র উপমানগুলো : গন্ধ, ধারা, আলো, হাওয়া, সুরধুনী, জাল, আগুন, ফুল, আসন, পথ, রঙ, খেলা, পরিষদ, রস, দেহ, হোমানল, অর্ঘ্য, রূপ, সান্ত্বনা, আবরণ, প্রাণ, বাঁধন, প্রতিধ্বনি, লেখা, তরী, রেখা, দূতী, যুবতী ঢেউ, হার, তরঙ্গ, ক্ষেত, সংকেত, মালা, আবীর, বান, প্লাবন, ছন্দ, কাঁপন, ভুবন, কূল, দান, ইত্যাদি।

সুরকে উপমান ধ'রে : সোনার সুর (পূ ২৩), সোনার বরণ সুরের ধারা (পূ ৩০), আলোর সুর (প্রে ১২৬), পুষ্প বিকাশের সুর (প্রে ৩৩১), আলো ছায়ার সুর (প্র ৬), চলার সুর (বি ৩২) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রসংগীতে সুর শব্দ নিয়ে বিশেষণ, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিদগ্ধ ভাষণ-শৈলী উল্লেখযোগ্য। কিছু দৃষ্টান্ত :

গানের সুরের আসনখানি পাতি (পূ ২৪), সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে/সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে/বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী/চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি (পূ ৪), তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে (পূ ৬), দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে/সেইদিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে (পূ ১৬), সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে (প্রে ৯), আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন (পূ ৩১২)।

উদ্ধৃত বাণীবন্ধে সুরের সোহাগ, সুরের ঢেউ, সুরের মালা, সুরের ফুল ইত্যাদি অনন্য অসামান্য শব্দ-শিল্প রচিত হয়েছে।

গান ও সুর : বিচিত্র ধ্বনির মূর্ছনা

গান ও সুর—শব্দ দুটির উপমেয় ও উপমান বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। দুটি শব্দ আপাতত সম-উপাদানের হলেও তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য কবি-চেতনায় প্রতিভাত হয়েছে ; কেননা শব্দ দুটির সঙ্গে উপমান সংযোজনা কিংবা তুলনা-করণের সময় অনেক স্থলে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করতে পাই। ব্যাপারটি খুব সূক্ষ্ম হলেও অভিনিবেশ সহকারে এটি ধরতে পারা যায়। যেমন : গানের কুসুম, গানের নূপুর, গানের পাখা—এই উপমাগুলো প্রণিধান করলে এদের বস্তু-গ্রাহ্য রূপটাই চোখে পড়ে। কিন্তু সুরের গন্ধ, সুরের সোহাগ, সুরের হাওয়া, সুরের প্রতিধ্বনি—উপমাগুলো অনির্বচনীয় মায়ালোকের খবর এনে দেয়। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শব্দের সঙ্গে সমান উপমান প্রয়োগ করাও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সমশব্দ, প্রতিশব্দ ও সমভাবের উপমান প্রয়োগ পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলো থেকে এখানে এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারা যায় :

গানের তরী : সুরের তরী, গানের টানা জাল : সুরের জাল,
গানের বন্ধন : সুরের বাঁধন, গানের তুফান : সুরের প্লাবন,
গানের লেখা : সুরের লেখা, গানের আল্‌পনা : সুরের আসন,
গানের কুসুম : সুরের ফুল, গানের ঢেউ : সুরের ঢেউ,
গানের হার : সুরের হার, গানের স্রোত : সুরের তরঙ্গ,
গানের সাগর : সুরের নদী, গানের মালা : সুরের মালা,
গানের ধারা : সুরের ধারা, গানের তরী : সুরের তরী,
গানের তারা : সুরের তারা ইত্যাদি।

শব্দ দুটোর (উপমেয়-র) উপমান চয়নে এই সমতা ও তুলনা যেমন স্পষ্টীভূত হয়েছে, পার্থক্যটাও তেমন প্রকট হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। অর্থদ্যোতনা ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা কোন কোন শব্দের স্বভাবসিদ্ধ। ভাবের একটি চিরগ্রাহ্য সংস্কার আছে। শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার একটা তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা চকিতে মানসপটে আভাসিত হয়ে উঠবে। যেমন : ঢেউ, তরী, প্রবাহ, প্লাবন, মালা, হার, কুসুম, ফুল ইত্যাদি শব্দগুলোর একটি বস্তু-গ্রাহ্য তাৎপর্য ও ভাবের প্রসাদ আছে। গান ও সুর—শব্দ দুটির সঙ্গে এগুলো উপমিত হয়ে গীতাত্মক রসব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত করে এবং রসকে অভিব্যক্ত করে। কিন্তু অন্য উপমানগুলো গান ও সুর শব্দ দুটির সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সংলগ্ন হয়ে উপমিত হলো কেন ?

প্রথমত: গান ও স্থর এবং অন্যান্য উপমান-শব্দগুলোর প্রকৃতিগত অবস্থায় তারতম্য আছে। শব্দ বা কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যে লক্ষণা বা প্রতীয়মান অর্থ প্রতিভাত হয়, তার সূক্ষ্মতা ও স্বরূপ নিয়ে আমরা ভাবতে পারি; অর্থাৎ অর্থের মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। বস্তু-রূপ অপেক্ষা তার নিরালম্ব বিমূর্ত রূপটা নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের। গান ও স্থর শব্দ দুটিতে যথাক্রমে বস্তুগত ও বিমূর্ত অবস্থা প্রকটিত হয়। স্থর চরমতম সূক্ষ্ম অবস্থা, অনির্দেশ্য, অনুভববেদ্য, ইন্দ্রিয়াতীত। গান অপেক্ষাকৃত বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়বেদী। গান শব্দটির সঙ্গে বাস্তব ক্রিয়ার সংযুক্তি আছে ব'লে আমরা সহজে তার অর্থের সংস্কার ধরতে পারি। গান হলো কথা ও স্থরের সমন্বিত উপাদান। গানের স্থর, গানের তান, গানের সাহিত্য, গানের গায়ক ও গায়কী, গানের পরিবেশন ও আয়োজন, গানের শ্রোতা—এমনই সব বাস্তব ধারণা।

এর থেকে গান ও স্থর শব্দ দুটির প্রথমটিকে মূর্ত বা কংক্রিট, দ্বিতীয়টিকে বিমূর্ত বা এ্যাবষ্ট্রাক্ট্ উপাদান হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারি। বোধকরি রবীন্দ্রনাথ এজন্যই তাদের উপমানগুলোকেও পৃথক ক'রে প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: কবি রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম ও সতর্ক করণ-কৌশলের মাধ্যমে ভাব বা ইমোশন, ইন্টেলেক্ট্ ও রস-স্বজ্ঞাকে প্রকাশ করেছেন। শব্দের বাহ্য বা সূক্ষ্ম রূপ যা-ই থাকুক, কবি অর্থের বিমূর্ত অবস্থা বা এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শ্‌ন এবং দ্বিতীয়ত: তার বস্তুগত রূপকে তাঁর রচনায় পারম্পর্যে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যসংগীতে এই ব্যাপারটিকে একটি বিস্ময়কর কারুকর্ম হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতের বাক্‌প্রকরণ-লীলার ক্ষেত্রটি অধিক প্রশস্ত ও ঐশ্বর্যপূর্ণ। এখানে নানাভাবে সেই প্রকরণ-লীলাকে পর্যালোচনা করবার অবকাশও আছে। এখানে গান ও স্থর শব্দ দুটির মধ্যে কবি-চেতনার যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ও পার্থক্য-বোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তার একটি সম্ভাব্য চিত্র নিম্নরূপ বিবৃত করা যায়।

গান শব্দটি মূর্ত উপাদানের সঙ্গে নৈকট্য পেয়েছে: ভেলা ভরা ভার বোঝা সাগর পাল ঝরণা শৈবাল ডালা জাল ঢেউ স্রোত কুসুম মুকুল পত্রপুট তারা প্রদীপ আল্‌পনা নূপুর লেখা পাখা বলাকা ইত্যাদি।

'গান' বিমূর্ত উপাদানের সঙ্গেও মিশেছে। যেমন: সুধা সুধারস সৌরভ পরশ স্থর রস বেদন ইত্যাদি।

বস্তুর সঙ্গে বস্তুগত উপাদানের সম্পর্কটি অধিক প্রত্যক্ষ ও অভিপ্রেত।

বিমূর্ত উপাদানের সঙ্গে বিমূর্ত উপাদানের সম্পর্কটি তেমনই অভিপ্রেত।

'সুর' বিমূর্ত উপাদানের সঙ্গে মিশেছে। যেমন: গন্ধ আলো হাওয়া রস পরশ সুরধুনী প্রাণ প্রতিধ্বনি সংকেত কাঁপন দান বেদন সোহাগ সান্ত্বনা খেদ ছন্দ ইত্যাদি।

'সুর' মূর্ত উপাদানের সঙ্গে: রূপ ধারা পথ কূল রঙ ঠাট খেলা পরিষদ দেহ মালা, আগুন, অর্ঘ্য আবরণ আবীর রেখা দূতী যুবতী ভুবন ক্ষেত্র বেদী ইত্যাদি।

সুর শব্দের সঙ্গে মূর্ত ও বিমূর্ত উপাদানের শব্দ (উপমান) গুলি যেভাবে বাণী-শৈলীতে সংলগ্ন হলো, তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে একটা কথা বলা যেতে পারে। এখানে সুরের বিমূর্ত-চিন্তার বস্তু-রূপায়ণ কি সম্পূর্ণ সম্ভব হলো? সুরের রূপ, সুরের আবীর, সুরের রঙ, সুরের রেখা, সুরের পথ, প্রভৃতি কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রত্যক্ষ বস্তুরূপ ইন্দ্রিয়বেদী হয়ে ধরা পড়ছে না। মূর্ত ও বিমূর্ত অবস্থার মাঝামাঝি একটি সূক্ষ্ম অবস্থা যেন আভাসিত হয়। এর কারণ হলো, সুর শব্দটিই যারপর-নাই এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শ্‌ন্ ও অতীন্দ্রিয়। অথচ গানের হার, গানের ফুল, গানের পাখা, গানের তরী, গানের সাগর প্রভৃতি কথাগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রত্যক্ষতার আভাসে ধরা পড়েছে খুব সহজে।

পুনরায় দেখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ অতিসূক্ষ্ম বিমূর্ত উপাদানগুলোকে কিভাবে প্রমূর্ত করবার চেষ্টা পেয়েছেন। সূক্ষ্ম নিরালম্ব বাষ্পায়িত রস-চেতনাকে ভাবের শৈত্যে শিলীভূত প্রত্যক্ষ-রূপে আনবার চেষ্টা যেন। যেমন: আলোর সংগীত, কিরণ সংগীত, সুরের আবীর, সুরের গন্ধ, প্রেমের সেতার, প্রভৃতি। আলো, কিরণ, সুর, প্রেম প্রভৃতি শব্দের অবয়ব কিংবা বাহ্য অবস্থা কেমন? বলা যেতে পারে, তাদের ধরা হলো আধার দিয়ে। আধার ও আধেয়ের (Content) এই সম্পর্কটি বড় বিচিত্র। বোধি অনুভূতি স্বজ্ঞা ভাব বা ইমোশন ইন্দ্রিয়-চেতনা কিংবা জড় বস্তুর উপাদানে এই সূক্ষ্ম আধার নির্মিত। রবীন্দ্রসংগীতে একেই আমরা সুরের তরঙ্গ-প্রহত-আবহ-ভূমি বলেছি—কবিগুরু যাকে ব্যাপকার্থে ধ্বনির শিল্প আখ্যা দিয়েছেন। একটু ভাবলে এই আধার ও আধেয়ের সম্পর্কটি যে রকম মনে আসে:

আলোর সংগীত—এর আধার শ্রুতি অনুভূতি দৃষ্টি বোধ

সুরের গন্ধ—এর আধার ঘ্রাণ অনুভূতি শ্রুতি হৃদয়

সুরের রঙ্—এর আধার দৃষ্টি শ্রুতি অনুভূতি চিন্তা
প্রেমের সেতার—এর আধার শ্রুতি স্পর্শ অনুভূতি হৃদয়
কালের মন্দিরা—এর আধার শ্রুতি দৃষ্টি বোধি চিন্তা

শব্দকে নিয়ে, শব্দের অর্থকে নিয়ে,—রূপের ও ভাবের সন্নিপাতে কবির এ এক আশ্চর্য খেলা। শব্দের সামূহিক তত্ত্বকে নিয়ে এমন করণ-কৌশল তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, রসজ্ঞ সমালোচকগণ সহজে তার কূল-কিনারা নাও পেতে পারেন। কবি শব্দ-তত্ত্ব নিয়ে এক ধরণের পাঠমালা রচনা করেছিলেন। বাক্-কে নিয়ে তাঁর যে এই সীমাতিশায়ী সৃষ্টি-প্রয়াস, তাকে বুঝতে পারলে রবীন্দ্রনাথকে কেন বাক্পতি বলা হয়েছে, তা বোঝা সম্ভব। সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে (গদ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান প্রভৃতি) সেই বিরাট বাক্পতির স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-সৃষ্ট প্রায় সমস্ত রচনাবলীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার মহিমান্বিত দিব্য বৈভব প্রকট হয়ে পড়েছে। প্রকৃত, যোগ্য ও রসজ্ঞ ছাড়া সেই বাক্পতির অলৌকিক লীলার বৈশিষ্ট্য আর কে বুঝবে বা বোঝাবে!

এতক্ষণ গান ও সুর শব্দ দুটি নিয়ে আমরা রবীন্দ্র-সংগীতের গীতানুষঙ্গ প্রসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করেছি। এছাড়াও অন্যান্য শব্দের গীতানুষঙ্গ-প্রয়োগ, বিশেষণ ও উপমা-রূপক ইত্যাদি বুঝতে পারি। রবীন্দ্র-সংগীতের সর্বত্রই বিশেষণের দীপ্ত মহিমা। গীতানুষঙ্গ শব্দ-তালিকা থেকে এই বিশেষণ ও উপমা-নির্মিতির সাফল্য অবলোকন করা যায়। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তৃত তথ্য সহযোগে নানাভাবে এই শব্দানুষঙ্গগুলির প্রয়োগ-প্রকরণ পর্যালোচনা করেছি। কবি অনেক সাধারণ বিশেষণ ও শব্দের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। যেমন: করুণ অজানা নিবিড় বিপুল বিজন অনেক আকুল গহন ইত্যাদি। গীতাত্মক শব্দের অনুষঙ্গে এই সরল শব্দগুলিও যুক্ত হয়েছে। গানের সুরের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব ও রস আছে, কবি বাক্শিল্পে তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। গীতানুষঙ্গেও তাঁর বিশেষণ, উপমা-নির্মাণ কত স্বাভাবিক, তা দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখেছি। যেমন:

(পূজা পর্যায়ে) মরণ জয়ী গান, গানের ঘোর, গান ভোলা গান, গানের বেদনা, গানের বেদন, সঙ্গীত সৌরভে, ভাষা ভোলা গীত, নাম গান, আশাগীত, সুধা সংগীত, গানের ব্যথা, গীতরস, হরষগীত, প্রলয় গানের

মহোৎসবে, গানের পরশ, অসীম গানের রেশ, গানের দেশ, ইত্যাদি
—সুরের দীক্ষা, কঠিন সুর, করুণ সুর, অজানা সুর, সুরের সোহাগ, অসীম সুর, সাঁজের সুর, ইত্যাদি।
—চরম তান, বিশ্বতান, লহরী লীলার তান ইত্যাদি।

(প্রেম পর্যায়ের গানে) গানের বেদনা, গানের পরশ, কাতর গান, গোপন গান, সেঁউতি ঝরা গীত, নতুন গান, সুদূর রাতের গান।
সুরের আশা, সুরের কাঙাল, সুরের সাহস, গভীর সুর, উদাস সুর, কাঁচা সুর, আবেশ বিহ্বল সুর, পিছন ফেরা সুর, সুর-যুবতী, সুরের দূতী, ইত্যাদি।
—বিহ্বল তান, মোহন তান, সুরহারা মূর্চ্ছনা, আকুল তান

(প্রকৃতি পর্যায়ে) সংগীত মধুরিমা, গানের নেশা, ভুলে যাওয়া গীতি, চোখের জলের গান, করুণ গান, মিলন গীতি, আনন্দ গান, কলগীতি।
—সজল সুর, আকুল সুর, বিদায় সুর, হাসিঢালা সুর, উদাস করা কোন সুর,—মায়াতান, সোনার তান, করুণ রাগিণী, নৃত্য রস-ভঙ্গিমা, মহাতান, ইত্যাদি।

(বিচিত্র পর্যায়ে) গোপন গান, ভাঙনের জয়গান, হারিয়ে যাওয়া গীতি, বিপুল গান, প্রেমের সেতার, আলোর নাচন, ইত্যাদি।

গান, সুর, তান, তাল, গীত, সংগীত, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলোর বিচিত্র বিশেষণ ও উপমাদি অলঙ্কার লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেল, শব্দগুলোর প্রয়োগে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা ও সূক্ষ্মতা, আবেগ ফুটে উঠেছে; এখানে শব্দ বা অর্থের বক্রতা বা কাঠিন্য কম, কিন্তু রসের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে বেশী। সংগীতে প্রযুক্ত ব'লে গানের বাণীকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল হতে হয়েছে। বাংলা গানের স্বরবর্ণের স্থিতি-স্থাপকতা কম ব'লে তাতে খেয়াল গানের তানালাপ (ইম্প্রভাইজেশন) আরোপ করা যায় না, ওস্তাদ মহলে এধরণের একটা অভিযোগ প্রচলিত আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সংগীতে তানের বিস্তার-রীতিকে মূল্য দেন নি এইজন্যে যে, তাতে গানের সুর ও অর্থের সমন্বয় ঘটে না। শ্রোতা বা গায়কের মনে একটি সামগ্রিক ভাব বোধ ও সুরের রসের স্ফুরণ হয় না। অথচ রবীন্দ্র-সংগীতে স্বরবর্ণের নমনীয়তা ও কমনীয়তা অস্পষ্ট নয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেশী প্রয়োগের দ্বারা গানের বাণীতে কবি ধ্বনির সঞ্চরণ ঘটিয়েছেন খুব বেশী। বাংলা ভাষা সম্পর্কে ওস্তাদদের উন্নাসিকতা

ও অভিযোগ সর্বৈব যথার্থ নয়। বাংলাভাষা বর্তমানে বিচিত্র উপাদানে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষানির্মাণে সেই গৌরব আজ বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা কাব্যসংগীত নিয়ে আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা চলেছে। কেউ কেউ বাংলাগানে খেয়াল রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। কোন কোন রাগাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে সুরবিস্তারের রূপরেখা অস্পষ্ট নয়। তেমন গানের ভাষাও সুরের উপযোগী হয়েছে। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কেবল-মাত্র রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও ভাষানির্মাণ-কৌশলের দ্বারাই। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত নির্ভর ক'রে রবীন্দ্রনাথের রচনা-নির্মিতির এবং বাক্-প্রকরণ-কৌশলের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। এবং বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত হলো রবীন্দ্রসংগীতের সীমাতিশায়ী ভাব বৈচিত্র্যের উজ্জীবনে ও উদ্দীপনে গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গের নিবিড় অন্তর্প্রাবী প্রভাব এবং রবীন্দ্র-সংগীতের সুরপ্রহত আবহভূমি রচনায় এই বাক্-প্রকরণের বাহ্য ও সূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশল। অতঃপর এই প্রসঙ্গের এখানেই আমরা উপসংহার টানতে চাই।

নির্দেশপঞ্জী

১। মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য পৃ: ১৩০-১৩১

২। P. B. Shelly—A defence of Poetry : The Prelude to Poetry p. 207

৩। "Every nation, every race has not only its own creative but its own critical turn of mind ; and is even more oblivious of the short comings and limitations of its critical habits than of those of its creative genius"

T. S. Eliot—Tradition and the Individual
Talent : Sacred word p. 47

"No Poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poet and artists."

—Sacred wood p. 49

৪। মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক সাহিত্য পৃ: ২৩৯

৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড) পৃ: ১৫৫

৬-৭। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা পৃ: ১২৪ (আলাপ আলোচনা)

পৃ: ৮৯ (কথা ও সুর)

৮। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য পৃ: ৪, ৫ এবং সাহিত্যের পথে পৃ: ১৮

৯। T. S. Eliot—The voices of Poetry (1953) p, 18

১০। রবীন্দ্রনাথ—সংগীত ও কবিতা : সংগীত চিন্তা পৃ: ২৬

১১। Encyclopaedia Britanica—Vol. 25. p. 438.

১২। দ্রষ্টব্য : বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ভারতীয় সংগীত কোষ পৃ: ৮৩

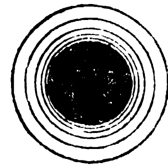
১৩। T. S. Eliot—Sacred Wood p. 54

১৪। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) পৃ: ৫২১

১৫। 'রম্যবীণা' শব্দটির প্রেরণা একটি পাঞ্জাবী গান—"বাদৈ বাদৈ রম্যবীণ বাদৈ"। রবীন্দ্রনাথ এই গানটির সুর ভেঙ্গে "বাজে বাজে রম্যবীণা" গানটি সৃষ্টি করেন। কবি রম্যবীণা শব্দটির ব্যবহার বেশি করেন নি। বিশ্ববীণা, অগ্নিবীণা, অরুণবীণা, হৃদয়বীণা প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ বেশি দেখা যায় রবীন্দ্ররচনায়।

১৬। অরুণ ভট্টাচার্য—সংগীতচিন্তা পৃ: ২৭

উত্তর ধারা



হে নিঃশঙ্কিতা,
আত্ম-হারানো রুদ্রতালের নূপুরঝঙ্কৃতা,
মৃত্যুতোরণ-তরণ-চরণ-চারিণী
চিরদিন অভিসারিণী,
তোমারে চিনি।

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি,
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে।
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে সেতো কেবলই গান কেবলই বাণী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কবিতা ও সংগীতে রসের সৌন্দর্য ও আনন্দস্বরূপতা

এক

সংগীতের রস বলতে সংগীতশাস্ত্রিগণ বুঝিয়েছেন, সুরলোকের সূক্ষ্ম অনির্বচনীয় রঞ্জনাশক্তিকে, যা সহৃদয়-সামাজিক শ্রোতার চিত্তকে দ্রবীভূত ক'রে দিয়ে তার ব্যক্তি-সত্তা ও বোধের ওপরে মহনীয় আত্মস্বরূপের জাগরণ ঘটায়। সংগীত-রত্নাকর বলছে—আস্বাদন নামক স্বসংবেদ্য সুখস্বরূপ সংবিৎকে রস বলা হয়। গানের আস্বাদনে চিত্তের এই উর্ধ্বগামী উত্তরণের বিষয়টি দার্শনিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার যোগ্য হ'লেও এর আসল কথা হচ্ছে আনন্দ-স্বরূপতা, কিংবা বলা যায় আনন্দ-রস-সম্ভোগ। স্বরের সুরে অথবা সুর-মিশ্রিত কথায় সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত যে রসে ও আনন্দে রঞ্জিত হয়,[১] তার বৈশিষ্ট্যগুলিও অসাধারণ। সংগীতের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই ভারতীয় রাগ-সংগীতের গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। প্রজ্ঞানানন্দজী বলেন— "রাগকে আমরা বলি আন্তর-বাহ্যাবগাহী বা সাইকো-মেটিরিয়েল পদার্থ, কেননা বাহ্য জগতে ও মনে তথা অন্তঃকরণে উভয় স্থানেই তার ক্রিয়া-চঞ্চল ভাব ও গতি আমরা লক্ষ্য করি। রাগের কাঠামো বাইরের জগতে প্রকাশ পায়, কিন্তু তার সংবেদন হয় মনে।"[২] মানসিক সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীত ও সাহিত্যের রসসৌন্দর্য কালে কালে মনীষিগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয়

সংগীত ও অলংকার-শাস্ত্রে এবং প্রতীচ্যের নন্দনতত্ত্বে রস-স্বরূপের ব্যাখ্যায় সীমাহীন বিশ্ব-প্রতিভার দীপ্তি সু-সংরক্ষিত। সাহিত্য ও সংগীতে রস এক-রকম বাসনা-বিস্তারী অলৌকিক প্রতিক্রিয়ায় সত্ত্বোদ্রেক কিংবা অভিব্যক্ত হ'য়ে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। গায়কের কণ্ঠস্বর-ক্ষেপনে ও সুনিয়ন্ত্রিত শ্রুতি-সুভগ ধ্বনি-পরম্পরায় অনির্বচনীয় অথচ অর্থগত বোধে শ্রোতাকে রসার্দ্র করে। কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি হ'লো সহৃদয় সামাজিকের মনে অলৌকিক আনন্দের জগৎ নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা সীমাতিশায়ী সৌন্দর্যের আধার। আমরা বলবো—সেই আধারটাই হলো ভাব; ভাব ও রসের আধার। প্রমথ চৌধুরী বলছেন, "শাস্ত্রমতে সংগীতকে কাব্যের মতো বীর করুণ শান্ত প্রভৃতি নানারসের আধার বলে কল্পনা ও বর্ণনা করা হয়েছে।"[৩] ভরতাচার্য, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, হেগেল, কাণ্ট, নিট্‌সে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ রস ও সৌন্দর্যের মৌল আধার হিসেবে ভাব ও ইমোশানকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেছেন—

"In the history of aesthetic we may discover a growing consensus of emphasis upon the doctrine that all beauty is the expression of what may be generally called emotion, and that all such expression is beautiful."[৪]

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাব হোলো আত্মস্বরূপ ; এবং ভাবের প্রকাশ হোলো আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ। তিনি বলেন— "রস মাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই আনন্দ।"[৫] সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী ও রূপ, গানের সুরমূর্চ্ছনা, স্বরকম্পন, আলপ্তি, তানকর্তব ইত্যাদি মার্গীয় ও উচ্চাঙ্গ রাগ-গীতিরীতি মানব-চিত্তে ও অনুভবে নিশ্চিন্ত রসাভিব্যক্তি ঘটায়। প্লেটো, এরিস্টটল্ প্রভৃতি মনীষিগণ ললিতকলাশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগ (ভাস্কর্য, চিত্র, গীত, নৃত্য, বাদ্য ইত্যাদি) কে অনুকরণাত্মক ক্রিয়ার ফল হিসেবে বলেছেন। তাঁরা হারমনি ও রিদম্‌কে সংগীতের মাধ্যম এবং ভাবাবেগকে অনুকার্য বিষয় ব'লে ধরেছেন। চিত্র, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতি কলা-র কাজই অনুকরণের দ্বারা সৌন্দর্য-রূপকে প্রকাশ করা ও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই পুরোপুরি অনুকরণ-নীতিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, ভাব-বৃত্তির অনুশীলনে ও ভাব-প্রকাশে একটি সমগ্রতার বিশেষত্বই হলো আসল কথা। তিনি বলেন— "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য ইহাই ললিতকলা।"[৬]

শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্লেটো ও এ্যারিস্টট্‌ল জ্ঞানাত্মক অনুকরণ-বৃত্তিকে প্রাধান্য দিলেও পরবর্তীকালে অনেকে (কাণ্ট প্রভৃতি) আবেগাত্মক অনুভব-বৃত্তিকে, কেউ (ফ্রান্সের ডি ব্যাসু প্রমুখ) ভাবাবেগবাদকে, কেউ (ইটালীয় ভিকো প্রমুখ) কল্পনাবাদকে, কেউ (হার্বার্ট প্রমুখ) রূপবাদ বা ফর্মালিজম-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংগীত সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান-দেশীয় মনীষী এডোয়ার্ড হ্যান্সলীকের নতুন চিন্তা ও পর্যালোচনা উল্লিখিত মতবাদগুলি অপেক্ষা একটি অভিনব ও মূল্যবান দিগদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সংগীত-শিল্পের বৃত্তি, বিষয় ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে হ্যান্সলীক কল্পনাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কল্পনার মাধ্যমেই সুরশিল্পী ও শ্রোতা গানের রূপ-রস, সৌন্দর্য ও আনন্দের অবয়ব রচনা ক'রে নেয়। তাঁর মতে সংগীত কোনো কিছুর ভাব, অনুকরণ বা অনুভব বা শূন্যগর্ভ অবস্থা নয়। তিনি বলেন— "A Musical composition originates in the composer's imagination and is intended for the imagination of the listener."[৭]

মেলোডি বা হার্‌মনি অর্থাৎ সুরধ্বনি হলো আইডিয়া; এই আইডিয়াকেই মাধ্যম ক'রে সংগীতে সুন্দরকে ধ্যান মূর্তিতে গড়ে নিতে পারে শিল্পী ও রসজ্ঞ শ্রোতা। উভয়ের কল্পনার ওপর প্রায় সমান দায়িত্ব। শিল্পী ও শ্রোতা উভয়কেই সুরের রূপ কল্পনা করতে হয়।

ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার্য হলেও, ভারতীয় রাগসংগীতে এভাবে সুরধ্বনির আইডিয়া অর্থাৎ সুসমন্বিত সুসঙ্গত সুরের কাঠামো (organic Unit) রচনা করা এবং সেই অনির্বচন সংগীতে 'চরমের রূপ' প্রতিফলিত করার জন্য বিশুদ্ধ ধ্যান ও কল্পনা বৃত্তির আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রকাশের রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে কল্পনা ও স্বতোবোধের বস্তু-রূপ; এবং তাঁর প্রকাশ-তত্ত্বের মূলনীতিতে আছে রূপ ও সুন্দরের বিকাশ, রসের ও আনন্দের অভিব্যক্তি, আত্মার উদ্‌বোধ ও অদ্বয়বাদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "রস মাত্রেই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ ও আমার প্রকাশ একই কথা।"[৮]

তিনি আরও বলেছেন—"জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য।"[৯]

রবীন্দ্রসংগীতে এই প্রকাশতত্ত্বের সব মূল ও সূক্ষ্ম সূত্রগুলো রূপায়িত। রবীন্দ্রসংগীত ও ইস্‌থেটিকের মধ্যে পার্থক্য নেই ব'লে এখানে ভাব, ভাষা ও সুর এমন পরিপূর্ণ অন্বয়-ঐক্যে সুসমঞ্জস, এখানে সুন্দরের ও রসের প্রকাশ এমন প্রত্যক্ষ। এখানে আত্মার উদ্‌বোধ একই সঙ্গে কবির ও সহৃদয় রসজ্ঞের। এ'কথাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টি-কর্ম সম্পর্কেও বলতে পারি। ভারি আশ্চর্য এ এক প্রতিভান।

দেশে-বিদেশে সংগীত নিয়ে প্রধানতঃ দুটো মনোভাব ব্যক্ত হয়।

এক) সংগীত নিছক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন (নির্গুণাত্মক ক্রিয়া), বচনহীন অনির্বচনীয়ের রস-প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ-ও এ রকম মতের ধারক।

দুই) সংগীতের একটা রূপকে প্রতিমায়ণে সগুণাত্মক সৌন্দর্যে ধরা হয়। সুকুমার ললিত শিল্পকলার অক্ষর শব্দ রঙ্‌ ইত্যাদির মতো গানের স্বর-শ্রুতিতে শ্রোতা ও কলাকারের মানস-পটভূমে একটা ছবি ক'রে নেওয়া হয়, যাকে বলা যায় আইডিয়ার ছবি। ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রকৃতি ও অনুভব-গুলোকে মানবমানবী ও দেবদেবীর রূপাবয়বে আঁকবার প্রবণতা বহু যুগ ধরে চলে এসেছে। টোড়ি রাগিণীর প্রচলিত একটি ছবির বিবরণ দিয়ে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন—"ইহা টোড়িরাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ীরাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। এই রকম অন্যান্য রাগরাগিণীর ধ্যান।"[১০]

সংগীতের নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়বিধ প্রকাশের মৌল সূত্র ধরতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় ধ্যান, ভাবের ধ্যান। এই ধ্যান নিঃসন্দেহে কবি-কল্পনার ও রসের। নাট্যশাস্ত্রে ভরতাচার্য এই অনুভব ও রসাস্বাদনকে বলেন—'আস্বাদ্যত্বাৎ'। শার্ঙ্গদেবও বিভাব ব্যভিচারী সংযোগে রস-নিষ্পত্তির কথা স্বীকার করেন। এবং ভারতীয় রসশাস্ত্রের অসামান্য মনীষী পণ্ডিত আনন্দ-বর্ধন ও অভিনবগুপ্ত রস-স্বরূপকে 'পরব্রহ্মাস্বাদ সচিব' কিংবা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' ব'লে জানিয়ে গেছেন। এই সূক্ষ্ম ভাবনারই যথার্থ অনুবর্তী হ'লেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

রসের আনন্দময় ফলশ্রুতিতেই ললিতকলা-শাস্ত্রের সর্বশেষ পরিণাম। যুগে যুগে রসসাহিত্য অর্থাৎ কাব্য, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি এক পরমকে সন্ধান ক'রে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা কিছু

প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ"।[১১] তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশে পরম পুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে, তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটি হচ্ছে সব শেষের কথা। এর পরে আর কোন কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব, তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোন হিত সাধন হয়।"[১২]

আর্ট ও ললিতকলা শাস্ত্রের আনন্দময় রস-সৌন্দর্যের প্রকাশ-তত্ত্বটি ভারতীয় সংগীতেই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে শতাব্দীর সাহিত্য ও সংগীত বিশেষজ্ঞগণ 'নাদাত্মক জগৎ'কে সুরে স্বরে শ্রুতিতে বিষয়ীভূত করেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থে স্বরের বর্ণ ও রস বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। সাতটি স্বর মানুষের রসাভিব্যক্তির অনুকূলে রূপ পেয়েছে। শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকরে-ও এ সবের ব্যাখ্যা আছে। সাহিত্যের রস-পরিণাম ব্যাখ্যার মতো তিনি স্বরের রসের কথা বলেছেন। যেমন—ষড়্জে বীররস, ঋষভে বিস্ময়, গান্ধারে শান্ত, মধ্যমে হাস্য, পঞ্চমে মধুর, ধৈবতে বীভৎস, নিষাদে করুণ রস প্রকাশ পায়। ভিন্নমতে ষড়্জে ও ঋষভে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস, গান্ধারে করুণ, মধ্যমে ও পঞ্চমে শৃঙ্গার ও হাস্য, ধৈবতে বীভৎস ও ভয়ানক, নিষাদে করুণ রস প্রকাশ পায়। আবার কোন্ রসে কোন্ স্বর প্রযোজ্য তারও ভিন্ন মত আছে। সাংগীতিক স্বরগুলি নিয়ে রসানুকূল এই পর্যালোচনা অনেকটা ব্যাকরণ-সম্মত। এতে স্বরের সামগ্রিক ক্রিয়ার ফল স্পষ্ট বোঝা যায় না। এটা কেবল গতানুগতিক ব্যাখ্যামাত্র। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রাচীন সংগীতে স্বরের রসবিনিয়োগ প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এক একটি স্বরের দ্বারা রসনির্বাচন ব্যাপারটি অনিশ্চিত। তিনি বলেন, "মূল স্বরকে কেন্দ্র ক'রেই একটি সামগ্রিক গীতরস পূর্ণতা পায়, মূলস্বরে যে রসের ইঙ্গিতও থাকতো তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত গানে সেই ইঙ্গিতটি ফুটে উঠতো—এটাই ছিল সাধারণ একটি ট্রাডিশন।"[১৩] রবীন্দ্রনাথ এই রসের ব্যাকরণ ও বাঁধাধরা বিধি অস্বীকার করেছেন। আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রসংগীতের রসাভিব্যক্তি সমগ্রের সন্নিপাতে। রসের প্রকাশ ও আনন্দরূপ উপলব্ধিই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত; ব্যাকরণ তো উপলক্ষ্য মাত্র জীবিতের রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য ছেড়ে রসজ্ঞেরা কংকালের বিজ্ঞানকে আশ্রয় করতে চাইবেন কেন? আর রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন শিব সুন্দরের নিত্য-সন্ধানী। জীবনরস ও আনন্দময় জীবন-সত্যের সন্ধান করতে করতে কবিগুরু

বারবার লোকাতীত ব্রহ্মাস্বাদসচিব-সমীপবর্তী হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট রচনাবলীর মধ্যে বিশেষক'রে কবিতা ও কাব্যসংগীতের মধ্যে সেই পরম-রসস্বরূপের পরিপূর্ণ উদ্ভাসন-লীলা অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে। কেবল কতকগুলো স্বর-সমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।"[১৪] কবিগুরুর অসামান্য তত্ত্ব-চিন্তা তাঁর কাব্যে যেমন লোকোত্তর অসীম আনন্দময় রস-স্বরূপকে আবিষ্কার করেছে, তাঁর সংগীতেও ঠিক তেমনটি অথবা ততোধিক ফলশ্রুতিতে এক অনির্বচনীয় আনন্দময় ও বিশুদ্ধ রস-সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই বোধ নিয়েই আমরা তাঁর কাব্য-সংগীতের রস-বিচার করতে পারি নিম্নরূপ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সূত্রে :

(ক) তিনি নিরালম্ব সূক্ষ্ম স্বরের সঙ্গে সমযোগ্য বাণীর মিলন ঘটিয়ে সংগীত-বোধের একটা সাহিত্যগত রস-সমগ্রের রূপায়ব (Complete Form) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গটি কাব্যগীতি ও গীতিকবিতা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"তিনিই প্রথম সুরজগৎ ও বাণীজগতের মধ্যে সংযোগ-সেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনিই প্রথম অনির্বচনীয় ভাবের ও আনন্দের আবেগকে অদম্য ভাবোচ্ছ্বাসকে কাব্যের পরিমিত আধারে, প্রকাশ-শক্তির স্থির অটুট সংযমে আবদ্ধ করিয়াছেন। স্বপ্নলোককে বাণীর শাসনে আনিয়াছেন। প্রতি রাগরাগিণীর অন্তর্লোককে উহার জটিল সুরজালে আবদ্ধ অব্যক্ত আকুতিকে ভাষার সুনির্দিষ্টতায় মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় নিয়মাধীনতায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিনিই সত্যই পৃথিকৃৎ, এক অনাবিষ্কৃত রাজ্যের আবিষ্কর্তা।"[১৫]

(খ) প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকূল পটভূমিতে মানব-চেতন-বৃত্তি অর্থাৎ মানুষের ভাব ও রসবোধ ভারতীয় রাগরাগিণীতে কতখানি স্বাভাবিক-ভাবে সংযুক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। করুণ বীর শান্ত প্রভৃতি রসের আধার হিসেবে ভারতীয় রাগরাগিণীর কল্পনাকে তিনি যথার্থবোধে বিশ্লেষণ করেছেন। রাগরাগিণীর স্বর ও সুর-মিশ্রণের মাধ্যমেও তিনি পরম রসাভিব্যক্তির কারণ

ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গটি আমরা রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেছি।

নব রসের মধ্যে করুণ ও শান্তরস প্রধানতঃ অঙ্গীরস হিসেবে বিরাজ করছে রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় সর্বত্র। করুণ ও শান্তরসের অন্তঃপাতী প্রবাহে ও প্রসাদে রবীন্দ্রসংগীত প্রোজ্জ্বল। এছাড়া উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আনন্দ, বিস্ময়-বিরক্তি, ক্রোধভয় ইত্যাদি সব রস এখানে অভিব্যক্ত। বীভৎস রস সংগীতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনভিপ্রেত। রবীন্দ্রসংগীতে তার উপস্থিতি আমি দেখি নি।

(গ) রবীন্দ্রসংগীতের রস-সৌন্দর্য কবির সামগ্রিক কাব্যরূপ-নির্মাণ-শৈলীর (ভাষা, ছন্দ, মিল্, বাগ্‌বিভূতি, চিত্রকল্প, গীতাত্মক শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদি) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভাব-বিষয়ের উপযোগী ভাষার অবয়ব নির্মাণের লোকোত্তর ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গটি আমরা বিস্তৃতভাবে বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণে বুঝিয়েছি। গানের বাণীর অবয়বে রবীন্দ্রনাথ যে সব নিবিড় সুর সঞ্চার করেছেন, আমার মনে হয়—রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী অংশে সর্বাপেক্ষা প্রাণ-মাতানো সুরের যাদু লেগে আছে। স্থায়ী অন্তরা আভোগ অংশের সুরবিন্যাস সঞ্চারীতে সুনিবিড় রসে, ভাবে, বৈচিত্র্যে ও কারুণ্যের আবেগে অসামান্য সুন্দর হয়ে উঠেছে।

(ঘ) আমার একটি বিশেষ বক্তব্য। রবীন্দ্রসংগীতের রস, সুর ও কথার সম্মিলিত ফলশ্রুতি হ'লেও আমি বলতে চাই, রবীন্দ্রসংগীতের কবিতার রসস্ফূর্তিটাই অগ্রগণ্য। যাঁরা তদ্গতভাবে রবীন্দ্রসংগীত শোনেন এবং হৃদয় দিয়ে বোঝেন, তাঁরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু অনুধাবন করতে পারবেন। মহিমান্বিত বাক্‌-শিল্প সুগভীর অর্থধ্বনিসহ অনতিবিলম্বেই শ্রোতাকে আবেগে উদ্দীপ্ত করে ও রসার্দ্র করে। সেই ভাব ও রসের অতি-সংলগ্ন হয় উপযুক্ত সুরমূর্চ্ছনা; বাণীর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই সুরপ্রবাহ শ্রোতৃচিত্তকে স্পর্শ করে গভীরভাবে। ভাষার ভাব ও সুরের আবেগ এত নৈকট্যে বিরাজ করছে যে, এই অগ্রপশ্চাৎ সূক্ষ্ম দূরত্বটুকু বোঝা যাবে না সহজে। তবে সূক্ষ্ম অনুধাবন ক'রলে ধরা পড়বে যে, ভাষার ভাবটি যাচ্ছে আগে, সুরটা তার সহগামী, সহধর্মিনীর মতো নিবিড়ভাবে আশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের খুব কমসংখ্যক তান-প্রধান ও সুর-প্রধান গান আছে, যেখানে সুরের রসটি প্রধান। সে সব গান সুরকে একান্তভাবে মানছে ব'লে তাদের বাগৈশ্বর্যের বিকাশ কম। রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রধানতঃ ব্রহ্মসংগীতগুলোতে ক্লাসিক্যাল সুরের প্রাধান্য ও বহু রাগরাগিণীর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ-শৈলী দেখতে পাই। অবশ্য বাগৈশ্বর্য নেই এমন রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যায় অতি অল্প।

দুই

রবীন্দ্রনাথ গীতবিতান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সম্পাদন করার সময় গানের একটি সাহিত্যরস-সম্মত বিষয়ানুক্রম উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে (ভাদ্র ১৩৪৬) তাঁর বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরূপ :

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা ক'রে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"[১৬]

গান ও গানের সংখ্যাসহ বিন্যস্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

ভূমিকা ১, (পূজা পর্যায়ে) গান ৩২, বন্ধু ৫৯, প্রার্থনা ৩৬, বিরহ ৪৭, সাধনা ও সংকল্প ১৭, দুঃখ ৪৯, আশ্বাস ১২, অন্তর্মুখে ৬, আত্মবোধন ৫, জাগরণ ২৬, নিঃসংশয় ১০, সাধক ২, উৎসব ৭, আনন্দ ২৫, বিশ্ব ৩৯, সুন্দর ৩০, বাউল ১৩, পথ ২৫, শেষ ৩৪ বিবিধ ১৪৩, পরিণয় ৯, (স্বদেশ পর্যায়ে) স্বদেশ ৪৬, (প্রেম পর্যায়ে) গান ২৭, প্রেমবৈচিত্র্য ৩৬৮, (প্রকৃতি পর্যায়ে) সাধারণ ৯, গ্রীষ্ম ১৬, বর্ষা ১১৫, শরৎ ৩০, হেমন্ত ৫, শীত ১২, বসন্ত ৯৬, (বিচিত্র পর্যায়) ১৩৮, আনুষ্ঠানিক ৯, পরিশিষ্ট ২

উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কবিতার বিষয়-শ্রেণীতে বিন্যস্ত ক'রে দেখানো হয়েছে। এখানে অবশ্য অলংকার শাস্ত্র-সম্মত ভাব ও রসের শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট হয়নি। তবে আমাদের প্রত্যক্ষ ও নৈমিত্তিক জীবনের সাধারণ ভাব আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশগুলোকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুগভীর তত্ত্ব, দার্শনিকতা, মিষ্টিক চেতনা ইত্যাদি যা-ই থাক, তাঁর গান শুনলে হৃদয়মন আবেগে পরিপ্লুত হয়, ভক্তিতে বেদনায় হৃদয়-মন আর্দ্র হয়, শোকে দুঃখে আসে নীরব নিশ্চিন্ত সান্ত্বনা। রবীন্দ্রসংগীত কষ্টে দেয় আনন্দ, ভয়ে দেয় সাহস, দুর্বলকে দেয় জাগরণের মন্ত্র, উৎসাহ উদ্দীপনা। আলংকারিক রসবিচার সুবিধা হবে না ভেবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে গানগুলোকে করুণ শান্ত বীর হাস্য ইত্যাদি নবরসের শ্রেণীতে দেখাতে চেষ্টা করেননি। আমরা দেখতে পাই—বৈষ্ণবপদাবলীর রসগত বিষয়-বিন্যাস তার স্বকীয় পদ্ধতিতে

করা হ'য়েছে। তা অনেকটা স্পষ্ট ও নিয়মিত। কিন্তু এভাবে রবীন্দ্র-নির্ধারিত বিষয়ানুক্রম ধ'রেও রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক রস-সূত্র সহজে বোঝা যাবে না। পরবর্তীকালে কাব্যধর্মী পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতকে যেভাবে সাজানো হয়েছে তা হ'লো পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক, প্রেম ও প্রকৃতি, গীতি ও নৃত্যসংগীত, নাট্যগীতি ও অন্যান্য। কিন্তু এভাবেও কি সাংগীতিক রসপরিচর্যা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হতে পারে? মনে হয় না। তাঁর গানের বাণী ও সুরের সম্মিলিত মূল্যে রসপর্যালোচনা করা দরকার। কাব্যের ও ভাষা-শিল্পের বিচার ছাড়াও তাঁর গানের শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর প্রয়োগে, তাল-সৃষ্টি ইত্যাদিতে সংগীত-রস-সাধনার সিদ্ধি আছে, এসবও দেখতে হবে একাধারে মিশিয়ে।

কাব্য ও সংগীতে আবেগ বা ভাবাবেগকে মনীষী হ্যান্‌সলীক বরদাস্ত করেননি, রবীন্দ্রনাথ-ও স্বজ্ঞাবোধ, উপলব্ধি, অনুভূতি ও প্রকাশকে প্রাধান্য দিলেও আবেগ-কে বেশী দাম দেননি।[১৭] গানের কথাবস্তুতে তারই উপযুক্ত সুর-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ রসানন্দের মায়াময় জগৎ নির্মাণ করেছেন। বিভাবাদি সংযোগে রসের অভিব্যক্তির মৌল তত্ত্বটি তিনি অলঙ্কার-সম্মত ভাবেও ভেবেছিলেন। তাঁর একটি উক্তি— "আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নেই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে হাসি কান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়, যেখানে আমাদের সুখ দুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয় সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়-বেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো সংগীতের জিনিষের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস, কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্য-নৃত্যের পাদবিক্ষেপ, তাহা আমাদের হৃদয়-বেগের পুতুল নাচের খেলা নহে।"[১৮]

জাগতিক বস্তু-ভাবনা কিংবা সাধারণ শোক আনন্দ ইত্যাদি বোধ অপেক্ষা,

গভীরতর সূক্ষ্ম প্রাণলীলাকে কবি তাঁর গানে লীলায়িত করেছেন। রবীন্দ্র-সংগীতের সূক্ষ্ম সংবেদনের সন্ধান পেতে গেলে এবং রসগ্রহণ ক'রতে হ'লে আমাদের সমুচ্চ আত্মিকমানের সঙ্গতি অর্জন করতে হবে। একটা সমুচ্চ শুদ্ধধ্যানের স্তরে তাঁর চিত্তচেতনা ও কবি-স্বরূপ সদা-বিচরণ করতো ব'লেই তাঁর সংগীত-সৃষ্টির এতবড় সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, বিশালত্ব, ব্যাপকতা ও উত্তুঙ্গতা। রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্র-জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা তাঁর বইতে বারংবার উল্লেখ করেছেন, এ ক্ষেত্রে সেটা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে, কবিগুরুর বিচিত্র কর্মযজ্ঞ ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রবাহ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অখণ্ডবেগে ব'য়ে গেছিল। নানা গঠনমূলক কাজকর্ম, আন্তর্জাতিক সংযোগ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা গল্প নাটক প্রবন্ধ তিনি অবিশ্রান্ত গতিতে লিখেছেন। কিন্তু গান-রচনা-ব্যাপারটি ছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রিত। তিনি যখনই গান লিখতে বসতেন, তখন তারা ঐকান্তিকতায় এসে পড়ত ঝাঁকে ঝাঁকে। গানের জন্য তিনি এতই ব্যস্ত ও সন্নিবিষ্ট হতেন যে, আর কোনো সাহিত্যশ্রেণীর সৃষ্টি-কাজ বিশেষ আমল পেতো না সে সময়। আবার, অন্যান্য সাহিত্য রচনার সময় সমানে তাঁর গান লেখাও আসতো না। গান আসতো প্রাতিস্বিক গৌরবে। গান লেখা শেষ হতো যখন, সুর-রস-স্বরূপ ক্ষান্ত হতেন। একথাটি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ইন্দিরা দেবী, সাহানা দেবী, নির্মলকুমারী, অসিত হালদার প্রমুখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সকলেই স্বীকার করেছেন। কত বড়ো তাঁর সংগীত-চিন্তন ও সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব! সেখান থেকেই তাঁর গানের উৎসরণ হয়েছে নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে নানাস্থানে। ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চার অনুবর্তনে, সাময়িক দেশ-দশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ হাস্য পরিহাসের ভাবানুষঙ্গ থেকে—নানাভাবেই তাঁর সংগীত জোয়ারের প্লাবন নিয়ে এসেছে। সংগীতময়, সংগীত-তন্ময় সংগীত-নিয়ন্ত্রী সুমহান এই কবি-স্বরূপকে গভীর তাৎপর্যে ভাবতে হবে।

তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁর সংগীতময় জীবনের সামান্য কয়েকটি তথ্য এখানে উদ্ধার ক'রে দেখা যাক্। তাঁর বিখ্যাত গান 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' 'ডাকঘর' নাটকের মৃত্যুপথ-যাত্রী অমলের জন্য লেখা; গানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তিনি বলছেন, "পূর্বে আমার দু একটা বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু।······কোথায়

যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম"। ১৩১৮ সালের ২২শে আশ্বিন শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখেছিলেন—"আমার সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে যাচ্ছি।" বিশেষ তাৎপর্য-বোধে মৃত্যু-সময়ে ও মৃত্যুবাসরে এই গানটি গাইবার জন্য তিনি আকাঙ্খা প্রকাশ করে গেছিলেন। ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে মহা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক অনশন-জনিত মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ক্রোধের তীব্র উত্তেজনায় আলোড়িত করে। ফলস্বরূপ তাঁর তপতী নাটকের বিখ্যাত গান 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ, হে ভৈরব শক্তি দাও।' পিতার মৃত্যু-বাসর উপলক্ষে লেখেন—'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস', বড় মেয়ের মৃত্যুতে লেখা—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।' কেউ বলেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেখেন আশাবরী ললিত বিভাস ভৈরবী সংযোগে রচিত করুণ ও শান্তরস-নিস্নাত গানটি 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' কবির সকল নাটের কাণ্ডারী সকল গানের ভাণ্ডারী একান্ত স্নেহের দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর অশ্রুগূঢ় স্মরণ—'আমার কি বেদনা সেকি জানো ওগো মিতা, সুদূরের মিতা'। ট্রাজেডীর দুঃখের ভেতর এই মর-জীবনের আসল সত্যদর্শন আছে। কবি তাঁর নিরাসক্ত দার্শনিক প্রত্যয়ে এ কথাটা বুঝেছিলেন ; এজন্য তাঁর গানগুলোর অশ্রু, শোক, হাহাকার ইত্যাদি একান্তই দুঃখ-সর্বস্ব নয় ; গুরুতর অন্য কিছু তাৎপর্যে গুঞ্জরিত। প্রাচীন আর্যঋষির তুল্য শালপ্রাংশু সুতনু বিশাল-দেহী রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অন্তর্বাহী জাগতিক শোক দুঃখের ঝড়ের কোনো আভাস ও উচ্ছলতা কেউ কখনো দেখেনি। ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, দেখেছেন তাঁকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষায় আনন্দে ধৈর্যে স্থৈর্যে উপনিষদ-যুগের ঋষির মত স্থিতপ্রজ্ঞ বিরাট পুরুষ এবং একই সঙ্গে আধুনিক যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনরসিক লোকায়ত গীতিকবি ও গীতিকার।

এই অসামান্য মানুষ ও তাঁর প্রতিভাকে সহজে বোঝার ও জানার উপায় কোথায়? বিশেষক'রে তাঁর সহস্র সহস্র গানের ভেতর সেই লোকোত্তর মহান প্রতিভাধর কবিকে ও অন্তরঙ্গ মানুষকে বিপুলভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এজন্যই বোধকরি রবীন্দ্রনাথের সব রচনার অপেক্ষা তাঁর

সংগীতগুলোকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়। আমার এই রচনার মধ্যে এই বিশ্বাসকেই আমি নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছি।

প্রথম জীবনের উপাসনা-উপলক্ষে তাঁর রচিত গানগুলি ছাড়া পরবর্তী জীবনের এই কাব্যগীতিতে কবির চরম কৃতিত্ব ও সিদ্ধি লক্ষ্য করেছি। শ্রীঅজিত চক্রবর্তী-ও বলেছেন—"তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনের চরম পরিণতি স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে—আত্মগত, দশের জিনিষ নহে—একেলার।"[১৯] করুণ রসের গান রবীন্দ্রনাথ বেশী লিখেছেন এক অন্তঃপাতী জীবনবোধ ও দার্শনিক অনুপ্রেরণায়। এছাড়াও তাঁর নানা প্রসঙ্গের নানা রসের সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ শত শত সংগীত উৎসারিত হয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে তারা ব্যাপক। মানবিক বাসনা-বিস্তারী রসচেতনার সামগ্রিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এখানে। অলংকার-শাস্ত্রসম্মত বিভাব-অনুভাব ব্যভিচারী-সংযোগেই এদের রসনিষ্পত্তি-ব্যাপারটি গতানুগতিকভাবে আবদ্ধ থাকলো না। মানবিক ভাবগুলো সূক্ষ্ম বা প্রত্যক্ষ,—এখানে বিপুল রস-সমাহারে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হতে পেরেছে।

ভারতীয় রাগরাগিণীর স্বরসর্বস্ব-প্রকরণ এক-রকমের ভাব-নিরালম্ব বায়ুভূর্ত অথচ সূক্ষ্ম ব্যাপার। কিন্তু কাব্যসংগীতের সূক্ষ্ম ধ্বনি ও রস বাচ্যের নির্ভরতায় পেয়েছে বিরাট বিচিত্র রূপময় ও আনন্দের জগৎ। মানুষের ছোট বড় ভাব-অনুভাবগুলো এখানে নানা আলম্বন-উদ্দীপন ঘটনা-পরম্পরায় রসাভিব্যক্ত হচ্ছে। কবিগুরুর গানের সেই বিশাল জগতের রসের বিষয় মানুষের ভাব-চেতনাকে অবলম্বন করেছে ব'লে তার এত বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা। রবীন্দ্র-সংগীতে পাই—মৃত্যুর গান, দুঃখের গান, বিরহের গান, আশার গান, উদ্দীপনার গান, উল্লাসের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহের গান, উৎসবের গান, প্রকৃতির গান, জাতীয় ভাবনার গান, ভক্তির গান, ভালোবাসার গান, হাসির গান ইত্যাদি; এবং মানব-মনের স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবনির্ভর অজস্র বিষয়ের গান। এছাড়াও আছে—নানা ঘটনা ও অনুষ্ঠানের গান, অভ্যর্থনার, চাষ করার, ধানকাটার, চলার, খেলার, চায়ের, নলকূপের ইত্যাদি বিষয়ের গান। এই বিচিত্র গানকে আমরা বিচিত্র ভাবের রসাভিব্যক্তি ব'লে জানি। কবিগুরুর গানের বাণী ও সুরের যৌগপদ্যে এক অলৌকিক রসলোক উদ্‌ভাসিত হয়েছে। জনৈক রবীন্দ্রসমালোচক বলছেন—"জন্মোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত বাঙালিঘরের সকলরকম অনুষ্ঠানের গান তিনিই রচনা ক'রে গিয়েছেন।

বিলাসে ব্যসনে উৎসবে তো বটেই, রাজদ্বারে শ্মশানেচ রবীন্দ্রসংগীতের মতো বান্ধব আমাদের আর নাই।"[20]

তিন

পূজা বিষয়ক : তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি

কবিগুরুর সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক গান ভক্তি ও পূজা বিষয়ক, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। গীতবিতানে পূজা পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৬১৭। এছাড়াও অনুরূপ ভাবের গান বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। ধর্মভিত্তিক তাঁর কবিতা ও গানে অসামান্য প্রজ্ঞাবোধ ও রসচেতনার দ্বারা নির্মিত এমন একটি বিশাল আধ্যাত্মিক স্তর গড়ে উঠেছিল যে, সেখানে রবীন্দ্রনাথকে একজন অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক ও ঈশ্বরভক্ত যোগী বলেই প্রতিভাত হয়। তাঁর সংগীতের এই ধর্মচেতনার তত্ত্বটি নিবিড় রসের উপলব্ধিতে আর্দ্র ও প্রশান্ত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন—"রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ নির্ভর করে সেই অনির্বচনীয় আনন্দ-রসের উপলব্ধিতে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মদৃষ্টির রহস্যানুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কবির ধর্ম, অর্থে বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণধর্ম।"[21] রবীন্দ্রনাথের সংগীতে দুঃখ-জয়ের প্রমুক্ত প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক সত্যদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভাবতেন, জাগতিক অসংখ্য যন্ত্রনা ও দুঃখ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না, তবু অনিবার্য কষ্ট থেকে মনকে মুক্ত ক'রে সমুচ্চ ভাবের ও আনন্দের লোকে নিয়ে যেতে পারলে বাহ্য দুঃখবেদনা লাঘব হয়। বারে বারে গানের ভেতর তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন। গানই সেই আনন্দলোক এবং আনন্দই ব্রহ্ম। কবিগুরুর সংগীত-সাধনা ছিল এক অর্থে আনন্দ ও ব্রহ্ম-সন্ধান। সেই 'পরম-এক'কে তিনি তাঁর কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় সন্ধান করেছেন। বিশেষক'রে তাঁর ভক্তিগীতিতে সেই করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সীমাহীন আকুতি স্পষ্টীভূত হয়েছে।

প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন—"His out-look was always surcharged with spiritual fervour. He maintained that absolute freedom (Mukti) can be attained through music in the midst of innumerable sufferings and a thousand bondage of the world. So most of his songs are full of adoration and supplication of

the supreme-Being and as such stir the very depth of heart of man irrespective of caste, creed and colour."[২২]

কবি রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম ধর্মসাধনাকে তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে ভাবতেন ব'লে তাঁর কাব্যে ও সংগীতে সেই প্রভাব এত প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছে। The Religion of an Artist বইতে তিনি বলেছেন—"My religion is essentially a poet's religion Its touch come to me through the same unseen and trackless channel as dces the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life."[২৩]

তাঁর ধর্মভিত্তিক গানগুলো তাঁর বাল্যকৈশোরের প্রতিভাকে স্বাক্ষরিত ক'রে এসেছে। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার সুরে নির্মিত ব্রহ্মসংগীত ও ভাঙ্গাগানগুলোতে সব সময় বাণীর সৌষ্ঠব রক্ষা পায় নি, কিন্তু ভাবোপযোগী উচ্চাঙ্গের ও রাগাঙ্গের সুর-প্রয়োগে ভক্তি বিনম্র করুণ-শান্ত রসের দ্বারা ভ'রে আছে গানগুলি। শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর ও দেশীয় বাউল কীর্তনাদির সুরে এবং বাণী-বৈদগ্ধ্যে তাঁর অন্যান্য ভক্তিগীতের রস-সৌন্দর্যের তুলনা নেই। অন্তর্যামী জীবনদেবতাকে বিচিত্রভাবে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ধ্বংস, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু ঈশ্বরাশীর্বাদে ধন্য ও সুসহ হয়েছে। এ পর্যায়ের গানগুলিতে অঙ্গীরস হিসেবে 'শান্তরসের'ই প্রভাব সর্বাধিক। জনৈক সমালোচক বলেছেন—"বস্তুত পূজা পর্যায়ের রচিত গানগুলিতে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী, জিজ্ঞাসার, সমর্পণের, আকুতি বা বিস্ময়ের, বেদনা বা আনন্দের, মানব মনের সবরকম ভাব-অনুভবের মধ্যে উচ্চগ্রামে বিধৃত। সুর সংযোজনা, ভাব অনুযায়ী রাগরাগিণীর ব্যবহার, গায়কী চালের মধ্যে ধ্রুপদ প্রধান, তান বর্জিত, মীড়, কখনো বা সূক্ষ্ম কাজের অলংকার—এসব মিলে এবং গভীর ছন্দে চৌতাল বা সুর-ফাঁক্তা অথবা তেওড়ার ঝোঁকে এ সময়কার গানগুলি রসিকচিত্তকে এক গভীর অন্তর্লোকে সহজে পৌঁছে দেয়।"[২৪] উদাহরণ স্বরূপ এ পর্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গানের প্রথম পংক্তি উল্লেখ করছি:

আমার মিলন লাগি তুমি, অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে, অরূপ তোমার বাণী, অনেক দিয়েছ নাথ, আমার যে গান তোমার পরশ পাবে, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে, আঁখি জল মুছাইলে জননী, অকারণে অকালে মোর পড়লো যখন ডাক, এই করেছো ভালো নিঠুর, একটি নমস্কারে প্রভু, এবার নীরব

ক'রে দাও হে, ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না, চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, তব সিংহাসনের আসন হতে, তাই তোমার আনন্দ, তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ, জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে. ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, তোমার পূজার ছলে, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে, প্রথম আদ তব শক্তি, বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, মধুর তোমার শেষ যে না পাই. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি, শুভ্র নব শঙ্খ তব, সারাজীবন দিল আলো, সুরের গুরু দাও গো, সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই, সে যে মনের মানুষ, হে মহাজীবন, নৃত্যের তালে তালে, অন্ধজনে দেহো আলো, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, অশ্রুনদীর সুদূর পারে, ক্ষত যত ক্ষতি যত ইত্যাদি।

প্রেম বিষয়ক : প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে

প্রেম পর্যায়ের সংগীতের (গীতবিতানে সংখ্যা ৩৭৫) রাগরাগিণী ও দেশী-সুর প্রয়োগের বিপুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য এবং বাণীবিভূতির গুণোৎকর্ষ ভক্তি-সংগীতগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। নরনারীর ব্যবহারিক সম্পর্ক ও প্রেমপ্রীতিবোধকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম আদর্শে ও নিসর্গ পটভূমিতে স্থাপন ক'রে তিনি বৈষ্ণব-পদসাহিত্যের মতো এক অতুলনীয় প্রেম-পদাবলী রচনা ক'রেছেন। সর্বাপেক্ষা অধিক কাব্যধর্মী রস-সৌন্দর্যের পরিণত বিকাশ এই পর্যায়ের গানগুলোতে। এখানকার রস কি মধুর রস ? তাহলে প্রেম আখ্যাপ্রাপ্ত এইসব সংগীতের পরিমণ্ডলে রসশাস্ত্রীয় রতিভাবের পরিণাম শৃংগাররসের অভিব্যক্তি কেন ঘটলো না ? বাস্তবিকই প্রকৃত-সংগীতের পক্ষে শৃংগাররস অসমীচীন ও রসাভাস। পরন্তু দেহ-লালসা ও জৈবিক-ভাববোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লেখেন নি। এখানে প্রেমের ভেতরে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি মাধুর্য, ভক্তি, ভালোবাসা, দুঃখ বিরহ, কলুষহীন উন্নত অনুভাব ; তারই অত্যুন্নত দিব্য-রসস্ফূর্তি এইসব গানগুলোতে। প্রেমপর্যায়ের বহু গানকেই ঈশ্বরে নিবেদিত ভক্তিগীতি মনে হয়। প্রেমসংগীতের কাব্যধর্মীয় এবং অধ্যাত্ম-লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে এবং সেজন্যই কবিতার রসধারা এখানে প্লাবনের মতো এসেছে। বিভিন্ন রাগরাগিণী, দেশী ও বিদেশী গানের সুরের মিশ্রণে এই গানগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তেমন কয়েকটি বিখ্যাত রচনা :—মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে, তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে,

এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি, আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে, ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার, আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে, বাণী মোর নাহি, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, বিরহ মধুর হলো আজি মধুরাতে, সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানেনা, ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী প্রভৃতি। রাগরাগিণীর সুর ও মিশ্রসুরের প্রভাবে এবং বাণী-সৌকর্যে এরা অসামান্য হয়ে উঠেছে।

আরও এই শ্রেণীর কিছু বিখ্যাত রচনা—আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন, তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, যখন এসেছিলে অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে, তোমায় গান শোনাব ওগো ঘুম ভাঙানিয়া, হার মানা হার পরাবো তোমার গলে, হে নিরুপমা, তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, তুমি কোন কাননের ফুল কোন গগনের তারা, কেন সারাদিন ধীরে ধীরে বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে, তার বিদায় বেলায় মালাখানি আমার গলে রে, আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা নিয়ো হে নিয়ো, আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো, ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর, ভালোবেসে সখি নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখো, গর্জন মন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমার দ্বারে, খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে, আরো একটু বসো তুমি, একটু কেবল বসতে দিও কাছে, আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়, এই কথাটি মনে রেখো, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে, দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে ইত্যাদি।

প্রকৃতি বিষয়ক : একি আকুলতা ভুবনে, একি চঞ্চলতা পবনে

প্রকৃতি পর্যায়ের সংগীতে (গীতবিতানে সংখ্যা ২৮৩) কবিগুরুর বিশিষ্ট তত্ত্বচিন্তা, দার্শনিক প্রত্যয় ও সূক্ষ্ম রসোপলব্ধির বিকাশ দেখা যাবে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত যেখানে নিসর্গ সাধনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেখানে গানগুলি নূতন অর্থনির্দেশ, নূতন ব্যঞ্জনালাভ করিয়াছে; সে গানগুলির কবিত্বরস কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।"[২৫]

প্রকৃতিকে মাধ্যম ক'রে জগৎ, জীবন, মানব ও ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ঋতুর রূপায়ণ ও মানব-চেতনার সম্পর্কে তিনি যে সূক্ষ্ম রসের

উজ্জীবন ঘটিয়েছেন, কাব্যগত এর কোন্ নাম হবে? একে কি প্রকৃতি-রস বলা যায়? তিনি বলেছেন— "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না।...বিশ্বেশ্বরের খাস মহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাই জানাচ্ছে।" প্রকৃতি-সংগীতগুলিকে বিশেষভাবে কাব্যগীতি বলা যাবে। এবং সেই ভাবের উপযোগী মিশ্র রাগরাগিণীর প্রয়োগে প্রকৃতি-সংগীতগুলি বিশিষ্টতা পেয়েছে। গ্রীষ্মের গান—দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে, প্রখর তপন তাপে, বৈশাখ হে মৌনীতাপস, নাই রস নাই দারুণ দাহন বেলা, ঐ বুঝি কালবৈশাখী, মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে ইত্যাদি।

কবিগুরু গ্রীষ্মের গানে রৌদ্ররসের সঞ্চরণ করে দিয়েছেন—

ভয় নাই, ভয় নাই, গগনে রয়েছি চাহি,
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, একদা তাপিত প্রাণে রে।
দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে ॥ (প্র ১১)

কিংবা মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি
হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।
প্রান্তর প্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে।
মধুরের স্বপ্নাবেশে-ধ্যান মগ্ন আঁখি—
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বর প্রান্তে যে দূরে ডম্বরুগম্ভীর স্বরে
জাগায় বিদ্যুত-ছন্দে আসন্ন বৈশাখী—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী। (প্র ১৬)

তপস্যাবিশুষ্ক প্রকৃতির ধ্যানশুদ্ধ গম্ভীর চিত্ররূপায়ণ, দারুণ রৌদ্রবেলায় আতঙ্কের মধ্যে আশ্বাসের সংবাদ, রাখালের বাঁশীতে জীবনের প্রত্যয়। ভাবে-ভাষায় এক অসামান্য কাব্যগীতি।

কবি বিশেষভাবে বর্ষার গীতিকার। বর্ষাপ্রকৃতির মর্মরসে নিস্নাত ঔদাস্য,

বিরহার্তি ও প্রত্যাশা এনেছে এই গানগুলো। একদিকে বর্ষণ-মুখর প্রকৃতির পটভূমি, অন্যদিকে পর্য্যুৎসুকী চঞ্চলমন। ভাবের এই সংরাগের সঙ্গে সংযুক্ত হলো মল্লার দেশ সাহানা ইমন প্রভৃতির সুর। কবি বলেছেন—"দেশ, মল্লার যেন অশ্রু-গঙ্গোত্রীর কোন আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে ক'রে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।" কবিগুরুর বর্ষার গানে ভাব ও ভাষার ঐশ্বর্যে এবং অসামান্য সুরের সম্মিলনে এক দিব্য-উদ্ভাসন—যা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এ গানের তুলনা পাওয়া যায় না। ভাষা ও সুর সহ বর্ষার গানই রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে হয়। প্রকৃতির গানের মধ্যে বর্ষার গানের সংখ্যাও সর্বাধিক, ১১৪টি। বোধকরি ১১৪টির কোনটিকেই মানের দিক দিয়ে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। এছাড়া অন্য পর্যায়েও বর্ষার ও প্রকৃতির গান বহুসংখ্যক আছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গান—নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়, নীলাঞ্জন ছায়া প্রফুল্ল কদম্ববন, ঝরঝর বরিষে বারিধারা, আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান, আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি, মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, ওগো সাঁওতালি ছেলে, কেন পান্থ এ চঞ্চলতা, মধু গন্ধে ভরা, একি গভীর বাণী এলো প্রভৃতি প্রায় সব বর্ষার গানেই প্রকৃতি-রসের অশ্রান্ত প্রস্রবণ দেখতে পাই। বর্ষার গানের ভাবের সঙ্গে ভাষার ঐশ্বর্য, বাক্‌শিল্পের বিচিত্র প্রকরণ-লীলা বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে। ভাষার শব্দ-প্রকরণ, ধ্বনি-বিন্যাস, ছন্দঃ-স্পন্দন, চিত্রকল্প ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে বর্ষার গান বাংলা গীতিকাব্য ও কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে অভিনব ও তুলনা-রহিত। বাণীতে বর্ষার সর্বব্যাপী মেঘ-মন্দ্রিত গম্ভীর রূপ পরিস্ফুট :

নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর,
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর ॥

কিংবা মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি
ওরা ঘর ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বীণার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে,

দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—

সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।

ছয়টি ঋতুর প্রত্যেককে নিয়ে তাঁর গানের সম্ভার উজাড় হয়েছে। বর্ষা ও বসন্ত স্বাভাবিক কারণেই তাদের অত্যধিক প্রভাব বিস্তার ক'রেছে কবি-চিত্তে। বসন্তের কাব্যসংগীতগুলি পরজ, বসন্ত, বাহার ইত্যাদি রাগরাগিণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসোচ্ছল হয়েছে। বর্ষার গানের পরেই বসন্তের গানের সংখ্যা গীতিবিতানে ৯৬টি। কয়েকটি বিখ্যাত গানের দৃষ্টান্ত : আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, একি আকুলতা ভুবনে, আজি দখিন দুয়ার খোলা, নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগলো, বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হ'ল উতলা, মধুর বসন্ত এসেছে, একটুকু ছোঁয়া লাগে, চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি, এবার এল সময় যে তোর শুকনো পাতা ঝরা, ঝরা পাতাগো, এস এস বসন্ত ধরা তলে, বকুল গন্ধে বন্যা এলো, হে মাধবী দ্বিধা কেন, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি ইত্যাদি গান ভাবে ও সুরের ঐশ্বর্যে দেদীপ্যমান। বাণীতে নিবদ্ধ কবির মর্মগত যৌবন-বেদনার মাধুর্য ও সৌন্দর্য ; লিপি-চিত্রের মাধ্যমে যৌবনের রঙ্ শ্রুতি-দৃষ্টি-স্পর্শেন্দ্রিয়ে প্রতিভাত—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥ (প্র ২৭১)

চার

রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রসতাত্ত্বিক সৌন্দর্য বিচার চলে। আরও রসবিচার চলে তাঁর গানের কথা-উপযোগী রাগরাগিণীর সুর, কিংবা দেশী সুর প্রয়োগের রস-সাফল্য নিয়ে। রাগরাগিণীর ও দেশী সুরের মাধ্যমে তাঁর সংগীতগুলোতে কতখানি কল্পনা ও উপলব্ধির রঞ্জন-ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে—তার পরিচয় নেওয়া দরকার। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য বলেছেন—"কবিগুরু সুর-বিস্তারের সময় গীতশব্দের ভাব-রূপকে যথাযথ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন। দূরে কাছে, উচ্চতা নীচতা, সুখ-দুঃখ, শান্তি উত্তেজনা, বিরহ মিলন, অতীতের প্রতি আকর্ষণ, আত্মমগ্নতা, এবংবিধ নানা ভাবরূপকে সব সময় বিভিন্ন

স্বরে প্রক্ষেপন দ্বারা ধরবার চেষ্টা করেছেন। কোথাও স্বরের নমনীয়তা, কোথাও স্বরের ব্যাপ্তি, কোথাও স্বরের গাঢ়তা, সব কিছুকে ইস্থেটিক চৈতন্যময় আলোকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ স্বরগুলি যখন পরস্পর সমাহার দ্বারা স্বরের আবর্ত তৈরী করছে, তখন সব সময় লক্ষ্য রেখেছেন, সেই আবর্ত থেকে নানাবিধ ভাবরূপ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা।"[২৬]

রবীন্দ্রসংগীতে করুণ রসের ব্যাপক বিস্তার ও গুরুত্ব তাঁর স্বকীয় তত্ত্বচিন্তার দ্বারাই রূপ নিয়েছে। রাগরাগিণীর স্বরের কারুণ্য যেখানে, সেই স্বর তিনি তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন সব থেকে বেশী। দুঃখ ও বেদনা তাঁর কাছে ছিল অভিনব এক প্রত্যয়। কবি বলেন—"দুঃখের নিবিড় উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক।...দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।"[২৭] সৃষ্টি-চরাচরে অখণ্ড জন্ম-বিলয়ের মধ্য দিয়ে একটা করুণ সংরাগ অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে তাকে অভিব্যক্ত করা হয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক রস-সম্মত ক'রে।

ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত কোমল স্বর-বিন্যাসে সংরচিত ভৈরবী, মালকোষ, বিলাসখানি টোড়ি প্রভৃতি রাগরাগিণীগুলো বিশেষভাবে গম্ভীর বিষাদ ও করুণ। কবি ভৈরবী রাগিণীকে তাঁর কাব্য-সংগীতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করেছেন। কবির মতে—ভৈরবী যেন "সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল থেকে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী।" ভৈরবীর গভীর করুণ রাগিণীর সুরপ্রস্রবণ তাঁর গানে বিপুলভাবে ঝরে পড়েছে, সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে ভৈরবী-সিদ্ধ বলেন। প্রাচীন ভৈরবীর স্বরবিন্যাসকে সংস্কার ও সংযোগ ক'রে (শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ গান্ধার, কড়ি মধ্যম লাগিয়ে) রবীন্দ্রনাথ তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন হাজার গানের মধ্যে এই নতুন রাগে বাঁধা প্রায় তিনশো গান আছে।" (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

শুদ্ধ ও মিশ্র ভৈরবীর স্বরে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিখ্যাত গানগুলো—মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, অসীমকালসাগরে, তোমার পতাকা যারে দাও, পিপাসা হায় নাহি মিটিল, আনন্দ তুমি স্বামী, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী, সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জীবনে পরম লগন করো না হেলা, দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে, আসা যাওয়া পথের ধারে,

আরো একটু বসো তুমি, তুমি একটু কেবল বসতে দিও, অন্তরমম বিকশিত কর, আজি যে রজনী যায়, এবার সখি সোনার মৃগ, ওগো কাঙাল আমারে, ঐরে তরী দিল খুলে, জীবনে যত পূজা ইত্যাদি।

রাগরাগিণীর সুরের মাধ্যম বা কল্পনাটি যেমন হবে, রবীন্দ্রনাথ তেমনটি ভাষানির্মাণ করলেন। সুরের ঐশ্বর্য ও বাগৈশ্বর্য এক জায়গায় এসে মিলে গেছে। ভক্তি প্রেম আনন্দ উৎসাহ নিসর্গবোধ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্য দিয়ে এই করুণ রসটি ব্যক্ত। ভৈরবীর সুরে বসানো রবীন্দ্রসংগীতগুলো সেজন্য মনকে রসার্দ্র করে, দুঃখে নয়নকে সিক্ত করে খুব সহজেই।

কবি বলছেন—

"যদি জল আসে আঁখি পাতে, একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধু রাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে, —মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে, ছলো ছলো জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে—
তবু মনে রেখো।

সহজ সরল বাণীবন্ধে কীর্তনের সুর ও ভৈরবীর সুর বিমিশ্র হয়ে কবির আর্ত আকাঙ্খাটি করুণরসে আর্দ্র করে শ্রোতার চিত্তকে। করুণ রসের রাগিণী বেহাগ, মল্লার, টোড়ি, ইমন, যোগিয়া, বিভাস, পূরবী, গান্ধার, জয়জয়ন্তী, আলাহিয়া প্রভৃতিও বিবেচিত হয়। বিভাসে রচিত 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায় হায় সজনী উথলে নয়নবারি, পূরবীর সুরে 'অশ্রু নদীর সুদূর পারে, দিন শেষের রাঙা মুকুল, সমুখে শান্তি পারাবার, তুমি তো সেই যাবেই চলে প্রভৃতি। বহু কাব্যসংগীতের রস কারুণ্যে ও প্রসাদে পরিপূর্ণ। আশাবরী বিভাস ললিত রামকেলি—এদের মিশ্র সুরে রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গান 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে'।

অতি নিকট প্রিয়জনের মৃত্যুর তাৎক্ষণিক বেদনা কবি প্রকাশ করলেন দার্শনিক প্রত্যয়বোধে, অধ্যাত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ এই আশ্চর্য রচনায়—

"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্য ধারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা।
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ ওঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।

নাহি ক্ষয় নাহি শেষ নাহি নাহি দৈন্য লেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে। (পূ ২৪৮)

কেবলমাত্র করুণরসের রাগরাগিণীর সুর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ব্যবহার করেন নি, শান্ত ও অন্যান্য রসও যথেষ্ট বিকশিত ও স্ফূর্ত। মল্লার রাগে বর্ষার প্রাকৃতিক পটভূমিতে প্রিয়-বিচ্ছেদ বিরহ ও বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়। মল্লারের সুরে তাঁর অনেক গান রচিত। বিখ্যাত গান—আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান, ঝরঝর বরিষে বারিধারা প্রভৃতি। কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ—গানটি আশ্চর্য অভিনবত্বে রবি-মল্লার হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর গানে ভৈরবীর পরে ভেঁরো ও বেহাগের স্থান। বেহাগের শুদ্ধ ও মিশ্রসুরে শতাধিক গানে দেখেছি করুণ রসের অভিব্যক্তি ও প্রশান্ত আবেদন এনে দিয়েছে তারা। মহারাজ একি সাজে, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমায় অসীমে প্রাণমন লয়ে, চিরসখা ছেড়োনা মোরে প্রভৃতি। কাফি ঠাটের রাগ কানাড়াতে কারুণ্যের সঙ্গে মিশে আছে পৌরুষ ও গাম্ভীর্য, এতে ভক্তিভাবেরও প্রকাশ হয়। এই রাগের ও মিশ্র সুরে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলো, যেমন: এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে, যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা, বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে আবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো, নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা, বড়ো বিস্ময় লাগে তোমারে হেরি ইত্যাদি। বিলম্বিত তানের লয়ে স্বচ্ছসুন্দর বাণী ভঙ্গিতে কানাড়ার তীব্র মর্মান্তিক করুণসুর ধ্বনিত হতে শুনি, যখন কবি বলেন—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে,
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহ শশীরে। (পূজা ২৫৪)

অলঙ্কারশাস্ত্রে স্বীকৃত প্রধানতঃ নয়টি রস। এর মধ্যে হাস্য ভয়ানক বীভৎস ও অদ্ভুত এই চারটি রস সংগীতে স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে, মনে করিনা। যদিও সংগীতে রসের পরিধি সীমাতিশায়ী। কিন্তু সংগীতের সুরের জগৎ ব্রহ্মাস্বাদসচিব হয়ে বিরাজ করে। সেই পরিশুদ্ধ আনন্দলোকে লৌকিক রসাভাসগুলো স্থান পেতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতেও রসের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের আবহে যে রস পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করেছি। আরও দু-একটির

কথা বলা যায়। গম্ভীর রসের রাগিণী হিসেবে মালকোষ বিখ্যাত। মালকোষের সুরে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'। দিনাবসানের রাগিণী হিসেবে ভীমপলশ্রী, মুলতান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বতন্ত্রভাবে উভয় রাগিণীর মিশ্রনে তাঁর বিখ্যাত গান—আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে, যদি হায় জীবন পূরণ নাহি হল, আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া, আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে ইত্যাদি।

শাস্ত্রমতে বীর রসের রাগিণী মালকোষ, শঙ্করা, মালব, পুরিয়া, নট, সিন্ধুড়া প্রভৃতি বিবেচ্য হয় নানা মতে। হাস্য রসের রাগিণী সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ স্বীকৃতি পায় নি ; সাধারণভাবে হাম্বীর, শ্যাম, আড়ানা, সাহানা প্রভৃতিকে ধরা হয়। উল্লিখিত রাগিণীগুলো রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ এই সব রাগরাগিণীর সুর নিয়ে সুগভীর কবি প্রত্যয় ও তত্ত্বচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। সাহানা তাঁর মতে গম্ভীর ও গভীর। বীর রসের উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের গানগুলি চিরন্তন আবেদন নিয়ে জাতির মনে ও হৃদয়ে সঞ্চলন করেছে। এখনও তাদের উদ্দীপনা ও প্রেরণার ভাব কমে যায় নি।

বিভিন্ন রাগরাগিণীর সুরের সংযোগে তাঁর উদ্দীপনার গানগুলো :

মিশ্র বাহারের সুরে—ওরে আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে, একি আকুলতা ভুবনে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, একমনে তোর এক তারাতে ইত্যাদি। বাউল-কীর্তনের সুরে—বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান। ভৈরবীতে—ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারি হোউক জয়। ভোঁরোতে —ঐ মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে। খাম্বাজের সুরে—আমরা যৌবনেরই দূত আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত ইত্যাদি।

শাস্ত্রে শৃঙ্গাররসের রাগিণী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ললিত, সোহিনী, বাহারপরজ, কালিঙড়া। রবীন্দ্রনাথ এধরণের সুর নিয়ে তাঁর গানে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন ও ভিন্ন রস সৃষ্টি করেছেন। মিশ্র পরজের সুরে তাঁর গান—ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ইত্যাদি। বাহার-এর সুরে তাঁর বিখ্যাত ভক্তি রসের গান—একি করুণা করুণাময়, আজি মম মন চাহে, পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ইত্যাদি।

রস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ও নাট্যসংগীতগুলিও উল্লেখ্য। অভিনয় ও

নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে চিরায়ত ভাবের রসাভিব্যক্তি ঘটেছে এখানে ভিন্নভাবে। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন—"নৃত্যনাট্যের অনেক অংশ প্রায় গদ্যের আকারে আছে, অথচ সঙ্গীত হিসাবে সব মিলিয়ে এ একটা নতুন আর্ট। নৃত্যনাট্যে দুটি চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—একটি সরল সুন্দর সঙ্গীতকলার পরিচয় স্থাপন, অপরটি বর্ণনাত্মক বস্তুকে সুরে রূপে প্রত্যক্ষীভূত করা। নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত-কলার এই যে আত্মপ্রকাশ, এ-ও প্রধানতঃ রোমান্টিক।"[২৮] সুসঙ্গত পদ্যবন্ধ ছাড়াও কথোপকথন বা সংলাপকে সুরের সংযোগে সর্বাপেক্ষা রসগ্রাহী করা সম্ভব, কবি একথা বুঝেছিলেন। নাচের আর্ট কায়র কাছে নৃত্য-রসভঙ্গিমা, যার একটি আধ্যাত্মিক আবেদন আছে। কবি জানতেন, এভাবে ললিতবিদ্যার নব-রূপায়ণ ও প্রয়োগ বৈচিত্র্যে একটা পরিপূর্ণ জীবন বিকাশ ও রসস্ফূর্তি সম্ভব। কবির একসময়ের সেক্রেটারী কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য শিল্পের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"Tagore believes that through dancing and music the highest spiritual gifts can be expressed and therefore by neglecting them we shall be crippling our essential personality." (A plea for the art of dancing, 3rd January 1933).

অন্যান্য বিষয়ীভূত রবীন্দ্রসংগীত অপেক্ষা রবীন্দ্রনাট্য-সংগীতে শাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের সন্ধান করেছেন কেউ কেউ।[২৯] অভিনয় নৃত্যভঙ্গি, আবৃত্তি ও সুর এই উপাদানগুলি সম্মিলিত হ'য়ে রবীন্দ্রগীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যের রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি লাভ করেছে আবশ্যিকভাবেই। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন—"ভারতীয় রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত রসরূপটি গুরুদেবের মনে প্রাচীন ভারতের অন্যান্য গীতসাধকদের মতো কিরকম সুন্দর ধরা পড়েছিল, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটকের সুরেই তার বড় প্রমান মেলে। কথার সঙ্গে কোন রাগরাগিণী কি ভাবে সাজালে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, তারই প্রকাশ এতে দেখি।"[৩০] চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, শাপমোচন, বসন্ত, মায়ার খেলা, বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া প্রভৃতি নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যগুলি তাঁর কলাবৈদগ্ধ্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রসংগীতের রস-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে একটা কথা বড় ক'রে ভাবতে পারা যায় যে, কবিগুরু তাঁর সৃষ্টিকর্মে সর্বদাই ঔপনিষদিক ধ্যান দৃষ্টি ও মধুর প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকটিত হয়েছেন। তাঁর সেই শুদ্ধ শান্ত মানসিকতা, জীবনদর্শন ও রসবোধ গানগুলোতে বিচিত্র রসসৌকর্য সৃষ্টি করেছে। সেই রস-

বিস্তারী হৃদয়দ্রাবী মধুর রসের গান শুনতে গেলে উন্মুখ করতে হয় প্রাণ-মনকে, গাইতে গেলে প্রাণ মন উজাড় করে ঢেলে দিতে হয়। Art is never an exibition but a revelation. রবীন্দ্রনাথ সেইজন্যই বলেছেন—"গান হবে যারা আশেপাশে থাকে তারা যাতে খুশি হয়, তাদের আনন্দের জন্যেই আমার সব গান, বাইরের হাততালি পাবার জন্যে নয়। আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত গলা ছেড়ে যাবে। আমার আকাঙ্খার দৌড় এই পর্যন্ত।" প্রতীচ্যের রসজ্ঞ গুণী ডক্টর আর্নল্ড বাকে রবীন্দ্রনাথের গানে অখণ্ড শান্তরসের প্রভাব দেখে পুলকিত হয়ে বলেছিলেন—"The music of Tagore like most Indian Music needs a tranquil atmosphere It should be sung in a subdued tones It has a constant quality of veiled tenderness gentle almost confidential."

তাঁর গানের মর্মরস চিত্তকে কেবল দ্রবীভূত করে না, গানের ভক্তি ও অধ্যাত্মরস মনকে উন্নত করে। সমস্যার জ্বালা, দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি দিতে পারে মনকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসাহিত্য-দীপপুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের গানগুলোকে বলেছেন 'কুহকিনী'। সে কুহকিনীর রূপ বৈভব ও অমৃতবর্ষী প্রীতি-কণ্ঠস্বর সপ্তডিঙ্গা-বাহী দুর্দম দুঃসাহসী নাবিককেও তার কাজ ভুলিয়ে অনিবার্য সুরের আনন্দে আবদ্ধ ক'রে তার আধিভৌতিক সর্বনাশ ঘটাতে পারে; এবং লোকোত্তর আনন্দলোকের অমৃত এনে দিয়ে তাকে পরম অমিত বিত্তশালী করতে পারে। এ গানের আকর্ষণ মৃত্যুর চেয়ে বেশী, অমৃতের চেয়েও সত্য। দুঃখের মধ্যে আনন্দ, অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে সঞ্জীবনী অমৃতের সন্ধান দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের গান। কবির কিশোরদিনের এক ভক্তি-প্রাণা কিশোরী সাথী বলেছিলেন—

"তোমার গান শুনলে
আমি বোধ হয় মরণদিনের থেকেও
প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[৩১]

এক অনন্যার এই অন্তরঙ্গ উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে রচিত পূজা পর্যায়ের একটি গানে প্রকাশ পেয়েছে স্মৃতিবেদনার বাতাবরণ ভেদ ক'রে; প্রেমের অমৃতৈষণার ব্যাকুলতায় প্রার্থনা হয়ে উঠেছে—

"তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হ'তে যেন জাগি
গানের সুরে (পৃ ১৭)

রাগরাগিণীর সুরবিন্যাস-মূল্য অপেক্ষা ভাব, ভাষা ও সুরের সন্নিপাতে সৃষ্ট রসের অব্যাহিত পূর্ণ আনন্দকে কবি বেশী স্বীকৃতি ও বেশী মূল্য দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন—"রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যেসব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন, কোনদিন সেইসব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি। এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই একথা আমার বিশেষভাবে জানা; তার চেয়ে বেশী জানা, গানের ভিতর দিয়ে অব্যাহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিন্ত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে।"৩২ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিশেষ অনুসরণ-যোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানে রাগরাগিণীর মেল-বন্দেজ-কাঠামো ইত্যাদির সন্ধান অপেক্ষা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবের প্রকাশ ও রসাভিব্যক্তি অনুধাবন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রসংগীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব-রস-চেতনালোকে। আধুনিক বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও রসসংস্কার নির্ণয়ে সে গান প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় ও ক্রান্তিকারী, এসত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। "সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় যদি বলি তবে বলবো, বাঙালি সমাজের বৃহত্তম সংখ্যার প্রভূততম আনন্দ তথা কল্যাণের ভাণ্ডার এই রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে।"৩৩ এখনও পর্যন্ত এই অমেয় অমিয়-নিষ্যন্দী সৃষ্টির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বাঙালীরা সম্পূর্ণতঃ অবহিত ও তন্নিষ্ঠ হতে পারে নি, সেটাই আক্ষেপে কথা।

কীর্তন বাউল ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথা। দেশী লোকগীতির সুর ও বাণী তীব্র রসোদ্রেককারী। বাঙালীর চেতনা, সংস্কার ও জীবনরসসম্ভোগসঞ্জাত উপাদানে গঠিত সে সুর। শ্যামছায়া-ঘন শান্ত সমাহিত গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-খাল-বিল-গঞ্জ-মন্দির-মণ্ডপ-আখড়া-আস্তানায় বহু যুগ ধরে শোনা যেতো সারি জারি ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া গম্ভীরা ঝুমুর বাউল ভাদু টুসু মুর্শিদি কীর্তন ইত্যাদি। সে গান স্বভাব-নিয়মে সৃষ্টি লাভ করছে। তারই মর্মগহনে ডুব দিয়ে আছেন পরম রসের রসিক। কিংবা বলা চলে, গ্রামীন নরনারীর উন্মুক্ত পবিত্র নগ্নপ্রাণে—যেখানে লেগে আছে সহজ সতেজ অনুভবের রস, কবিগুরুর বিবাট প্রাণসত্তা সেই উপেক্ষিত প্রান্তদেশে নিবিড় আসক্তি ও

আনন্দে খুঁজে পেয়েছিল পরমের স্পর্শ। কীর্তনে বাউলে রামপ্রসাদী গানে আছে বাংলাদেশের প্রাণের রস। দুঃখ বেদনা বৈরাগ্য ও ভক্তিরসে গড়া তাদের সুর কবিগুরু আকণ্ঠ পান করেছিলেন। কবি বলেছেন—"গ্রাম্যসংগীত, বাউলগান, এসবের মার নেই। কেননা ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে।" রাগরাগিণীর জগতে ব্রাত্য এই মিষ্টিক অধ্যাত্ম দেশী সংগীতগুলোর অন্তর্নিহিত রস এত বিরাট যে, রীতিসিদ্ধ ওস্তাদী গায়কীকে "সে কিসের কেয়ার করে।" লালনসাঁই, গগন হরকরা, ফিকিরচাঁদ, জগা কৈবর্ত প্রভৃতি মেঠো গায়কদের সঙ্গে কবির আন্তরজীবন নিবিড় সঙ্গ খুঁজে পেয়েছিল। বাউলদের গানের কথায় রীতিহীন গ্রাম্যতাদোষ যথেষ্ট আছে, তবু তাদের ভাবরস ও অবিকল সুরটি তুলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সংযোগ করলেন। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি এপার ওপার করো কেগো ওগো খেয়ার নেয়ে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে, আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, হৃদয়ের একূল ওকূল, প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে ইত্যাদি বিশিষ্ট গানগুলোর সুর খাঁটি দেশজ। কবির অনেক গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য ও রূপক নাটকে বাউল ও কীর্তন গানের সুর এবং অনুরূপ সুরানুষঙ্গ বিপুলভাবে এসেছে। রামপ্রসাদী গান কবিকে আপ্লুত ক'রে দিত। তিনি বলতেন—'আমি সুর ভুলে যাই, নইলে আমার সব গানেই রামপ্রসাদী সুর প্রকাশ পেত'। প্রসাদীসুরে বাঁধা তাঁর গান—আমি শুধু রইনু বাকী, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা ইত্যাদি। বাঙলার শ্যামচ্ছায়াস্নিগ্ধ ধূসর লালমাটির পথে পথে, নদী হাওর বিলের উচ্ছল ঢেউর হিল্লোলে, শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি কম্পিত সন্ধ্যাচ্ছন্ন মন্দিরে মন্দিরে বাঙালীর সহজ জীবনচর্যার ধারা চলেছিল কতোকাল। বৈরাগীর একতারার সুরে মনের মানুষের সন্ধান চলে। একালের বিরাট প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের চলেছে সে-ই শ্রেয়োসন্ধান ; চলেছে সেই মনের মানুষের অতন্দ্র অনুসন্ধান।

কীর্তন সংগীতের সুর রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল। তিনি বলেন—"কীর্তন সংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে।" রাগরাগিণীর জগতে কীর্তনের স্থান মেলেনি কীর্তনে সুরবিহার ও নাটকীয় বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও। দেশী সংগীতের এক পরম ও চরম রস-রূপতা অর্থাৎ কাব্যবাণী ও সুরের মিলিত রূপ

নিয়ে কীর্তনের অনন্যতন্ত্র ঐতিহ্য। কবির মতে—"রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক"। কাজেই ভাব-চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ কীর্তনকে তাঁর ভাবের বাহন ক'রে নিলেন। আখর-যুক্ত কীর্তনের সুরে রবীন্দ্রসংগীত—ওহে জীবন বল্লভ ওহে সাধনদুর্লভ, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, আমি সংসারে মন দিয়েছিনু তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ইত্যাদি। আখরহীন কীর্তনের সুরে—না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, রোদন ভরা এ বসন্ত, ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে, সখি বহে গেল বেলা শুধু হাসি খেলা একি আর ভালো লাগে ইত্যাদি। কীর্তন ও বিবিধ রাগরাগিণীর মিশ্রসুরে—নয়ন ভুলানো এলে, তোমায় আমায় মিলন হবে বলে, তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ ইত্যাদি। সারি গানের প্রচলিত গ্রাম্যসুরের সঙ্গে ভাটিয়াল মিশ্রণে কবি বেঁধেছিলেন—গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ, বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ইত্যাদি। তাঁর নিজস্ব ঢঙের বাউল ও সারি সুরের গান হলো—তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, আমি কান পেতে রই, যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে ইত্যাদি। দেশী লোকসংগীতের মর্মবাণী ও সুরের স্পর্শে রবীন্দ্রসংগীত প্রোজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে আর্নল্ড্ বাকে রবীন্দ্রসংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"Tagore has absorbed the age long tradition of mystic songs from Kirtans, Bauls and this popular line of sarigan. In them he found nourishment and help as well as a meterial which he has stamped with his strong personality. He is thus at once more than an isolated creative artist."

রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারীর সুর

রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী অংশে বাণীর বিভূতির সঙ্গে সুরের কুহক ঝরছে; এখানে রবীন্দ্রসংগীতের রসের চরম রূপায়ণ ও অভিব্যক্তি। সুরের বিশিষ্ট প্রকরণ দেখা যাবে স্থায়ী ও সঞ্চারীতে। স্থায়ী বা অস্থায়ীতে ভাবের ও সুরের সূচনা। সেখানে মূলভাবের রস ও সুরের রস সম্মিলিতভাবে পটভূমি বা আবহ সৃষ্টি করবে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিটিতে সুরের সূচনা রসিক-চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে। অন্তরা ও আভোগ অংশ দুটি সাধারণতঃ 'তার' গ্রামে চড়া সুরে

বিচরণ করে। ঠিক সেই দুটো অংশের মাঝখানে সঞ্চারী অংশে সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্য-সপ্তকের গম্ভীর ও সরল অন্তর্ভেদী সুরের গতিভঙ্গ সঞ্চরণ করে। রবীন্দ্রনাথের গানের এই সঞ্চারী যেন প্রাণের সমস্ত তারে তারে অনির্বচনীয় রসব্যঞ্জনার অন্তঃসঞ্চারী লীলা। ধীর শান্ত নিবিড় অথচ তীব্র আবেগে সঞ্চারীর সুরের গায়কী শ্রোতার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে দেয়। "রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে তাঁর গানে সঞ্চারীর সুরকে লীলায়িত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সংগীতরসিক মাত্রেই রবীন্দ্রগীতির সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্যে বিমোহিত হবেন।"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের গানের সঞ্চারীতে অলৌকিক রসের উদ্ভাসন, হৃদয়ভাবের মূর্চ্ছিত নিবেদন। বাংলা কাব্যসংগীতের জগতে রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী চরম এক সিদ্ধি। রবীন্দ্রসংগীতে ভাবের দিগদিগন্ত, সাতরঙ রামধনুর বর্ণালী। সেই সঙ্গে রসের অন্তর্প্লাবী বিচ্ছুরণ। সব মিলিয়ে একটি আনন্দময় মায়ার জগৎ রচনা করছে। অসামান্য বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও ভাষণ-শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত স্বর্গীয় সুরের প্রবল মূর্চ্ছনা। সবকিছু মিলিয়ে এ-কে কোন জগৎ বলবো? লৌকিক জগতের সীমায় এসে ধরা দিয়েছে অলৌকিক জগতের অধরা মাধুরী, রসের দিব্যমহিমা। সহজে এর পরিচয় দিতে সমর্থ হই না আমরা।

রবীন্দ্রসংগীতের গীতিবিন্যস্ত কলিগুলো স্থায়ী অন্তরা আভোগ পর্যায়ে সুরের সূচনা ও বহির্মুখী গতি ও বিস্তার লক্ষ্য করি। সেই সুর সঞ্চারীতে এসে নিবিড় সৌন্দর্যে ও অন্তর্মুখী গুঞ্জরণে গভীর ব্যাকুল। স্থায়ী ও সঞ্চারীর সুর-গুঞ্জনে উদ্বেলিত বহু রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। সে'রকম কয়েকটি গানের প্রথম পংক্তি :—

চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ, শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি, তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে, যখন এসেছিলে অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি সিন্ধু পারে, আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়, জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর, যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে, সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান ইত্যাদি।

সঞ্চারীর সুরে রসাভিব্যক্তির প্রকরণশৈলী দেখতে দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া গেল—বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল। দাদ্‌রা তালের তানে মিশ্র মল্লার সুরের

বিভিন্নমুখী লীলায়ণ ও গতির একটি আইডিয়া স্পষ্ট হয়ে পড়ছে বাণীবন্ধে ও সুরে। ফুল গান ধান ঢেকে তারে প্রভৃতি শব্দগুলোর সুরে মীড়-গমক গতি লক্ষণীয়। স্থায়ী অন্তরা ও অভোগ অংশে বাণী ও সুরের বহির্মুখী বেগ ও বিকাশ, সঞ্চারীতে তারা গুরুতর স্থৈর্য ধৈর্য বৈরাগ্য ও সান্ত্বনার রসে অভিব্যক্ত। বাদল দিনে প্রথম কদম ফুলের বিনিময়ে কবি দিলেন সোনার ফসলের মতো শ্রাবণের প্রথম গানটি। ফুল শুকনো হয়ে যাবে, ডালে একদিন সে ফুল আর ফুটবে না। কিন্তু তার বিনিময়ে কবির দান চিরকালের। স্মৃতি-বিস্মৃতির কাল পার হয়ে থাকবে এগানের সওগাত, এগানের অবিনশ্বর মূল্য। সঞ্চারীতে কবির অপ্রতিগ্রহ-ভাববোধের, নির্বেদের রসস্ফুরণ ঘটলো :

আজ এনে দিলে হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

দিলে, দিবে না, কাল, তোমার, ফুলের ইত্যাদি শব্দগুলোতে মল্লার সুরে মীড়ের অসামান্য দোলা ও অন্তর্গুঞ্জরণ :

পামা ণা ণা | ণধা ণধা র্সণধা | পা া া | পা ধা মা ।
আ জ এ নে দি 0 লে 0 0 0 0 0
মা া পা | পণা ণা ণা | মা জ্ঞা া | র্সা া া |
হ য় তো দি বে না কা 0 0 ল্ 0 0
র্সা া ণা | ধা পা মা | মা মা জ্ঞা | রা জ্ঞা রা | সা া া | া া া |
রি ক্ ত হ বে যে তো মা র ফু লে র ডা 0 0 0 ল্ 0

পাঁচ

প্রসঙ্গ : মৃত্যু-মনস্কতা

মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে

কবিগুরুর সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত ক'রে আছে মৃত্যুর প্রোজ্জ্বল মহিমা। মৃত্যু-মনস্কতার স্নিগ্ধ কম্প্র ছায়াপাত হয়েছে রবীন্দ্রসৃষ্ট রচনাবলীতে। মৃত্যু রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম নির্ণায়ক-সূত্র; বোধকরি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসংগীতে। মৃত্যু-চেতনার নিবিড় সংরাগে স্তনিত সেই গান। কবিগুরুর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সৃষ্টি তাঁর দ্বি-সহস্রাধিক গানের সর্বাধিক সংখ্যক গানের গভীর অন্তঃতলে করুণ সুরের ধারা-প্রবাহ। জীবন-মৃত্যুর যৌক্ত

সত্যান্বেষণে সেই গান-'এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা'। এখানে 'জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে বসিয়াছে দুই আলো মুখোমুখি।'

বিরাট রবীন্দ্রজীবনের প্রবাহের স্তরে স্তরে দুঃখের ফেনায়িত উর্মিসংক্ষোভ। মৃত্যুদূত বারংবার হানা দিয়েছে, আঘাত হেনেছে সংসার-সীমায়। স্বজন, প্রিয়জন, আত্মীয়ের মৃত্যু-বিয়োগ-ব্যথার পুনঃপুনঃ অভিঘাতে উপদ্রুত হয়েছে মানসিক স্বস্তি, ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা। কম্প্র বিশাল বক্ষে ও হৃদয়ে উত্তাল সেই নিরুচ্চার শোক-সন্তাপ। মূক করেছে মুখর প্রকাশনাকে। 'বেদনা কী ভাষায় রে, মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।' ঐশ্বর্য ও সম্মানের সুউচ্চ চূড়ায় উত্তরণ করেও নীচাশয়-দুর্জন-দুর্মুখের হিংসা-নিন্দা-বৈরীত্বের পুনঃপুনঃ দংশনে-সংকটে কম্পমান। কল্পলোক-বিহারীকে বারংবার নিষ্ঠুর জীবনের উপলভূমিতে আকর্ষিত হতে হয়েছে। সেই অসীম-সীমা, পূর্ণ-খণ্ড, আনন্দ-দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যুর রেখা স্পর্শ করতে করতে সৃষ্ট ও বিকশিত হয়েছে মহান কবি-সত্তা ও গীতি-সত্তা। সব কিছুর থেকে মৃত্যুকেই বেশী ক'রে চিনতে ও বুঝতে হয়েছে কবিকে। তারপরই শেষ বোঝাপড়া তার সঙ্গে—'মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়।'

মহাকবির অতলান্ত ভাব-সাগরের সর্বোচ্চ উচ্চকিত ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি এই মৃত্যু-চেতনায়। সেই আত্যন্তিক জীবনবোধ, মরমিয়া রোম্যান্টিক কল্পচিন্তা এবং অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম ভাব-সংবেদন বিশ্বরসিক-চিত্তকে নাড়া দিয়েছিল সেদিন; আজ তার জয়যাত্রা উড়িয়ে ধ্বজা। রবীন্দ্রসংগীতে মৃত্যু কোনো তত্ত্ব, কোনো নিগূঢ় দার্শনিক প্রত্যয় কিংবা সুগভীর অধ্যাত্ম-দর্শনে পর্যবসিত হয়নি। স্বভাবনিয়ন্ত্রী জীবনবোধ ও জীবনচর্যার সাবলীল সহজ সরল আবেদনে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বলেই রবীন্দ্রসংগীত আমাদের ভাবায়, কাঁদায়, উদ্দীপ্ত করে, অনুপ্রাণিত করে। মৃত্যু এখানে আশ্বাস ও আনন্দ; মৃত্যু এখানে জীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জীবনের জয়যাত্রা।' এই তত্ত্ব-চিন্তা কবিকে কিশোরকাল থেকে আমৃত্যু প্রভাবিত করেছে। মৃত্যুকে তিনি মহাজীবনের গতির একটি পরিণতিমাত্র হিসেবে গণ্য করেন নি। মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে অনিবার্য ও উপলব্ধ সত্য হিসেবে বারংবার বিচার করেছেন। জীবনপাত্রে উচ্ছলিত মাধুরী মহিমা সে। 'মধুর-মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাবো প্রাণ'—এই আকুতি। ভাবে বোধে কর্মে ধর্মে মৃত্যুকে সহজ

স্বীকৃতি। 'জীবন মরণ নাচের ডমরু' বাজে যুগে যুগে কালে কালে, 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু'—অনিবার্য আবর্তন-লীলা। এই পরম সত্যকে অবহিত হ'তে পেরে কবি বলেন—'জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে, থৈ থৈ নর্তন নৃত্যে।' মৃত্যু জীবনের নৃত্যরস সঞ্চার করে; মৃত্যু জীবনের মধ্যেই এক প্রত্যক্ষ লীলা। পরপারে নেই, লোকান্তরে নেই—এই বাস্তবজীবনেই পরম সত্য সে। 'জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা।'

জগতের আনন্দযজ্ঞে জীবনের আমন্ত্রণ। সুধাসাগরতীরে অমৃত-তৃষ্ণায় জন্যই তো আসা। মৃত্যু কেন বিভীষিকা হবে? কবির জিজ্ঞাসা, 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।' বলছেন—'অচেনাকে ভয় কি আমার?' বলিষ্ঠ সাহসিক সিদ্ধান্ত কবির—'আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেবো, এই বিষম ঝড়ের বায়ে, আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।' কবির বিনম্র স্বীকৃতি আবার—'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক, তবে তাই হোক। মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক, তবে তাই হোক।'

যমুনাতীরের শ্যামনিকুঞ্জে বাঁশরীর পাগল করা সুরের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বিপথে বেরিয়েছিল যারা, তারা জানে বাহির পথের তত্ত্ব, তারা জেনেছিল সঠিক পথের নিশানা। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' 'জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো' এবং 'মৃত্যু অমৃত করে দান'। রবীন্দ্রসংগীত মৃত্যুঞ্জয়ীবাণী, মরণজয়ী সুরের অমৃততৃষ্ণা।

কবি বলছেন—'আমরা ভাবি মৃত্যুই জীবনের শেষ। কিন্তু দেহটাই বর্তমানে সমাপ্ত; জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।' (পঞ্চভূত)। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলছেন—'কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।' জীবনের শেষ কোথায়? 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?' মৃত্যু এক পরিবর্তন-পরম্পরা। মৃত্যুতে শোকের দুঃখের সম্পর্ক নেই। তুচ্ছ জীবনাসক্তি, ভোগেচ্ছা ইত্যাদিই জীবনকে বারংবার অর্থহীন, মূল্যহীন ক'রে দেয়। ক্ষুদ্র সুখের জন্যই এত কৃচ্ছ্রতা, এত কান্না। অথচ 'দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন, মরণ যে তোর নয়রে চিরন্তন।' জাতকের মৃত্যুই যদি ধ্রুব হয়, তবে মৃত্যুর বেদনা ও কান্নার প্রয়োজন কোথায়? সেই অনন্ত প্রাণ-ধারার প্রবাহে জন্মমৃত্যুর সানন্দলীলা সংঘটিত—তাকে সহজে স্বীকার করার মানসিক প্রস্তুতি চাই। কবি বলছেন—'মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে

বাঁচে।' মৃত্যুই অধিক সত্য প্রাণের চেয়ে। মৃত্যুই জীবনের স্রষ্টা। মৃত্যুর মধ্যেই জীবন বারবার বেঁচে ওঠে,—

'আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে,
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।'

ভারতভূমিতে কালে কালে সাধু সন্ত ঋষি মনীষীদের দ্বারা কথিত কত মতবাদ কত জন্ম-জন্মান্তরবাদ। জগৎসংসারকে মায়া-প্রপঞ্চময় অলীক অসত্য বলেছেন তাঁরা, অর্থ-ঐশ্বর্য-বৈভব, দেহ-রূপ-সৌন্দর্য, সম্মান-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে মায়া ও মিথ্যা বলছেন তাঁরা। তাঁরা বলেছেন ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। কে তোমার কান্তা, কে তোমার পুত্র! অহং বলতে কেউ নেই, আমার বলতে কিছু নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতের অধ্যাত্মমার্গীয় ঋষিকল্প ও ব্রহ্মবাদী হ'য়েও জীবন ও জগৎকে প্রধান সত্য বলে মানলেন। ধ্যান-জ্ঞান-বোধ দিয়ে মানুষ ও মানুষের প্রেমকে পরম সত্য বলে স্বীকার করলেন। জন্ম-জীবন-ঐশ্বর্য-যশ-প্রতিষ্ঠা-স্বজন-আত্মীয়-দেশ ও দশ তাঁর কাছে অধিক সত্য হলো। ব্রহ্মবাদী, মায়াবাদীদের মতো বলতে পারলেন না, জগৎ সম্পূর্ণতঃ মিথ্যা। পরন্তু বললেন—'এ-জগৎ মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' সংসারের অনিবার্য শোকদুঃখ সন্তাপ লাঞ্ছনা যেমন সত্য, তেমন সত্য তাদের অতিক্রম করার সত্য-সাধনা। ঈশ্বর আছেন বলেই তিনি নিশ্চিন্ত, সেই জীবনবন্ধু হৃদয়সখা প্রাণনাথের কাছে তাঁর নিয়ত আবেদন চলে। তিনি 'সেই জনমে মরণে নিত্য-সংগী, নিশিদিন সুখে শোকে, সেই চির আনন্দ বিমল চিরসুধা'। তাঁকে তিনি জানেন—'পরা শান্তি পরম প্রেম পরা মুক্তি পরমক্ষেম।' তিনি তাঁকেই চান—'সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু, চিরসখা, ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয়হরণ।'

কবি জানেন, কর্ম ও সাধনার দ্বারা সেই পরমকে খুঁজতে হয়; সংসার-পলায়নী সন্ন্যাস অপেক্ষা সংসারীর তপস্যার গুরুত্ব সমধিক। এই জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের জয়যাত্রা চলছে। কবি বলছেন—"জীবনকে সত্য ব'লে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের প্রতি তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক'রেও মৃত্যুতে প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরছে, সে মৃত্যুই নয়—সে জীবন।" (ফাল্গুনী)

বিরাট কবিজীবনের স্তরে স্তরে বারংবার লেগেছে কতই না আঘাত। রোগযন্ত্রণা, শোক, মৃত্যুজনিত মনোবেদনা, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির সংকট, নিন্দা-অসম্মান কিংবা বিরূপা নিয়তির নিয়ত দুশ্চালনার শত শত সংশয় সমস্যা। অথচ প্রাজ্ঞ ঋষির মতোই তাঁর বিনম্র সহনশীলতা—'দুঃখ দিয়েছ দিয়েছ ক্ষতি নেই।' যন্ত্রণা-জর্জর হয়েও বলেন—'আরো আরো প্রভু আরো, এমনি ক'রে আমায় মারো।' পরম ভক্ত বৈষ্ণবের মতো বলেন—'আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো। আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝংকারো।' আবার অভিমানী শাক্তের মতো বলেন—'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা, তরিতে পারি শকতি যেন রয়।' বলেন—

'দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

অথবা আত্মবিশ্বাসী কবি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—

তোমার কাছে শান্তি চাবনা
থাক্‌না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার 'পরে বোসো বোসো লীলা ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা,
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা। (পৃ ২১৯)

আবার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ কবি বলেন—

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন ক'রে মারতে হবে।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।
(পৃ ২০৪)

অভিমানী ভক্তের এই যে শরণ-প্রার্থনা, ভগবানকে আসতেই হয় দুঃখের বেশে ঝড়ের রাতের অভিসারে। ভক্তকে বারংবার পরীক্ষা ভগবানের। তবু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কবি বলেন—'আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি। মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।' রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে এভাবে দুঃখবোধের গভীর তাৎপর্য ছড়িয়ে আছে। খাঁটি রতন 'দুঃখ

আমার ঘরের জিনিস'—জননীকে গলায় মুক্তোর হার হিসেবে উপহার। 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।'—এই করুণ বিপ্রলম্ভ সুরে প্রতিধ্বনিত রবীন্দ্রসংগীত। কবির জীবন-প্রত্যয়ের ও উপলব্ধির সরল রেখায় এই গানগুলি চিহ্নিত ; সেজন্যই গানগুলি দিয়ে কবিকে বোঝা সহজ হবে।

মহাজীবনের যাত্রাপথে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার মূল্য নেই। মৃত্যু আছে বলেই জগতের গতি দুর্বার। কবি বলেছেন—"মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভয়কে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগতকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে।" (পঞ্চভূত)। রবীন্দ্রসংগীতে মৃত্যুতত্ত্বের এই বিশ্লেষণ আছে সহজ সরল ভাষায় ও সুরে এবং গভীরতর উপলব্ধিতে। কবির কাছে মৃত্যু নানারূপে নানাভাবে দেখা দিয়েছে— পরমাত্মীয় বন্ধু প্রভু সখা বিধাতা জীবন-দেবতা কিংবা মরণপ্রিয়া। মৃত্যুকে কখনো কঠিন নিষ্ঠুর বলেও সম্ভাষণ করেছেন—কিন্তু কোথাও কোনো অভিযোগ নেই। অথচ সেই বিনম্র আত্ম-নিবেদন—'হে মহাজীবন হে মহামরণ লইনু শরণ, লইনু শরণ।' মৃত্যুর প্রতি গভীর প্রত্যাশায় ও ভালোবাসায় তিনি উদ্‌বোধিত। সেজন্যই গভীরতর আত্মবিশ্বাসে প্রতিধ্বনিত হয় সেই মর্মস্পর্শী বাণী—

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।
···নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে। (পৃ ২৪৮)

শান্ত স্থির অবিচল প্রজ্ঞাদৃষ্টি যে কবির, যাঁর মধ্যে লোকায়ত জীবনের প্রতি অনন্ত ভালোবাসা—তাঁর মরণ-মনস্কতার বিশিষ্টতা সহজে ধরা পড়েছে তাঁর গানে। গীতোক্ত নিষ্কাম নিরাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের মতো, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতো, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদীর মতো মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য জীবন-মৃত্যু-বোধ,—আবার জীবনবাদী লোকায়ত মানুষের মতো ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবন-মৃত্যু প্রত্যয় একই আধারে সংঘট্ট হয়েছে ব'লে এতো তার বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য। মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্বচিন্তা বা দার্শনিক শ্রেয়োদর্শন তাঁর গানগুলোতে আন্তর-সংযোগে কতখানি সরল সুললিত ব্যাখ্যায় বিশদ হ'য়ে উঠেছে, আমরা বুঝতে পারি। ভাব, ভাষা ও সুরের সন্নিপাতে সেই অবিনশ্বর বাণী জনচিত্ত রঞ্জন করে, রসার্দ্র করে। বিক্ষুব্ধ হতাশ হতবুদ্ধি অবিশ্বাসী পায় আশ্বাস ও

বিশ্বাস; স্ব-জন বিরহী শোকার্ত পায় সান্ত্বনার প্রলেপ; বিচলিত বিদ্দিষ্ট সামাজিক মানুষ খুঁজে পায় সঠিক পথচলার নির্দেশ।

শোক-মৃত্যু-আঘাত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে; সুখের দ্বারা, প্রাপ্তির দ্বারা যা হবার নয়। মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য যাচাই হয় সংঘাত-সংকট-দুঃখ-মৃত্যুর দ্বারা, সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ দিয়ে তা হবার নয়। বিশাল রবীন্দ্রজীবনেব মূল্য সেভাবেই যাচাই করা, বিচার করা আবশ্যক। জীবনের সত্য মূল্যকে খুঁজে পেতে কবিকে অনিবার অনন্ত দুঃখ দহনে জ্বলতে হয়েছে। 'দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে' এবং 'অশ্রু-উৎস-জল স্নানে' পরিশুদ্ধ পরিস্নাত এক জ্যোতির্ময় জীবন; মৃত্যুঞ্জয় তিনি। তাই কবি বলতে পেরেছেন—'যতো বড়ো হও তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও, আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো এই শেষকথা ব'লে—যাবো আমি চলে।' কবির কাছে মৃত্যুই তো 'চরম পূজা'। বলছেন—'চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে, চরমপূজায় হবে সার্থক হবে।' মৃত্যুকে এক তাৎক্ষণিক ঘটনা কিংবা জীবনের এক লীলা হিসেবেই কবি বিবেচনা করেন। জীবনরথের সারথি সঠিক পথে চালনা করছেন জীবন-রথ। পরম নিশ্চিন্ত মানুষ জীবন-মৃত্যুর সীমা সহজে পারপার ক'রে যায়। 'নাহি ক্ষয় নাহি শেষ।' সেই অমৃত সুধারস পানের জন্য নির্ভয় এক যাত্রা। কবির কণ্ঠে জয়যাত্রার মহাগীত—'সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।' গাইছেন—'মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া হবে চির পাথেয় চিরযাত্রার।'

"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে মৃত্যুদিনের দিকে।" অতঃপর এক মেঘমন্দ্রিত বর্ষণ-ঝরা বাইশে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথির মধ্যদিনে এক বিশ্বাত্ম অতিমানসের মহাযাত্রা। সেই মহামৃত্যুর প্রতীকী দ্যোতনায় এক মহাভাব, মহান তত্ত্ব, মহা-উত্তরণের বার্তা জগৎবাসীর কাছে স্থির চিহ্নিত হয়ে আছে। যাঁর জীবন দিয়ে এত সত্যান্বেষণ, তাঁর মৃত্যুও সেই একই সত্যের তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে। বাইশে শ্রাবণ একটি মহামৃত্যুর নাম নয়। বাইশে শ্রাবণ এক উত্তরণের এক জয়যাত্রার নাম। বাইশে শ্রাবণ মৃত্যুতত্ত্বের এক প্রতীকী নাম।

বাস্তবিকই মহাকবির জীবন-তপস্যার মধ্যে, কর্মে-ধর্মে যে ভাব যে সত্য প্রত্যক্ষীভূত ও স্পষ্টীভূত, তাঁর সমস্ত রচনাবলীতেও সেই ভাব সেই সত্য স্থায়ী মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে সেই ভাব ও সত্যের সরল সহজ ব্যাখ্যা ও শাশ্বত অভিব্যক্তি আছে। সেই মহাভাব আমাদের

প্রত্যেকের প্রত্যহের জীবনেও সঞ্চারিত হয়ে যায়; শোকে দুঃখে সন্তাপে রোগ যন্ত্রণায় পারিবারিক-সামাজিক সংকটে আমাদের বিপন্ন বিষণ্ন প্রাণ-মনকে শান্তি সুখ সান্ত্বনা ও প্রেরণা দান করে সেই অনিবার্য রবীন্দ্রসংগীত। আমাদের চিন্তা-ভাবনার সীমায়, আমাদের সুখ আনন্দ মুক্তিবোধের সঙ্গে ঐশ্বরিক আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হয় সেই অনিবার্য রবীন্দ্রসংগীত। অতঃপর অহরহ সেই মৃত্যুঞ্জয়ী গান আমাদের বুকে বাজতে থাকে—

তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হ'তে যেন জাগি গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি যেন মাতার স্তন্যসুধা হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে॥

নির্দেশপঞ্জী

১। "স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে'—সংগীত রত্নাকর।
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—রাগ ও রূপ—(১ম খণ্ড) পৃঃ ২৫
৩। প্রমথ চৌধুরী—হিন্দু সংগীত পৃঃ ৩৩
৪। ক্রোচে—The Theory of Beauty. P. 296.
৫, ৬। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের পথে পৃঃ ১৩৪, সাহিত্য পৃ ১৯-২৩
৭। Edward Hansiick—The beautiful in music.
৮, ৯। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের পথে পৃঃ ১২৮, সাহিত্য পৃঃ ৭৭
১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৮৬
১১, ১২। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য, সাহিত্যের পথে
১৩। রাজেশ্বর মিত্র—প্রাচীন সংগীতে স্বরের রসবিনিয়োগ : বিশ্ববীণা—১৩৭৭ বৈশাখ
১৪। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা : সংগীত চিন্তা পৃ. ১৭
১৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৩৩
১৬। দ্রষ্টব্য—গীতবিতান (অখণ্ড সংস্করণ) পৃঃ ৯৬৫

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহকারী সুধীরচন্দ্র করকে লিখেছিলেন— "প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি। ভিন্ন পর্যায়ের শিরোনাম দেওয়া সম্ভব হয়নি, অথচ ইঙ্গিতে তাদের ভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যামালার পরিবর্তনে পর্যায়ের পরিবর্তন নীরবে নির্দিষ্ট হতে পারবে—ভাবুক লোকের পক্ষে সেই যথেষ্ট।"—২৩ বৈশাখ ১৩৪৫।

কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর।

১৭। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য—"আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যা কখনই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হইতে পারে না, এ তত্ত্ব সমালোচক রবীন্দ্রনাথের হইতেই শোনা"—রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৪

১৮। রবীন্দ্রনাথ—অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়—রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড পৃঃ ৮২৬

১৯। অজিত কুমার চক্রবর্তী—কাব্য পরিক্রমা পৃঃ ১৫৪

২০। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য পৃঃ ২১২

২১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান পৃঃ ২০২

২২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—A historical study of Indian music—P. 464

২৩। রবীন্দ্রনাথ—The Religion of an Artist—P. 20.

২৪। অরুণ ভট্টাচার্য—সংগীত চিন্তা পৃঃ ২৮

২৫। নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা পৃঃ ১২০

২৬। অরুণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রসংগীতের স্বরসংগতি ও স্বরবৈচিত্র্য পৃঃ ২১

২৭। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের পথে পৃঃ ৯

২৮। রাজ্যেশ্বর মিত্র—রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড)—পৃঃ ২১৩

২৯। রবীন্দ্রসংগীতে নয়টি রসের প্রয়োগ দেখিয়েছেন প্রফুল্লকুমার দাস—দ্রঃ রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৬৭

তাঁর তালিকাটি উদ্ধৃত করছি :—

মধুর (শৃঙ্গার) রস : মায়াবনবিহারিণী হরিণী

হাস্যরস : আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে

করুণরস : সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুর হাতে ঘোচাবে কে

রৌদ্ররস : জাগেনি এখনো জাগেনি

বীররস : এত বড় আস্পর্ধা তোদের

ভয়ানকরস : নাম লহ দেবতার রক্ষা নাহি আর

বীভৎসরস : ওমা ওমা ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র

অদ্ভুতরস : অর্জুন তুমি অর্জুন

শান্তরস : হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে

৩০। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত পৃঃ ১৪৬

৩১। রবীন্দ্রনাথ—ছেলেবেলা

৩২। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা—১৪. ২. ৩৯. তারিখে ; রবীন্দ্ররচনাবলী (১৪শ) পৃঃ ৯৭০

৩৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য পৃঃ ২১৬

৩৪। নারায়ণ চৌধুরী—সংগীত পরিক্রমা পৃঃ ৭০

যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মিলে নিকট হতে দূর
বোঝে কি নাই বোঝে থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণ তলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির মৌলিক সম্পর্ক : নানা প্রসঙ্গ

এক

কবিতা ও সংগীতের স্বরূপ-চিন্তা : দেশ-বিদেশ ও রবীন্দ্রনাথ

গীতিকাব্য ও কাব্যগীতি অর্থাৎ কবিতা ও গানের সম্পর্কটি রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গেই অনিবার্যভাবে আলোচনা-যোগ্য হ'য়ে দাঁড়ায় এইজন্যে যে, গান ও কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাব-ভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের প্রশ্নটি ইতিপূর্বে এত গুরুতরভাবে দেখা যায় নি। বাংলাসাহিত্য ও কাব্যস্বরূপ আলোচনায় বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতকে অন্যতম একটি প্রধান উপাদান হিসেবে বিশেষ মূল্য দেবার প্রবণতা এসেছে। অথচ কেবলমাত্র কবিতাতেই রবীন্দ্রসংগীতকে সম্পূর্ণ ও সার্থক বলে স্বীকার করাই যথেষ্ট হবে না। কবিতার থেকেও অধিক মূল্য এবং সাধারণ কাব্য-সংগীত অপেক্ষাও অধিক ভাবসমাহার ও রসস্ফূর্তি যেখানে, তার স্বরূপ বিচার করতে গেলে বিপুল আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধ্যানদৃষ্টি থাকা আবশ্যিক।

প্রাসঙ্গিকভাবে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ও মূলতত্ত্ব এবং কাব্যসংগীতের দুনিয়ার গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীনকালের চেতনা-সমৃদ্ধ মানবকুলের ভাব, রস ও শিল্পবোধের এবং প্রকাশের উপাদান হিসেবে কবিতা ও গানের সূচনা হয়েছিল। মানুষের বুদ্ধি উপলব্ধি রুচি সংস্কার ইত্যাদির সূত্রে মানুষের সভ্যতা ও শিল্পকলার ধারাক্রমিক বিকাশ

ঘটেছে। গান ও কবিতা সর্বকালিক মানুষের ভাব-বিকাশের পথে সার্বজনীন উপাদান ও প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত। সবদেশে কণ্ঠভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কথা, আবৃত্তি, সুর, গান, নাচ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। কেননা সর্বদেশীয় সভ্য মানুষদের সুকুমার কলাবৃত্তি, চৈতন্য-প্রকৃতি ও রসবোধে সাদৃশ্য প্রণিধান করা যায়। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে এবং গান ও কবিতার বিকাশ-পদ্ধতি ও দেশভেদে রূপান্তর সম্পর্কে দু একটি কথা উল্লেখ করবো।

শরীর-ধর্মের সঙ্গে ভাবধর্মের সম্পর্কটি অনিবার্য। ভাব-প্রকাশের আদিমতম প্রক্রিয়া কণ্ঠভঙ্গি থেকে সুর ও কথা উৎপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন— "গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গিতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। আঃ-এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গির গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সংগীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য-প্রযুক্ত মনুষ্য সংগীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সংগীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। এই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা হয়।"[১]

হার্বার্ট স্পেন্সরের মতানুসরণে রবীন্দ্রনাথও সংগীতের উৎপত্তি সম্পর্কে বলছেন—"সুখ দুঃখ প্রভৃতি উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়, স্বরে সুরের আভাস থাকে, সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচু নীচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর।"[২] উক্তিগুলো থেকে বোঝা গেল, ভাবপ্রকাশের তাগিদ যেখানে অনিবার্য ও গুরুতর, ভাব-প্রকাশের প্রক্রিয়াগুলোরও তেমনি প্রগতি ও বিকাশ পর্যায়ক্রমে এবং গুরুতর-ভাবেই ঘটেছে। এই ভাব-প্রকাশের প্রধান দুটো উপাদান নিঃসন্দেহে আবৃত্তি ও সংগীত। ভারতের প্রদীপ্তচেতন ঋষিযুগ থেকে সামগান, বেদবেদান্ত, উপনিষদ্‌, কাব্য, চিত্র-ভাস্কর্য ইত্যাদির ইতিহাস অনুধাবন-সাপেক্ষে এই ধারণায় আসতে পারা যায়। "যখন পৃথিবীর অপরাপর জাতি অজ্ঞানের গাঢ়তম অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তখন ভারতের কাননস্থলী ঋষিগণের বেদগানে মুখরিত হইত, তখন হইতেই আর্যজাতি সংগীতের মর্মজ্ঞ, সংগীতের মধুরস্বরে গান করিতেন। অধিকাংশ ঋক্‌-ই স্বরসমন্বয়ে গেয়, সাম ত' সম্পূর্ণই সংগীত।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সামগানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ যত প্রাচীন, সংগীতও তত প্রাচীন।”[৩] একথা স্বীকার করা যায়, প্রাচীন ভারতের ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি সভ্যজাতির আত্মিক সাধনার বিকাশ চরমে পৌঁছেছিল একসময়। ভারত, গ্রীস, রোম ইত্যাদির এই চরম বিকাশের ইতিহাসকে তাদের কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতের মধ্য থেকে খুঁজে নেওয়া যায়।

সংগীতের সুদৃঢ় বনিয়াদ যে জাতির, সে জাতির আত্মবিকাশ চূড়ান্ত। সে জাতির ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়ীভূত। ভারতে ও গ্রীসে প্রায় সমকালে সাহিত্য ও সংগীতের বিকাশ ঘটেছিল সমসূত্রে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানকে 'যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান' বলেছেন।[৪] বঙ্কিমচন্দ্র স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্যের মাধ্যমে গান ও কবিতার সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করেছেন। ভারতে সামবেদের যুগ থেকে কবিতার পাশে পাশে সামিক-স্বরবিন্যাসের বিকাশ ঘটে। আর্চিক, গাথিক ও সামিক যুগ পর্যন্ত সুরের তিনটি স্বর গড়ে ওঠে। তখন থেকেই কবিতা ও সংগীত একত্রবাহী। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী উল্লেখ করেছেন—"একেবারে গোড়ার দিকে সামগানে প্রয়োগ করা হতো তিন বা চারটি মাত্র স্বর (সামিক বা স্বরান্তর), তখনও সামগান ছিল সংগীতমূলকই, কেবল আবৃত্তিমূলক নয়।···সুর ও স্বরসজ্জাকে প্রেরণা জোগাত বাক্য তথা অর্থসম্পৃক্ত কথা বা সাহিত্য। সুতরাং বাক্য ও সুরের মিলন শুধু আধুনিক যুগেই নয়, বৈদিক যুগপ্রবাহেও বর্তমান ছিল।”[৫] রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যগুলো সুরসহ আবৃত্তিতে পাঠ করা হতো। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের সুসভ্য দেশগুলিতেও ছিল এই পদ্ধতি। বলা হয়েছে, অন্ধ মহাকবি হোমার সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তিনি ইলিয়ড্ মহাকাব্যকে সুরে আবৃত্তিতে প্রচার করতেন। গ্রীসদেশে একসময় সংগীতশিক্ষা একান্তই বাধ্যতামূলক ছিল। সে জাতির আত্মোদ্‌ঘাটনে গান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"গ্রীস যে আজও অমর হয়ে আছে সে তার ধনে ধান্যে রাষ্ট্রীয় প্রতাপে নয়, আত্মার আনন্দরূপ যা কিছু সে সৃষ্টি করেছে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্তলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে। সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ। সে মানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত ব'লেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের। রাজ্যসাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হ'য়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।”[৬]

সংগীত সকলকালের সকল মানুষের আনন্দরূপ ও আত্মবোধের উপাদান; সেজন্যই কালাতিশায়ী সংগীতচিন্তন নিয়ে সভ্যতার একটি মুখ্য-অংশের বিকাশ ঘটেছিল। পূর্বযুগের কবি ও গায়ক একই ব্যক্তি হতেন, একাধারে বাব্যকার, সুরকার ও গায়ক, এক কথায়—'বাগ্‌গেয়কারক'। পরবর্তী যুগেও অনেক গাতজ্ঞ বিশ্বশ্রুত কবি জন্মেছেন। মহাকবি দান্তে গীতজ্ঞ ছিলেন; তিনি কবিতা ও গানের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ও উভয়ের সম্পর্ক বিষয়ে যে মতবাদ নির্ণয় ও প্রচার করেছিলেন—তার নাম 'De Valgari Eloquino'[৭]। কথিত আছে, মহাকবি মিল্‌টনও সংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ঝুঁপার, বেন, রোমাঁরোলাঁ, গ্যেটে প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিগণও সংগীত সম্পর্কে এবং কবিতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ ও চিন্তা রেখে গেছেন। যুগ-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যধারাতে কবিতা ও গান যেভাবে পৃথক হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনটি দেখা যায়। তবে বর্তমানে কবিতা ও গান উভয় সৃষ্টির পার্থক্য ও প্রভেদের ভেতরেও পরোক্ষভাবে কিছু ঐক্য ও নৈকট্য সংরক্ষিত আছে। একদিকে কবিগণ অন্যদিকে গায়কগণ—আপাতত মনে হয় দুপক্ষের দূরত্ব অনেক। কিন্তু এঁদের মৌল-প্রবণতা, স্বভাব ও সংস্কার যথেষ্ট পৃথক্ হতে পারেনি কালের প্রগতিতেও। কবিতা ও গান এই দুটো উপাদানের মৌল বৈশিষ্ট্য একেবারে পৃথক হয়ে গেছে, এমন কথা বলা যাবে না। কেননা সাম্প্রতিক কবিতার দুনিয়ায় পুনরায় সংগীতকে কবিতার আত্মার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ সুরু হয়েছে।

পাশ্চাত্যের সংগীত ক্ষেত্রে সিবাস্টিয়ান বাক্, হেণ্ডেল, মোৎসার্ট প্রমুখ গীতশিল্পিগণ ধ্বনিময় শব্দবিন্যাসে গতানুগতিক সংগীতচিন্তা করলেও বিটোভেন গানের বিষয়, ভাব, সুর প্রয়োগে প্রচুর অভিনবত্ব আনলেন—"With Beethoven song was suddenly exalted to a place among the highest branches of composition. Taken in hand with the utmost seriousness by the greatest musician of the age and associated by him for the most part with lyrical poetry of a high order."[৮] শিল্পের তন্ময় গুরু বিটোভেন অসামান্য দক্ষতায় ও প্রতিভায় গান ও কবিতাকে সমন্বিত ক'রে তাঁর সিম্ফনিগুলো রচনা করতেন। গতানুগতিক সংগীতকলাকে তিনি অক্ষয় শিল্পকলায় রূপায়ণ করলেন; বিশেষতঃ বিটোভেন সুরে-গেয় কথাবস্তুকে কবিতার ভাবরূপের পর্যায়ে তুললেন। অন্যান্য

সমগোত্রীয় শিল্পীদের মধ্যে আরও অনেকে ছিলেন—স্টেণ্ডেল বেনেট, স্টানফোর্ড, স্যুবার্ট, ব্রাহ্‌ম্‌স্‌, চোপিন প্রভৃতি, যাঁরা সংগীতকে সুকুমার ললিতকলার সমগোত্রীয় করলেন। রিচার্ড ওয়াগ্‌নার, রবার্ট স্যুমান প্রমুখ প্রতিভাসম্পন্ন গীতশিল্পীরা জার্মাণী সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনের গুরুতর অংশীদার ছিলেন। স্যুমান সম্পর্কে ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে—

"Both by temperament and by choice he is identified with so-called romantic movement in which bo h poetry and music have tended more and more to become rather a personal revelation than a critism of life."[৯]

ওয়াগ্‌নার সমকালীন ও পরবর্তী কবি শিল্পী গায়কদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। বিশেষক'রে, কবি মালার্মে ওয়াগ্‌নারের সুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতায় আনলেন সংগীতধর্ম, অনেকটা ভেরলেনের Art Poetique আদর্শের মতো। কবিতা ও সংগীতে এঁরা আবেগবাদকে এত বেশী প্রশ্রয় দিলেন যে, সমকালীন জার্মান সমালোচক এডোয়ার্ড হ্যান্‌স্‌লিক তাঁর The Beautiful in Music বইতে এঁদের তীব্র সমালোচনা করলেন। যাইহোক- কবিতা, সংগীত, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকলার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস সকলকালে সকল দেশে কম বেশী হ'য়েছে। ফরাসী শিল্প-সাহিত্যেও তাই দেখা যায়। বিখ্যাত সুরকার ক্লদ দেবুস্সি তাঁর বিখ্যাত গীত রচনা করতেন কবি রসেটির বিখ্যাত কবিতা ও বতিচেল্লির সুন্দর ছবিগুলো সামনে রেখে। দক্ষিণ ফ্রান্সের ত্রবাদ্যুর কবিগোষ্ঠীর মৌল প্রেরণা ছিল লোকায়ত সংগীত। এই কবিগোষ্ঠী আমাদের দেশের শাক্ত গীতিকার কিংবা বাউল গায়ক দলের মতো গান ও কবিতাকে এক ক'রে নিয়েছিলেন। বর্তমানের বিখ্যাত কবি জাক প্রেভর ফ্রান্সের বিখ্যাততম গানের লেখক। ভাব ও বোধের প্রকাশ হিসেবে কবিতা, সংগীত ও চিত্র নিয়ে পাশ্চাত্যের প্রবণতা ও বিশিষ্ট মতবাদ-গুলো সুস্পষ্টই দিগদর্শন হিসেবে চিহ্নিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যে এ'রকম লক্ষণ বা বৈলক্ষণ্য এত বিচিত্র সমস্যার মধ্য দিয়ে কখনো আসেনি। বাংলার প্রাচীন পদসাহিত্যও এরকম জটিল বিমিশ্র ভাবের সংঘাতে ও ভাবোপাদানে গড়া ছিল না। ভারতীয়দের সরল জীবনচর্চা ও ধ্যান-ধারণার সহজ স্বচ্ছ রূপ তাদের সহজ সাহিত্য ও শিল্পকলায় প্রকটিত হয়েছে। কেবল রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাব-উৎসের সম্মিলিত

কূলপ্লাবী স্রোতকে তীব্রবেগে বয়ে নিয়ে এলেন। বিশাত্মভাবের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি-লীলার নাম রবীন্দ্র-প্রতিভা।

বর্তমান যুগ কাব্যসংগীতের যুগ। ভারতীয় মার্গসংগীতের একটি প্রধান শাখা ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ ছিল মুখ্যত কাব্যসংগীত। অন্যান্য সংগীতের বাণী-দারিদ্র্য সর্বদাই প্রকট ছিল। পৃথিবীর অন্যদেশে গানের জন্য বিশেষ প্রযত্নে কবিতা লেখার প্রয়াস হয়েছে, ভারতে তা হয়নি। কেন না, ভারতীয়গণ গান ও কবিতার মূলীভূত তত্ত্বগুলো সঠিক রপ্ত ক'রে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারে নি। কবিতার গীতধর্ম নিয়ে পাশ্চাত্যে রোমান্টিক কাব্যান্দোলন (লিরিক্যাল মুভমেণ্ট) হ'য়ে গেল; অথচ ভারতবর্ষ কিংবা বাংলাদেশ তখনও মানবিক সমস্যা-শূন্য গতানুগতিক দেবমাহাত্ম্য কীর্তন কিংবা স্থূল রসাত্মক গাথাকাব্য নিয়ে কয়েক শতাব্দী আচ্ছন্নের মতো কাটিয়ে দিল। বাস্তবিকই ভারতের নিশ্চল পঙ্গু শাস্ত্র-সংস্কারের প্রভাবে সাহিত্যকেও হ'তে হয়েছে প্রগতিহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন। কেবল রবীন্দ্রনাথ এসে এই সমাজ-মানসের বন্ধ অচলায়তন ভেঙে সেখানে প্রমুক্ত ভাবের আলো-হাওয়া এনে দিলেন নানাভাবে। এবং তাঁরই চিন্তার শক্তিতে আজ বাংলার সাহিত্য, কবিতা ও কাব্যসংগীত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম গৌরব কেড়ে নিয়েছে। মনীষী দিলীপকুমার রায় বলেছেন—"আজ অকুতোভয়ে বলা চলে যে, গান সম্পর্কে বাংলাসাহিত্যের সমান সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে কোথাও নেই, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যসাহিত্যে এখনো ইংরাজি সাহিত্য আমাদের চেয়ে ঠিক ভাবগরিষ্ঠ না হলেও রসগরিষ্ঠ ও ওজস্বী একথা অস্বীকার করা যায় না।"[১০]

আর একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলা-কাব্যসংগীতের প্রভাবে বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা ও সংগীত সমমূল্যে লিখিত হচ্ছে। এমনকি হিন্দুস্থানী গানও সুরের একান্ত আধিপত্য বরদাস্ত না ক'রে গানের ভাষার অবয়বে কবিতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ভারতীয় প্রাদেশিক কলা-চর্চার এই আধুনিক প্রবণতা একরকম প্রাকৃতিক কারণেও আসতে বাধ্য ছিল, কেন না ভাবপ্রগতির যুগে ভাবপ্রকাশের সহজ পথগুলোকে অন্যায়ভাবে আর আটকানো গেল না। অনেকদিন আগে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' বইতে মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলাসংগীত-জগতে অবিলম্বে কাব্যসংগীত ও নাট্যসংগীতের যুগ আসবে। সনাতন-পন্থী ও গোঁড়া ওস্তাদদের আমলে এ ধরণের ভবিষ্যৎবাণী করার সাহস ও দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল।

তাঁর ভবিষ্যৎবাণী বোধকরি ভারতের সব প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। বর্তমানে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এই যুগলক্ষণ প্রকট হ'তে চলেছে। অক্স্ফোর্ডের গবেষক স্ট্রাঙ্গোয়েজ সাহেব বলেছিলেন—উত্তর ভারতে বাংলা-ভাষা ও দক্ষিণ ভারতের তেলেগুর মতো মধুর কোমল সাংগীতিক ভাষা ভারতে আর নেই।[১১] অথচ বাংলাদেশের আত্মবিস্মৃত গায়করা বাংলা ভাষার শক্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অমনোযোগী ছিলেন। পরন্তু এইসব বাঙালীরা বাংলাভাষার প্রতি হিন্দী-ওস্তাদদের উন্নাসিকতাকে নীরবে বরদাস্ত করেছেন। কৃষ্ণধনবাবু-ই প্রথম বাঙালী, যিনি বাংলা কাব্যসংগীত ও নাট্যসংগীতের ভবিষ্যৎ ও গুরুত্ব লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। বাংলা কাব্যসংগীতে এখন জোয়ার লেগেছে, বাঙালী আজ গানের রাজা। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও কাব্যসংগীতের প্লাবন এসে গেছে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলোয় কাব্যসংগীতের বিকাশ সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার রায় যে তথ্য উল্লেখ করেছেন, এখানে তা বিবৃত করা যেতে পারে—

"শুধু হিন্দুস্থানী সংগীতের খাসতালুকেই যে গান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা নয়, নানান প্রাদেশিক সংগীতেও এ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। মহারাষ্ট্রে বালগন্ধর্ব প্রমুখ নট-গায়করা যে এই নাট্যসংগীতের পথে চলেছেন সেকথা সবাই জানেন।...উর্দুতে হায়দ্রাবাদে অমজদ প্রমুখ কবিরা গজলে নব নব ছন্দোবন্ধে নানাভাবেই এই কাব্যসংগীতের স্বাদ গ্রহণ করতে চাইছেন। আধুনিক হিন্দীকাব্যে শ্রীমতী রাহানা তায়েবজী ও শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গানই সর্বশ্রেষ্ঠ, এঁরাও উত্তরোত্তর গানে কাব্যের ললিত আবেশই আনতে চাইছেন। শ্রীমতী রাহানা আমাকে একটি পত্রে সম্প্রতি লিখেছেন যে, আশৈশব রাগসংগীতে দীক্ষিতা হয়েও হাল আমলে তিনি কথা-নিরপেক্ষ রাগবিস্তারে আর তেমন রস পাচ্ছেন না—আত্মবিকাশের এক বিচিত্র নবস্বাদ পাচ্ছেন এই ভজনাত্মক কাব্যসংগীত রচনায়।...এক কথায় সুর-সর্বস্ব রাগসংগীত কাব্যসংগীতের দিকে এই যে মোড় নিয়েছে, এ-কে আধুনিক সংগীতের যুগধর্ম বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।"[১২]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কবিতা ও সংগীতকে নিয়ে এই যে আধুনিক যুগধর্ম—একে আমরা জাতীয়-আত্মপ্রকাশ বলতে চাই। এবং আত্মবিকাশের ও প্রকাশের উপায় হিসাবে কবিতা ও সংগীতকে নিশ্চিত-রূপে সমধর্মী হতে বাধ্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"গীতের যে উদ্দেশ্য, যে

কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"[১৩] গান ও কবিতার ভাবোচ্ছ্বাসের ও রসস্ফূর্তির সমান ধর্মের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ গীতিবিতার নামানুসরণে গানকে কাব্যগীতি নাম করেছিলেন। গাথা, ইলেজি ও কবিতার সুললিত বাণীতে বিজ্ঞাপিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগের রূপ। কিন্তু তাতে সংগীত-ধর্ম থাকা চাই।[১৪] রবীন্দ্রনাথ কবিতার অন্তঃপাতী ফলশ্রুতিকে বলেছিলেন 'গীতরস'; কার্লাইল যাকে বলেছেন 'গীতিচিন্তন' (Musical thought)।[১৫] ইংরেজী লিরিক কবিতার মৌলধর্ম সংগীতকে নিয়ে নির্ণীত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সংগীত-রসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজীতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য ব'লে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করতো। কবিতার এই সম্মিলিত সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণ্য হতো, বৈদিককালে যেমন সামগান।"[১৬] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কবিতা ও গানের অন্তর্লীন সামঞ্জস্য কোনদিনই অস্পষ্ট ছিল না। অথচ ভারতে একসময় কণ্ঠসংগীতকে যন্ত্রবাদনের মতো গণ্য করা হয়েছে, এর বেশী নয়। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে রসিকতা ক'রে বলেছেন 'কণ্ঠবাদন'। এবং দিলীপকুমার রায় ভাবভাষা বর্জিত গায়কীকে কটাক্ষ করেই বলেছেন—"এ-যুগল-মিলনের (কথা ও সুর) মহিমা যাঁর কাছে নিরর্থক, গান তাঁর জন্যে নয়। তিনি যেন আমরণ কণ্ঠবাদন, নয় যন্ত্রসংগীতের খাসতালুকেই খুষমেজাজ বাহাল তবিয়তে কায়েম হয়ে পুত্রপৌত্রাদি-সে জমিদারি ভোগ দখল করতে থাকেন। গান-দরদী হতে হলে বীণাপানির শুধু বীণাকেই নয়, বাক্‌কেও শিখতে হবে আদর করতে। নান্যঃ পন্থাঃ।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ বাণী ও বীণার যোগপন্থে বাংলাকাব্যসংগীতের দ্বারা বিশ্বজয়ী গৌরব অর্জন করলেন। রবীন্দ্রসংগীতের কবিতা যে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্পদে পরিপূর্ণ, তা আমরা নানাভাবে বাক্‌শিল্প বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি। সংগীতে বাক্‌-শিল্পের এমন নিবিড় তন্নিষ্ঠ আরোপ ইতিপূর্বে গানে কেউ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের মৌল পার্থক্য ও সম্পর্কসূত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে অবহিত ছিলেন। দুটো বিষয়ের মৌল স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ব'লেই তিনি দুটোকে এমন গঙ্গাযমুনায় মিলিয়েছেন। পৃথিবীর কাব্য ও সংগীতের ইতিহাসে এমন সিদ্ধি অপ্রতুল। "সবদেশেই ভালো-গান ভালো-সুরে গ্রথিত হয়ে দাম্পত্যমিলনে তবে বরণীয়

হয়ে ওঠে। ব্রাহম্‌স্‌, শুবার্ট, শুমান, বিটোভেন, সোপ্যাঁ, চাইকভস্কি, স্কার্লাত্তি, হেন্‌দেল প্রভৃতি সুরকারদের নানা গান আজও ওদেশে ঘরে ঘরে গীত হয়। তাদের শব্দসুষমা কাব্যসৌন্দর্য নেই একথা বলি না—কিন্তু এদের মধ্যেও অনেক বিশ্ববিশ্রুত গানই নিছক কাব্য হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাব্য নয়, সেকথা সবাই জানেন। একথা সত্য যে গানের পরমতম বিকাশে তাকে হতেই হবে—কাব্যেও প্রথম শ্রেণীর, সুরেও।"[১৮] আমরা নিশ্চিন্ত যে, রবীন্দ্রনাথ বাক্‌প্রকরণ ও সুর-বিন্যাসের শ্রেষ্ঠতম উপাদান সংযুক্ত ক'রে দিয়ে অসামান্য কাব্যসংগীত রচনা করেছেন এবং বাঙালীর রসচেতনাকে সম্মানের সঙ্গে বিশ্বচৈতন্যলোকে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ

অতঃপর বাংলাকাব্য ও সংগীত, এবং রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব ও কবিস্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলি। খাঁটি বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সৃষ্টি হ'লেও চর্যাপদ, বৈষ্ণব-পদাবলী, শাক্ত-পদাবলী প্রভৃতি গীতিকবিতা ও সংগীতের বিপুল উপাদান বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচলিত ছিল। একসময় তাদের প্রভাব বাংলাদেশে কম ছিল না। বিশেষক'রে বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যগুণ ও সুরের গায়কী উন্নত ছিল। দীর্ঘকাল ধ'রে পদাবলীসাহিত্যের অমৃতবর্ষী প্রভাব বাঙালী-চিত্তকে রসার্দ্র করেছে, আনন্দ দিয়েছে। তাছাড়া বাংলা-কীর্তন, বাউল প্রভৃতি দেশী সংগীত-ও কাব্যমূল্যে উন্নতমানের ছিল। সেযুগে গান ও কবিতাকে আজকের দিনের মতো এত গুরুতরভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যে ভাবা হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনাসাঁ-সম্ভূত বস্তুময় চেতনার দ্বারা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের ভাবগতি আচ্ছন্ন হয়। নবযুগ-চিন্তার দ্রুত প্রতিফলনে আধুনিক সাহিত্যের নির্মিতি ঘটতে থাকে। কাজেই সাহিত্য থেকে কিছু কালের জন্য সাংগীতিক-চেতনা পৃথক পথ নেয়। অর্থাৎ গীতিকার, গায়ক ও কবি পৃথক ব্যক্তি হিসেবে মনোভাব খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও সংগীত সম্পূর্ণতঃ পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এই ভাবান্দোলনের ভেতরেও কবিসংগীত এবং পাঁচালী, টপ্পা ও গ্রাম্যগীতি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। আবার ফিরে আসে কাব্যসংগীত। আধুনিক বাংলা-কাব্যসংগীতের প্রথম রূপ হিসেবে অনেকে রামনিধি গুপ্তের টপ্পাগানকে স্বীকার করতে চান। ডক্টর অরুণকুমার বসু বলেন—"বিদ্যাসুন্দর বা কবিগানকে গ্রহণ না ক'রে, হিন্দী

খেয়াল টপ্পা ভেঙে নিধুবাবু লিখলেন প্রেমের গান, নবযুগের প্রথম স্বাধীন হৃদয়ানুভূতির কাব্যসংগীত। তাঁর প্রায় সব গানই এরকম কাব্যসংগীত ও প্রেমগীতি, রাধাকৃষ্ণের বা বিদ্যাসুন্দরের বেনামিতে লেখা নয়।"[১৯]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য-ও এ মত পোষণ করেন যে, বিভিন্ন পশ্চিমা হিন্দী ও সুরের বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ ক'রে নিধুবাবু বাংলাভাষায় নূতন ধরনের ছোট কবিতা রচনা ক'রে নতুন গায়কী প্রবর্তন করলেন। এই গানের মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী গায়কীর একান্ত সুরের দাপট কমতে কমতে সুর ও কথায় রফা হয়ে যায়। পরবর্তী কাব্যসংগীতকারদের ওপর নিধুবাবুর প্রভাব সেজন্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। অরুণ বসু বলেন—"টপ্পাই প্রথম নাগরিক জীবনের কাব্য-সংগীত। একালের রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত বাংলাকাব্য-সংগীতকারদের নিধুবাবু প্রভাবিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত কালী প্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন ও ঈশ্বরগুপ্তের চেয়ে নিধুবাবুর দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন।"[২০] আমরা মনে করি, আধুনিক বাংলা-কাব্যসংগীত এখন কবিতা ও সংগীতের মধ্যে যে একান্ত সম্মিলনের প্রয়াস করছে, তা অবশ্য নিধুবাবুর প্রভাব থেকে নয়; সে প্রভাব রবীন্দ্রনাথেরই। কবি রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার প্রমুখ কাব্যসংগীত লিখে সুর দিলেন রবীন্দ্রনাথের মত। আবার পাশ্চাত্যের মতো এখানেও কবিদের ভালো ভালো কবিতায় সুরারোপ করার চেষ্টা চললো। সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের ভালো কবিতায় এবং অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় প্রমুখ ভালো গীতকারদের গানে সুর দিতে বসলেন গুণী সুরকার হিমাংশু দত্ত, শচীন বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীগণ। সাগর পারের কল্লোল এসে সনাতনীরক্তে কিছু আলোড়ন—কিছু প্রেরণা সঞ্চার করেছে। এটা স্বাভাবিক এবং সুলক্ষণ। বাংলা কাব্যসংগীতের সংগে বাদ্য-সংগীতেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটতে থাকলো। সেজন্যও আলাউদ্দিন, রবিশংকর কিংবা তিমিরবরণের বাদ্যযন্ত্রে আশ্চর্য সুরের ঢেউ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে।

কবিতা, কাব্যসংগীত, সুর, যন্ত্রসংগীত ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন উপাদান ও উপায়-গুলো বর্তমানে যেভাবে সমন্বয়ের দ্বারা গঠিত হয়েছে, তার কার্যকারণ অনেকটা যুগধর্ম-সম্মত হ'লেও কবি-গীতকার সুরকার রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য প্রভাবে তা বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে—একথা অস্বীকার করা যাবে না। এ সম্পর্কে কবি-গুরুর সতর্ক প্রয়াস ও অতন্দ্র প্রহরা লক্ষ্য করতে পাই। তিনি বলেন—"সুর-

সম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গে সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্ররূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্‌ভাবিত হল। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এদের যে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা মূল্যবান সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাই এদের পরস্পরের সঙ্গ ঠেকাবার জন্য জেনানা রীতি চালাতেই হবে, এমন গোঁড়ামি মানতে পারবো না।"[২১] এক সময় রবীন্দ্রশিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মহৎকাব্য ও মহৎ সংগীত (great poetry and great music) এর পার্থক্য জানতে চাইলে কবি সেই পার্থক্য-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দেন। রসের মূলীভূত স্থির ও একক সত্যে যারা বাঁধা, আর্ট হিসেবে তাদের পার্থক্য অচিন্ত্যনীয়। অন্ততঃ শিল্প ললিতকলা বা আর্টে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বৈতবাদী ; ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি ঐক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন সারাজীবন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ দুইই বিরাট ব্যক্তিত্বের উপাদান ; দুই ব্যক্তিত্ব একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কেউ বলেছেন, তাঁর প্রতিভাকে চালনা করেছে তাঁর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব ; কেউ বলেছেন, তাঁর সকল প্রেরণার মূলে ছিল তাঁর অধ্যাত্ম সত্তা। যা-ই হোক না কেন, তাঁর সংগীতরচনা নিঃসন্দেহে একটি সাধনা-ই, তাঁর সব-ব্যক্তিত্ব সব-সত্তা এব্যাপারে সক্রিয় হয়েছে একমুখী হ'য়ে। বাংলা কবিতা ও সংগীতের পরিপূর্ণ স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে সম্পর্ক-নির্ধারণ সবই করে গেছেন। সেজন্যই তাঁর লেখনী অবিশ্রান্ত অফুরন্ত গতির বেগে ছুটেছে। অন্যান্য সাহিত্য-কর্ম ছাড়া তাঁর কবিতা প্রায় সাড়ে চার হাজার এবং গান প্রায় আড়াই হাজার, এই অমেয় অনন্য সৃষ্টি রস ও ললিত শিল্পকলার ইতিহাসে চিরবিস্ময় হ'য়ে প্রতিভাত হতে থাকবে। সমস্ত কিছুর পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভান, স্বজ্ঞা ও সাধকের ব্যক্তিত্ব সদা সক্রিয় ছিল, সেখান থেকেই তাঁর বিপুল সংগীতের এত উৎসার, এত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। আমরা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর গানের প্রতি তাঁর ছিল বেশী নিষ্ঠা ও আগ্রহের বেগ। তাঁর স্বপ্ন, জাগরণ ও চিন্তন ছিল গীতগুঞ্জনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কবির এই আত্যন্তিক সংগীত-মগ্নতা তাঁর আমৃত্যু জীবনধারাকে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে চালিয়েছে। কথায় কথায় তাঁর গান এসেছে, সুরও এসেছে। কল্পলোকের মায়ার সুষমা কাগজে কালিতে স্থায়ীভাবে ধ'রে রেখে গেলেন তিনি। যুগ যুগ ধ'রে যা নিয়ে আমরা ধন্য হতে পারি, বাঁচতে পারি।

প্রভাতকুমার বলেছেন—"বিচিত্র কর্মের মধ্যে এই গানের নৈবেদ্য ছিল তাঁহার উপাসনার অন্তর্গত সাধনা।"[২২] তিনি আর এক স্থানে বলেছেন—"১৯২২ সালের গোড়ায় কয়েকমাস কবির জীবন যেমন কর্মময়, তেমনি সংগীতময়, বড়ো রচনা নাই, সারাদিন খুচরা কাজে সময় যায়, শক্তি যায়; তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান রচনা ছাড়া মনের মুক্তির আর কোনো মাধ্যম নাই। গানের মধ্য দিয়াই তাঁহার উপাসনা।"[২৩] রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানের সাধনাকে দৈবিক ব্যাপার বলা যায়। এমন লোকোত্তর কবির কাব্য-জীবন-প্রতীতির সঙ্গে সাংগীতিক-ব্যক্তিত্বের সংযোগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। বিদেশী মনীষী ফাদার পিয়র ফালোঁ রবীন্দ্রকাব্য-চেতনায় বিস্ময়কর গীতধর্মিতা লক্ষ্য করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতে একটি বিস্ময়কর সংগীতধর্ম উপলব্ধি ক'রে পুলকিত।

তিনি বলেন··"Tagore's Poetry is wonderfully musical. Mallarme dreamed of a poetry that would be pure music but most modern poets have lost the secret of those ancient poets who were at once musicians and poets. For Tagore poetry and music were never seperated. A modern bard who sang his own compositions, a Bengali troubadour for whom the lute was as important as the pen, Rabindranath was as a musician even before he was poet. I have read many times his Gitanjali before I could listen to the music of its songs ; listining, I understood so much more than I had been able to grasp when I was merely reading. This may apply to all great poetry but it applies in a very special manner to the poetry of Tagore. Many poems or lyric dramas of Rabindranath only live when heard in their musical context. This harmony is the soul of Tagore's poetry. The whole univers, nature, man's life and its diverse moods, Tagore approached as a musician searching for and perceiving harmonies infinitely varied and subtle. He has created an extra ordinary number of rythms and

his whole poetic work but a never ending song, a song that was in turn light and fresh, dreamy grave and solemn, passionate, mystical and contemplative, but always a song"[২৪]

দীর্ঘ একটি উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ব্যক্তিস্বরূপ, কাব্য ও গীতি-চেতনা সম্পর্কে বিদেশী গুণগ্রাহীর গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য মতামতটি অনুধাবন করা গেল। স্বদেশী সমালোচকগণ এই মর্মে বিস্তৃত ব্যাপক আলোচনা করেছেন। মনীষী বুদ্ধদেব বসু বলেন—"সারতঃ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ একজন গীতিকবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা অধিকাংশই আকারে ছোট, অথবা তা কাব্যসংগীত। কাব্য-সংগীত বলেছি গীতাঞ্জলি জাতীয় রচনাকে, যা সুরের সংলগ্ন হলেও কবিতা হিসেবে স্বাধীন সত্তার অধিকারী।"[২৫] কবি অমিয় চক্রবর্তী বিদেশী রবীন্দ্রভক্ত কবি এজরা পাউণ্ডের মন্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর বইতে। পাউণ্ড বলেছেন—"গীতিকাব্য যে কোথায় পৌঁছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার তুলনা নাই. সুর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে, গঠন সৌকর্যে এবং ভাষার ভাবে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সম্রাটশিল্পী।"[২৬]

বিশ্বসংগীতচিন্তা, কবিতা ও সংগীতের মৌল প্রেরণা ও মূলতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমরা সাধারণভাবে ভারতীয় সংগীত-চেতনা, রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রসংগীত, এবং কবিতা ও গানের আপেক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করলাম। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে কবিতা ও গানের সম্পর্ক-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এবং দেখা যেতে পারে, কবি কোন্ প্রক্রিয়া ও প্রকরণে কবিতা ও গানের চূড়ান্ত রসস্বরূপকে ধরতে পেরেছেন। তাঁরই মত ও মন্তব্য অনুসরণ ক'রে তাঁকেই বুঝতে পারা যাবে সব থেকে সহজ ও সুন্দরভাবে।

দুই

কবিতা ও কাব্যসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত-নির্দেশ

সংগীত ও কবিতার প্রক্রিয়াগত সূচনা, সুর ও কথার মিলন, ভাব-প্রকাশের উপায়, কবিতা ও গানের স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে এবং গান ও কবিতা এই উভয় বিষয়ের সম্পর্ক-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তার কিছু উদ্ধৃতি সংকলন করা গেল।

গান ও কবিতা একটা প্রধান সম্পর্ক-সূত্রে নিবদ্ধ, তা হ'লো অনির্বচনীয় লোকোত্তর আনন্দ, ভাবলোকের প্রকাশ, ভূমার সুর ও আত্মরূপের উপলব্ধির সূত্র। কবি এই কথাগুলো বিভিন্নভাবে নানাস্থানে বারংবার বলে গেছেন।

"আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি, সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্রও নয়, কাব্যশাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতশাস্ত্র; সংগীত এবং বাক্য দুই তার অন্তর্গত। কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্রে সম্পৃক্ত, কিন্তু যে বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মত লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্মলাভ করে। তখন সে হয় সংগীতেরই সমজাতীয়।" (কথা ও সুর)

"সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলাবাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটাই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।" (ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা, ১৯৩২)

মানবমনের চকিত উদ্দীপন ও আলোকিত আভাসকে গান ও কবিতায় চিরকালের মতো ধরে রাখা হয়েছে। কবি বলেন—"গান জিনিষটা নিছক সৃষ্টি-লীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খাম-খেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ; একটি মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে যাত্রা করবে। হ'য়ে গেল এই খেলা। মুহূর্তটি তার রঙিণ উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশী আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিণ খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য।" (আত্মকথা : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মহাকাব্যগুলো ও বেদমন্ত্রগানগুলোতে কাব্যরস ও সংগীতরসের সহাবস্থানে সৃষ্ট নিত্যবিশ্বরসের উল্লেখ ক'রে বলেছেন—"ভারত-বর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়।" (সংগীতের মুক্তি)

কবি বলেন, ভাব প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে কবিতা ও গান এক-গোত্রীয়, সেখানে অলংকার-শাসনে তাদের পার্থক্য নির্দেশ চলবে না।

প্রকাশ ও সংগীত এরা সমপর্যায়ভুক্ত, এক অর্থে পরস্পর সম্মিলিত। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেছেন, যেমন :—"সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়। সংগীত আর কিছুই নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।...সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।...গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।"

(সংগীত ও ভাব)

"আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি সংগীতকেও সেই চক্ষে দেখিব। বলাবাহুল্য আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখিনা, কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই।...সংগীত স্বরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।" (সংগীত ও কবিতা)

"কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা বাছা সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়।"

(সংগীত ও কবিতা)

ম্যাথু আর্নল্ড্ সংগীত, কবিতা ও চিত্রের মধ্যে ভাবের অবস্থা ও ভাবের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেছেন—"ম্যাথু আর্নল্ড্-এর মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অনমুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখিনা। কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, একমায়ের সন্তান।...কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে, সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা, কারণ সংগীত কবিতার ভাই।" (সংগীত ও কবিতা)

—"আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।" (সংগীত ও ভাব)

রবীন্দ্রনাথেরই এই ধরনের মত অনুসরণ ক'রে আমরা কবিতা ও সংগীতের সম্পর্কের স্পষ্ট কয়েকটি সূত্র দেখতে পাই :—

(এক) কবিতা ও গান ভাববোধেরও চকিত মেজাজ-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

(দুই) কবিতার আবৃত্তির ঢঙ্, সংগীতের স্বরের ঢঙ্ শারীর যন্ত্রের (কণ্ঠ) প্রকারভেদ মাত্র। একটি ক্রিয়া, অন্যটি চরম পরিণতি।

(তিন) ললিত কলাশাস্ত্র হিসেবে কবিতা ও গান শাস্ত্রশাসন-মুক্ত রসরূপকে পরিস্ফুট করে। কাজেই উভয় বিষয়ে অনির্বচনীয়ের সংবাদ আছে; উভয় বিষয়ে অখণ্ড এক নিত্যবিশ্বরস সংযুক্ত; ভিন্নভাবে তাকে ভূমার স্বর বলা হবে। চিরচঞ্চল এক চিন্তা-প্রগতি ও আত্মস্বরূপের উজ্জীবন দেখা যাবে কবিতা ও সংগীতে।

সংযম ও নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে আর্ট হিসেবে সংগীত ও কবিতার নির্মিতি, মৌলধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রকরণগত ভাষারূপের নির্দেশ দিয়ে কবি বলেছেন— "আর্ট জিনিষটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ সংযমই অন্তর্লোকে প্রবেশের সিংহদ্বার"। (অন্তর-বাহির)। তিনি আরও বলেন— "আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ"। (ছিন্নপত্র ৪৯)। একথা ভেবেই কবিতা ও গানের বাক্‌নির্মিতি ব্যাপারে স্পষ্টতঃ তিনি উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। ভাষাগত পরিমান, শব্দ, অলংকার, উপমা, ছন্দ ইত্যাদির রীতিসম্মত প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা ও গানের ভাব-সম্মত রূপ দিলেন। তাঁর কবিতাই চরম শৃঙ্খলা, সূক্ষ্মতা ও সংযমের পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে রূপ নিল সংগীতে। বলছেন—

"নিতান্ত সাদাসিধে দশ বারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে, কোনদিন আমি বাঙালি শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখিনি। এমন কি অনেকে আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা বলেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ করে বলেছিলেন, ইদানিং আমি কেবলই গান লিখছি। বলেছিলেন— আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে ছোট হয়েই আসছে।···আমি গান রচনা করতে করতে সে'গান বারবার নিজের কানে শুনতে শুনতে বুঝেছি যে, দরকার নেই প্রভূত কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়, অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।" (আলাপ-আলোচনা)

তিনি আরও বলেন—"চারখানি পাঁপড়ি নিয়ে ছোট জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয়, যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে।"

(আত্মকথা : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)

রবীন্দ্রনাথ সংগীতের বাক্‌প্রকরণ সম্পর্কে বলেন—"যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের স্বর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের স্বর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার স্বরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে। তেমনি কথোপকথনের স্বরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে।" (সংগীত ও কবিতা)

"কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসায় গান বাঁধিতে বসিলাম।" (সংগীতের মুক্তি)

—"ছোট ছোট একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিতাকে যদি তাল ঠুকে বেড়াতেই হয়, তাহলে অন্ততঃ একটা বড়ো আখড়া চাই। তাছাড়া গান জিনিসে বেশী বোঝাই সয় না। যারা মালের দর যাচাই করে, তারা এরকম দশ বারো লাইনের হাল্কা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৯১)

উদ্ধৃত মন্তব্যগুলো থেকে একটি কথা অনুধাবন করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতার ও গানের আকারের (ভাষাগত) মূল্য দিতে চান নি, কেননা ভাব-প্রকাশ ব্যাপারটি নিয়মবদ্ধ হতে পারে না; প্রকাশ-রূপও সীমা-স্বীকৃত নয়। ছোট ছোট কবিতা ও ছোট ছোট গান তাঁর কাছে সমান। বড় কিংবা ছোট কবিতাতেও তিনি স্বরারোপ করে গান বানিয়েছেন। অবশ্য গান লেখার ব্যাপারটিতে তিনি সতর্ক থেকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ ইত্যাদি ফর্মে গানের বাণীকে নিবদ্ধ করেছেন। সুর-প্রয়োগ ব্যাপারটিও সেখানে গুরুতরভাবে মনে রাখতে হয়েছে তাঁকে। অন্তরা-আভোগ এবং স্থায়ী ও সঞ্চারীর স্বরের মন্দ্র মধ্য তার স্বরগ্রামের বিন্যাস বাণীর কাঠামোর বিন্যাস অনুযায়ী স্থিরীকৃত করেছেন। দ্বিসহস্রাধিক গান রচনা ও তাদের সুরে সুরে বসানো ব্যাপারটি

আমাদের কাছে পরম বিস্ময়কর ঠেকলেও রবীন্দ্রনাথ তা অবলীলাক্রমে সম্ভব করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে গান রচনাকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন। কবিতা অপেক্ষা গান রচনাকে প্রাধান্য দিলেও গানকেই কবিতার সামূহিক ভাব ও রূপগত বৈশিষ্ট্যে নির্মাণ করতেন। তাঁর গান লেখা মানে সবচেয়ে তন্নিষ্ঠ সাধনায় শ্রেষ্ঠ গীতকবিতা রচনা। ফলতঃ তাঁর গীতিকাব্য ও কাব্যসংগীতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বলেন—"অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দাম বেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম, তখন মনে পড়ে গেল সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে।" (ভিয়েনা, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬, বনবাণী কাব্য-এর ভূমিকা)

তাঁর বক্তব্যে কবিতা ও গান সম্পর্কে আনুপাতিক নির্ভরতার কথা ফুটে উঠেছে। বলেন—"ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোনটা ছোট বোঝা গেল না ...অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই, গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।" (আমাদের সংগীত)

কবিতা ও গানের ভাষা সম্পর্কে :—"আমার গানের কবিতাগুলোতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব, সেইসব কথা ব্যবহার করেছি, সুরের সঙ্গে যারা সমান ভাবে আসন ভাগ করে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করছে। এর থেকে বুঝতে পারবে—তোমার মূল নীতিকে আমি সুরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি।" (আলাপ আলোচনা)

বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রতে গিয়ে বাংলাগানের কাব্য-লক্ষণকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দেশীসুরে সহজ ভাষায় লোকসংগীতগুলোকে তিনি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যগুলো এ'রকম—"বাণীর প্রতি বাঙালীর টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না, এই জন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।...

এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে।"

(আমাদের সংগীত)

—"হিন্দুস্থানী-সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ-ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার-ব্রত তার নয়; সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপোষ ক'রে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক।" (আলাপ আলোচনা)

বাংলাকীর্তন-গানে কবিতা ও সংগীতের যুগল-মিলন তত্ত্ব নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভেবেছিলেন; এ সম্পর্কে তাঁর বহু বক্তব্য আছে। তিনি বলেন— "কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তার সহায়মাত্র।··· কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাব-রসটিকেই নানাভাবে নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষক'রে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম ক'রে বর্ষিত হতে থাকে। এই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত-সম্মিলিত কাব্য। কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টপ্পাগানে, হরুঠাকুর, রাম বসুর কবির গানে সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধারা।" (আলাপ আলোচনা)

কবিতা ও সংগীত সম্পর্কে নানামুখী অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন গুরুদেব। এসম্পর্কে ভারতীয় ও বিদেশীয় বহু মনীষীর সঙ্গে কবির গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম মন্তব্যসহ আলোচনা আছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সংগীতচিন্তা' পুস্তকটি রবীন্দ্রসংগীত চিন্তার পূর্ণাঙ্গ সংকলন। বিভিন্ন বিষয়ে কবিগুরুর মতামত উক্ত গ্রন্থে প্রাপ্তব্য; কাজেই এখানে আর বক্তব্য উদ্ধারের প্রয়োজন নেই।

তিন

গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয়, কাব্য-গীতির চরম স্থান

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলোর অনুসরণে ও কয়েকটি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূত্রে গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রণিধান করতে পারি। এখানে

একটি বিষয় স্পষ্ট ক'রে মনে রাখা দরকার যে, গীতিকবিতা হচ্ছে গীতধর্মী সুললিত সহজ স্বচ্ছ বাণী-নির্মিতি, তাতে সুর সংযোগ করার কথা ওঠে না। কাব্যগীতি মানে গান; গানের দেহে কবিতার ভাষা, অথচ বাণী থাকবে সুরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কবিতাকে আবৃত্তি ও গানকে সুরে গাওয়ার দুটো পদ্ধতি পৃথিবীর সবদেশে সমানে চলে এসেছে। প্রাচীন গ্রীসেও আবৃত্তিযোগ্য কবিতা ও সুরে গাইবার কবিতা আলাদাভাবে রচনা করা হতো। ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে—

"Even the Greeks drew a fundamental distinction between the melic poetry (poetry written to be sung) and poetry that was written to be recited."[২৭]

কথা ও সুরের সমানুপাত গুণের সন্নিপাত হ'য়ে কাব্যগীতি হচ্ছে; কবিতা ও গানের যৌগপন্থ যেখানে, তারই স্বরূপ বিচার করাটাই আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

কবিগুরুর কাছে কবিতা ও কাব্যসংগীত একার্থক। পূর্বে বলেছি, গীতি-কবিতার নামানুকরণে তিনি গানকে কাব্যগীতি বা কাব্যসংগীত নাম দিয়েছিলেন। এক সময়, কবি সুরনির্ভর ও সুরোপযোগী গানের ভাষাকে হিন্দুস্থানী রূপাবয়ব-সম্মত ভেবেছিলেন। "বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো।" (গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ১৩:৯)

দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে গানের কাব্যরূপ সম্পর্কে কবির বিস্তৃত আলোচনা চলেছিল। এবং স্পষ্টতঃ কবি স্বয়ং এবং দিলীপকুমার তাঁদের আলাপ-আলোচনায় মাধ্যমে স্বীকার করেছিলেন যে, কবিতা ও গানের কাব্যরূপ সমশ্রেণীর। গানের সুরটাই একমাত্র বস্তু নয়, উপযুক্ত বাণীবন্ধে তাকে সার্থক হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অজস্র বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। আর দিলীপকুমার বলেছেন—"এর মধ্যে সার কথাটি অনুধাবনীয় যে, বাংলাগানে একরোখা সুরবিহার না-মঞ্জুর। কারণ ও-গানকে বলা যেতে পারে কাব্যসংগীত।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী গানের কথা-নিরপেক্ষ সুরবিস্তার বা ইম্প্রভাইজেসনকে অসম্পূর্ণ বলেছেন। কেননা রাগরাগিণীর সুরের রঞ্জনা-ব্যাপারটি যদি হৃদয়-

ভাব, আবেগ ও উপলব্ধির প্রকাশকে কেন্দ্র ক'রে হ'য়ে থাকে, তবে তাতে অর্থবোধক ভাষার সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থহীন ভাষানির্ভরে স্বরালাপ শ্রোতাকে উদ্দীপিত করলেও (যেমন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের স্বরবিস্তার) ভাষা-সহযোগে সংগীত-মূর্চ্ছনা অধিক মহিমায় রসসৃষ্টি করে। কাব্যসংগীতের ভাব ও রসস্ফূর্তি আপতিক ও অসম্পূর্ণ নয়; পরিপূর্ণ, সমগ্র ও সুগভীর। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ গানের রাজ্যে কবিতার সমান প্রতিষ্ঠা স্বীকার ক'রে নিলেন। তাঁর বক্তব্য ইতিহাস অনুসরণ করেও প্রমাণসিদ্ধ হ'তে চেয়েছে।

তিনি বলেন—"তানসেন প্রভৃতি গুণীদের রচনা সাহিত্যভাষা অবলম্বনেই আজ পর্যন্তটিকে আছে।" (কথা ও সুর, সংগীত চিন্তা পৃঃ ৯১)। ইউরোপের গীতকলার ক্ষেত্রেও "সিম্ফনির বিরাট গরিমাময় গঠন-কারুকলা" (ঐ পৃঃ ১১৭)-কে তিনি মূল্য দিয়েছেন, কেননা সিম্ফনি ললিত-কলারূপ ও রস-উৎস সৃষ্টিতে সক্ষম। তিনি বলেন, বিটোফেনের সংগীত (সিম্ফনি) এর মত "বাগ্নার প্রভৃতি গুণীদের রচিত সাহিত্য-বিষয়-সমাশ্রিত পার্সিফাল প্রভৃতি অপেরা পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রভূত সম্মান পেয়েছে। ওই সংগীতে যা বলতে চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হতেই পারে না।" (ঐ, পৃঃ ৯০)

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে আরও বুঝতে পারি, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কাব্য ও সংগীতকলার ক্ষেত্রে সর্বত্রই একটা সুষম সুনির্দিষ্ট সমন্বয় (synthesis) লক্ষ্য করেছেন। কাব্যসংগীতের যুগ আজ পৃথিবীতে। কাজেই সংগীত ও কবিতার অদ্বয়-সম্পর্কটি সর্বত্র অনুধাবন করা হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণেই।

ব্রিটানিকায় সংগীত ও কবিতাকে একার্থক ধরা হয়েছ —"A song, as a from of poem usually terns on some single thought or emotion, expressed subjectively in a number of stanzas or strophes."[২৯] উক্ত গ্রন্থে কবিতা ও গানের সম্পর্ক-সূত্র নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা আছে।[৩০] এ প্রসঙ্গে মনীষী রোনাল্ড পিকক-এর মন্তব্যটি উদ্ধার করছি:

"Some of the means of poetry are very similar to those of music. They both use rhythm and acoustic features, which include the sounds produced by the inflexions of voice and

various vocal devices of verse such as assonance, rhyme, and the play of vowels. This gives a simple, elementary overlap with music. The border line of poetry and music is seen where reading a lyric seems to be on the point of becoming a song ; or in recitative, where the word meaning predominates over the melody. Thus, though normally a poem read and song sung are two different phenomena, between them they have a common element."[৩১]

উপরে উক্ত মন্তব্যগুলোর অনুসরণে কবিতা ও সংগীতের কিছু বাহ্য রূপগত ও ভাবগত সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য সূত্রাকারে লিখছি।

এক উভয় বিষয়ে সুর-সংবেদনশীল স্বরবর্ণ ও যুক্তবর্ণ, নির্বাচিত শব্দ, বাগ্‌বিভূতি ইত্যাদি বাগ্‌রূপ-প্রকরণ আবশ্যিক। বলা হয়েছে, কবি ও গীতকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা, সুগভীর তত্ত্বচিন্তা ও উপলব্ধি থেকে বাক্‌শিল্পরূপ নির্মাণ করেন।

দুই শব্দ ও অর্থগত মিল-পারম্পর্য, ধ্বন্যাত্মক ও সংগীতাখ্য শব্দানুষঙ্গ প্রয়োগে উভয় বিষয়ে সাংগীতিক পরিমণ্ডল আসতে পারে। সংগীতধর্ম কবিতা ও কাব্যসংগীতের রূপ-প্রকরণেই উদ্ভাসিত হয়।

তিন শব্দে ও বাক্যে বাক্‌প্রকরণের বিপরীত-কথন-রীতিটি ভাব ও রসাভিব্যক্তিতে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্রান্তিকারী (effect of the contrast of words and their literal sense)। কবিতা ও গানে ভাবের গভীরতা এই তীক্ষ্ণ ভাষণ-রীতিতেই অনিবার্য হ'য়ে ওঠে।

চার ছন্দঃস্পন্দন কবিতা ও কাব্যসংগীতের প্রাণস্বরূপ। ছন্দ ও সুরের তানের অন্তর্গুঞ্জন পদবন্ধে প্রাতিস্বিক হয়ে উঠতে পারলে সেখানে এক অনির্বচনীয় গীতরস উচ্ছ্বসিত হয়।

পাঁচ কবিতা ও গানের তুলনাহীন ভাষায় সংবৃত, অনতিরেক ও ঐন্দ্রজালিক রূপ-প্রকরণ আছে, যাকে বলা হয়েছে চিত্রকল্প ও প্রতীক।

উল্লিখিত কয়েকটি রূপ-প্রকরণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করলাম, আমার গ্রন্থের পূর্ব-ধারায় সেগুলিকেই বিস্তৃত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি। সেখানে আমরা

সর্বতোভাবে বোঝাতে চেয়েছি যে,—রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত কেবলমাত্র কবিতা নয়, কবিতার চেয়েও বেশী কিছু। আমার সেই মূল বক্তব্যটি এখানে সাধারণভাবে উপস্থাপিত করেছি প্রাসঙ্গিকতার তাগিদে। অর্থাৎ গীতি-কবিতা ও কাব্যগীতির ভাব ও রূপগত সম্পর্ক নির্ণয়ে আমি রূপবাদ-রীতিকে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে প্রয়োগ করেছি। কিন্তু প্রশ্ন, গান ও কবিতাকে কি সর্বতোভাবেই এক সূত্রে বিচার করা চলে? এক সুরেই কি তারা সঞ্চরণ করে? কিংবা একই রূপ ও ভাবের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত তারা?

কবিতা ও গানের এমন কিছু সূক্ষ্ম গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমধর্মী। কিন্তু কবিতাকে পেছনে ফেলে গান নিঃসন্দেহে একটি স্তর ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সে হচ্ছে সুরের মূল্যে। একথা আগেই বলেছি। তাছাড়া, অংশতঃ ও সাধারণ কিছু পার্থক্যও আমরা দেখতে পাই বিচার বিশ্লেষণ ক'রে। এখানে আমার বক্তব্য নিবেদিত হচ্ছে, প্রধানতঃ কেন আমি গান (কাব্যগীতি)-কে কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলবো।

এক: গীতময় (লিরিক্যাল) ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে কবিতা ও কাব্যগীতি গুরুতরভাবে সদৃশ। "গীতিকাব্য এবং গীত—এ দুয়ের রস-পরিণাম একই, কোন না কোন ভাব-নির্ভর আহ্লাদ বিশেষ"[৩২] কিন্তু সুরাশ্রিত ব'লেই কাব্যগীত অধিক গীতধর্মে অধিক মর্মস্পর্শী। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন "সুরের জগৎ কথার জগৎ থেকে পৃথক।"[৩৩] কবিগুরু 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', 'আর্যগাথা' ইত্যাদি প্রবন্ধে কাব্যবাণী-নিরপেক্ষ গানের শ্রেষ্ঠত্ব এক সময় স্বীকার ক'রে পরবর্তীকালে মত বদলে নিয়েছেন এবং বাণী ও সুরের হর-গৌরী সম্পর্কে বিশ্বাসী হলেন; তবুও তাঁর গান-নির্মাণ ব্যাপারটিতে কিছু অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে। গান লেখার কাজটি কবিতার মতো নয়, ভিন্ন প্রযত্নে ঐকান্তিক আগ্রহে সম্পন্ন করেছেন। কবিতা ছেড়ে গান লেখায় কবির অন্ত্যহীন প্রয়াসের মূলে কাজ ক'রে গেছে কবির অখণ্ড সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব। সেই বহু বিচিত্র বহুবর্ণী বিস্ময়কর প্রতিভাকে সহজে প্রণিধান করতে না পারলেও আমরা তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার প্রত্যক্ষ ও পর্যাপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত হই এবং আনন্দে উল্লসিত হই। তাঁর অজস্র কবিতা ও গান প্রত্যক্ষতঃ সেই আলোর প্রস্রবণ। বিশেষকরে তাঁর গান অফুরন্ত সুরের আলোর ঝর্ণা-ধারায় ধুইয়ে দেয় আমাদের মন-প্রাণ।

প্রক্রিয়াগতভাবে কবিতাকে গানের সুরে বসাতে গিয়ে কবিতার রূপান্তর-

পদ্ধতিতে তাঁর সূক্ষ্ম গীতরচনা-কর্মের নজীর দেখি। ভাব ও ভাষাগত আধার-ভেদে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুকুমার সেন,—"সহজ করিয়া বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাধারণতঃ রূপের রসাভিব্যক্তি, গানে প্রধানতঃ রসের রূপ পরিণতি।...কবিসত্তের আবেদন কবিতায়, নিবেদন গানে।...কবিতায় এমন দীপ্ত বর্ণসম্পাত, গানে এমন মায়াময় স্বপ্ন-সুষমা।"[৩৪]

দুই: ভাব ও রূপগত বিধি-নিষেধ ও প্রকরণ-শৈলীর প্রয়োগ-সীমা ইত্যাদির বাঁধন থেকে কবিতা অনেকটা মুক্ত। সীমাতিশায়ী ভাবোপযোগী ছন্দ, পদবিন্যাস, অনুপ্রাস, মিল, চিত্রকল্প, প্রতীক ইত্যাদির স্বভাব-নির্মিতি কবিতায় চলে যথেচ্ছ, কিন্তু গানকে সাবেকী ও অধুনা প্রচলিত কিছু রীতি-নীতি ও নিয়ম মানতে হয়। অবশ্য এ নিয়ম শৃঙ্খলের বন্ধন নয়, নিয়মের শৃঙ্খলা। আর্টের সংযম ও সৌষ্ঠবের চরম রূপ গানে প্রতিফলিত। গানে সুর-নির্ভরতার জন্যে পদবন্ধে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ ধরণের পংক্তির কাল-বিভাগ মানতে হয়। যেমন সংযম ও নিয়মের গুণে সনেটগুলো কবিতার থেকে উৎকর্ষ হয়, তেমনই কাব্যগীতি সীমিত বাক্‌রূপের মধ্যেই সীমাতিশায়ী ভাবের সাতরঙ-দিগন্তচ্ছটা ধরতে পারে। যদিও "ছোট ছোট একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই।" (যাত্রী, পৃঃ ৬৭)। রবীন্দ্রসংগীতের রূপবন্ধনে বন্ধনহীন সংরাগ ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। কবির কথা—"মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।"

তিন: কাব্যভাষা (শব্দ-ঝংকার, বাগ্‌বিভূতি, বিশেষণ, সমাস, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি) প্রয়োগে কবিতায় অনেকখানি নিশ্চিন্ত ঔদার্য আছে। কিন্তু সংগীতের ভাষার সংহতিতে আনতে হবে তীব্র অন্তর্লীন বেগ ও চলিষ্ণুতা। হাল্কা, ঋজু অথচ নমনীয় প্রসাদে শব্দচেতনা বিকশিত হবে। কবিতার ভাষা-নির্মাণে বিপুল ঐশ্বর্য দার্ঢ্য ও সৌন্দর্য ঢেলে দেওয়া যায়, গানের ভাষায় সে'সব দেবার অবসর কম; অপরিসর অবয়বে বহু রত্নের সম্ভার সাজানো যাবে কি ক'রে? সংগীতকে বাগ্‌বিভূতি বর্জন করতে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কবিতার সকল প্রকার বাক্‌-রূপোদান তাঁর গানে প্রযুক্ত। নানা বাক্‌-প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেকক্ষেত্রে কবিতাকে ছাড়িয়েছে তাঁর সংগীতগুলো। সরল ও তৎসম শব্দের ধ্বনি-মিল, চিত্রকল্প ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা অপেক্ষা সংগীতে অধিক সাফল্য পেয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশাপাশি তাঁর গীতিধারা

চিরদিনই এই বাঙ্‌ময় সন্মানে স্রোতোবহা ছিল। কিন্তু শেষ দশকের কাছাকাছি এসে তাঁর কবিতা ও গানের সম্পর্ক এই অর্থে নতুন হয়ে উঠেছে যে তাঁর অনেক কবিতাকে গান হতে হয়েছে, এবং গানের সংহতি অনুসন্ধান করেছে। এবং ফলতঃ এক-একটা চিত্রকল্প এখানে শায়ক সুতীক্ষ্ণ বাক্‌সংযমে পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি আর অন্তঃশ্রুতিকে প্রায় একটি সর্বান্বয়ী জ্যোতিরিন্দ্রেয়ের (Sixth Sense) কোঠায় নিয়ে গিয়ে পৌছে দেয়।"[৩৫]

(চার) কবিতায় ছন্দের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যগীতিতে বাক্‌-ছন্দের প্রভাব অনিবার্য নয়। কেননা গানের কথাবন্ধে সুরের সঞ্চরণ ঐকান্তিক; এবং সুরের তান, গতি-গমক, বিস্তার বা আলপ্তি বাণীকে ছাড়িয়ে যায়, কিংবা বাণীকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়। সুরের সেটা নিজস্ব মৌল বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া। সেজন্য গানে কাব্যছন্দ শিথিল এবং বাধ্যবাধকতাহীন। বরং গানের কথায় বাক্‌ছন্দের রীতি চালাতে গেলে গানের স্বাভাবিক গতিকে ক্ষুন্ন করা হয়।

তাহ'লে রবীন্দ্র-সংগীতে বাক্‌ছন্দের গুরুত্ব কতখানি? আমরা বলবো, কবিতার চেয়েও বেশী। কবিতার ঝোঁক, মাত্রাধ্বনি, মিলবিন্যাস, অনুপ্রাস, সাস্তমিল ইত্যাদি কাব্যছন্দরীতি ও প্যাটার্ন সুরের তানলয়ের সঙ্গে প্রায় ঐক্যসূত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে রবীন্দ্রসংগীতের কবিতা ও গায়কীকে সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রথম জীবনে রচিত ধ্রুপদাঙ্গ ভক্তিগীতিগুলোতে সুরপ্রাধান্য থাকায় কবিতা ও কাব্যছন্দ নির্ভরতা পায়নি। মধ্য ও পরবর্তী জীবনে সংগীতগুলোর সুর ও কবিতা সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস ছিল। ছন্দ সেখানে আবৃত্তির স্পন্দনে ও সুরের লয়ে সম্মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন বা রূপকল্পের মূল্য লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—"তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় তাঁর গান যেমন একটি বড়ো অংশের অধিকারী, তেমনি শুধু সুর নয়—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির কারুশিল্পেও তাঁর কৃতি এখানে অপর্যাপ্ত।"[৩৬]

এই গ্রন্থের পূর্বধারায় গীতিকবিতার ও কাব্যগীতির এই সব বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিশ্লেষণ করেছি আধুনিক রূপরীতিবাদের অনুসরণে। এখানে তাদের মৌল স্বরূপ ও তত্ত্বের বিশিষ্টতা ধরে দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় কবিতা ও গানের সূক্ষ্ম সংযোগের নাম—'গীতরস'। সুরে না গাইলেও কাব্যসংগীত কবিতার মত রসস্ফূর্তিতে সামাজিক হৃদয়ে রসোদ্রেক করবে। যেমন করে বৈষ্ণবপদ। ভাব ও ভাষারূপের নিবিড় সন্নিপাত ও স্টাইলই বৈষ্ণবপদকে কবিতার থেকে বড় ক'রে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"এসো

এসো বঁধূ এসো, আধ আঁচরে বসো, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি—এই পদটিতে যে গভীর প্রীতি ও একান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কি কথার দ্বারা হইয়াছে? না আমরা মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত করুণ সুর সংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি?...এইজন্য এই কবিতায় সুর না থাকিয়াও উহা গান।" (আর্যগাথা)

অথণ্ড অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মত 'গীতরসের' অন্তর্লীন প্রবাহে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীত বেগবান। সংগীতের সুর তাঁর সংগীতকে চরমে নিয়ে গেছে। এসব বিচার ক'রেই আমরা রবীন্দ্রসংগীতকে শ্রেষ্ঠতম মূল্য দিতে চেয়েছি। কেউ সমান গুরুত্ব দিয়েছেন কথা ও সুরকে। কেউ শ্রেষ্ঠ মূল্য দেন সুরকে। আমার মনে হয়েছে, সুর নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত-গায়কীতে কখনো দুঃসময় এলে-ও তাঁর সংগীত বাণী-বৈভবের ও রসের উদ্ভাসনে ধ্রুপদী গৌরব নিয়ে আরও প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটা সংগীতময় কম্পন সৃষ্টি ক'রে সুরলোকের দাবি নিয়ে মরলোকে অক্ষয় হয়ে থাকবে রবীন্দ্রসংগীত।

বাণী ও সুরমিশ্রিত বাণীর, কবিতা ও গানের কবিতার তুল্যমূল্য ও আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রতিপাদন ক'রে আমি কেন যে সংগীতকে শ্রেষ্ঠতম বিষয় বলতে চাই, বলেছি। আমার সব বক্তব্যকে আরও ঋজু ও স্পষ্টীভূত ক'রে দেবার জন্যে এখানে একটা সারণী-চিত্রের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করছি।

সংগীতের স্থান : পর্যায় স্তর

বিষয়	স্তর ১	স্তর ২	স্তর ৩	স্তর ৪	স্তর ৫
সাধারণ গদ্যরচনা	বাক্	অর্থ	•	•	◦
সাধারণ গীতিকবিতা	বাক্	অর্থ	ধ্বনি	•	•
শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য কাব্যসংগীত বৈষ্ণবপদ, রবীন্দ্রকবিতা	বাক্	অর্থ	ধ্বনি	গীতরস[২]	• •
সুরযুক্ত সংগীত কাব্যসংগীত[১]	বাক্	অর্থ	ধ্বনি	গীতরস	অনির্বচনীয়
রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি					আনন্দলোক[৩]
	উপায়		উদ্দেশ্য		চরমরূপ[৪]

সূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য :

বাক্ ও অর্থ এই দুইস্তরেই গদ্যের পূর্ণতা। গীতিকাব্যের উত্তরণ তৃতীয়-স্তর ধ্বনিতে। অবশ্য অনেক শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনাও তৃতীয় স্তরে উন্নীত হতে

পারে। শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, রবীন্দ্রকাব্যসংগীত ইত্যাদির মধ্যে রবীন্দ্রকথিত 'গীতরস বা সংগীতরস' সম্পৃক্ত হয়ে তাদের আরও সার্থকতার স্তরে উন্নীত করে। সব কবিতায় তো সুর সংযোগ করা চলতে পারে না। সুর-প্রয়োগের উপযুক্ত বাণীসিদ্ধ-কাব্যগীতি বা কাব্যসংগীতে যখন সুর সংযুক্ত ক'রে গাওয়া হবে, তখনই তো অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সৃষ্টি; সেই তো শেষ স্তর, সেইতো চরমরূপ।

এখানে উপায় বলতে বোঝায় অবলম্বন। সকলপ্রকারের রচনার অবলম্বন হল বাক্ ও অর্থের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠাভূমি। এখানেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। তবে উদ্দেশ্যের স্তর গদ্যে স্পষ্ট নয় তেমন, যেমন স্পষ্ট গীতিকবিতায়। ধ্বনি, গীতরস ও চরমরূপ এই তিন স্তর হলো উদ্দেশ্য কিংবা অভীষ্টলাভের স্পষ্ট অবস্থা ; যথাযোগ্য রচনায় এই স্তরগুলির স্বরূপ প্রকাশ পায়।

সংকেতগুলির প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি উদ্ধার করা গেল।

১. "রবীন্দ্রনাথের বহু গীতিকবিতাই যে শব্দচয়নে, ছন্দবিন্যাসে আলংকারিকতায়, এক কথায় কাব্য-প্রকৃতির বিচারে বৈষ্ণবপদাবলীর সগোত্র।...এগুলি রচনাগুণে গীতিরচনার এত কাছাকাছি যে, সুরে বসালে এগুলি অতি সহজেই গান হয়ে ওঠে।"

(প্রবোধচন্দ্র সেন—বাণী ও বীণা : গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১১৬)

২. দ্রঃ আর্যগাথা : আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ১১৯—"এই কবিতাটির মধ্যে যে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও উক্তি—"বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসে ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গিতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায়, অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে।" (সাহিত্যের স্বরূপ : রর ১৪শ পৃঃ ৫১১)

"সাংগীতিক চরক সংহিতার মতে তাকেই বলে সংগীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায়। কিন্তু ওস্তাদের সাক্রেদরা বলে সেটাই সংগীত যেটা পাওয়া হয় হিন্দুস্থানী কায়দায়।" (কথাও সুর : রর ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৯১৬)

৩. "সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য।"

(রবীন্দ্রনাথ)

…"সংগীতের ক্ষেত্রে আমরা কথায় যে সুর লাগাই, তা সীমাবদ্ধ এতটুকু কথাকে সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অসীম রহস্য মহিমা দান করিবার জন্যই।"

(শশিভূষণ দাশগুপ্ত : উপমা কালিদাসস্য পৃঃ ১০)

"এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্‌ ; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা, যা আমাদের অন্তরে রসের সঞ্চার করে।" রবীন্দ্রনাথ

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে চিঠি ৬ চৈত্র ১৩০২ শিলাইদহ)

৪. সংগীতের সুরের যাদুস্পর্শ শ্রোতার আত্মবোধ ও আত্মবিস্মরণের একটি সূক্ষ্ম অবস্থার সৃষ্টি করে। সহৃদয় সামাজিকের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দ-বোধের এই অবস্থাকে কবি চরমরূপ বলেছেন, দর্শনে একে বলে পরা অবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ 'এক'-কে চরমরূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন।" (সাহিত্যের পথে পৃঃ ৪৯)

আর একস্থানে কবিগুরু বলেছেন—

"মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুর-সংঘকে বাঁধে সীমায়, ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন পায় গানে-গড়া রূপ।…"

(শেষ সপ্তক/সতেরো/ধূর্জটিপ্রসাদ কল্যাণীয়েষু)

এখানে বলে রাখা ভালো, এই চিত্রলেখা কোনো স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসেবে দাবী করা হয়নি। কাব্যসংগীত অন্যান্য রচনার থেকে স্তর-পারম্পর্য উত্তীর্ণ হয়ে যে সর্বশেষ স্তরে অবস্থান করছে, এ'রকম একটা ব্যক্তিগত ভাবনাকে বোঝাতে চেয়েছি রেখা দিয়ে। এ বিষয়ে কারও কোনো মতান্তর থাকলেও আমার আপত্তি চলে না। সংগীতকে সবার উচ্চে স্থান দেবার যুক্তি অনেকটা প্রথাগত হয়েও উঠেছে অনেককাল ধরে। সংগীত এখন সাহিত্যগত হয়ে পড়ায়, এ'ভাবনা এখন আবশ্যিক ও মূলীভূত হ'য়ে উঠেছে আরও বেশী।

ললিতকলা-শাস্ত্রের সবার ওপরে সংগীতের স্থান কেন ? কেননা "সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা এবং যাঁহারা উহা বুঝেন তাঁহাদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা। ঈশ্বরকে স্মৃতি পথে রাখিবার জন্য অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক শব্দসঙ্গীত।" (স্বামী বিবেকানন্দ)। বেদান্তকেশরী তপস্বী বিবেকানন্দের

কাছে তাঁর শাশ্বত জীবনবাদ ললিতকলার পবিত্র রসানন্দে সম্পৃক্ত হ'য়ে গ্রাহ্য হয়েছে। জীবনের সত্য ও আর্টের সত্য তাঁর কাছে সমান প্রেরণা যুগিয়েছে। রাস্কিনের মতে সকল আর্টের নামই স্তব। শোপেনহাওয়ার বলেছেন —সংগীত সব শিল্পের বড় শিল্প।

চার

কবিতা ও গানের সম্পর্ক নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকরণ-শৈলী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সংগীতে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তি আরোপ করেছিলেন। দীর্ঘ জীবনের স্তরে স্তরে তাঁর এই তন্নিষ্ঠ সাধনার রূপায়ণ-বৈচিত্র্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে হয়। একদিকে প্রায় সাড়ে চার হাজার কবিতা, অন্যদিকে প্রায় আড়াই হাজার গান, দুটো স্বতন্ত্র ভূমিও নয়, তবুও তাঁর অনেক কবিতাকে গান হ'তে হয়েছে, এবং অনেক গানকে কবিতা। এভাবে দুটো ভিন্ন উপাদানের রূপান্তর-প্রকরণ বোধকরি পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে বেশি নেই। মারিয়া রিলকে কবিতার পাঠান্তরে ও পরিমার্জনে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কবিতা, গদ্য, গান, গল্প, নাটক ইত্যাদি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরিমার্জন-প্রবণতার তুলনা কোথাও নেই। যাইহোক, তাঁর গান ও কবিতার রূপ-পরিবর্তনের বিষয়টি থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রবণতাটি খুঁজে পাই যে, কবিতা ও গানের অন্তঃপাতী সম্পর্কটি তাঁর কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। সেজন্য কবিতা ও গানের রূপ-প্রকরণের রূপান্তর-কাজে তিনি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। সেগুলি পর পর উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(ক) কবিতাকে গানে ব্যবহার

কবিতাকে গানের কবিতায় রূপ দেবার কারণ হ'লো তাকে সুরের উপযুক্ত ক'রে তোলা। কবিতার ফর্ম গানের কলিবিভাগ-সম্মত থাকবার কথা নয়, সেজন্যও এই পরিবর্তন; এবং কবিতার বাণীরূপের এমন কোনো পরিবর্তন হওয়া দরকার, গানে যা প্রসাদশ্রী ও নমনীয় মাধুর্য আনতে পারে। এই অক্ষর ও শব্দ-পরিবর্তনের ব্যাপারটি কবির সূক্ষ্মতম বোধ ও সচেতন প্রতিভা থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। এর থেকে বোঝা যাবে, রবীন্দ্রপ্রতিভা কতখানি চলিষ্ণুতা বা ডাইনামিজম্-এর দ্বারা প্রভাবিত। এই চলিষ্ণু প্রতিভা সদাচঞ্চল জীবনের

ও জগতের সঙ্গে সুনিবিড় নৈকট্য থেকে যে প্রকাশ-সম্ভাবনা লাভ করতো, তা হ'তো চরমতম প্রকাশ। মারিয়া রিলকে বলেছেন, কবিতার বাণীতে সেই প্রকাশটি সুদুর্লভ, যা সুনির্বাচিত অতি দুর্লভ ভাষা-শব্দকেই অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষক'রে তাঁর কবিতা ও গানের প্রতিটি শব্দ সেই সুদুর্লভ স্বভাব-প্রসূত উপাদান। তাঁর কবিতা ও গানের নির্মিতি ও পরিমার্জন, নিখুঁত নিবদ্ধ ভাষণ-শৈলী—যা তাঁর একান্তরূপেই প্রজ্ঞা-প্রসূত। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বাছাই করা কবিতাকে, সম্পূর্ণ পাঠে, পাঠান্তরে বা সংক্ষেপাকারে তিনি অবলীলাক্রমে সংগীতে পরিবর্তন করেছেন। ছবি ও গান থেকে তাঁর পরবর্তী প্রায় সকল কাব্যেই কিছু কিছু সংগীতের উদাহরণ থাকবেই। দৃষ্টান্ত—

কাব্যগ্রন্থ, কবিতা ও গান : (গান বন্ধনীর মধ্যে)

ছবি ও গান : কে (আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে), সুখস্বপ্ন (ওই জানালার কাছে)। 'কে' অবিকল, 'সুখ স্বপ্ন' কিছু পরিবর্তন ক'রে গানে গৃহীত।

কড়ি ও কোমল : গান (ওগো কে যায় বাঁশরি), বিরহ (আমি নিশি নিশি কত), বাঁশি (ওগো শোনো কে বাজায়), বিলাপ (ওগো এত প্রেম), সারাবেলা (হেলাফেলা সারাবেলা), আকাঙ্খা (আজি শরত তপনে), তুমি (কোন কাননের ফুল), হৃদয় আকাশ (ধরা দিয়েছি গো), গান রচনা (এ শুধু অলস মায়া), বঙ্গবাসীর প্রতি (আমায় বোলোনা গাহিতে), মথুরায় (বাঁশরী বাজাতে চাহি), বসন্ত অবসান (কখন বসন্ত গেল)। কয়েকটি কবিতা গানে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতা অবিকল গানে গৃহীত।

মানসী : ভুলে (কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া), শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা (আবার মোরে পাগল ক'রে), তবু (তবু মনে রেখো), বর্ষার দিনে (এমন দিনে তারে বলা যায়)। শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্রিপদী ছন্দের ৮৪ পংক্তি—গানে পরিমার্জিত ২৪ চরণ।

সোনার তরী : তোমরা ও আমরা (তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও), দুই পাখি (খাঁচার পাখি ছিল), ব্যর্থ যৌবন (আজি যে রজনী যায়), হৃদয় যমুনা (যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ)। ব্যর্থযৌবন ৫০ পংক্তি

৫ স্তবকের বড় কবিতাকে গানে রূপান্তরিত ১২ চরণ। সবগুলি প্রধানতঃ বড় কবিতা হয়েও ভাবের গৌরবে সুরানুকূল্য পেয়ে গানে ধন্য হয়েছে।

চিত্রা: উর্বশী (নহ মাতা নহ কন্যা), নারীর দান (একদা প্রাতে কুঞ্জতলে), দুরাকাঙ্খা (কেন নিবে গেল বাতি)। কবিতাগুলি গানের রূপে সর্বাধিক সার্থক হয়েছে বলা যায় না।

চৈতালী: গান (তুমি পড়িতেছ হেসে), প্রার্থনা (আজি কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে)।

কল্পনা: বর্ষামঙ্গল (ঐ আসে ঐ অতি), চৈত্র রজনী (আজি উন্মাদ মধু নিশি), স্পর্ধা (সে আসি কহিল প্রিয়ে), প্রণয় প্রশ্ন (একী তবে সবি সত্য), হতভাগ্যের গান (বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে), সে আমার জননীরে (কে এসে যায় ফিরে), ভিখারি (ওগো কাঙাল আমারে), যাবনা (ভালোবেসে সখী), বিদায় (এবার চলিনু তবে), লীলা (কেন বাজাও কাঁকন), নববিরহ (হেরিয়া শ্যামল ঘন) লজ্জিতা (যামিনী না যেতে), কাল্পনিক (আমি কেবলি স্বপন), মানস প্রতিমা (তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর), সংকোচ (যদি বারণ কর তবে), প্রার্থী (আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা), সকরুণা (সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে), বিবাহ মঙ্গল (দুইটি হৃদয়ে একটি আসন), ভারত লক্ষ্মী (অয়ি ভুবন মনোমোহিনী), ভগ্ন মন্দির (ভাঙা দেউলের দেবতা), জন্মদিনের গান (ভয় হতে তব অভয় মাঝারে), পূর্ণকাম (সংসারে মন দিয়েছিনু), পরিণাম (জানি হে যবে প্রভাত হবে)।

এই কাব্যে একত্রে কবিতার সঙ্গে গান অধিক পরিমাণে দেখা গেল। ভৈরবী, বিভাস, বেহাগ, মল্লার, কীর্তনের সুর-প্রয়োগের বৈচিত্র্যও আছে এখানে। বর্ষামঙ্গল ৫৬ পংক্তি ৭ স্তবকের কবিতা—গানে ৫ স্তবক গৃহীত। মানসপ্রতিমা কবিতাটি গানে একাধিক পাঠান্তর: তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর এবং তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা।

ক্ষণিকা: আষাঢ় (নীল নবঘনে), নববর্ষা (হৃদয় আমার নাচেরে), অবিনয় (হে নিরুপমা), কৃষ্ণকলি (কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি), মেঘমুক্ত (ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে), বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী

(যাবই আমি যাবই)। কবিতা ও সুরারোপিত গান হিসেবে এগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—৭০ পংক্তি ১৫ স্তবক। প্রথম দুটি স্তবক বাদ দিয়ে মাঝের স্তবকগুলির স্থানান্তর ও পরিমার্জন ক'রে বিখ্যাত গান—যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই। অবিনয় ৫ স্তবক কবিতায়, গানে ৪র্থ স্তবক বাদে স্থানান্তর হয়েছে—তৃতীয় প্রথমে, পঞ্চম দ্বিতীয়ে, প্রথম তৃতীয়ে, দ্বিতীয় চতুর্থে। সামান্য ভাষান্তরসহ সুরের তাল-ফেরতা অনবদ্য এই গান। ৫ স্তবক কৃষ্ণকলি গানে অপরিবর্তিত। ভাষার সঙ্গে টপ্পা-কীর্তনাঙ্গ সুর, নাটকীয়তা ও চিত্রকল্পের অসামান্য সমারোহ। আষাঢ় ৪ স্তবক—গানে সম্পূর্ণ গৃহীত; স্থান বদল ক'রে হয়েছে যথাক্রমে ১, ৩, ২, ৪ স্তবক। সামান্য ভাষান্তর। নববর্ষা ৮ স্তবকের ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম স্তবক গানে গৃহীত। ভাষার পরিবর্তন হয়নি। মেঘমুক্ত ৫ স্তবক গানে ১ম ও ৪র্থ স্তবক সম্পূর্ণ গৃহীত। গানের শেষ স্তবকে কবিতার ৫ম স্তবকের ১টি পংক্তির সঙ্গে ২য় স্তবকের ৪টি পংক্তি সংযুক্ত।

নৈবেদ্য: নামহীন রচনাগুলির মধ্যে কিছু পরিবর্তনসহ গানগুলি—১নং প্রতিদিন আমি, ২নং আমার এঘরে, ৩নং নিশীথ শয়নে, ৪নং তোমারই রাগিণী জীবনকুঞ্জে, ৫নং যদি এ আমারো, ৬নং সংসার যবে মন কেড়ে লয়, ৭নং জীবনে আমার যত আনন্দ, ১০নং যারা কাছে আছে, ১২নং অমল কমল সহজে জলের কোলে, ১৩নং সকল গর্ব দূর করি দিব, ১৪নং তোমার অসীমে, ১৬নং ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ, ১৭নং অল্প লইয়া থাকি, ১৯নং প্রতিদিন তব গাথা, ২০নং তোমার পতাকা যারে দাও, ২১নং ঘাটে বসে আছি আনমনা, ১০০নং সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে।

এগুলি রাগাশ্রিত ব্রহ্মসংগীত হিসাবে প্রখ্যাত। ১০০নং গান ৩ স্তবক ৩০ পংক্তি—গানে কিছু ভাষান্তরে ১৬ পংক্তি হয়েছে। অন্যান্য গানে সামান্য পরিমার্জন কোথাও আছে।

শিশু: খেলা (তোমার কটি-তটের ধটি), নবীন অতিথি (ওহে নবীন অতিথি)।

উৎসর্গ: ৮নং (আমি চঞ্চল হে), সংযোজন: ১২নং (হে ভারত আজি

তোমারি সভায়), ১৪নং (নব বৎসরে করিলাম পণ)। ভৈরবী সুরে আমি চঞ্চল হে গানটি ৮নং কবিতার ১ম ও ৩য় স্তবক নিয়ে গঠিত। ২।৩টি শব্দের সামান্য পরিবর্তন আছে।

খেয়া : ঘাটে (আমায় নাইবা হল পারে যাওয়া), দুঃখমূর্তি (দুখের বেশে এসেছ বলে), গোধূলি লগ্ন (আমার গোধূলি লগন এলো বুঝি কাছে), মিলন (আমি কেমন করিয়া জানাব), বিকাশ (বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে), ভার (তুমি যত ভার দিয়েছ), সীমা (সেটুকু তোর অনেক আছে), খেয়া (তুমি এপার ওপার কর কেগো)।

গোধূলি লগ্ন ৫ স্তবক—গানে গৃহীত ১, ২, ৫ স্তবক, অপরিবর্তিত।

গীতাঞ্জলি : মোট ১৫৭টি। বড় ও ছোট কবিতার ৮৫টিতে সুরারোপিত। গেয় গানগুলির বিশেষ ভাষান্তর নেই। অধিকাংশ পূজা পর্যায়ের গান; কিছু গান প্রকৃতি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গানগুলোর নামোল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সেজন্য সুর-নির্ভর গেয় কবিতাগুলির সংখ্যা উল্লেখ করছি। ১ থেকে ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৪—৬২, ৬৫, ৬৮—৭০, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৯—১০১, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮। গীতাঞ্জলির বাকি ৭২টি কবিতায় সুর বসানো হয়নি। ৪৮নং আকাশতলে উঠল ফুটে ৪ স্তবক ৪২ চরণ, ৪৯নং হেথায় তিনি কোল পেতেছেন ৪ স্তবক ৪৮ চরণ। এরকম কিছু নিতান্ত কবিতা-শ্রেণীর রচনায় সুরারোপের প্রচেষ্টা করেননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বাকি অনেক ছোট ও গানের উপযোগী চমৎকার রচনা আছে—যেগুলিতে অবলীলাক্রমে সুরের সঞ্চার করিয়ে দেওয়া যায়। হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে, যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দিন—দুটি বড় কবিতায় কবি সুর বসিয়েছেন ভাবের উপযোগী ক'রে।

গীতিমাল্য : কবিতা ও গানের সহাবস্থান গীতাঞ্জলির মতো। গানের সংখ্যা বেশী। সংখ্যা ১—৩, ৭, ৮, ১৬—২৮, ৩০, ৩২—৩৭, ৩৯—৫২, ৫৫—৫৯, ৬১, ৬৩—৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১—১০৪, ১০৬—১০৮, ১১১। মোট ১১১টি রচনার মধ্যে সুর-যোজনা ৮৯টিতে। বাকি ২২টি রচনার কয়েকটি কবিতামাত্র, কয়েকটি সুরারোপ-উপযোগী।

গীতালি : মোট রচনা ১০৮টির মধ্যে ৬৮টিতে সুর সংযোজিত। সুরযুক্ত

গানগুলি ১, ৩-২৯, ৩১-৩৪, ৩৬-৩৮, ৪৩-৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৯-৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯৫, ৯৭-৯৯, ১০১, ১০৩।

গীতা°্য এই তিন পুস্তকে গানের সংখ্যাই বেশী। তিনটি বইয় মোট ৩৭৬টি রচনায় ২৪২টিতে কবি স্থর বসিয়েছেন। কবিগুরুর সংগীত-মনস্কতার স্থবর্ণ যুগে এই তিনটি গীতগ্রন্থ (গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি) বিশিষ্ট দিগ্‌দর্শন হিসেবে চিহ্নিত।

বলাকা: ৬নং (তুমি কি কেবলই ছবি), ১৫নং (গানগুলি মোর শৈবালেরই দল), ৩০নং (আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি), ৩৫নং (তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ)। ৬নং (ছবি কবিতা) ১০৭ পংক্তি—১ম ও শেষ স্তবক নিয়ে স্থরারোপ। ১৫নং সম্পূর্ণ বদল করা হয়েছে গানে। ৩৫নং আজ প্রভাতের আকাশটি—পরিবর্তিত হয়েছে 'তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলোছলো'।

পূরবী: আনমনা (আনমনা গো), বদল (তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার)। আনমনা ৩৩ পংক্তির কবিতার প্রথম ৯টি ও শেষ ৮টি মোট ১৭ পংক্তি গানে গৃহীত। বদল কবিতায় প্রথম চরণ ও অন্যান্ত ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে গানে। পঁচিশে বৈশাখ ৮০ পংক্তির কবিতার শেষ ২টি স্তবকের ১০টি নির্বাচিত চরণে স্থর যোজনা করেন কবিগুরু।

মহুয়া: কবিতা ও গানের ঘনিষ্ঠতা এখানে। কিছু কবিতাকে গানের উপযোগী করেন, গান হিসেবেও অনেক রচনা আছে। গানের জন্ত পরিবর্তিত কবিতা ও অপরিবর্তিত কবিতাগুলির নাম উল্লেখ করছি। সন্ধান, বরণডালা, নিবেদন, নির্ভয়, গুপ্তধন, অবশেষে, মুক্তি, উদ্‌বোধন, পুরাতন, বিজয়ী, প্রত্যাশা। এই গানগুলি কয়েকটির একাধিক রূপান্তর স্থরে বসানো। যেমন—সন্ধান: আমার নয়ন তব নয়নের ও আমার নয়ন তোমার নয়নতলে। বরণ ডালা: আজি এ নিরালা-কুঞ্জে ও আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো। নিবেদন: অজানা খনির নূতন মণির ও কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার।

মহুয়া কাব্যের অন্তর্গত গানগুলির ভাষান্তর ও স্থরান্তর ব্যাপারটি খুবই আকর্ষণীয়। ভাষা, ভাব ও স্থর নিবিড় আত্মীয়তায় অসামান্ত আবেদন সৃষ্টি করে এখানে।

বনবাণী : বৃক্ষ রোপণ উৎসব (মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে), ২নং (আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুর দল)। প্রকৃতি-বন্দনায় ও স্তবের সুরে গান দুটি অনবদ্য।

পরিশেষ : (সংযোজন) : প্রবাসী (পরবাসী চলে এসো ঘরে), বুদ্ধ জন্মোৎসব (হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি), নূতন (দূর রজনীর স্বপন লাগে)। ভাবে ও সুরে গানগুলি মর্মস্পর্শী।

বিচিত্রিতা : ঝাঁকড়া চুল (ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলিনি)। ছড়াটিতে বাউলাঙ্গের সুর বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বীথিকা : ছবি (একলা বসে হেরো তোমার ছবি), প্রতীক্ষা (আজি বরিষণ মুখরিত), বাদলসন্ধ্যা (জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে), বাদলরাত্রি (কি বেদনা মোর জানো), অভ্যাগত (মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম)। কবিতাগুলিকে গানে কিছু পরিবর্তিত করা হয়েছে।

নবজাতক : উদ্‌বোধন (প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে)। একটি ভাবগর্ভ চমৎকার কবিতার প্রথম কুড়ি চরণে চমৎকার সুরারোপ।

প্রহাসিনী : সুসীম চা-চক্র (হায় হায় হায় দিন চলি যায়)। হাসির গান, বিশেষ উপলক্ষে রচিত ও সুরারোপিত।

সানাই : মহুয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেখানে কবিতার থেকেও গানের গুরুত্ব বেশী দেখতে পাই। কবিতাগুলি যেন গানের অবয়বে রচিত হয়ে সুরের প্রতীক্ষা করেছে। বহু কবিতা পরিবর্তন ক'রে সুর সংযোজিত হয়। আসা-যাওয়া (প্রেম এসেছিল), অনাবৃষ্টি (মম দুঃখের সাধন), নূতন রঙ (ধূসর জীবনের গোধূলিতে), গানের খেয়া (আমি যে গান গাই), অধরা (অধরা মাধুরী ধরেছি), ব্যথিতা (ওরে জাগায়ো না), বিদায় (বসন্ত সে যায় তো হেসে), যাবার আগে (এই উদাসী হাওয়ায় পথে পথে), পূর্ণা (ওগো তুমি পঞ্চদশী), কৃপণা (এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণ রাতে), ছায়াছবি (আমার প্রিয়ার ছায়া), দেওয়া-নেওয়া (বাদল দিনের প্রথম কদমফুল), আহ্বান (এসো গো জেলে দিয়ে যাও), দ্বিধা (এসেছিলে তবু আস নাই), আধো জাগা (স্বপ্নে আমায় মনে হল), উদ্‌বৃত্ত (যদি হায় জীবন পূরণ নাহি হল), ভাঙন (তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে), গানের

জাল (দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে), মরিয়া (আজ মেঘ কেটে গেছে), গান (যে ছিল আমার স্বপন চারিণী), বাণীহারা (বাণী মোর নাহি), আত্মছলনা (দোষী করিব না তোমারে), রূপকথায় (কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার)। কবিতা থেকে গানে রূপান্তরের জন্য নিমগ্ন এই কবি-মানসিকতা আমাদের বিস্মিত করে। কিছু গানের প্রথম চরণে, ভাষায়, স্তবকবন্ধে কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও কবিতাকে বেশি পরিবর্তন করতে হয়নি। গানগুলির সুর-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। 'শেষলেখা' বইর অন্তর্গত 'সমুখে শান্তি পারাবার'—বিখ্যাত গানের সৃষ্টির মূলে কর্ণধার কবিতার প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ বলেছেন।

শেষ লেখা: ১নং (সমুখে শান্তি পারাবার) ৩নং (ওরে পাখি থেকে থেকে সুর ভুলিস নে) ৬নং (ঐ মহামানব আসে)। কবির তিরোধানের কিছু পূর্বে রচিত ও পরিবর্তিত এই বিখ্যাত গানগুলি।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে তাঁর গানের বিরাট তালিকা উদ্ধার করা গেল। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার সঙ্গে সুর-চেতনার নিবিড় সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনেকে সাঙ্গীতিক-ব্যক্তিত্ব বলতে চেয়েছেন। হাজার হাজার কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় গান রচনা ক'রে গেছেন। বহু মূল্যবান কবিতাকে গানের ভাষা ও অবয়বে পরিবর্তন ক'রে তাতে সুর সংযোজন করেছেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের সাহিত্য ও কর্ম-সাধনায় বিরাট রবীন্দ্রজীবনে এই সাঙ্গীতিক স্বভাবের সম্বন্ধ ও সংগীত-প্রেরণার তথ্যগুলি বুঝে উঠতে পারলে আমরা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিরাট অংশের পরিচয় পেয়ে যাবো। এই রচনায় সেই বিরাট প্রতিভাধরের একটি অতি অন্তরঙ্গ সৃষ্টি-কর্মের নানামুখি পর্যালোচনা করতে করতে আমরা সেই বিরাটের স্পষ্ট রূপরেখা উদ্‌ঘাটিত হতে দেখতে পাই।

কবি নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন, মানসী কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কবিত্ব-প্রতিভা সার্থকতার পথোত্তরণ করেছে। সীমা-অসীমের মিলন-তত্ত্বের সন্ধানে যে প্রতিভা বিচিত্র পথের দূর-সীমা সংক্রমন করেছে, তার সামগ্রিক পরিচয় নিতে গেলে আমাদের সর্বাগ্রে কবির সুর-স্বভাবের পরিচয় নিতে হবে। প্রায় ষাট বছরের সাহিত্য-সাধনার বিরাট সময়ের মধ্যে তাঁর সংগীত-চিন্তন ও সংগীত-

সৃষ্টির কাজ প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। ছবি ও গান (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থে গানের অবস্থান পাওয়া গেলেও তারও পূর্বে ভগ্ন হৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড, নলিনী, বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা প্রভৃতি রচনার মধ্যে কিশোর কবি গানের সুরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিলেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় কবির গীতি-কাব্যিক মনোবৃত্তি এবং তৎসহ নাটকের মাধ্যমে সংগীত-সৃষ্টির এক পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। কিশোরকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই সংগীত-প্রাণ-সত্তার সুগভীর প্রচার দেখতে পাই কাব্য-কবিতায়, নাটকে, নাট্যগীতি ও নৃত্যনাট্যে এবং স্বতন্ত্রভাবে কাব্য-সংগীতের বিপুল সম্ভারে। পূর্বোল্লিখিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে তাঁর গীতি-চেতনার সেই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি এই ত্রয়ীগ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবিতাকে কিভাবে গানে ব্যবহার করা হয়েছে দেখেছি। কবিতাকে পরিবর্তিত ক'রে কিংবা অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রনাথ সুর সংযোগ ক'রে তাদের কাব্যসংগীতে রূপান্তর করেন। প্রকৃতপক্ষে পরিমার্জন, গ্রহণ, বর্জন ইত্যাদি যেখানে যতটুকু যেভাবে আবশ্যক, কবিগুরু অসামান্য দক্ষতায় তা নিষ্পন্ন করেছেন।

এরকম অসংখ্য উল্লেখযোগ্য রূপান্তর আছে। সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করছি। খেয়ার 'মিলন' ও 'বিকাশ' কবিতা দুটি, বলাকার ১৫নং কবিতা (গানগুলি মোর) এবং ছবি'। সানাই কাব্যের ছন্দোবন্ধ কবিতাকে মিলহীন গানে (অধরা মাধুরী ধরেছি) পরিবর্তন। 'আধজাগা' ও দ্বিধা' কবিতার সহজ পদবন্ধ রূপ নিল গানে শক্ত ভাষণ-শৈলীতে। পূরবীর 'আনমনা', 'পঁচিশে বৈশাখ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর। এছাড়া 'ওগো কিশোর আজি', 'পরবাসী চলে এসো' ও 'এসো প্রাণের উৎসবে' ভাষান্তর সহ পবিবর্তিত হয়ে সুরে যুক্ত হয়। 'সাতভাই চম্পা' থেকে 'ওগো বঁধু সুন্দরী' পরিবর্তিত।

আবার একই কবিতাকে অপরিবর্তিত রেখে কবি সুর দেন; আবার ভাষান্তর করেও সুর দেন—এমন উদাহরণ মহুয়ার 'সন্ধান' ও গুপ্তধন' কবিতা দুটো। কবিতা-সৃষ্টি ও সুর-সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কবির আত্যন্তিক উল্লাস নানাভাবে দেখতে পাই। এই যে রূপান্তর, এর কাব্যগত ও সুরগত করণশৈলী নিয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।

(খ) বড় কবিতা ও কবিতার অংশ গানে গৃহীত

কাব্যগ্রন্থগুলি-আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরো কবিতা অপরিবর্তিত রেখে এবং পুরো কবিতার কয়েকটি স্তবক বাদ দিয়ে অপরিবর্তিত অন্যান্য পদবন্ধে সুর যোজনা করেছেন কবিগুরু। গানের কলি-বিভাগ নিয়মিত না হলেও তিনি সুরযোজনা করেছেন অসামান্য স্বাচ্ছন্দে। এরকম বহু কবিতা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে।

গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্যের গানগুলোর বেশ কয়েকটি সার্থক গীতি-কবিতা বৃহৎ আকারে লেখা। এরকম আরও কিছু সুরে বসানো বিখ্যাত কবিতা ও কবিতাংশ: উর্বশী, দুই পাখি, তোমরা আমরা, ব্যর্থ যৌবন, বর্ষা-মঙ্গল, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, মেঘমুক্ত, নববর্ষা, আনমনা, ছবি, নির্ভয়, আষাঢ়, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ভারততীর্থ, কৃষ্ণকলি, অবিনয় ইত্যাদি। প্রকৃত কবিতার লক্ষণাশ্রয়ী বড় বড় গানগুলো গীত-পঞ্চাশিকার অন্তর্গত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন', 'দেশ দেশ নন্দিত করি,' এই তো ভালো লেগেছিল'। তাছাড়া 'বিশ্ববীণারবে', 'নৃত্যের তালে তালে', 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি', 'ওগো কিশোর আজি', 'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে' ইত্যাদি বিখ্যাত গান। এছাড়া বহু অপরিবর্তিত কবিতায় সুরারোপ ক'রে দিয়ে কবি কবিতার রসলোক অধিক মহিমায় উন্মোচিত ক'রে দিয়েছেন।

(গ) গানের কবিতায় পরিবর্তন

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সমন্বন্ধ ও তন্নিষ্ঠ চেতনার আর একটি শৈলী হচ্ছে, গানকে কবিতায় রূপান্তর। গানের দেহ থেকে সুরকে নির্বাসন দিয়ে ভাষণ-শৈলীর মাধ্যমে তাদের নিখুঁত কবিতায় রূপ দিয়েছেন কবি। এরকম দৃষ্টান্ত অন্যত্র বেশী না হ'লেও কেবল রবীন্দ্রপ্রতিভাতেই তার কিছু সম্ভাবনা ও সাফল্য দেখেছি। যেমন:

আমার প্রিয়ার ছায়া ২৫.৩.৩৮। কবিতার রূপ সানাইতে ছায়াছবি:
আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি; ১৩৪৫ সালে ৭ বছর পরে রূপান্তর করা হয়েছে।

এস গো জেলে দিয়ে যাও ১,৮.৩৯। সানাইতে আহ্বান কবিতা হিসেবে রূপান্তর—জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ। আহ্বান ১৫.১.৪০ তারিখে রূপান্তর হয়।

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল ৩০.৭.৩৯। সানাইতে দেওয়া নেওয়া কবিতা হিসেবে রূপ নেয় ১০.১.৪০ তারিখে।

পাখি তোর সুর ভুলিস্‌নে ডিসেম্বর ১৯৪০। 'শেষ লেখাতে'—ওরে পাখি থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর' কবিতা হলো, তারিখ—১৭ ২.১৯৪১।

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ৮.১২.৩৮। সানাইতে কবিতা হলো ঐ দিনেই।

গান ও কবিতার পাঠান্তরে বিশিষ্টতা কোথায়? দুটি দৃষ্টান্ত:

গান: আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়,
বৃষ্টি সজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায় হায়।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো
স্মরণে তার আসে। হায়॥

গানটির কবিতার রূপ হলো—

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি সজল নীলাকাশে
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে। ইত্যাদি।

গানে 'হায় হায়' শব্দগুলোর ধ্বন্যাত্মক সুর-ব্যঞ্জনা ও ছন্দ-শৈথিল্য কবিতায় সংশোধিত হলো। কাব্যছন্দে চিত্রকল্পের অভিব্যঞ্জনায় কবিতার ভাষণ-শিল্প আরও হয়েছে নিখুঁত, অনবদ্য।

'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানটিতে মল্লার সুরের লয় সঞ্চারিত; সেখানে কাব্যছন্দের শৈথিল্য আছে। কবিতায় ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের রূপায়ণে সে হয়েছে আরও সুন্দর। 'আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান' চরণটির 'গান' শব্দটি সুরের ছন্দে দীর্ঘায়িত ক'রে (চমৎকার গমকে) গাওয়া হয়। কবিতার ছন্দে এই গানের চরণটিকে রূপান্তর করা হয়েছে:—আমি তো দিয়েছি। ভরা শ্রাবণের। মেঘমল্লার। গান। ছন্দ-সচেতন কবি তাঁর গানগুলোর বহুস্থলে যে ছন্দ-শৈথিল্য দেখিয়েছেন, সে কি ইচ্ছাকৃত? কবি কোন্ অনিয়ন্ত্রিত সূক্ষ্ম তান-সৌন্দর্যের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন? সংগীতের লয় ঠিক কাব্য-ছন্দের মতো নয়। যদি-ও কবি বলেছেন—'কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে

সেইটেই লয়'। গানের লয়কে কাব্যছন্দের অনেক ওপরে নিয়ে গেছিলেন তিনি। ছেদ, যতি, মাত্রিক কাঠামোর বদ্ধতার বাইরে ছিল সংগীতের লয়। এই লয় কবির মুক্তমানসের দিগ্বলয়। অপরিসীম বর্ণালীর রঙ্‌বেরঙের খেলা। কবির কাছে 'লয়' কথাটির তাৎপর্য ছিল—'এই লয় সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত'। (সংগীতের মুক্তি)।

(ঘ) গানকে গানে পরিবর্তন

পরিবর্তন ও পরিমার্জন-প্রবণতা কবিকে আবার গান থেকে গানের রূপান্তরে উৎসাহিত করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

আমি কারেও বুঝিনে বুঝেছি তোমারে—বেহাগ রাগের গানটি রূপ নিল যে ছিল আমার স্বপনচারিণী (ইন্দিরা দেবী : রবীন্দ্রস্মৃতি পৃ: ১৭)।

অনেকদিনের মনের মানুষ—নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার পাণ্ডুলিপির গান থেকে রূপান্তর : আপন গানের টানে তোমার (২৫, ৯, ১৯২৬)।
পাঠান্তর : গানে গানে তব বন্ধন যাক্ টুটে।

আমার মুক্তি গানের সুরে (১৯, ৯, ১৯২৬)—
পাঠান্তর : আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ (প্রজাপতির নির্বন্ধ),
পাঠান্তর : কার হাতে যে ধরা দেবো হায়।

জীবনে আজ কি প্রথম এলো বসন্ত (নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা); পরিবর্তিত রূপ : জীবনে একি প্রথম বসন্ত এল এল এল রে।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা (৯ আশ্বিন ১৩০৪): ভিন্নরূপ—তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা ইত্যাদি।

ভালো লাগার শেষ যে না পাই; পাঠান্তরে হল : মধুর তোমার শেষ যে না পাই (২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬)।

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী এবং আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে—গান দুটি যথাক্রমে নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য মায়ার খেলার অন্তর্গত আছে একই গানের বিপুল পরিবর্তিত রূপ। দুটিকে পাশাপাশি রেখে এই পরিবর্তনের চেহারা দেখতে পারি।

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলায় গান :

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারিনি—

দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারিনে যুঝিতে।
তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥

গীতিনাট্য মায়ার খেলায় ভিন্নরূপে এই গান :

আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলোসংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এভুবন, পাইনি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমারে পেয়েছি কূল-অকূল পাথারে॥

(ঙ) গানের কঠিন ও গম্ভীর বাণীবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার নৈকট্য-সূত্র নির্ধারণ করতে সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন কিনা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কেননা, গানের বাণীবন্ধে কবিতার শব্দবিভূতি ও ধ্রুপদীচাল অবলীলাক্রমে সৃষ্টি করেছেন তিনি। গান ও কবিতার ভাষণ-শিল্পের পার্থক্য তিরোহিত হয়ে গেছে সেখানে। কিছু দৃষ্টান্ত :

: হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর।
হোক জটা নিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম—

: পিনাকেতে লাগে টঙ্কার
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্র ভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার।

: জয় ভৈরব জয় শঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর

জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধন ছেদন জয় সঙ্কট হর,

: নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সমবৃত অম্বর, হে গম্ভীর

: মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধছায়া, নীপকুঞ্জতলে

শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টি জলে।

ফিরে রক্ত-অলক্তক ধৌত পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে,

মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ক কলা সিঁথিপ্রান্তে জলে।

এ'রকম—মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে, সর্ব-খর্বতারে দহে, আহ্বান আসিল মহোৎসবে ; ধ্বনিল আহ্বান, ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব, প্রচণ্ড গর্জনে আসিল, ইত্যাদি অনেক কাব্যসংগীতের দৃঢ় কঠিন সংবদ্ধ ভাষণ-শৈলীতে কবিগুরুর স্বর-সংযোজন ক্ষমতা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই।

গানের কাব্য-ভাষণ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা করেছি এই গ্রন্থের পূর্ব ধারায় ; সেখানে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্ক-নির্ণয়ে কবিগুরুর বিস্ময়কর প্রকরণ-শৈলীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সৌন্দর্য লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই এখানে পুনরাবৃত্তি না ক'রে আমরা এই প্রসঙ্গের ছেদ টানতে পারি।

নির্দেশপঞ্জী

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৮৭

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা : সংগীতচিন্তা পৃঃ ১২

৩। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—সংগীতচন্দ্রিকা পৃঃ ৩

৪। রবীন্দ্রনাথ—সংগীত ও কবিতা : সংগীতচিন্তা পৃঃ ২৪

সংগীত ও কবিতার প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সৃষ্টি সম্পর্কে জনৈক বিদেশী পণ্ডিতের উক্তি—"The mingling of music and poetry is a notable feature in the earlier stages of evolution in every language. Poetry and music were born as twins in womb of nature. দ্রষ্টব্য : গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ১৬৪

৫। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান পৃঃ ১১৫

৬। রবীন্দ্রনাথ—আমাদের সংগীত : সংগীতচিন্তা পৃঃ ৭৫

৭। Encyclopaedia Britanica, Vol 21-22, Page 880.

৮। Encyclopaedia Britanica Vol. 25-26, P 408

বিটোভেন প্রসঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তী :

"শিল্পের তন্ময়ী গুরু বেটোভেন শব্দধ্যানে একা,

তর্জমা করেন সৃষ্টি মগজের সংগীতের ঝড়ে।
অসম সুষম এক প্রকাণ্ড একক সিম্ফনিতে।"

৯। Encyclopaedia Britanica Vol. 25-26, P 410.

১০। দিলীপকুমার রায়—সাঙ্গীতিকী পৃঃ ১৭৬

১১। স্ট্রাঙ্গোয়েজ বলেন—'Telegu, the most musical language of the south as Bengali is of the North'—Music of Hindustan.

১২। দিলীপকুমার রায়—সাংগীতিকী পৃঃ ১২৩-১২৪

১৩। বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৮৭

১৪। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ বলেন—"For the Production of their full effect an accompaniment of music is indispensable". (Observations on Lyrical Ballads)

১৫। কার্লাইল বলেন—"All speech, even the commonest speech, has something of song in it......Poetry, therefore, we will call musical thought". (The Hero as Poet)

১৬। রবীন্দ্রনাথ—কথা ও সুর : সংগীতচিন্তা পৃঃ ৮৫

১৭-১৮। দিলীপকুমার রায়—সাঙ্গীতিকী পৃঃ ১৩০, পৃঃ ১৬৭

১৯-২০। অরুণ বসু—কাব্যসংগীতের জন্মদাতা (বিশ্ববীণা ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা৹)

২১। রবীন্দ্রনাথ—কথা ও সুর : সংগীতচিন্তা পৃঃ ৮৫

২২-২৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী (৩য়) পৃঃ ২৩, পৃঃ ৯২

২৪। P. Fallon—Calcutta Municipal Gezette, Tagore Centenary Vol. p. 24-25

২৫। বুদ্ধদেব বসু—কবি রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২

২৬। অমিয় চক্রবর্তী—সাম্প্রতিক পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য

২৭। Encyclopaedia Britanica Vol.21-22, P. 880.

২৮। দিলীপকুমার রায়—সাঙ্গীতিকী পৃঃ ১৫৪

২৯-৩০। Encyclopaedia Britanica Vol. 25-26, P. 400 & 877

৩১। Ronald Paecock—Music and Poetry : The Art of Drama P. 121

৩২। ক্ষুদিরাম দাস—চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী পৃঃ ১৪৪

৩৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কথা ও সুর পৃঃ ৬৫

৩৪। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়) পৃঃ ৫০৪

৩৫। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প : রবীন্দ্রনাথ

৩৬। বুদ্ধদেব বসু—সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৫০

———

নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর সংগীতচেতনা, বাংলা কাব্য-সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ

এক

ইতিহাসের ধারায়

রবীন্দ্রসংগীতচিন্তার পর্যালোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে ভারতীয় শাস্ত্রীয় রাগসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত এবং পরবর্তীকালের রাগাঙ্গ তানপ্রধান গীতরীতির (খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরি, তেলেনা ইত্যাদি) দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য ও সংস্কারের সঙ্গে বাঙালীর রসচেতনার ও সাহিত্যের কতখানি সাযুজ্য ও সম্পর্ক, বিচার ক'রে দেখা দরকার।

চর্যাপদ রচনার কাল আনুমানিক নবম শতক। তখন থেকেই বাংলাসাহিত্যের সূচনা ধরা হয়েছে। পুরো প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ধারাটাই ছিল গীতনির্ভর। এই পদসাহিত্যের ধারা ও সাংগীতিক চেতনার ধারা বাংলাদেশে দুটো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে, কিংবা অবিচ্ছিন্ন অবস্থা নিয়ে বিরাজ করতো কিনা, এটা স্পষ্ট ক'রে বলা যাবে না আজ। যেমন যাবে না বাঙালী-জাতির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসকে সঠিক ক'রে বলা। ইতিহাসে বলা হয়েছে, বাংলার আদি-আর্যেতর (অষ্ট্রিক, মোঙ্গলীয় ইত্যাদি শাখা) জাতির সঙ্গে আর্যাবর্তের সুসভ্য আর্য জাতির মিশ্রণে একটি শংকরজাতি হিসেবেই আধুনিক বাঙালীজাতির সৃষ্টি ও বিকাশ। এই বাঙালীর চিত্তচেতনা ও রসসংস্কারে যে জটিল বিমিশ্র ব্যাপারগুলো অবস্থান করেছিল, তার থেকে কোন সহজ মৌল ও

বিশিষ্টতার অনুসন্ধান সম্ভব ছিল না। বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিতেও দেখা যায় বিচিত্র অস্পষ্ট প্রভাব ও প্রেরণা। নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে এ জাতির মানসিকতা, রসসংস্কার, কাব্যচেতনা ইত্যাদির বিচার করা চলে। বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস নানা কারণে তমিস্রাময় হ'লেও বাংলার বীরসন্তানগণ শশাংক, বিজয়সিংহ, আদিশূর, সেন ও পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ এবং বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত কবি কলাবন্তগণকে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলার ইতিহাস প্রোজ্জ্বল। জাতির রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক। চর্যাপদ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে আপাততঃ বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর মানসিকতা ও সময়ের সংবাদ পাওয়া গেল। ফলে সেইসঙ্গে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তথ্যগত সন্ধানও শুরু হতে পেরেছে।

গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে সংগীতচর্চার বিকাশ হয়েছিল, প্রধানতঃ উত্তর ভারতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যের অনুসৃতিতে। ডঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁর Early History of India বইতে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য তথ্যের নজীর খাড়া করেছেন। বাংলাদেশের সংগীত সম্পর্কে-ও এই রকম তথ্যগত স্বীকৃতি সেখানে রয়েছে। এছাড়া অনেক মনীষী গবেষক বাংলার বিভিন্ন দিকের মূল্যবান ইতিহাস রচনা করেছেন। সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ক তথ্যও তাঁরা বিবৃত করেছেন। সেসব তথ্য অনুসরণ ক'রে ধারণা করা যায় যে, খুব গোড়ার দিকে বাংলাদেশে উচ্চতর-সাহিত্য (সংস্কৃত) প্রথমে উচ্চ-বর্ণের আওতা ছাড়িয়ে সর্বসাধারণ্যে পৌঁছতে পারেনি। গানও তেমনি ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠদের নিজস্ব সম্পদ। গানের উচ্চাঙ্গ রীতির ধারা উচ্চসম্প্রদায়ের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে প্রথমে প্রচার লাভ করে। তারপর প্রস্থত হয় হিন্দির মাধ্যমে। অন্যদিকে সর্বসাধারণের মধ্যে সাংগীতিক চেতনার বিকাশ এতটা পরিশীলিত না হলেও নানাপ্রকার পূজাপার্বণ, অনুষ্ঠান ও ব্যবহারিক জীবনসূত্রে লোকায়ত সাংগীতিক রীতি নীরবে রূপ নিয়ে চলেছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ ও দেশজ লোকসংগীত—এই দুটো ধারাই মৌল বিশিষ্টতা নিয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। এবং এই দুটো ধারাই যে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের উপর নির্ভর করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সংগীত-রীতির আদি ও বিশিষ্ট রূপটি দীনেশচন্দ্র সেনের একটি দীর্ঘ বক্তব্য থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

"সংগীত যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেন প্রমুখ সংগীতাচার্য-

গণের দ্বারা রাগরাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাংলাপল্লীতে সেই সুর পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুযুগে এদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে সংগীতচর্চা বিশেষরূপেই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাগরাগিণী রাজসভায় মূর্ত হইত বলিয়া কথিত আছে।...জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্বদাই গুর্জরী, খাম্বাজ, গান্ধার, প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। বঙ্গদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটি নির্দিষ্ট কায়দা বা বিধানের বশবর্তী হইয়া চলিতে রাজি নহে। জনসাধারণ সংগীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য করিয়া লয় নাই। তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল, এই সুর মনসামঙ্গলে (বেহুলা কাব্যে) বংগাল রাগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ। এই সুর কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহা খাঁটি পল্লী-হৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। বোধহয় এটি দেখানো যাইতে পারে যে,—রেনেটি, গড়নহাটি, মনোহরসাই প্রভৃতি কীর্তনের সুর এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সৃষ্ট। আমি জানিনা, মনোহরসাই কীর্তনের মতো এরূপ প্রেমের উন্মাদনা জগতের আর কোন সুরে আছে কিনা; কারণ উহা প্রেমের উন্মাদেরই সুর,—সে সুর বিজ্ঞান-সম্মত কিনা জানিনা। যদি না হয়, তবে এই সুরকে বুঝিবার জন্য নববিজ্ঞান সৃষ্টি করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙালী এই সুরের মোহে পাগল হইয়া আছে। যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল। এবং বাঙ্‌লা কীর্তনের সুরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল।”[১]

বস্তুতঃ গীতগোবিন্দই বাংলাদেশের সর্ব প্রথম লোকায়ত সংস্কৃত সাহিত্য। কয়েক শতাব্দীর বর্ণাভিমানীদের সংকীর্ণতা ও সাহিত্যাভিমান নস্যাৎ ক'রে দিয়ে কবি জয়দেব মানবিক বিষয়, ভাব ও সরল কোমল বাক্‌শিল্পের সৌষম্যে রচিত গীতগোবিন্দকে সাধারণ শ্রেণীর বাঙালীদের হাতে তুলে দিলেন। ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য-রস-স্রোতের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাঙালীর চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করেছে। প্রধানতঃ কাব্যরস ও গীতরস এই যুক্ত প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী বিপুল অনুপ্রেরণা লাভ করে। পরবর্তী বহুকাল ধরে গীতগোবিন্দের বিষয় ও ভাষার সরাসরি প্রভাব ও গায়নরূপ পদ্ধতির প্রভাব বাঙালীদের ওপর বর্তেছে। এটা বোধ করি অস্বীকার করা যাবে না যে, উচ্চতর গীত-পদ্ধতির সঙ্গে দেশজ লোক-সংগীতের গায়নরূপের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে গীতগোবিন্দের

ভূমিকা আছে। তারপর বাংলার দেশজ সাহিত্য ও সংগীত মৌলিকত্বে ও নিজস্বতায় বিকাশলাভ করতে করতে কয়েকটা শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে বিশ্বাত্ম রবীন্দ্রপ্রতিভায় লীন হয়ে গেছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতপদাবলী হয়েও উৎকৃষ্ট কাব্য। বইটি বাঙালীর রসচেতনার একান্ত উপাদান হিসেবে আজও সমাদৃত। এক হিসেবে গীতগোবিন্দকে বিশিষ্ট কাব্যসংগীত বা গেয়-সাহিত্য বলা চলে। এ'গানে যেসব রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, যেগুলো সঠিক মার্গরীতি-সম্মত নয়। কথার সঙ্গে সুরের সন্নিপাত যা বাংলার দেশীসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, গীতগোবিন্দে তা লক্ষীভূত হয়। গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গানে বারোটি রাগের উল্লেখ আছে। যেমন: গুর্জরী ৫, বসন্ত ৩, রামকিরী ৩, মালব ২, কর্নাট ১, দেশ ১, দেশবরাড়ী ৩, গুণকরি ১, ভৈরবী ১, বরাড়ী ২, বিভাস ১, মালবগৌড় ১। এই রাগবিশেষের গায়কীকে কেউ কেউ উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল গায়ন-রীতির[২] সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাচীন ধ্রুপদ-রীতির বাণীসৌকর্য এবং ভাব ও ভাষার সঙ্গে অনবদ্য রাগরাগিণীর সুর যুক্ত থাকা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দ অনেকটা দেশীয় লোকসংগীতের ধারায় সম্পৃক্ত ও পুষ্ট ছিল, একথা আবার কেউ কেউ মনে করেন। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বাঙালীর জাতীয় রসসংস্কার ও লৌকিক গাতি-প্রবণতা থেকে গীতগোবিন্দের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেছেন—"চর্যাপদের মধ্যে বাঙালীর সংগীতরচনার যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ সে যুগের সমাজের বিশিষ্ট লৌকিক সুরের উপরেই আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারই ধারা গীতগোবিন্দ এবং ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মধ্য দিয়া-ও অনুসরণ করা হইয়াছে।"[৩] ডঃ ভট্টাচার্যের মতে বাঙালীর লৌকিক রসসংস্কার ও জীবনবাদ প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ও গীতরীতিকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচীনসাহিত্যের সঙ্গে জনসংগীতের ধারার সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—"জনসংগীতের প্রবাহ সে-ও ছিল বহু শাখান্বিত। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গনে যেমন ছোটবড়ো নদীনালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানারূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোন

দেশে আছে কিনা জানিনা।"[৪] এই দেশজ রসচেতনারই সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে গীতকার রবীন্দ্রনাথকে মনে করতে পারা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে রাগরাগিণীর প্রয়োগ ও বিন্যাস যে-ভাবে হয়েছে, তাতে শুদ্ধ রাগরাগিণীর অনুসন্ধান চলে না। কেননা তাতে দেশজ ও পাশ্চাত্য গীতরীতির অনুপ্রেরণা সংযুক্ত হ'য়েছে। তাছাড়া, সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য—সুর ও বাণীর অর্ধনারীশ্বর-রূপ হলো রবীন্দ্রসংগীত। এ প্রসঙ্গ পরে আমরা আলোচনা করেছি। এখন বাংলাসাহিত্যের সাংগীতিক চেতনার সাধারণ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত হওয়া দরকার।

চর্যাপদ বা চর্যাগীতি যদিও সহজযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধদের সাধনপদ্ধতি ও তন্ত্রাচার-নির্দেশ হিসেবে প্রচলিত, তথাপি সেগুলি যে সংগীতানুষঙ্গ ও জীবন-রসে জারিত তা বোঝা যায়। এবং চর্যাপদ-এর কিছু কিছু ধ্বনিময়তা ও প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদের কোন কোন গানে ভাব ও ভাষার চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে। চর্যাপদের ভাষা কোন কোন স্থলে কোমল ও কমনীয়। কোন কোন স্থানে গীতাত্মক অনুষঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে। সুজ লাউ সসি লাগেলি তন্তী (১৭ নং)। ফোইরে বংশী বাজিরে বীণা (১৭ নং)। এই পংক্তিগুলোতে তন্ত্রী, বাঁশি, বীণা প্রভৃতি শব্দানুষঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে এবং নানাদিক থেকে বোঝা যায় যে, সমকালীন জনজীবনে সংগীতের প্রভাব প্রকট ছিল। চর্যাগীতির রচনা ও গায়ন-পদ্ধতি সংগীতরত্নাকর ও বৃহদ্দেশী প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দের মতই বিভিন্ন ছন্দ ও রাগরাগিণীর প্রয়োগ সেখানে দেখা যায়।

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলাগানের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার গান হিসেবে বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা নেই। গায়নরীতিকে মুখ্য না ধ'রেও সাহিত্য হিসেবে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য চিরকালের জন্য উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণবভাব পরিমণ্ডলের কবি ও গীতকারগণ এবং চৈতন্য পরবর্তীকালের গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় রামানন্দ, শশিশেখর, নরহরি সরকার, নরোত্তম দাস, বলরাম দাস প্রমুখ চৈতন্য-প্রভাবিত গীতকারগণ ব্রজবুলি ও বাংলাভাষায় ললিতকোমল বৈষ্ণব-পদগান রচনা ক'রে বাংলাদেশে এক বিশিষ্ট গায়কী-ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। এবং অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত চক্রবর্তী

প্রমুখ সাধকগণ শাক্তসংগীত রচনা ক'রে কাব্যগীতির ধারারই বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটালেন। তারপর কবিগান, আগমনী-বিজয়া ইত্যাদি জনসংগীতের ধারা অখণ্ডভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। কালের সঙ্গে সমাজের গতি-প্রকৃতির রদবদল হয়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলাসাহিত্যের ও গীতধারার গতি ও পরিবর্তন সেভাবেই নির্ণীত হ'তে দেখা যাবে।

বাংলার মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত-পাঁচালী প্রভৃতি এবং মঙ্গল-গীতের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসার ভাসান, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি লৌকিক গায়নরীতির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছে। আবৃত্তি, কথকতা ও সামান্য সুরের সংযোগে এই গাথা ও পাঁচালীগানগুলো দীর্ঘকাল বাঙালীর চিত্তহরণ ক'রে এসেছে। এভাবেই আমরা পদ, পদাবলী, কীর্তন, মঙ্গল, বিজয়গান, পাঁচালীগীত, নাটগীত ইত্যাদি আভিধানিক শব্দের মাধ্যমে বাংলাগানের প্রকৃতি ও রসরূপ সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারি। উৎকৃষ্ট ভাব ও রসযুক্ত পদসমষ্টিকে তাল বা তালহীন আলাপযোগে সুরে গান করা হতো। সমকালীন পদসাহিত্যগুলোর মধ্যে মহাজনগীত বলতে বোঝাতো প্রধানতঃ সুন্দর গায়কীযুক্ত বৈষ্ণবপদসাহিত্যকে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদগানগুলোতে মার্গ ও দেশীয় রাগরাগিণীর অনেক নাম দেখা যায়। যেমন—কামোদ ধানসী সিন্ধুড়া তুড়ি তিরোতা বরাড়ি শ্রীরাগ সুহই সুহিনী তিরোতা-ধানসী ভাটিয়ারী মল্লার কানাড়ী পঠমঞ্জরী মালব মঙ্গল সওয়ারী দাসপাড়িয়া বিহাগ্ড়া ইত্যাদি অনেক নাম। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদগানে-ও এসব রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের কিছু কিছু বর্তমানে অপ্রচলিত। তৎকালীন সংগীতরীতিতে দেশজ রাগানুশীলন যে যথেষ্টই ছিল, তা এ'সব তথ্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের একটি বক্তব্য এখানে উদ্ধার করি—"তাহ'লে বুঝতে হবে বাংলার সংগীত পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। অতএব প্রশ্ন হলো—বাংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কতদিনের কয় পুরুষের ঐতিহাসিক পরিমাটি বুঝব? উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কি ছিল জানি না, কিন্তু গীতগোবিন্দে, পদাবলীতে, বাঘা বাঘা রাগরাগিণীর নাম বসানো আছে। ডঃ প্রবোধ বাগচী বলেন, আরো আগে ছিল, হয়তো নামকরণ পরে হয়েছে।"[৫] প্রাচীন বাংলা-লোকগীতির শ্রেষ্ঠ বিষয়টি ছিল কীর্তন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথোপকথন ও নাটকীয় ভংগীর গানে কীর্তনের গায়কী সঠিকভাবে অনুসৃত ছিল কিনা জানা

নেই। কিন্তু তাতে রাগরাগিণীর প্রয়োগ ছিল, যেমন ছিল গীতগোবিন্দে। যশোগাথা ও মাহাত্ম্য-কীর্তির জন্যে কীর্তন, সংকীর্তন, নামসংকীর্তন, নগর-কীর্তন ইত্যাদি তৎকালে সমাদৃত পদ্ধতি ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-পদসাহিত্য ভাব ভাষা ধ্বনি ও ছন্দ ইত্যাদি গুণগত বৈশিষ্ট্যে ও সাংগীতিক প্রবণতার সাযুজ্যে প্রথাগত গীতিসাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিটি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন—

"চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। এই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধাছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনীর পুনঃপুনঃ আবৃত্তি আর চলিল না, বাঁধন ভাঙ্গিল।··· বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই সেই বৈচিত্র্য-চেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়।"[৬]

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কবিতা ও সংগীতের সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হ'লো বৈষ্ণবপদাবলী। শাক্তপদসাহিত্য সম্পর্কে-ও সেই কথা। সহজ সরল ভাষায় ও দেশজ সুরের গায়কীতে শাক্তপদগান একসময় বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, তার প্রভাব ও প্রেরণা এখনও কমেনি। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যয়সাধ্যচর্চা চলতো ধনশালীদের বৈঠকখানায়, তার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব গ্রামের জনজীবনে পৌছায়নি। আর ছিল জনসংগীত—যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, আগমনী-বিজয়াগান প্রভৃতি। চৈতন্যদেবের অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভাব বাংলাদেশের সংগীত ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেইসঙ্গে বহির্বঙ্গীয় প্রভাবও এসেছিল এখানে। সাধককবি তুলসীদাস সুরদাস মীরাবাঈ নানক কবীর প্রমুখ এবং মিথিলার কবি বিদ্যাপতি প্রমুখ বাঙালীর সাহিত্য ও সংগীত-চেতনাকে প্রভাবিত করেছিলেন। ফলে বাংলা-পদসাহিত্যে ও সংগীতে হিন্দী, ব্রজবুলি প্রভৃতি ভাষার ও গীতের প্রভাব পড়ে। এভাবেই বাংলাদেশের সাহিত্যচেতনায় উচ্চাঙ্গ ও দেশী সংগীতের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে।

গীত, বাদ্য, নৃত্য—এই তিন নিয়ে তৌর্যত্রিক সংগীতের পূর্ণ রূপায়ণ হ'য়েছিল বৈষ্ণব-পদকীর্তনে ও বাউলগানে। রাগ, বাদ্য, তাল ও নৃত্যভঙ্গিমা ছিল এইসব গানে অপরিহার্য। পরবর্তীকালে এই কীর্তনকে যথেষ্ট আভিজাত্য দান করলেন নরোত্তম দাস। ষোড়শ শতকে খেতরীর বৈষ্ণব-মহোৎসবে কীর্তনের ধ্রুপদী সাহিত্যগুণের সঙ্গে অভিজাত গায়কীরীতির সমন্বয় সাধন ক'রে নরোত্তম দাস ঠাকুর বাংলাগানের নতুন সমৃদ্ধি আনলেন। নরোত্তম দাসের গরাণহাটি গায়নপদ্ধতির প্রসন্নগাম্ভীর্য, অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা ও রসস্ফূর্তি জনসাধারণের মনে বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছিল। অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়-ও তাকে বরণ করেছিল। পরবর্তীকালে এই রীতির অনুসরণে ভিন্ন চারটি আঞ্চলিক কীর্তনগায়কী সৃষ্টিলাভ করে—মনোহরসাই, রেনেটি, মন্দারনী ও ঝাড়খণ্ডী। এই গায়নরীতিগুলো গরাণহাটি কীর্তনের সমুন্নত মহিমা পায়নি, না ভাষা-গৌরবে, না স্বরবিন্যাসে। তারপর অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে কবিগান, ঢপকীর্তন, টপ্পা, পাঁচালী, বাউলগান প্রভৃতি বিকাশলাভ করে। শ্রীধর কথক, দাশু রায়, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত প্রমুখ যুগসন্ধির কবি ও গায়কগণ বাংলাদেশের নবযুগ-সম্ভাবনার প্রত্যুষে দাঁড়িয়ে নান্দীমুখ রচনা করেছিলেন তাঁদের সংগীত দিয়ে। বাংলাকাব্য-সংগীতের সে ছিল এক নতুন যুগের বৈতালিকী।

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশ ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রেরণায় যুগ-কালান্তরে প্রবেশ ক'রল। বাংলাদেশের দুর্বল ও গতানুগতিক সমাজরাষ্ট্রের সামূহিক পরিবর্তন আসে নবজাগৃতির নতুন মূল্যবোধে। প্রাচীন ছ'-সাতাশ' বছরের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এর প্রভাবে সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে প্রচণ্ডবেগে ও নব বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করে। বাংলাসংগীতের-ও পরিবর্তন এভাবে আসে। পূর্বে বলেছি, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ ছিল সুরে নির্ভর কথকতা ও লৌকিক সুরে গীতনির্ভর। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, রামায়ণ, ভারত-পাঁচালী, মনসার ভাসান প্রভৃতি আবৃত্তির ঢঙে ও সুরে প্রচারিত হত কমবেশী। উনবিংশ-শতকের প্রথমপাদ থেকে বাংলা গদ্যরচনার চেষ্টা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গীতিসাহিত্যধারা তার সাবেকী ঢঙ্ নিয়ে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেল। কেবল কবিসংগীত, পাঁচালী, টপ্পা ও গ্রাম্য সংগীতের মধ্যে প্রাচীনের সংকুচিত অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছিল কিছুদিন। প্রাচীন বাংলাগানে কবিতা ও সুরের যে সম্পর্ক ছিল, তা সাময়িকভাবে যুগসন্ধির

ভাববিপ্লবের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলো ; অর্থাৎ পঠনীয় কবিতা ও সুরে-গেয়-গীত স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়ে ভিন্ন শাখায় বিকাশলাভ করেছে। কিছুকাল পরে আবার সেই সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের হাতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টপ্পাগানে, হরু ঠাকুর রামবসুর কবির গানে সংগীতে এই যুগল মিলনের ধারা"। তিনি আরও বলেন—"কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত। কথা তাতে যতই থাক্, কীর্তন তবুও সংগীত। অথচ কথাকে মাথা নিচু করতে হয়নি। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদকে কাব্যহিসেবে তুচ্ছ বলবে কে।"[৭] কিন্তু আধুনিক কালের জীবন-মানসিকতায় অন্তঃপাতী প্রেরণায় এবং বাংলাগদ্যের প্রচণ্ড সমৃদ্ধির ফলে প্রাচীন গীতিসাহিত্যের ঐতিহ্য, সংস্কার ও প্রভাব ক্ষীণ হয়েছে। নবযুগের গীতিকবিতা আর শুধুমাত্র গান হিসেবে লেখা হয়নি। নতুন ভাব, ভাষা ও গঠন-বৈচিত্র্যে মনোময় কবিসত্তার প্রকাশের ও রূপায়ণের দায়িত্ব নিল গীতকবিতা, গীত নয়। বাংলাদেশ গান হারিয়েছিল সেদিন।

কেন হলো এই ঘটনা? ব্যাপারটি বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন—"গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। এই দুইটি পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি তিনিই গায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।"[৮] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলছেন—"য়ুরোপীয় সাহিত্যে এক শ্রেণীর কবিতাকে লিরিক নাম দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই বোঝা যায় সেগুলি গান গাবার যোগ্য, এমনকি কোন এক সময়ে গাওয়া হত। মাঝখানে ছাপাখানা এসে শ্রাব্যকবিতাকে পাঠ্য করেছে। বর্তমানে গীতিকাব্যের গীতি অংশটা হয়েছে উহ্য।...এখনকার গীতিকাব্যে অশ্রুত সুর আর পঠিত কথা দুইয়ে মিলে আসর জমায়।"[৯]

বাংলাসাহিত্য থেকে বাংলাগান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিল স্বাভাবিক-ভাবে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে। কিন্তু সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাসংগীতের ধারার সমৃদ্ধি হতেও পারতো, কিন্তু তা হয়নি উপযুক্ত কলাবন্ত বা প্রতিভাধর গীতিকারের অভাবে। তাছাড়া, বাংলাগান কবিতার নির্ভরতা ছাড়া ঠিক দাঁড়াতেই পারে না, সেজন্যও তার প্রগতি হয়নি। নতুন-সৃষ্ট উচ্চতর গদ্যসাহিত্যের পাশে পাশে সেদিন প্রায় সংকুচিত বৈশিষ্ট্যে দেশীসংগীতের ক্ষীণধারা সামান্যই বয়ে চলেছিল কীর্তন, বাউল, মুর্শিদি, আগমনী-বিজয়া, আঞ্চলিক লোকগীত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, গম্ভীরা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ থেকে আচারে আহারে শিক্ষায় ধর্মে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব সমন্বয়ের কাজ চলেছিল, এর ফলে নবসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। বঙ্গীয় নব্যসংস্কৃতির অন্যতম প্রথম পাদপীঠ হয়েছিল সেদিনের কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার। শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত, কলাচর্চা ও আভিজাত্যগৌরবে বাংলাদেশের নবজীবন-সম্ভাবনা এখানে পরিপূর্ণভাবে ও উজ্জ্বলতায় রূপায়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সেই নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। ঠাকুরবাড়ীর কৃতী সন্তানদের প্রয়াসে বাংলাসাহিত্য ও সংগীতের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সংগীত-গবেষণা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের দেশী-বিদেশী সংগীতচর্চা, কথা ও সুর নিয়ে সংগীতচর্চা, ক্লাসিক্যাল সুরসাধনা, কাব্যগীত ও নাট্যগীতরচনা, নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মাধ্যমে কবিতা ও সংগীতের সম্পর্ক নতুন ক'রে প্রতিপন্ন হতে পেরেছে। ষোড়শ শতক থেকে বাংলা-সাহিত্যে গান ও কবিতার পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতক থেকে বিদেশী সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাব এই পার্থক্যকে তীব্রতর করেছিল। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিচর্চা পুনরায় বাঙালীর সাংগীতিক রসচেতনাকে অর্থাৎ গীতিকবিতা ও গানের অন্তঃপাতী সংযোগধারাকে পুনরায় যুক্ত ক'রে দিয়েছে। এবং "রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই যুক্তবেণীর প্রবাহ, তাঁর গানে রূপকল্পের সেই প্রবাহের সাগর-সঙ্গম। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় রূপকল্পের ঐশ্বর্যে ও বস্তুভাবের মহিমায়, বাংলাসাহিত্য নবজন্ম লাভ করিল; তাঁহার গানের বেদনায় সুরের প্লাবনে যেন দিগন্ত হারাইয়া গেল।"[১০]

বাঙালী কবিকলাবন্তরা যা কোনোদিন ভাবেন নি, বিদেশী পণ্ডিত

স্ট্রাঙ্গোয়েজ সাহেব সেটা বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে বাংলা ও তেলেগুর মতো এত সুকোমল, সুললিত ও সাংগীতিক কমনীয় ভাষা আর নেই। বাঙালী গীত-শিল্পিগণ হিন্দুস্থানী গানের সুর-বিস্তারকেই গীত-সাধনার উপায় হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। সুরে তানলয়ের ওস্তাদী কৌশলকেই তাঁরা প্রকৃত সংগীতচর্চা ভেবেছিলেন। বাংলার কাব্য-সমৃদ্ধ দেশীগানের গুরুত্ব তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি, অথবা সেসব রচনাকে তাঁরা গ্রাহ্যই করেননি। হয়তো সেজন্য গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবপদ শাক্তপদ ও গরানহাটি কীর্তন ইত্যাদি মূল্যবান গায়কীর বিপুল ধারার অনুশীলন ও অনুবর্তন থেমে যায়। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমকালীন বিশিষ্ট কবি গায়কদের আবির্ভাবের ফলে অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষা বাংলাতে প্রকৃতপক্ষে কাব্যসংগীতের যুগ এসে গেল। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ওস্তাদী গানের আমলে দাঁড়িয়েই নিজস্ব দূরদৃষ্টির দ্বারা মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলাদেশে কাব্যসংগীত নাট্যসংগীতের যুগ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর কথা আজ সত্য হয়েছে, বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে বর্তমানে কাব্য ও নাট্য-সংগীতের প্লাবন এসেছে বলা যায়। নির্দ্বিধায় বলতে চাই, এই যুগের সর্বোত্তম সৃষ্টি হলো রবীন্দ্রকাব্য-সংগীত; কাব্য ও সুরের যুগলমিলনের এক অনন্য অতুলনীয় ও অসাধারণ নিদর্শন।

প্রাচীন বাংলার গীতিচর্চা প্রধানতঃ দেশীয় ধারায় প্রবাহিত ছিল, নৃত্য বাদ্য কথকতা ও সুর সংযোগে তারা প্রচারিত ছিল। গীতগোবিন্দে বড় বড় রাগ বসানো হয়েছে। বৈষ্ণব-কীর্তনে মালব, মুখারি প্রভৃতি এবং শাক্তগীতে মালসী, খাম্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিণীর সংযোগ দেখা গেছে। কিন্তু এই নতুন যুগের কাব্যসংগীতে হিন্দুস্থানী, দক্ষিণী বা কর্নাটি রাগরাগিণীর সুর ও দেশীয় সুরবিন্যাস কাব্যকথার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এবং এর পেছনে আছে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অবদান। দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীগানে উচ্চাঙ্গ অভিজাত সুর সংযোজন করলেন। তাঁর বহুগান সুর ও ভাষার গৌরবে মূল্যবান।

তাঁর বিখ্যাতগান—'হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি'—ঝাঁপতালে জয়জয়ন্তীরাগে অসামান্য ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। হরুঠাকুর ও রামবসুর কবির গান, রূপচাঁদ পক্ষীর বাউল অঙ্গের গান, মধুকিন্নরের ঢপকীর্তন, শ্রীধর কথকের প্রেমগীতি ও টপ্পা, কালি মির্জার সরল গান, রামনিধি গুপ্তের হিন্দী-ভাঙা টপ্পাগান বাংলা কাব্য-সংগীতের প্রথম যুগের মূল্যবান সৃষ্টি। অনেকে

নিধুবাবুকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন—"নিধুবাবুর হাতেই একালের মানুষের সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আত্মভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। আধুনিক গীতিকবিতার পূর্বাভাষ নিধুবাবুর টপ্পাবিহারী কাব্যসংগীতের মধ্য দিয়েই সূচিত হল।"[১১]

ডঃ অরুণ বসু বাংলাকাব্যসংগীতের জন্মদাতা হিসেবে নিধুবাবুকে মূল্য দিয়েছেন। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীতের সঙ্গে বাংলা কাব্যসংগীতের সংযোগ ঘটিয়ে দেবার কৃতিত্বে নিধুবাবুর টপ্পার গুরুত্ব স্বীকৃত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেন—"হিন্দুস্থানী টপ্পার তিনি (নিধুবাবু) এক বাংলা রূপায়ণ সাধিত করিয়া বাংলার সংগীতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিলেন। হিন্দুস্থানী ঢঙ্ ইহাতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া ও বাংলার লৌকিক সুরের ধর্ম ও মেজাজ ইহাতে তিনি আরোপ করিলেন, তাহাতে ইহা অনুশীলন সাপেক্ষ এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের রূপ গ্রহণ করিলেও, সে যুগে বাঙালী রসিকের চিত্ত অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইল। তারপর হইতে ক্রমাগত হিন্দুস্থানী বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সংগীত বাংলাদেশে নানাভাবে প্রচার করিতে লাগিল।"[১২]

নিধুবাবুর গানের প্রকৃতি সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—"গানগুলি প্রায় অতিসংক্ষিপ্ত, সেই স্বল্পাক্ষরা গীতিকার প্রত্যেকটিই একটি সমগ্রভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষুদ্র-গীতিগুলি বিয়োগান্ত করুণা ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতায় সার্থক হইয়াছে।"[১৩] নিধুবাবুর গান সমকালীন বাংলা গীতিকারদেরও প্রভাবিত করেছিল। দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন যে, ভগিনী নিবেদিতা নিধুবাবুর গান অত্যন্ত পছন্দ করতেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথের উপরও নিধুবাবুর গানের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিধুবাবুর গানের ভাষা-বৈশিষ্ট্য এমন কিছু ছিলনা; তবে তা হিন্দী-ভাঙা সুরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। যুগসন্ধির জটিল সময়ের মানুষ হয়েও চারিত্রিক বহু বিশিষ্টতার জন্য দীর্ঘজীবী নিধুবাবু তৎকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। হিন্দীগীত ও রাগরাগিণীতে বিশেষজ্ঞ হয়েও বাংলা ভাষার ও বাংলা গানের জন্য ছিল তাঁর উৎকণ্ঠা—'নানান্ দেশে নানান ভাষা, বিনা স্বদেশীয় ভাষা মেটে কি আশা?' (গীতরত্ন ৯৮)। ঈশ্বরগুপ্তেরও অর্ধশতাব্দী পূর্বে জন্মলাভ ক'রে তিনি স্বদেশী ভাষায় মানবমুখী আধুনিক কাব্য-ভাবনার সূচনা করেছিলেন। প্রচুর রচনা করেছিলেন তিনি। অর্ধসহস্রাধিক গান নিয়ে সংকলন প্রকাশ করেন 'গীতরত্ন' নামে। বাংলা কাব্যসংগীতের সূচনা-পর্বে 'গীতরত্ন' একটি গুরুত্বপূর্ণ

অবদান। নিধুবাবুর রচনার দৃষ্টান্ত :—

১। সোহিনী। জলদ তেতালা। গীতরত্ন ৩৬

বিধুমুখে মৃদু হাসি ভালবাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রসাদ হয় কাতর নয়ান
অধিনী জনেরে কেন কর এত অভিমান।
তুষিতে উচিত তারে এই ত বিধান ॥

২। ভৈরব। ঢিমে তেতালা। গীতরত্ন ১

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এমন, না পারি দেখিতে ॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে।

গানের স্থায়ী এবং একাধিক অন্তরা নিয়ে ভৈরব, ভৈরবী, বেহাগ, ঝিঁঝিট, কাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিণীর সুর সংযোগ ক'রে নিধুবাবু পশ্চিমী বা হিন্দুস্থানী টপ্পাকে পরিবর্তিত ক'রে বাংলা টপ্পা প্রবর্তন করেন এবং বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বস্তুতঃ বর্তমান কাব্যসংগীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে এ'রকম গানের কাব্যভাষা-ভঙ্গিমাকে যথেষ্ট উন্নত বলা চলেনা। কিন্তু কবিতা ও উচ্চাঙ্গের সুরের সন্নিপাতে প্রাথমিক কাব্যসংগীত হিসেবে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এককালে বাঙ্গালী রসিকসমাজ এই নতুন সৃষ্ট টপ্পাগানে বিমুগ্ধ ছিলেন। পরবর্তী মঞ্চযুগের গায়কীকেও এই টপ্পা প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে। বিংশ শতকের প্রথমদিকেও এর প্রভাব অস্পষ্ট নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঔপপত্তিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানানুশীলন ও গীতচর্চা বেড়েছে। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর যে নববিন্যাস (দশথাট বা মেল) প্রবর্তন করলেন, সেই ধারায় বাঙালী কলাবন্তরাও আজ অনুবর্তী হয়েছেন। সৌরীন্দ্রমোহন ও ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, প্রমুখ ও অন্যদিকে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, কৃষ্ণধন বাঁড়ুজ্জে, রাধিকা গোস্বামী, বিষ্ণু চক্রবর্তী, সুরেন মুজমদার, লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ গায়ক ও গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিবর্গ বাংলাগানের পর্যাপ্ত বিকাশ সাধন করলেন। আকার মাত্রিক ও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন হলো, বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। তখন গ্রামোফোনেরও প্রচলন হয়েছে। এই

পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্য-সংগীতের-বিপুল বিকাশ ও সমৃদ্ধি। হিন্দুস্থানী লক্ষ্ণৌ ঘরাণার স্বর-নির্ঝরিণী বাংলাগানে বয়ে আনলেন অতুলপ্রসাদ সেন। দেশী ও বিলাতী সুরের সমন্বয় ঘটিয়ে হাস্যরস ও উদ্দীপনার গান লিখলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রজনীকান্তের ভক্তি নম্র মধুর গান বাঙালীর চিত্ত আর্দ্র করলো। নজরুলের অক্লান্ত প্রয়াস চললো গুরুত্বপূর্ণ সুরবিন্যাসে অজস্র কাব্য-সংগীত রচনায়। বর্তমানে কাব্যগীতি, নৃত্যগীতি, নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদিতে বাঙালীর প্রতিভা নতুনতর ফসল ফলিয়ে চলেছে। গায়ক, কবি, সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে বর্তমানে নিবিড় ভাবগত সংযোগ প্রতিষ্ঠিত। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসংগীতের যে সর্বব্যাপী ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন বাণী ও সুরের যুগল মিলনে, সেই ধারায় বঙ্গীয় কলাবন্তদের প্রতিভা সুনিশ্চিতভাবে বিকশিত হতে পারবে। উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী, উচ্চাঙ্গ ও কালোয়াতি গানের মুখাপেক্ষী হওয়ার অনিবার্য আবশ্যকতা দূর হ'য়েছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

"বাংলার সংগীত ধারায় রামপ্রসাদী বাউল ভাটিয়ালি থেকে আরম্ভ ক'রে সারি জারি কবিগান রামায়ণগান কথকতা পাঁচালী তর্জা যাত্রাগান চণ্ডীরগান মনসার গান প্রভৃতি কোনটাই বাদ যায় নি। আসামের বনগীত, বরগীত ও মণিপুরের কীর্তনেও বাংলার সংগীত ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙালী জাতি তার সক্রিয় প্রতিভায় বিশুদ্ধ সংগীতের অনুশীলন করেছে; একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণকায় বাংলার সংগীত ইতিহাস রচিত হ'লে। বাংলার মাটিতে পরিবর্তনশীল শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর মধ্যেও আবার নবরূপায়ণের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন বসন্ত ভৈরব রামকেলি আসাবরী পূরবী বেহাগ প্রভৃতি, রাগরাগিণীদের রূপের বিকাশে ও রসপরিবেশনে উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি থেকে তারা আজ একটু আলাদা হয়ে পড়েছে। তাহলেও বিচক্ষণ ভাব ও রসদর্শী সংগীত-সাধকদের দরবারে এদের সত্যকারের সমাদর হয়তো রক্ষিত হবে; কারণ বর্জন নীতির চেয়ে গ্রহণ রূপ জাতীয়করণের মূল্যই বেশী, তাতে সম্পদের ভাণ্ডার হয় উজ্জ্বল ও ক্রমবিবর্ধমান।"[১৪]

বাংলাদেশের সংগীত-ঐতিহ্য সম্পর্কে উপযুক্ত ইতিহাস লিখিত হওয়া দরকার। বাংলাসাহিত্য ও সংগীতের যুগবাহী ঐতিহ্যের ধারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যেভাবে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে, তার তথ্য-সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ইতিহাস হয়তো পরে লেখা হবে। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথই একটি

বিপুল ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীতের মধ্যে সেই যুগবাহী ইতিহাসের নীরব অন্তর্গুঞ্জন শোনা যায়। বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে নানা-দিকের বিচিত্র ইতিহাসের অমেয় ধারা-স্রোত মহাসাগর-তরঙ্গে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত।

দুই

রবীন্দ্রসংগীতচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত-আলোচনার বিশ্লেষণ

ভারতীয় রাগসংগীতের যুগবাহী ঐতিহ্যের ও সংস্কারের ক্রিয়া যদি বাঙালীর রসচেতনাকে প্রভাবিত ক'রে থাকে, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক চেতনা সেই ধারারই স্বাভাবিক ফসল কিনা এবং যদি সেই ধারার অনুবর্তী না হয়, তবে রবীন্দ্রসংগীত একটি স্বতন্ত্রতাযুক্ত সম্পূর্ণ আধুনিক ও মৌলিক শ্রেণীর সৃষ্টি কিনা?

এই প্রশ্নের অনুবর্তী হ'য়ে রবীন্দ্রসংগীতের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং রবীন্দ্র-নাথের সংগীতচিন্তার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার। সবার আগে জানা দরকার, রবীন্দ্রনাথ কিছুকম আড়াই হাজার কাব্যসংগীত রচনা করে-ছিলেন,[১৫] যাদের সামান্য কয়েকটি কবিতা হিসেবে গুরুত্ব দিতে না পারলেও সর্বাধিক সংখ্যক গানকে শ্রেষ্ঠ কবিতার মূল্য দিতে হয়; এবং মূল্য দিতে হয় কবিতার চেয়েও বেশী। বিপুলায়তন পর্যাপ্ত সাহিত্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে লোকোত্তর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর সংগীতসৃষ্টি অধিকতর বিস্ময়কর এক অলৌকিক লীলা হিসেবে পরিগণিত হবে। এই সহস্র সহস্র সংগীত-সৃষ্টির পশ্চাতে কবিগুরুর অতিমানুষিক ব্যক্তিত্ব, স্বজ্ঞা ও উপলব্ধির কার্যকারণ-পরম্পরা কতখানি সংযুক্ত, তা লক্ষ্য ক'রে তাঁর সাংগীতিক তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আমরা রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যগত বাগ্‌রূপ ও প্রকরণ-শৈলীর বিশ্লেষণ করেছি বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলোতে বিস্তৃতভাবে। এখানে তারই প্রত্যক্ষ পটভূমিকার পরিচয় উপস্থাপিত হওয়া দরকার মনে করি।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রধানতম পরিচয়, সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম নতুনশৈলীর গীতি-কবিতা। কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ও বিশিষ্ট গায়কীর পরিচয় না রাখেন বা সুর-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হন, কিন্তু যদি তাঁর প্রকৃত রসবোধ থাকে, তবে তিনি রবীন্দ্রসংগীত থেকে অনির্বচনীয় আনন্দ ও রস উপলব্ধি

করবেনই। আর যদি ভাবাজ্ঞান থাকে, তাহ'লে দেখবেন সেই রসাভিব্যক্ত ভাবস্বরূপের বাক্‌প্রকরণে অমেয় অতুলনীয় ঐশ্বর্য-বিভূতি। রবীন্দ্রসংগীত নিঃসন্দেহে বর্তমান সংগীত-দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবিতা ও সুরের যুগল সন্নিপাতে তার রসফলশ্রুতি। সেজন্য কেবলমাত্র স্বরবিন্যাসের কিংবা বাক্‌-প্রকরণ কিংবা সাহিত্যমূল্য নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা অসম্পূর্ণ। যদিও আমরা এই গ্রন্থে বাক্‌শিল্প-সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পেয়েছি, তা সত্ত্বেও বাণীর সঙ্গে সুরশিল্পের ঐতিহ্যবাহী সংস্কার এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগীতচিন্তার আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে ধরে দিতে চেয়েছি।

ভারতীয় রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম পরিচয়। ঐতিহ্য-মণ্ডিত পরিবারের সাংগীতিক আবহাওয়ায় তাঁর জন্ম, তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তের উন্মেষ ও বিকাশ। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"[১৬] ধূর্জটিপ্রসাদকে একটি চিঠিতে লেখেন—"আমাদের বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা হতো সেকথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ীর ছেলে হয়েও আমি কোনোদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়িনি। আড়ালে আড়ালে থেকে যেটুকু শিখেছি, সেটুকুই আমার শেখা।...সংগীত শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত, ধরাবাঁধা রুটিন মাফিক নয়।"[১৭]

এ'ধরণের বহু উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চাঙ্গ বা রাগসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। অথচ গতানুগতিক গীতচর্চা ও গীত সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষালাভ তাঁর ঘটে উঠেনি। কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রতিভার দ্বারা তিনি রাগসংগীতের স্বরূপ, তাৎপর্য ও মহিমা আন্তরিকভাবে বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েও অনুরূপ গান রচনা করতে সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁর প্রথম জীবনে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলোতে রাগভিত্তিক উচ্চাঙ্গের সুরারোপ আছে; কিন্তু রাগাঙ্গ তানপ্রধান সংগীতের সংখ্যা বেশী নয়। অন্যান্য সংগীতের চেয়ে এদের কাব্যগত ঐশ্বর্য কম। প্রথম ও মধ্যজীবন থেকেই তিনি কাব্য ও সংগীতের মিলন সংঘটন, সুরভাঙ্গা, সুরমিশ্রণ ইত্যাদি নিয়ে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের বিশাল সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাসকে

অনেকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান' গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের পাঁচটি স্তর এবং বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিরূপণ করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদও তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতকে কয়েকটি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেছেন। নানাভাবে এঁরা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলোতে রাগসংগীতের বিপুল প্রভাব পড়েছিল কয়েকটি কারণে। পরিবারে রাগসংগীতের চর্চা, উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষকদের সাহচর্য ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সংগীতপ্রীতি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া ব্রহ্মসংগীতে তানের উপযোগিতা সেকালে স্বীকৃত ছিল। আর ছিল নিধুবাবুর বাংলা টপ্পাগানের প্রভাব। এসব কারণে রবীন্দ্রনাথের রাগাঙ্গগানের সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম জীবনে নানারূপ সংগীতানুশীলন নিষ্ঠাসহকারে নিষ্পন্ন হয়েছে। রাগরাগিণীর সূক্ষ্ম ধারণা থাকার জন্য সহস্র সহস্র সংগীত রচনা করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটিতে সুরের প্রয়োগ ক'রে গেছেন তিনি অবলীলাক্রমে।

পরবর্তী বিভিন্ন স্তরে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যগত মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও রবীন্দ্রসংগীতে যে সুরবিন্যাস সংযুক্ত হয়েছিল, তা ভারতীয় রাগসংগীত থেকে আহরণ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গানকে ভারতীয় রাগভিত্তিক সংগীতধারার স্বাভাবিক ফসল বলা যাবে না।[১৮] বরং বলা চলে, বাঙালীর জাতীয় রসচেতনার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে এর সৃষ্টি। যে চেতনা থেকে গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবপদ শাক্তপদ রচিত হয়েছে, তারই দূরতম এবং সার্থকতম পরিণতি হলো রবীন্দ্রসংগীত। প্রাচীন ভারতীয় রাগসংগীতে ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কোনো গানে কথার ঐশ্বর্য প্রায় নেই। সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর প্রমুখের হিন্দীভজন যতখানি কথাভিত্তিক—প্রচলিত হিন্দুস্থানী গানে তা নেই।

বাংলাসংগীতে হিন্দুস্থানী ও দেশজসংগীতের ঐতিহ্য সমন্বয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ এক-অর্থে আধুনিক কাব্যসংগীত সৃষ্টি করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি লিখেছিলেন—"তুমি জানো সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক। অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি, তবে সেটা পাগলামী হয়ে দাঁড়ায়।"[১৯] এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন গীতিরীতির প্রতি বীতরাগ দেখাননি, তাকেই আত্তীকরণ

ক'রে তারই ঠাটের ওপর তাঁর সংগীতের ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বরং প্রচণ্ডতম আধুনিক স্রষ্টা ছিলেন তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোর রচনায়। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"এরূপ একটা দস্তুরভাঙ্গা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এ'দুটি নাট্যলেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠক সমাজকে বারম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।"[২০]

প্রাচীন পদসাহিত্যের মধ্যে গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে আছে। যেহেতু রবীন্দ্রসংগীত কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, সেজন্য কবি-ব্যক্তিত্ব সেখানে নানাভাবে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। প্রাচীন বেদগান, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সাহিত্য ও সাংগীতিক ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। তাঁর বক্তব্য—"ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়।...আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, সুরমাত্র। আর কিছু নয়, ঐটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইশারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা কাহিনী বলিয়া চলে, সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল করিয়া যে মূর্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সংযোগ আছে, এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে। আমাদের বেদমন্ত্র গানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মতো, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মতো। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে, এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।"[২১]

রবীন্দ্রসংগীতে আত্মার নীরব মন্ত্র এবং জীবনের গভীর বিশ্লেষণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে সহজ সরল সুরে বিধৃত আছে সেই বিশ্বরস। সংগীতের রস ও ভাবকে কবি কথার দ্বারা অভিব্যক্ত ক'রে দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে

মানব-মনের বিভিন্ন অবস্থা—সুখ দুঃখ হর্ষ ইত্যাদির সাহায্য থেকে তিনি বাণী ও সুর রচনা করেছেন। সুরের আলাপ-প্রক্রিয়াকে তিনি সর্বস্ব মনে করেন নি। তাঁর মতে গান হলো ভাব ও হৃদয়াতি প্রকাশের সুষ্ঠু উপায় বা পদ্ধতি। প্রভাতের জাগৃতির সমারোহ তাঁর ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলী, টোড়ি, আশাবরী প্রভৃতি রাগাঙ্গের গানে প্রকাশ করলেন। দিনান্তের শান্ত বিদায় বিষণ্ণতা তাঁর পূরবী ইমন ইমনকল্যাণ ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগাঙ্গ গানে প্রকাশিত হলো। বর্ষাবসন্ত ইত্যাদি ঋতুবর্গ, দিনরাত, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, নদী, পাখি ইত্যাদি অজস্র বিষয় এবং মানুষের বিভিন্ন ভাববোধ তাঁর গানে প্রকাশিত। এবং এই সুর ও শব্দের সূক্ষ্ম ঐন্দ্রজালিকতা-সৃষ্টিতে তিনি কতখানি স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সৌভাগ্যবান রসজ্ঞ ও সংগীত-পারঙ্গম শিল্পীরা বুঝতে পারেন।

সংগীতের স্বরূপ : রবীন্দ্র-ভাষ্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান-সম্মত সংগীত-ভাবনা তাঁর রচিত বিচিত্র রচনা ও প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি সেগুলির একটি শোভন সংকলন বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন 'সংগীতচিন্তা' নাম দিয়ে। উক্ত পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তকের সাহায্যে রবীন্দ্রসংগীত চিন্তার কয়েকটি প্রধান সূত্রের সন্ধান করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর সৃষ্টি-কর্মের প্রকৃত ও সর্বোত্তম ভাষ্যকার। কবির প্রিয় শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

"আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সংগীতের অবতার মনে করেন। আপনি কয়েক শতাব্দী পরে ঐরকম পদে অধিষ্ঠিত নাও হতে পারেন। কিন্তু আপনার সংগীত রচনায় ও সংগীতে মুক্তি দানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনো কখনো ধ্রুপদের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনরুক্তি শোনায় বলেই সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার ও কর্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত করতে পারি না। সংগীতের যদি প্রাণ থাকে তবে তার ইতিহাসও থাকবে। যদি তার ইতিহাস থাকে তবে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা—তার সাথে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন রূপ দেবার দায়িত্ব—কখনো কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির ঘুচবে না, তাকে ভেঙে গড়ার কর্তব্য থেকে কোনো স্রষ্টাই অব্যাহতি পাবেন না। আমাদের দেশের বড় বড় রচয়িতা সত্তায় অব্যাহতি পেতে চান

নি। আমাদের সংগীতের ইতিহাস অনুকরণের তমসায় আচ্ছন্ন নয়। সে যাই হোক, কোনো তুলনা না করে বলছি, আপনার সংগীত রচনায় এই দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই।

আমার বিশ্বাস যে, আপনি সংগীত রচয়িতা এবং আপনার রচনার সাংগীতিক মূল্যও আছে। কত বেশী কত কম, কার তুলনায়—এ-সব আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিরে এবং আমার মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার জন্য মেনে নিচ্ছি যে, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন। তা ছাড়া আপনি যতই নিষ্কামভাবে আলোচনা করুন না কেন, সংগীত সম্বন্ধে আপনার মতামতে আপনার নিজের রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত হবেই হবে। উপরন্তু সেই মতামতকে এক হিসাবে আপনার সংগীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বলা চলে। সাহিত্যে অন্ততঃ দেখেছি যে, আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার।"[২২]

বাস্তবিকই একটি গুরুতর ও সর্বস্বীকৃত সত্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের সামূহিক প্রতিভা ও সৃষ্টি-কর্মের প্রকৃত যোগ্য ব্যাখ্যাকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই। একথা ভেবেই অনেক সমালোচক কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-বিচারে কবিরই ভাষ্যগুলোকে সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত-চিন্তার যে বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে ধরা পড়ে, সেগুলি স্পষ্টতঃ কতগুলি যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। কাব্য ও সুরের যুগল সন্নিপাত নিয়ে, কাব্য-ছন্দ ও সুরের ছন্দ এবং সংগীতের রস-সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ক'রে সংগীতালোচনার পথ প্রস্তুত ক'রে গেছেন। সে সব অনুসরণ ক'রেই আমরা সাধারণভাবে কয়েকটি সূত্র নির্ধারণ করতে পারি নিম্নরূপ:

এক: বাণী ও সুরের কতখানি সম্মিলনের সীমা ও সম্ভাবনা থাকতে পারে, কবি তাকে বুঝিয়েছেন কয়েকটি উপমার দ্বারা, যেমন—পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন, গঙ্গাযমুনা মিলন, অর্ধনারীশ্বর রূপ ইত্যাদি। কবিতা ও সংগীত, গীতকার ও সুরকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মূল্যবান তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, এই প্রসঙ্গটি আমরা স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

দুই: ভারতীয় মার্গ ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে সুরের অনির্বচনীয়ত্ব সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ও বিশ্বস্ত। সুর বড় না কথা বড়, এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা কিছুটা স্পষ্টাকারে কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। রাগরাগিণীর

সুরের মধ্যে জীবনের অনুভূতি, উপলব্ধি, এবং নিসর্গের অবস্থার সঙ্গে মানবের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির বাঙ্ময় প্রকাশ হওয়াটা তাঁর মতে সংগীত। ভাবপ্রকাশের জন্য সুর-নির্ভরে অর্থযুক্ত বাণীর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর গানের সুরে রাগরাগিণীর আরোপ তাঁর নিজস্ব ধারণা থেকে এসেছে। রাগরাগিণী সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্যগুলো উদ্ধার ক'রে এই বৈশিষ্ট্যটি বুঝে নেওয়া যায়।

তিন: রাগরাগিণীর স্বচ্ছন্দ লীলায়ণ, রাগ-রাগিণীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ঔদার্য সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে কাব্যসংগীতে রাগ রাগিণীর সুর বসিয়েছেন, ভাবোপযোগী সুর ভেঙেছেন, সুরমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সুরের তান, আলাপ ও ইম্‌প্রভাইজেশন (ধূর্জটিপ্রসাদ যাকে সুরবিহার বলেন) সম্পর্কে প্রচলিত ওস্তাদি রীতি, গায়কী-কৌশল ও তালের বন্ধন তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে তান ও তালের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলে গানকে বাঁধলে গানের প্রাণ থাকে না। কবিগুরু সংগীতের মুক্তি (ভাবে ভাষায় সুরে তালে তানে) বিষয়ে নানাকথা যুক্তিপূর্ণভাবে বলে গেছেন। সুরছন্দের মুক্তি চেয়েছেন কালোয়াতি বন্ধন থেকে, অথচ নিজে ছয়টি নতুন তালের প্রবর্তন করলেন। গানে তাল-প্রয়োগ তাঁর মতে অবাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু ভাবের প্রকাশকে মূল্য না দিয়ে তানালাপে কসরৎ ও তবলায় তালের ওস্তাদি-কৌশল তাঁর মতে গানের ওপর ষ্টীম্‌রোলার চালানো।

চার: শাস্ত্রীয় ও হিন্দুস্থানী, দেশজ লোকসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, সেগুলি প্রধানতঃ তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব থেকে উৎসারিত। ভাব-প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ তাগিদ সংগীতের। কাজেই কথা-সম্পৃক্ত পাশ্চাত্য গান (বিটোফেনের সিম্‌ফনি, হ্বাগনার প্রভৃতির ক্লাসিকাল অপেরা ইত্যাদি) তাঁর কাছে অধিক মূল্য পেয়েছে ; কিন্তু হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ ও তেলেনা গানকে বাণীদৈন্যের জন্য তিনি মূল্য দেননি। বাণী ও সুরের সম্মিলনে বাংলার দেশজ কীর্তনগান তাঁর কাছে ভাবের বেগবান অগ্নিচক্রের মতো। বাউল ও অন্যান্য জনসংগীতগুলোকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের একটি বিচিত্র জটিল

বিমিশ্র ক্রিয়ার রূপ তাঁর সংগীত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। একদিকে দেশীয় লোকগীতির ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুর ও বাণীর জ্ঞানের সংগতি,—সবগুলো মিলেমিশে রূপ পেয়েছে তাঁর গানে। রবীন্দ্র-সংগীত বস্তুতই এক অভিনব সৃষ্টি।

পাঁচ : সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যক্তিগত অনুভব। (ক) তাঁর গানের সুরবিন্যাসের রীতিতে অন্য কারও হস্তক্ষেপ তিনি কেন বরদাস্ত করবেন না, তার যুক্তি তিনি নির্ভর-যোগ্যভাবে খাড়া করেছেন। সুরে তানে ও গানের মুক্তি সম্পর্কে তাঁর তীব্রতম আগ্রহ নানা যুক্তিতে প্রকাশ পেলে-ও নিজের গান সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গানের ভ্যারিয়েশন্‌কে তিনি বাধা দিলেও প্রকৃত সুযোগ্য শিল্পীকে তার এক্‌সপ্রেশন্‌ ও ইন্‌টারপ্রিটেশন্‌-এর স্বাধীনতা তিনি দিতে চেয়েছেন। প্রকৃত-পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের সত্যকারের গায়ক বা শিল্পীর পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের কথায় ও সুরে কোনো অসম্পূর্ণতা বা অসমীচীনতা নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না; সেজন্য অধিক কিছু সংযোজন বা সম্পাদন করার দায়িত্ব আর কারও আছে ব'লে কবি স্বীকার করেন না। ভাবীকালে তাঁর সংগীতের প্রতি কোনো অবহেলার কথা ভেবে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন। সংগীত, চিত্র ও আর্টের মুক্তি ও স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে-ও তিনি নানা গুরুতর যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। (খ) বাংলাগানের বর্তমান দুরবস্থার কারণ নির্ণয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ সেই দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে-ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। (গ) তাঁর কবিত্ব ও গীতসৃষ্টি নির্ণয়ে তিনি নিজের সাংগীতিক ব্যক্তিত্বকে সকলের আগে স্থান দিয়েছেন। কবিতা ও সংগীত তাঁর কাছে জীবনলীলার পরিপ্রকাশ। তাঁর কবিতা ও গানে তিনি বিচিত্রের বাঁশির সুর শুনিয়েছেন। গানই ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রেরণা। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকগুলিতে তথ্যসহ এই কথাটিকে বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আমরাও বিশ্বাস করি। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রধানতম উপাদান ছিল তাঁর সাংগীতিক রসচেতনা, তাঁর সকল সৃষ্টির মূলে প্রধানতম ও অনিবার্য প্রেরণা ছিল সংগীত।

সংগীতই ছিল তাঁর মূল কবিধর্ম। (ঘ) রবীন্দ্রনাথ সংগীতে রসের স্থান নির্দেশ করেছেন গভীর গুরুত্বে; যেখানে ভূমার সুর, অসীমের উপলব্ধি, বিশ্বরসের কারবার ও আত্মার সার্বজনীন সম্মিলন ঘটে চলেছে। তিনি বলেন 'গানের ভিতরকার রসটি সর্বজাতির, কিন্তু ভাষা অর্থাৎ তার বাইরের ঠাটখানা বিশেষ বিশেষ জাতির।' (সংগীত-চিন্তা পৃঃ ১৭০)। ভারতীয় রাগসংগীতের সুরে সেই অনির্বচনীয় রসস্বরূপ বিরাজ করছে। তাঁর মতে কলাবন্তরা সাধনা ছাড়া তাকে ধরতে পারে না। তাঁর মতে 'সকলের অতীত সংগীত, বচনের অতীত গান' তিনি বলেন—'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই'।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চেতনার বিচিত্র সূত্রগুলোর অনুসন্ধান করা চলে। অতঃপর উদ্ধৃত সূত্রগুলির সামগ্রিক কিংবা অংশগত পর্যালোচনায় রবীন্দ্রভাষ্যের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারি। বাক্‌শিল্প-প্রসঙ্গের পরিচ্ছেদগুলোতে এ'রকম ব্যাখ্যা আছে। গীতিকাব্য ও কাব্যগীতির সম্পর্ক-নির্ণয় ও রবীন্দ্রসংগীতের রস ইত্যাদি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি বাঁচিয়ে এখানে কথিত বিষয়ের পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করছি। পূর্বে বলেছি, তিনি চরিত্রে ও সংস্কারে পেয়েছিলেন প্রচণ্ড সংগীতধর্ম। তাঁর কবিতা ও কাব্যসংগীতে সেই সংগীতধর্মের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করি। কথা ও সুরের আনুপাতিক তুলনা না ক'রে তিনি উভয়কেই সমান স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষপাতী। 'ছন্দ' গ্রন্থে তাঁর সরস উক্তিটি আছে এভাবে—"ভোজে বসে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেশন কর্তা জিজ্ঞেস করলে, নিরামিষ না আমিষ। সে বললে—দ্বৌ কর্তব্যৌ।...আমি বলি দ্বৌকর্তব্যৌ। কারণ দ্বিবিধ রসেই আমার রসনার লোভ।"[২৩] রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়-চিন্তা তাঁর কবিতা ও গানকে নিয়ে এবং কথা ও সুরকে নিয়ে। এই প্রসঙ্গে ও কাব্যসংগীত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নিম্নরূপ—

—আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের বিবাহ দেওয়া হউক।...গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শোনা যায়। (সংগীত ও ভাব)

—কথা ভাবের আশ্রয়-স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী।...আমাদের ভাব-প্রকাশের

দুটি উপকরণ আছে, কথা ও সুর। কথা যতখানি ভাব প্রকাশ করে সুরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে।...সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। (সংগীত ও কবিতা)

—যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয়, তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।

(সংগীতের মুক্তি)

—আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল।...এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয় বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে যে সংগীতের বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে।

(আমাদের সংগীত)

—সুরকে সরল করে গাওয়াকে আমি যে কারণেই হোক কখনো মনে প্রাণে ভালোবাসতে পারিনি, যেমন বেসে এসেছি তার মধ্যে স্বরবিন্যাসের কারুকলাকে, নানান অনুভূতির আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশকে, সুরকে লীলোচ্ছলভাবে উৎসারিত করে তুলতে পারাকে, এককথায় স্বর সম্পদ সৃষ্টিতে উদ্যম প্রেরণাকে। (আলাপ-আলোচনা)

—চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনও কাজ কর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গান শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে। (জীবন-স্মৃতি)

—হয়তো ভাবীকালের সংগীতটাও বন্ধন-হীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?

(পথে ও পথের প্রান্তে)

—বাংলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডী-ভাঙ্গা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, সঙ্গিনী করে, তার গৌরব রক্ষা ক'রে। সেই বাংলাদেশে আজ নতুন যুগের ডাক পড়ল। তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুল রক্ষা করতে পারবে না, তখন সে জটিলার শাসন

উপেক্ষা ক'রে যুগল মিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে।
(দিলীপ কুমারকে পত্র)

—বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতি-দত্ত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। (সুর ও সংগতি)

উদ্ধৃত উক্তিগুলি পর্যালোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীতের সম্পর্ক, কবিতা ও গদ্যের সংগীত-ধর্ম, সংগীতে অনির্বচনীয় রস, বাংলাকাব্য-সংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত জানতে পারি। গীতিকাব্য ও গীতের আবশ্যিক সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অনুধাবন করেছেন, প্রসঙ্গান্তরে এর বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি।

রাগরাগিণীর নাম : রবীন্দ্র-ভাষ্য

ভারতীয় রাগরাগিণীর স্বরূপচিন্তনে, রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ পর্যালোচনা বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলির কিছু একত্র সংকলন করা হলো। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রতি রাগরাগিণীর অন্তর্লোককে, উহার জটিল সুরজালে আবদ্ধ করিয়া অব্যক্ত আকুতিকে ভাষার সুনির্দিষ্টতায় মনস্তত্বের নিগূঢ় নিয়মাধীনতায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিনি সত্যই পথিকৃৎ, এক অনাবিষ্কৃত রাজ্যের আবিষ্কর্তা।" তিনি আরও বলেন—"সংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ ও নিগূঢ় তাৎপর্যময় ভাব-বিশ্লেষণ বাংলাসাহিত্যে অনন্য।"[২৪] রাগরাগিণীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ গানে ভাবের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে কেন স্বরবিন্যাসে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। রাগরাগিণী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রাসঙ্গিক মতামত :

(জয়জয়ন্তী বেহাগ কানাড়া) যে রাগরাগিণীর হাতে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলেই দেখিতে চান জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা। আরে মশাই, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অন্ধদাসত্ববৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুণ, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব।

(পূরবী ভৈঁরো) কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন—পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে ? পূরবীতেও কোমল স্বরের বাহুল্য, আর ভৈঁরোতেও কোমল স্বরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন ? তাহা কি কেবল মাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয় ? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান।

(মূলতান ইমনকল্যাণ কেদারা) সংগীত-বেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কি কি স্বর কিরূপে বিন্যাস করিলে কি কি ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমনকল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কি কি স্বর বাদী আর কী কী স্বর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী স্বর বাদী ও কী কী স্বর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। —'সংগীত ও ভাব'

(ভৈঁরো টোড়ি) আমাদের গুণীরা ভৈঁরোতে টোড়িতে স্বর বাঁধিয়া বলিলেন ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নব-জাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায় ? কিছুমাত্র না। তবে ভৈঁরোকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল ? তাহার মানে এই—সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন।

(সারঙ্ টোড়ি কানাড়া) আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। অন্তত আমি সারঙ্ রাগকে মাধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিনা।—বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে, আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে। —'অন্তর বাহির'

(সাহানা) আমাদের বিবাহের রাত্রের রশনচৌকিতে সাহানা বাজে, কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায় ? তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গম্ভীর, তাহার মীড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। —'সংগীত'

(ভৈঁরো পরজ কানাড়া ভৈরবী মূলতান পূরবী) আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড়ো বড়ো আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে।—ভৈঁরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রি-শেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা, মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

(সাহানা) যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী।

(মেঘমল্লার বসন্তবাহার) আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্তবাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্যলোকের সুখ দুঃখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না। —'সংগীতের মুক্তি'

(কানাড়া খাম্বাজ) বাণীর যোগে কানাড়া একটি বিশেষ রস পেয়েছে, তার দাম কম নয়।—একটি পুরানো গান আছে 'কাল আসিবে বলে, বলে গেল, কেন এল না'—এ'তো একটা সংবাদ মাত্র, কিন্তু খাম্বাজ সুরের জীয়নকাঠি লাগবামাত্র সংবাদের নির্জীবতা থেকে শিল্পের প্রাণলোকে বাণীটি মাথা তুলে উঠল।

(পরজ) নিরর্থক শব্দ আশ্রয় করে সংগীত তেলেনা সারগম সৃষ্টি করেছে। গীতকলায় তাদের স্থান উচ্চ নয়। 'গুরুজী কালো কম্বল আমায় কিনে দাও'—মুখের কথায় এটা তুচ্ছ। কিন্তু পরজ রাগে এটাকে টেনে তোলে বৈরাগ্যের ব্যাকুলতায়। কিন্তু এর জোর নেই তোম্-তা নানায়। —'কথা ও সুর'

(দরবারী তোড়ী, দরবারী কানাড়া) যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারী তোড়ী, দরবারী কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন, সেই মনোভাবটি সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তি মাত্র নয়।

(মালকোষ) ভাব প্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপ প্রকাশ অহৈতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্না হাসির সম্পর্ক দেখি নে, তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা।—আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ঈর্ষাশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈঁরোতে, তোড়ীতে, কল্যাণে, কানাড়ায়।

—'সুর ও সংগতি'

(ভৈরবী, পূরবী, টোড়ি) ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি একরকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।—এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষের হৃদয়ে একটা টান পড়ে।—বাস্তবিক আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে চিরকালের মানুষের পক্ষে আর কোনো গান সম্ভবে না।

(ভৈরবী মূলতান ভূপালী) আজ সকালে একটা সানাইতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে, সে আর কী বলব।—এখন আবার তারা মূলতান বাজাচ্ছে, মনটা বড়ই উদাস করে দিয়েছে।—আমার আজকাল ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে, বেশ অনেকগুলো ভূপালী এবং বর্ষার করুণ সুর—অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানীগান।

(মূলতান) আমাদের মূলতান রাগিণীটা এই চারটে পাঁচটে বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে, আজকের দিনটা কিছুই করা হয়নি।—আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিকিমিকি আলোতে জলেস্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটিকে তার করুণ চড়া অন্তরা শুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, না সুখ না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা।

(পূরবী ইমনকল্যাণ) কাল সন্ধ্যাবেলায়, হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকা থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল, সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই। যেই পূরবীর তান বেজে উঠল, আমি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য, গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার। —'ছিন্নপত্র'

(ভৈরবী দেশমল্লার) ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ ব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন আদি নির্ঝরের কলকল্লোল।

—'ছন্দের অর্থ : ছন্দ'

ভারতীয় রাগরাগিণীর পরিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের তত্ত্বগত ও রসগত মূল্যকে তাঁর আলোচনায় স্থান দিয়েছিলেন—এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে তা বিশেষভাবে

বোঝা যায়।

বাংলাদেশের কীর্তন কি কোনো শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর সমপর্যায়ের গীতরীতি কিংবা স্বতন্ত্র কোনো দেশীয় শ্রেণীর সংগীত? এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা যুক্তি-সিদ্ধ ও রসগ্রাহী। বাংলাদেশের লৌকিক সুরের গানগুলোর ভেতরে যে রসের বিকাশ, অনির্বচনীয় দিব্য উল্লাস ও আনন্দ আছে, রবীন্দ্রনাথ বোধকরি পরম আগ্রহে এই কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর ভাষণগুলোতে। কীর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"কীর্তন-সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে জানিনে।—কখনো কখনো কীর্তনের ভৈঁরো প্রভৃতি ভোরাই সুরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে, রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।

(দিলীপকুমার রায়কে পত্র)

"কীর্তনে সুরও অবশ্য কম নয়, তার মধ্যে কারু-নিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। একথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কী বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই, সংগীতের সুর বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয়কি? কিন্তু কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষকরে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিংগের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত-সম্মিলিত কাব্য।

—'আলাপ আলোচনা : সংগীতচিন্তা'

উদ্ধৃত উক্তিগুলো থেকে রাগরাগিণীর তাত্ত্বিক ও ঔপপত্তিক বিষয় এবং কীর্তন গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। সংগীতের তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রধান ছিল না, তিনি ভাব ও রসানুভূতির ভাষ্যকার। তিনি বুঝেছিলেন যে, সংগীত মর্মগত ব্যাপার একান্তই এবং জীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রাত্যহিক চিত্তপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সংগীতের অনিবার্য ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতখানি, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন। সংগীত তাঁর কাছে

সর্বোত্তম সান্ত্বনা ও মুক্তির আনন্দ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন —"সংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ ও নিগূঢ় তাৎপর্যময় ভাব-বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে অনন্য।"

সংকলিত এই উক্তিগুলো থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রিয় রাগরাগিণীর নাম আমরা উদ্ধার করতে পারি। তারা হলো—ভৈরবী ভেঁরো বেহাগ কানাড়া জয়জয়ন্তী সাহানা মূলতান কেদারা ইমনকল্যাণ পূরবী টোড়ি সারঙ্ বাগেশ্রী মালকোষ পরজ বসন্তবাহার মেঘমল্লার খাম্বাজ কল্যাণ কাফি যোগিয়া ভূপালি রামকেলি মেঘমল্লার বসন্ত ললিত প্রভৃতি। রাগরাগিণীর স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই তাৎপর্যময় ভাব-বিশ্লেষণ তাঁর সংগীতের ছত্রে ছত্রে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, পঞ্চম পরিচ্ছেদ (গীতানুষঙ্গ)-এ অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করেছি। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলো।

ভৈরবী : সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী (প্রে ১৬৬)
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে (প্রে ২৩৭)
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে (প্রে ২৪৯)
পূরবী : পূরবীতে করুণ বাঁশরি দ্বারে বাজবে মধুর স্বর (পূ ৫৯৯)
বিভাস : প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে প্রভাত হলো আঁধার রাতি (পূ ৫২৯)
ললিত : বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে (প্র ২০১)
মূলতান : পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকাল বেলার মূলতানে (পূ ৫৮২)
বেহাগ : দেখি তার বিরহীমূর্তি বেহাগের তানে (প্রে ২৩৬)
সাহানা : ধরো সাহানাতে মিলনের পালা (প্রে ৩১৮)
মেঘমল্লার : মেঘমল্লারে সারাদিনমান ঝরে ঝরণার গান (প্র ১২৯)
মেঘ : যেন মেঘরাগিণী কী সুর ঢুলালো কর্ণমূলে (প্র ১০০)
ভূপালি : আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি (প্র ১৬০)

রাগরাগিণীর অন্তঃপাতী রস রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে পরিপ্লুত ক'রে দিয়েছিল, এবং তারই দিব্য পরিপ্রকাশ তাঁর কাব্যসংগীতগুলোতে। রাগরাগিণীর সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোতে যে প্রয়োগ-পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাঁর যুক্তি এই মন্তব্যগুলোতে বিশেষ বৈশদ্যে বিবৃত। পূর্বে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ রাগের সাধারণ ঠাট বা বন্দেজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ ক'রে সুরবিন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং রাগরাগিণীর সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে

তাঁর সংগীতের ভাবের উপযোগী সুর রচনা করেছেন। এ বিষয়ে ভৈরবী ও বেহাগ দুটি রাগের প্রতি তাঁর সর্বাধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করেছি। অনেকে তাঁকে ভৈরবী-সিদ্ধ ও বেহাগ-সিদ্ধ বলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রাগচিন্তন ও রাগাঙ্গগান সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

"For full forty years Tagore was passing on to the era of blendings. It is not necessary to note them separately but a few broad hints can be indicated. The very broad generalisations were about eight in numbers,—tori, bhairabi, sarang, purabi, iman, mallar, and kedar; but the subtle refinements were numerous. Barring one or two, Malkaush and bageshri, in which not many songs were composed, there was hardly a single well-known raga which did not receive its due. Gradually, however, the number of musical compositions became limited, and new compositions became scarce in number and variety. But the total number of blendings was phenomenal in the plentitude of Tagore's powers. Bhairabi alone came to nearly a hundred and fifty, mallar nearly forty, purabi thirty, and so on. What is more important was the mixture of these Seminal ragas with the cognate ones. To take one example, bhairabi was mixed with ashabari and tori; and tori itself had its own compeers. Later on, occasionally, boul and kirtan were introduced into bhairabi. The ensemble was new and very pleasing. To take other examples, purabi was mingled with iman to become iman-purabi, kedar with hambir and later on with baul, was a brilliant tour de force. Tori with asabari and desi and bilaskhani formed itself into a totally new phenomenon. Mallar had its own variety, and Tagore exploited each and every one of them."[২৫]

রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত রাগরাগিণী : মিশ্রণ-বিশিষ্টতা

রবীন্দ্রসংগীতে রাগের ও মিশ্ররাগের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণভাবে দুটি পরিচিত তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা 'রবীন্দ্রসংগীতের

ধারা' বইতে ১৯০৯।১০ সাল পর্যন্ত রাগভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতের গণনা করেছেন। ১০টির কম গান যেসব রাগরাগিণীর, তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি :

ভৈরব ৪৭	কানাড়া ১৩	মিশ্র ইমনকল্যাণ ৩	মিশ্রদেশ ৩
বেহাগ ৪২	রামকেলি ১৩	মিশ্র বাহার ৪	মিশ্রছায়ানট ৩
বাহার ২৪	পিলু ১২	মিশ্র ঝিঁঝিট ৯	মিশ্র পূরবী ২
কাফি ১৮	ভূপালি ১২	মিশ্রটোড়ি ১১	মিশ্র বিভাস ২
ইমনকল্যাণ ১৮	বিভাস ১২	মিশ্র সিন্ধু ১১	
ঝিঁঝিট ১৭	দেশ ১১	মিশ্রভৈঁরো ২	
খাম্বাজ ১৬	ছায়ানট ১০	মিশ্রকানাড় ৪	
টোড়ি ১৫	আলাইয়া ১০	মিশ্র রামকেলী ৩	
সিন্ধু ১৪	পূরবী ১০	মিশ্র পিলু ২	
ভঁরো ১৪	আশাবরী ১০	মিশ্র ভূপালি ২	
হাম্বার ১৪			

উক্ত পুস্তকে লেখক দশটি ঠাটের অন্তর্গত রাগাঙ্গের বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের একটি চমৎকার তালিকাও করেছেন। এরপর আমরা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' গ্রন্থ থেকে তালিকাটি উদ্ধৃত করছি। স্বরবিতানের প্রথমদিককার ৫৪৬টি গানের রাগরাগিণীর ও তালের নির্দেশ আছে পুস্তকে। এই তালিকা থেকে জানা যায়, চলিত ও অচলিত, সহজ ও দুরূহ বহু রাগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ও জ্ঞান ছিল। তাল সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। পরন্তু তিনি কিছু নূতন তালেরও উদ্ভাবয়িতা। এই তালিকায় বন্ধনীর মধ্যে সেই রাগের মিশ্ররাগ সংখ্যা সূচিত হ'য়েছে।

রাগরাগিণীর তালিকা :

অহং ১, আলাইয়া ৬ (১), আড়ানা ৫, আশাবরি ১০ (৪), আশা-ভৈরবী ২, আনন্দ ভৈরবী ১, ইমন ৬ (২), ইমলী ১, ইমন-কল্যাণ ২২, ইমন ভূপালি ৪, কর্ণাটী খাম্বাজ ১, কর্ণাটি-ঝিঁঝিট ১, কর্ণাটী ভজন ১, কাফি ৮, কাফিসিন্ধু ৭, কামোদ ৩ (১), কানাড়া ৮ (৪), কাফি-কানাড়া ৩, কালাঙড়া ৫ (৩), কালাঙড়া-সোহিনী ১, কীর্তন ৭, কেদারা ১১ (৪), কুকুব ১, খট্ ৫ (১), খাম্বাজ ২২ (৬), গারা ১, গান্ধারী ১, গৌড় ২, গৌরসারঙ ৭ (২), গৌরমল্লার ২, গৌরী ১ (১), গৌরী পূরবী ১, গুজরাটি ভজন ১, গুর্জরি টোড়ি ৩, গুণকেলি ১ (১), ছায়ানট ১১ (৪), জয়জয়ন্তী ৫ (২), জঙ্লা ১, ঝিঁঝিট

১০ (৭), ঝিঁঝিট খাম্বাজ ৩, টোড়ি ৮ (৬), টোড়ি-ভৈরব ১, তিলক কমোদ ৩, দেশ ১৫ (১), দেশকার ১, দেশখাম্বাজ ১, দেশসিন্ধু ১, দেশীটোড়ি ১, দেওগিরি ১, দেওগিরি বেলাওল ১, দীপক পঞ্চম ১, ধূন ১, নট ১, নটনারায়ণ ১, নটমল্লার ৩, নটহাম্বীর ১, নাচারি টোড়ি ১, নায়কী কানাড়া ১, পরজ ৩ (১), পরজবসন্ত ৪, পিলু ৬ (২), পিলু বাঁরোয়া ৬, পূরবী ৯ (২), পূর্ণ ষড়জ রাগিণী ১, প্রভাতী ৩, বড়হংস সারঙ্ ১, বাউল ১১, বাঁরোয়া ৫ (৫), বাঁরোয়াপিলু ১ (১), বাগেশ্রী ৩ (১), বাহার ২০ (৬), বাহার বাগেশ্রী ২, বিভাস ১১ (৫), বিলাবল ৮ (৪), বেহাগ ৩৫ (৭), বেহাগ খাম্বাজ ৬, বেহাগড়া ১, বৃন্দাবন সারঙ্ ১, ভজন ১, ভীমপলশ্রী ৩ (১), ভৈরবী ৩৭ (৩), ভৈরোঁ ৯ (১), ভূপালি ৫ (৪), মল্লার ৯ (৭), মহীশূরি ভজন ১, মালকোষ ১ (১), মারুকেদারা ১, মিশ্র ১২, মেঘ ১, মেঘাবলী ১, মূলতান ২ (১), রামকেলি ১৩ (৫), ললিত ৫ (২), ললিত কালাঙড়া ১, ললিতাগৌরী ১, লচ্ছাসার ১, লুম খাম্বাজ ১, সরফর্দা ২, সাহানা ৯ (৬), সিন্ধু ৯ (৫), সিন্ধু খাম্বাজ ৫, সিন্ধুবাঁরোয়া ২, সিন্ধুড়া ৩, সুরট ২, সুরটমল্লার ১, সুহা কানাড়া ১, শংকরা ৪ (৩), শংকরাভরণ ১, শঙ্ক বিলাবল ১, শ্যাম ১, শ্রীরাগ ৩, হাম্বীর ৯ (৩), হেমখেম ১

এখানে মোট ৫৪৬টি গানের ১১৬টি ব্যবহৃত রাগ ও মিশ্ররাগের তালিকা করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগগুলির মধ্যে ছিল ভৈরবী বেহাগ ইমনকল্যাণ খাম্বাজ বাহার দেশ সিন্ধু প্রভৃতি। এছাড়া পূরবী রামকেলি কেদারা ছায়ানট বিভাস যোগিয়া সাহানা প্রভৃতিও তাঁর বিশেষ আদরণীয় ছিল। বিভিন্ন সম ও অসমপ্রকৃতির কিংবা সহধর্মী রাগরাগিণীর মধ্যে যেভাবে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁর অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় পাই। কাব্যসংগীতের ভাবের দিকেই মুখ্যত নজর রেখে কবি রাগরাগিণীর সুর প্রয়োগ করেছেন, গতানুগতিক নিয়মকে তিনি মানেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি—"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন ?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গানের ভাবানুযায়ী উপযুক্ত রাগের সুরের সংযোজনা করেছেন। সেই প্রধান সুরের সঙ্গে সম বা অসম প্রকৃতির রাগের সুর সংশ্লিষ্ট হয়ে গানের ভাব ও রস মাধুর্য

স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। এই রাগমিশ্রণ-ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ কতখানি সচেতনভাবে করেছেন সেটা হয়তো স্পষ্ট বোঝা যাবেনা। স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর ব্রহ্ম ও রাগাঙ্গ সংগীতগুলি ছাড়া কাব্যসংগীতগুলিতে স্পষ্টতঃ বিশেষ কোনো রাগ বা রাগমিশ্রণ ফুটে ওঠেনি। ভাব ও সুর একাত্ম হয়ে নবজীবনোল্লাসে উদ্দীপিত। কাব্যসংগীতগুলোতে সম বা অসম রাগরাগিণীর সুর এমনভাবে মিশে গেছে, যেখানে সুরের সমন্বয়ের রূপকল্প দেখা যায়। তবুও মিশ্র রাগরাগিণীর অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব এবং গানের উজ্জ্বল অঙ্গে অঙ্গে সেই সুরের মূর্চ্ছনা সজীব ও সতেজ হয়ে ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু বিখ্যাত গানে রাগ-মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য যেভাবে লক্ষ্য করা গেছে, তার সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত[২৬] এখানে উল্লেখ করা গেল।

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর :	ভৈরব, ভৈরবী
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু :	আশাবরী, ললিত, রামকেলি, বিভাস
আলোর অমল কমলখানি :	রামকেলি, যোগিয়া, কালাংড়া, ভৈরবী
কোথা যে উধাও হলো :	কানাড়া, সাহানা, মল্লার
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো :	সারঙ্, কানাড়া, মল্লার
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো :	কামোদ, দেশ, মল্লার
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া :	রামকেলি, ভৈরবী
দেখো শুকতারা আঁখি মেলি :	পিলু, খাম্বাজ
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে :	পরজ, বসন্ত, বাহার
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া :	কাফি, পিলু
দিন শেষের রাঙা মুকুল :	পূরবী, ইমন
এলো যে শীতের বেলা	পূরবী, ইমন-কল্যাণ, ইমন
তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ :	বাহার, পঞ্চম, বসন্ত
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় :	কেদারা, নট
আরো আঘাত সইবে :	ঝিঁঝিট, খাম্বাজ
ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী :	পরজ, বসন্ত
তুমি কোন কাননের ফুল :	পিলু, বাঁরোয়া
আমার মিলন লাগি তুমি :	বাহার, বাগেশ্রী
নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে :	বাহার, সিন্ধু
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন :	বেহাগ, খাম্বাজ

আমার সকল দুখের প্রদীপ :	ভীমপলশ্রী, মূলতান
প্রখর তপন তাপে :	ভীমপলশ্রী, মূলতান, ভৈরবী
যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার :	ভৈরবী, সিন্ধু
আমি কেবলই স্বপন করেছি :	সিন্ধু, বাঁরোয়া
ওগো কিশোর আজি :	ইমন, পিলু, খাম্বাজ, কানাড়া
অকারণে অকালে মোর :	পিলু, বাঁরোয়া, সাহানা, মল্লার
অরূপ তোমার বাণী :	ভৈরবী, ছায়ানট, কেদারা, বেহাগ, হাম্বীর
কখন দিলে পরায়ে :	ভৈরবী, ভৈরোঁ, পিলু, বাঁরোয়া
আমার প্রাণের পরে চলে গেল :	খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়া, বেহাগ
আজি শরত তপনে :	যোগিয়া, বিভাস
বিরস দিন বিরল কাজ :	কাফি, পিলু, খাম্বাজ, সারং
ফাগুনের নবীন আনন্দে :	কাফি, পিলু, খাম্বাজ

এই মিশ্রণ-রূপের ও সুর-প্রয়োগ-কৌশলের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে রবীন্দ্রসংগীতে। এজন্য স্বতন্ত্র এক বিরাট তালিকা প্রস্তুত করা যায়। সে অবকাশ এখানে না থাকায় আমরা সামান্য এই কয়েকটি গানে সুর-মিশ্রণের পরিচয় লক্ষ্য করেছি।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষার অতুলনীয় ঐশ্বর্যের সঙ্গে ও অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রসের সঙ্গে উপযোগী ক'রে সম ও অসম-প্রকৃতির রাগরাগিণীর সুরবিন্যাস ও সুর-মিশ্রণ ঘটান হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য একটি গানের সাহায্যে সামান্য বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটি—'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন।'

গানটিতে দুটি রাগ ভীমপলশ্রী ও মূলতানের মিশ্রণ ঘটেছে। উক্ত দুটি রাগ যথাক্রমে কাফি থাট ও তোড়ি থাটের অন্তর্গত, চরিত্র ও প্রকৃতিতে উভয়েই অনেকটা কাছাকাছি। দুটোর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। ভীমপলশ্রীতে গান্ধার নিষাদ কোমল, বাকীগুলি শুদ্ধস্বর। মূলতানে রেখাব গান্ধার ধৈবত কোমল এবং মধ্যম কড়ি। উভয় রাগে আরোহণে রেখাব, ধৈবত বর্জিত। এভাবে উভয় রাগের মুখ্য স্বরবিন্যাস বা পকড় নিম্নরূপ :

ভীমপলশ্রী—ণ্ সম, মজ্ঞ পম জ্ঞ, মজ্ঞ র স ণ্ স

মূলতান—ন্ স, হ্মজ্ঞ, পজ্ঞ, ঋস

এই গানটিতে ব্যবহৃত দুটি রাগই দিনাবসানের। কথায় ও সুরে করুণ বিষণ্নতা ও প্রশান্তি লেগে আছে গানটিতে। মূলতান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস, আজ আমি এই অপরাহ্ণের ঝিকিমিকি আলোতে মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরাশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, না সুখ না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা।" রাগরাগিণীর প্রকৃতি তাঁর গানের ভাষণ-শিল্পে কিভাবে সম্মিলিত হয়েছে দেখতে পারি, সেজন্য পুরো গানটিকে উদ্ধৃত করি :

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা,
আকাশ পানে ছুটবে বাঁধন হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন। (পূজা ২০১)

ভীমপলশ্রী ও মূলতানের স্বরবিন্যাস একত্রিত হয়ে এই কাব্যসংগীতের মর্মগত রসটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। স্বরলিপিতে রাগমিশ্রণের পদ্ধতিটি লক্ষ্য করতে পারি। (স্পর্শ স্বর দেখানো হয়নি) :

সা সা।	ণ্ া া সা া।	সমা মজ্ঞা মা া।	মা পা া পা।	জ্ঞা া জ্ঞা মা।
আ মার্	স 0 ক ল্	দু 0 খে র্	প্র 0 দী 0	0 প্ জ্বে লে
	মা পা পা া।	া া পা ধা।	ণা া ণা া।	ধা র্সা ণা দা।
	দি 0 ব 0	0 স্ গে লে	ক র্ ব 0	0 0 নি বে
	পা া া া।	া া পা পা।	দা পা দা পা।	মা া মা মা
	দ 0 0 0	0 ন্ আ মার	ব্য 0 থা 0	0 র্ পূ জা

পা মা পা মা ।	জ্ঞা মা জ্ঞা রা ।	সা । । । ।	। । সরা সা ।
হ য় নি 0	0 0 স মা	প 0 0 0	0 ন্ আ মার্
সা রা জ্ঞা । ।	। । রা সন্া ।	সা রা জ্ঞা । ।	। । রা সন্া ।
অ 0 নে 0	0 কৃ দি নের্	অ 0 নে 0	0 কৃ ক থা
সা রা জ্ঞা । ।	। । রা সন্া ।	সা রা জ্ঞা । ।	জ্ঞা । জ্ঞা রা ।
ব্যা 0 কু 0	0 0 ল তা	বাঁ 0 ধা 0	বে 0 দ ন
রা । সা । ।	। । । । ।	গা মা মা পা ।	পা । পা । ।
ভো 0 রে 0	0 0 0 0	ম 0 নে র্	মা 0 ঝে 0
পা ধা ণা । ।	র্সা । ণা ণা ধা ।	ধা । পা । ।	। । । । ।
উ 0 ঠে 0	ছে 0 আ জ	ভ 0 রে 0	0 0 0 0

ভীমপলশ্রী ও মূলতানের স্বর-সমূহ মিলে এখানে লাগছে ণ্ স র জ্ঞ ম প দ ধ ণ ন র্স (মূলতানের কড়ি মধ্যম ব্যতীত)। রাগের স্বরের এই মিশ্রণের ফলে উভয় রাগের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য যথাযথ থেকেও তার এক স্বতন্ত্র মূল্য প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যসংগীতের ভাষার ও ভাবের অনুকূলে সুরের সংযোগ ঘটায় গানটির মধ্যে ভাব ও রসলোকের স্পর্শ লেগেছে, যা সহৃদয় রসজ্ঞ শ্রোতার চিত্তকে আন্দোলিত করে। রসবোদ্ধাকে অনেক ঊর্ধ্বে উধাও ক'রে নিয়ে যায়। সেখানে পাখিরা কুলায় ফেরে, সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দিগন্তে কাঁপছে, অস্তপারে সূর্য বিদায় নিচ্ছে, আস্তে আস্তে আকাশের তারা ফুটবে। এদিকে অনেক দিনের ব্যাকুল মিনতিগুলো বেদনায় গুমরে উঠছে। দুঃখের প্রদীপ জ্বালা হলো, ব্যথার পূজা শেষ হবে, কী মর্মান্তিক আশা। ভারি আশ্চর্য এই বাণী এবং এর সুর। ভাষার প্রসাদপূর্ণ শিল্প-প্রকরণে ভাবের প্রবল স্রোতোবেগ এবং সেইসঙ্গে সুরের তরঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ ক'রে এই রবীন্দ্রসংগীতকে তুলনাহীন মহিমা দান করেছে। গতানুগতিকহীন এই যে মিশ্রণ, এ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুরচেতনা ও সুরজ্ঞান থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে কোন বিশিষ্ট ঔপপত্তিক সংজ্ঞারোপ কিংবা স্বতন্ত্র কোন প্রায়োগিক প্রকরণকলার সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মন্তব্য করেছেন—"অনুকরণ, অনুসরণ, সংযোজন ও সংগঠন এই নীতিগুলি তাঁর নিজস্ব।"[২৭] রবীন্দ্রসংগীতে এই যে ভাষাপ্রকরণের সংগে সুরবিন্যাসের সংযোগে সম্পূর্ণতা, এ-কে কোন ধারারই অনুবর্তন বলা চলে

না ; সব ধারা মিশে গিয়ে এমন একটি অভিনব বিশিষ্ট শ্রেণীর হয়েছে যে, যাকে মৌলিক সৃষ্টির সম্মান দিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, "আমরা রবীন্দ্রসংগীতের রাগরাগিণী নিয়ে যখন আলোচনা করব, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উচ্চাঙ্গের হিন্দীগানে যে মত প্রাধান্য পেয়েছে সে মতে এর বিচার করা উচিত নয়। সেভাবে বিচার করতে গেলে গুরুদেবের গান সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হবে।"[২৮] রবীন্দ্রসংগীতের এই মিশ্রণ সমপ্রকৃতির রাগের সুর নিয়ে, সেইসঙ্গে বাউল কীর্তন টপ্পা ইত্যাদি নিয়েও মিশ্রণ। এযে কতবড় আত্তীকরণ তা সহজে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই সম্পূর্ণ প্রাতিস্বিক গীতচেতনা থেকে তাঁর ভৈরবী খাম্বাজ টপ্পা কীর্তন ইত্যাদি রচিত। সামান্য সুর পরিবর্তন ক'রে যুগে যুগে অনেক কলাবন্ত অনেক নতুন রাগরাগিণী সৃষ্টি ক'রে গেছেন, সেজন্য তাঁরা সম্মানিত ও কীর্তিত; তাহ'লে রবীন্দ্রনাথকে রাগরাগিণী ও সুরের উদ্ভাবয়িতা হিসেবে সম্মান দিতে আপত্তি কোথায়? শান্তিদেব ঘোষ বলছেন—"রবীন্দ্রসংগীতকে সে-ভাবে বিচার করে যদি ব্যাকরণ-গত নিয়মে বাঁধা যায়, তাহলে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাগিণীর সৃষ্টি হয়।"[২৯]

রবীন্দ্রসংগীতে তালের প্রয়োগ : রবীন্দ্রভাষ্য

গানের সুরের তান তাল ছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিগ্রাহ্য মতামতগুলি তাঁর রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দ ও সুরের ছন্দকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেখেছেন, কবিতার ছন্দের স্বাধীনতা যেমন, গানের তালের স্বাধীনতাও সেভাবে কাম্য। তাল সম্পর্কে তিনি ভেবেছেন অনেক। তিনি বলেছেন—"সংগীতের একটা প্রধান অংশ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা তাল লইয়া। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি।" (সংগীতের মুক্তি)। গানের ছন্দ, তাল,—কবিতার মাত্রা-ঝোঁকের মতো খুবই প্রত্যক্ষ। কবিতার ছন্দ শব্দ ও বাক্যনির্ভর, গানের তাল সুর-নির্ভর। ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবৃত্তিতে সুনিশ্চিত একটা সময়-বিভাগ স্পষ্ট হয়। যাতে ধ্বনি-সৌষম্যও প্রকাশ পায়। গানের সুরের একটা নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়-বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন তালের সৃষ্টি। সংগীতের সৌন্দর্য নিবদ্ধ তালের মধ্যে

নিহিত। অবশ্য কবিতার আবৃত্তিতে ছন্দের আবশ্যকতা যা-ই থাকুক না, গানের সুরে তালের অনিবার্যতা অনেক বেশী। আবৃত্তি ও গীতের মধ্যে এই তালের পার্থক্যটা সর্বাগ্রে গণ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্য যথেষ্ট দূর ক'রে দিয়েছেন। বিশেষক'রে তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোতে গানের তাল ও কবিতার ছন্দ একাকার হয়ে গিয়ে একটা নতুন পদ্ধতি ও প্রযোজনা হিসেবে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে।

ছন্দের প্রযুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গানের তালের ব্যাখ্যা করেছেন; তিনি বলেন—"অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদসদাগরের উপর মনসার যেমন আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন।" এই বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের সুর তাল সম্পর্কিত চিন্তার অনুবর্তন হয়। তিনি তাঁর ধ্রুপদ-ভঙ্গিম, খেয়ালাঙ্গ গানগুলোতে সুরের ও তালের নির্দেশ প্রথম দিকে করেছিলেন, পরে করেননি। কেননা, গানের সুরে তালের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ওস্তাদি রক্ষণ-শীলতা তিনি বরদাস্ত করেন নি। গানের ভাব যেখানে অনিয়ন্ত্রিত, তারই উপযুক্ত সুরে নিয়ন্ত্রণ থাকা তিনি পছন্দ করতেন না; অযথা তালের গোলামি তিনি মানেন নি। তাঁর মতে ছন্দের বন্ধন হলো নিয়মের বন্ধন এবং স্বাভাবিক নিয়মটাই মুক্তি। এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—"গুরুদেব প্রথম জীবনে অর্থাৎ যতদিন বিষ্ণু, যদুভট্ট এবং তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সংগীতজ্ঞের আওতায় ছিলেন, ততদিন তবলা পাখোয়াজের তালের নিয়মকে অবহেলা করতে পারেন নি। সেই কারণে তখনকার গানগুলিকে নানা প্রকার তালের নাম দ্বারা চিহ্নিত করবার প্রয়াস দেখি। এমন কি সে প্রভাব শান্তিনিকেতনের জীবনে শারদোৎসব নাটকের গানরচনা কালেও দেখি। তখন পর্যন্ত গানের মাথায় রাগরাগিণী ও তালের নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরে এভাবে মৃদঙ্গ বা তবলার তালের নাম দেওয়া তিনি পছন্দ করেন নি, তাই জীবনের শেষ পর্যন্ত বাকি গানের তালের কোনো নির্দেশ নেই।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথ গানের সুর ও তালের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে পত্রে লিখেছিলেন—"গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দেশ না থাকা ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে

সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।"৩১ আর একটি চিঠিতে বলেন—"আমার আধুনিক গানে রাগতালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস্, সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন, আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামের ভুল হয়, তাহলে দাঁড়াবো কোথায়?"

গানে যেভাবে তিনি নতুন সুর-সৃষ্টির প্রেরণা নিয়েছিলেন গতানুগতিক পথ পরিহার ক'রে, তালের ক্ষেত্রেও তেমনই। কবি নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা বিচিত্র সৃষ্টি-কার্যে অহরহ সক্রিয় থেকে বাংলাসাহিত্যে কাব্যে গানে সুরে যে সম্পদ উজাড় করে দিয়ে গেছেন, তার সীমা নেই। তালের ক্ষেত্রেও তাঁর নতুন আবিষ্কার বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। তাঁর গানে প্রচলিত তাল ব্যবহৃত হয়েছে—দাদরা, কাহারবা, তেওরা ঝাঁপতাল একতাল ত্রিতাল চৌতাল সুরফাঁকতাল আড়াচৌতাল ষৎ ধামার কাওয়ালী আড়াঠেকা মধ্যমান পঞ্চমসওয়ারী ইত্যাদি। এবং তিনি আরও প্রবর্তন করলেন তার নিজস্ব সৃষ্টি নবপঞ্চতাল, নবতাল, একাদশী, রূপকড়া, ষষ্ঠী, ঝম্পকতাল। তালের এই বিপুল-বৈচিত্রী প্রয়োগ দেখে রবীন্দ্রনাথকে ঘোরতর পাখোয়াজী ওস্তাদ মনে করার কারণ নেই। গানের তাল তাঁর কাছে ছিল কাব্যসংগীতের বিবিধ গুণের একটি গুণ মাত্র। সম্‌ফাঁক্, মাত্রার বন্ধ, অলংকার, বোলবাণী, তোড়া, তেহাই ইত্যাদির বন্ধন থেকে তালকে মুক্ত ক'রে প্রমুক্ত স্বচ্ছন্দ সাংগীতিক ভাবপরিমণ্ডলের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চেতনার বিশ্লেষণ করতে গেলে যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিশিষ্টতাগুলো লক্ষ্যে পড়ে, তাদের স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক ব্যক্তিত্বে ভারতীয় রাগসংগীত, হিন্দী সংগীত, খেয়াল, টপ্পা ঠুংরি, কীর্তন বাউল প্রভৃতি দেশীসংগীত, পাশ্চাত্যসংগীত ইত্যাদির ব্যাপক প্রভাব আলোচনা হওয়া দরকার। রাগসংগীতের ও অন্যান্য সংগীতের সুরের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এনে তিনি তাঁর সংগীতে এবং গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা চলে। তাঁর সংগীত রচনার প্রায় ৬০ বছরের বিস্ময়কর ইতিহাসের সুগভীর সন্ধান আবশ্যিক। কাব্যধর্মী ও গীতধর্মী বিচিত্র শ্রেণীর প্রায় আড়াই হাজার গানের বিভিন্ন রূপাঙ্গিকের ও সুর-বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

এখানে সাধারণভাবে আমরা আমাদের মুখ্য প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের বাক্-শিল্পের পটভূমি হিসেবে এই আলোচনা করেছি। অতঃপর আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে আমরা এই আলোচনা শেষ করতে পারি।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ও ঘরাণার ভবিষ্যৎ : নানা চিন্তা

রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের এমন বিপুল বিচিত্র উপাদানের যে বিশাল ভাণ্ডার, যা বাংলাভাষা বাংলাসাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্তমানে নানাভাবে আশঙ্কার কথা উঠেছে। বলাবাহুল্য, নৈতিক দায়িত্বে উদাসীন সরকারী ও বেসরকারী অনেক স্থান ও প্রতিষ্ঠান থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি সুবিচার তুলে নেওয়া হয়েছে, এসব দেখেশুনেই এই তর্কের উদ্ভব। গুরুত্বপূর্ণ প্রচার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও কোন কোন সময় রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞান-হীনতা প্রদর্শিত হয়েছে ব'লে নানা মহল থেকে মাঝে মধ্যে অভিযোগ উচ্চারিত হ'য়েছে। কিন্তু আজকাল কোনো অভিযোগ, নিন্দা, আপত্তি বা সাজেসান্ কোনো কাজে লাগেনা ; কোনো সুফল ফলে না।

কবিগুরু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা গানগুলির প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। অতি-অন্তরঙ্গ গানগুলোর জন্যে তাঁর ব্যাকুলতারও অন্ত্য ছিলনা। সেজন্যই তাঁর গানগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণতি ব্যাপারে তাঁর আশঙ্কাও পর্যাপ্ত ছিল। সেজন্য তিনি গানের ওপর কিছু কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চেয়েছিলেন।

বিশেষক'রে তার গানের সুরের স্বাধীনতা নিয়ে সে যুগে অনেকেই তাঁর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় নেমেছিলেন। মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ এ-সম্পর্কে কবির সঙ্গে নানাভাবে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, অবশেষে কবির মতামতের স্বপক্ষেই তাঁদের যেতে হয়েছে। বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের সম্মিলিত যে আবেদন—তা অনেক শিল্পীর গায়কীতে পাওয়া যায় না। অনেকের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতকে নীরস ও নিষ্প্রাণ লাগে। রবীন্দ্রসংগীতের আন্তর-দিব্যপ্রেরণা অর্জন করা সহজ কাজ নয়। উচ্চাঙ্গসংগীতের জ্ঞানের অভাব, প্রকৃত রসজ্ঞান, উপলব্ধি, ও আন্তরিকতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সুপারিশ-আনুকূল্যে ও সুমিষ্ট কণ্ঠের দাবী নিয়ে স্বেচ্ছামত রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে অনেকে নেমেছেন। পরন্তু সুরের রদ-বদল

ব্যাপারেও বর্তমানে কোনো কোনো শিল্পীর উৎসাহ অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। এ বিষয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য।

"স্রষ্টার সৃষ্টির উপর মুন্সীয়ানা করবার অধিকার কারও নেই। গান-রচয়িতার গানের কথা যেমন বদল করবার অধিকার গায়কের নেই, তেমনি তার সুরের রূপকেও বদল করবার অধিকার গায়কের নেই। কেননা গায়ক স্রষ্টা নয়, গায়ক সুরের কৌশল-দক্ষ। রসের পরিমাণ-জ্ঞান গায়কের থাকতেও পারে। কিন্তু সেটা এক্ষেত্রে বিচার বস্তু নয়। যেমন একজনের কাব্যবোধ থাকলেই রবীন্দ্রনাথের কিংবা সেক্‌সপীয়রের কবিতার একটি শব্দ বদল করবার অধিকার তার থাকে না, কিংবা সুর-দক্ষতা থাকলেই বেঠোভেনের একটি সিম্‌ফনির সুরের অদল-বদল করবার কিংবা শুবার্টের গানের সুর বদল করবার অধিকার জন্মায় না; ঠিক তেমনি লোকোত্তর প্রতিভাশালী এক মহাকবি ও গান-রচয়িতা অসামান্য রসোপলব্ধির ফলে যে গান সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টির এতটুকু অদলবদল করা সৃষ্টির মূলতত্ত্বকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু নয়।" তিনি আরও বলেন— "শুধু রবীন্দ্রনাথের গান নয়, যে কোন গান রচয়িতার সুর-সৃষ্টির সঙ্গে কিছু জুড়ে দেবার অধিকার গায়কদের দেওয়া, রসমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করার অধিকার দেবার নামান্তর।"[৩২] রবীন্দ্রসংগীতের সুর নিয়ে বর্তমানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে যে স্বেচ্ছাচারিতা লেখক লক্ষ্য করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ'রকম বিক্ষুব্ধ মন্তব্য আরও অনেক জায়গায় করেছেন; অনেকেই করেছেন। হয়তো এ সম্পর্কে পরে পরে ঔদাসীন্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হবে। রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ ও সুসঙ্গত অনুশীলন ও চর্চা-বৃদ্ধির জন্য আকাশবাণী, বিশ্বভারতী, অন্যান্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণকে অগ্রসর হতে হবে। যাইহোক, রবীন্দ্রসংগীতের যে বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও মর্যাদা—তার একটি যুগোপযোগী মূল্যায়ণ বাঙলাদেশে অবিলম্বে হওয়া দরকার।

গণতন্ত্রের যুগে রক্ষণশীলতা বেদস্তুর হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ও ললিতকলা প্রসঙ্গে অন্যকথা। রবীন্দ্রসংগীতের সুরবিন্যাসের ব্যাপারে কেউ কেউ মধ্যপন্থা নিতে চান। এ সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী বলেন—"মনে হয়, অতিরিক্ত বন্ধন আর অতিরিক্ত স্বাধীনতা এই দুয়ের অন্তর্বর্তী কোন একটা জায়গায় এসে আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের সুর নূতন ক'রে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। রবীন্দ্র-সংগীতের সুর-স্ফূর্তির জন্যে শ্রোতার সর্বাঙ্গীন তৃপ্তি বিধানের জন্যে, ওপিচ

গায়কের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।"[৩৩]

লেখক তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বিশেষভাবে আধুনিক নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কেবল নির্বাধ প্রশংসা অপেক্ষা নিরপেক্ষ সমালোচনার মূল্যও কম নয়, একথা স্বীকার করি। কিন্তু শ্রীচৌধুরী সুর সম্পর্কে সমস্যার কথা তুললেও সমাধানের পথটি বাতলে দেননি। এধরণের সমস্যা নিয়ে দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদ কবির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে সুরবিস্তার, তানালাপ কিংবা সুর-পরিবর্তন বিষয়ে তাঁদের যুক্তি-তর্কগুলি কবিগুরুর কাছে পেশ ক'রে অবশেষে সবিনয়ে সে-সব প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন। ললিতকলাশাস্ত্রের একটা বিশেষত্ব হ'লো, যুগপ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বাবস্থায় সর্বদাই তার অগ্রগতি চলছে, কিন্তু তার অন্তর্লীন চিরন্তন ও সার্বজনীন বিশেষত্বগুলি হারিয়ে যায় না কখনো, কোনো কারণেও না। জাতির শাশ্বত ও নতুন ভাববোধ এবং সর্বকালের সংস্কৃতি-চিন্তা সংরক্ষিত থাকে রসসাহিত্যে, সংগীত কিংবা ললিতকলাশাস্ত্রের মধ্যে। রবীন্দ্রসংগীত আধুনিককালের সৃষ্টি হয়েও সেই গতিশীল ও ধ্রুপদীকালের একটি মহান ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিভাত। জগৎবরেণ্য মহৎ শিল্পী কবি কলাবন্ত কিংবা মনীষীদের সৃষ্টির স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে যেমন কোনো বিতর্ক নেই, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও সেই কথা। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার প্রয়োজনে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার অধিকার ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু সর্বসাধারণ্যে প্রচারের দায়িত্ব যাঁরা নেবেন, কিংবা গণ-প্রচার মাধ্যমগুলিতে যাঁরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন,—তাঁরা সর্বাগ্রে নিজেদের যথাযথ ও প্রকৃত যোগ্য ও উপযুক্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন কিনা— সেইটাই প্রশ্ন। প্রগতির নাম করে ললিতকলা, শাস্ত্র ও সাহিত্যের ধ্রুপদী মূল্যকে উপেক্ষা করা চলেনা। স্বরলিপিতে সুরের কাঠামোমাত্র বিধৃত থাকলেও সর্বমান্য একটি বিধি ও শৃঙ্খলার জন্য তার আবশ্যকতা আছে। তারপরই যোগ্য আচার্য, গুরু বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তালিম নেওয়া এবং যথাযথ গায়কী ও ঘরাণাকে রপ্ত করা, অর্জন করা। এছাড়া উপায় নেই। স্বরলিপি থেকে সুর তুলে নেওয়া বা অযোগ্য গায়কের কাছ থেকে গান শিখে নেওয়া—এসব হামেশাই চলছে। পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র সুর ও গায়কী বিষয়ে নয়, রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-ভাষা ও রবীন্দ্রমননের প্রখর অনুশীলন ও চর্চা

সুরু হোক। এভাবেই বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্রসংগীত প্রোজ্জ্বল মহিমায় স্পষ্টীভূত হবে।

বাঙালীজাতি বর্তমানে রবীন্দ্রচিন্তা তথা রবীন্দ্রসংস্কৃতির ছত্রচ্ছায়ার নীচে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছে। রবীন্দ্র-দাক্ষিণ্যে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ রবীন্দ্রবিরোধীরাও এই সার সত্যটি বুঝতে পারেন। অনেক করেছেন, অনেক দিয়েছেন যিনি—তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব, "আমার গান বাঙালী জাতিকে নিতেই হবে। আমার গান গাইতেই হবে সকলকে।" জাতির কাছে কবির এই একান্ত আশা ও বিশ্বাস আজ কতখানি ফলপ্রসূ হ'তে চলেছে—তা আজ কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্যই অধিক সতর্কতা চাই। অনধিকারীরা চিরকালই সংস্কৃতি-সংহারে সিদ্ধহস্ত। সমাজে তারাই সংখ্যাধিক্য, তাদের প্রভাবেই সমাজ প্রভাবিত হয়। কাজেই যোগ্যজনদের সর্বদাই সাবধান হতে হবে।

সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন, যেকোনো গানের স্বরলিপি, গায়কী বা ঘরাণা সম্পর্কে কঠিন বিধিনিষেধ থাকা আবশ্যিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খ্যাল ও রাগরাগিণীর সুকঠিন গায়কী-চরিত্র ও কাঠামো অটুট আছে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার জোরে। যোগ্য অধিকারী কলাবন্তদের অতন্দ্র সাধনা ও সতর্ক প্রহরায় মার্গ-গীতির শতাব্দীর সাধনার ধারা সমানে প্রবাহিত। কবিগুরু উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চার পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু অন্ধ অনুকরণবৃত্তিকে বরদাস্ত করেননি—এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব।"—কথাটি কবিগুরুর কাছে আক্ষরিক-ভাবেই সত্য ছিল মনে হয়না। রাগরাগিণীর স্বরের কড়ি-কোমল শুদ্ধ-বাদী-সংবাদী-বর্জিত স্বর, পকড়, মীড়, গমক ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য কিছু শৈথিল্য স্বীকার করলেও রাগরাগিণীর খাঁটি ও দৃঢ়ীভূত চরিত্রের ওপর না বুঝে আঘাত করেননি। তাঁর ব্রহ্মসংগীতগুলিকে বিচার করলে আমরা একথা বুঝতে পারি যে, বহু রাগরাগিণীর সুরের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রযোজনার দ্বারা এসব গান উচ্চাঙ্গ রাগসংগীত হয়ে উঠেছে। যাইহোক, রাগরাগিণীর মূলীভূত পরাকাষ্ঠা উন্মূলিত হবার নয়। নইলে তানসেনের যুগবাহী কীর্তি ধ্বংস হয়ে যেতো। ভাতখণ্ডেজীর সাধনালব্ধ বিরাট সম্পদ 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' স্থায়ী স্বীকৃতি হারাতো। এ'প্রসঙ্গে বিশেষক'রে ভাববার কথা যে, মৌলিকত্ব অর্থাৎ

ওরিজিন্যালিটির ক্ষতি না ক'রেও তো সারাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীরা একই রাগ-রাগিণী চর্চা ক'রে চলেছেন কোনো ব্যত্যয় বা রূপান্তরের চেষ্টা না ক'রেই। সেভাবেই একদিন রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-নিবদ্ধ সুরের ওরিজিনালিটিও স্বীকৃতি পাবে। সাম্প্রতিককালে বাঙলার প্রিয় কবি কাজী নজরুলের অসামান্য গানগুলি গাইবার সময় প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব ঢঙের সুর ও গায়কীর স্টাইল প্রকট হয়ে ওঠে। এই নির্বাধ স্বাধীনতা যে নজরুলের গানের সুরের ও গায়কীর মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব নষ্ট করবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। সেজন্যই অনতিবিলম্বে নজরুল-রক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে হবে উপযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। আইনের শাসন অনভিপ্রেত হলেও এই চিন্তাভ্রষ্ট জাতিকে শাসন দিয়ে সংযত করা উচিত। নজরুল, অতুল-প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রমুখ মহান গীতিকারদের মতো সম্ভাবনা দেখা যায়নি এ প্রজন্মে, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো দূরের কথা। যাঁদের দৌলতে বাঙালী আজ গানের রাজা, তাঁদের প্রতি বাঙ্গালী আজ কতটুকু কৃতজ্ঞ ও আন্তরিক? ক'জনই বা এই যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করে? কজনই বা বিক্ষোভ জানায় সংস্কৃতি-সংহারকদের বিরুদ্ধে? দুর্ভাগ্যদেশে রবীন্দ্র-প্রতিভাকেও বিপন্ন হতে হয় বারে বারে। এ সংকটের জন্য বিচলিত হন সংস্কৃতিবান নাগরিকগণ। কেউ বলেন—"রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই উত্তুঙ্গ ছিলো যে কয়েক ধাপ নেমে আসতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধেনি। সৃষ্টি-কর্মে তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তাঁকে একেবারে ফিল্মী বা আধুনিক গানের সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্টা সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। নিন্দিত হোক এ অপচেষ্টা।"[৩৪]

আমরা মনে করি, রবীন্দ্রসংগীত সুর ও বাণীর সংযোগে সম্মিলিত যে মহান সৃষ্টি, যে লোকোত্তর প্রতিভা থেকে এর সৃষ্টি হয়েছে—সে সম্পর্কে নতুন চিন্তা ভাবনার ও সংরক্ষণ-রীতি-নীতি প্রবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের সুরের তানালাপ, স্বরবিহার (ইম্প্রোভাইজেশন) সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন—"আমি তো কখনো একথা বলিনি যে কোনো গানে তান দেওয়া চলেনা। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী। তানের অলংকারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি, যেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই। হিন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখলেই তার প্রভাবে যে বাংলা সংগীতে

আরও সৌন্দর্য্য আসবে, এটা তো আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমরা এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনুমোদন আছে, একথা নিশ্চয়ই জেনো।" কবিগুরুর এই অনুমোদনের কথাটি তাঁরই গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা—তা স্পষ্ট হয়নি। পরন্তু, তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের নতুন ক'রে বাংলা গান রচনা করতে নির্দেশ দিলেন, যেসব গানে প্রকৃত তানালাপ চলতে পারে। অর্থাৎ তানালাপের জন্ত বাণী ও গঠন-উপযোগী গীতভাষা চাই। কবিগুরু তাঁর সংগীতে তানালাপ করতে বারংবার কেন নিষেধ করেছিলেন—তার কারণগুলি এতদিনে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কবিগুরুর গানের ভাষা ও ভাবগত বিশিষ্টতা এবং গায়ন-প্রকৃতি বা স্টাইলটাই এমন যে, তাতে ওস্তাদিয়ানা বা তানালাপের কসরৎ দেখানোর সুযোগই নেই। কবির প্রথম যুগের রাগাঙ্গ স্থায়ী-অন্তরা তুকলি গানেও এ সুযোগ বর্তায়নি; মধ্য ও শেষ যুগের নিটোল কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন তো ওঠেই না। এত বাধা ও নিয়মবিধি থাকা সত্ত্বেও ভাব, বাণী ও সুর-সন্নিপাতে মহিমোজ্জ্বল দিব্য দ্যোতনাময় রবীন্দ্রসংগীতের সম্মান ও স্বীকৃতি আছে বাঙালীর কাছে। বাঙালীর অতি প্রিয় ও অন্তরের সম্পদ হিসেবে রবীন্দ্রসংগীত পরিগৃহীত। আজ বিশ্ব-রসচৈতন্যলোকেও তার চলেছে নীরব উত্তরণ। একথা ভেবেই আজ আমাদের গর্বের ও আনন্দের অবধি নেই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর একান্ত প্রত্যাশাটি রেখে গেছেন সকলের কাছে—সে-কথাটি উদ্ধৃত ক'রেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেছেন—

> "এই পার্থিব জীবন ও পৃথিবীর মানুষকে আমি
> ভালো বেসেছি। সেই ভালোবাসা আমি রেখে গেলাম
> আমার গানের সুরে গেঁথে। মানুষ যদি আমাকে
> মনে রাখে, তবে এই গান দিয়েই রাখবে।"

নির্দেশপঞ্জী

এক

১। দীনেশ চন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১০৮, ১০৯
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—A Historical Study of Indian Music P. 229, 230
৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড) পৃঃ ২৮

৪। রবীন্দ্রনাথ—সংগীত চিন্তা পৃঃ ৭৯
৫। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সুর ও সংগতি : সংগীত চিন্তা—পৃঃ ১৬৯
৬। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতের মুক্তি : সংগীত চিন্তা—পৃঃ ৫৭
৭। রবীন্দ্রনাথ—আলাপ আলোচনা : সংগীতচিন্তা পৃঃ ১১১,
৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২৭
৯। রবীন্দ্রনাথ—আলাপ আলোচনা : সংগীতচিন্তা পৃঃ ১১৩
১০। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৫০৩
১১। অরুণ বসু—আধুনিক বাংলাসংগীতের জন্মদাতা, বিশ্ববীণা ৪র্থ বর্ষ (৩য় সংখ্যা) ১৯৬৯
১২। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য : সংগীত (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩৯
১৩। দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড) পৃঃ ১০১১
১৪। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—রাগ ও রূপ (পূর্বভাগ) পৃঃ ৮২

দুই

১৫। সংগীতচিন্তা (গ্রন্থ পরিচয়) পৃঃ ৩২৯—"যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে দুই হাজার হইতে কিছু কম গান রচনা করেন।" 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা-নির্ণয় করা হয়েছে—"মোট সংখ্যা প্রায় ২০৬০। গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের ১৭৭ খানা বাদ দিলে ১৮৮৩টি"—পৃঃ ২৮৫। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন—"প্রায় আড়াই হাজার গান তাঁর রয়েছে। এবং কেবল সংখ্যার দিক থেকে সেগুলি বিচিত্র।" —রবি প্রদক্ষিণ পৃঃ ৭১। তিনি আর একস্থানে বলেছেন—"In all Tagore had composed more than two thousand songs." (Centenary Vol. P. 180/Academy)। যাইহোক, রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যার হিসেব সঠিক হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি বিদগ্ধ রবীন্দ্রগবেষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতানের কালানুক্রমিক সূচী ২ খণ্ড প্রণয়ন করেছেন। তথ্য সমৃদ্ধ এই পুস্তক দুটিতে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে তিনি বলেছেন—"গীতবিতান নূতন সংস্করণে কবির এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গানের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। অবশ্য সকল গানের সুর তালাদি পাওয়া যায়নি। আমাদের হিসাব অনুযায়ী গীতবিতানের মোট গানের সংখ্যা হ'লো ২২৩২। তন্মধ্যে ১৮৯০টি গানের স্বরলিপি আছে স্বরবিতানের ৬০টি গ্রন্থে। সুতরাং এখনও ৩৪২টি গানের সুর তালাদি পাওয়া যায় নি। কিন্তু গীতবিতানে সেগুলি গান রূপেই স্বীকৃত।"
১৬-১৭। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা পৃঃ ১৮৫, ১২৪
১৮। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের মতটি উদ্ধার করছি; তিনি বলেন—"গোড়ার দিকে রবীন্দ্র-সংগীতে ধ্রুপদীরীতিতে রচিত হ'লেও ধ্রুপদ অঙ্গ সেখানে লক্ষণীয় নয়। শ্রেণীবিভাগে যাঁরা গানগুলিকে শাস্ত্রীয় সংগীতের রীতিতে বিভাগ ক'রে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন, তাঁরাই ভুল করেন। এ ভুলটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে বিশেষক'রে অবাঙ্গালীর কাছে অনেক পর্যায়ের এং স্তরের গানের বৈচিত্র্য নিয়েই রবীন্দ্রসংগীত একটি বিশিষ্ট সংগীত-রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে"—বাংলা সংগীতের রূপ পৃঃ ৪৭

১৯-২১। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা পৃঃ ১৩৫, ১৮৯, ৫৪ যথাক্রমে

২২। ধূর্জটি প্রসাদ—সুর ও সংগতি : সংগীতচিন্তা পৃঃ ১৪২

২৩। রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ পৃঃ ৩৩২

২৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং রাগ-রাগিণী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যঞ্জনামূলক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যগুলি উল্লেখ ক'রে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৩৩

২৫। ধূর্জটিপ্রসাদ—S. Academy : Centenary Vol. P. 181

২৬। এই তালিকাটির জন্য সহায়ক উল্লেখনীয় গ্রন্থ : রবীন্দ্রগীতি (জয়দেব রায়), রবীন্দ্রনাথের গান (সৌম্যেন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রঅভিধান (সোমেন্দ্র নাথ বসু), রবীন্দ্রসংগীত (শান্তিদেব), সুরের গুরু (কালিদাস নাগ), সংগীত পরিক্রমা (নারায়ণ চৌধুরী), রবীন্দ্রসংগীতকোষ/বিশ্ববীণা পত্রিকা (সুচিত্রা মিত্র)

২৭। প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান পৃঃ ২৩

২৮-৩০। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত পৃঃ ৬৬, পৃঃ ৭৯, পৃঃ ১৯৯

৩১। রবীন্দ্রনাথ—সংগীতচিন্তা পৃঃ ২৪৩

৩২। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান পৃঃ ৫২, ৫৩

৩৩। নারায়ণ চৌধুরী—সংগীত পরিক্রমা পৃঃ ৭৭

৩৪। আবু সৈয়দ আইয়ুব—পান্থজনের সখা পৃঃ ৫

———

সংযোজন

রবীন্দ্রসংগীতে ভাববিষয়ক ও বাক্‌প্রকরণগত শিল্পকলা

(এক) ইন্দ্রিয়-চেতনা-বিষয়ক

রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-চেতনার বিচিত্র সন্নিপাত এবং সম ও বিষম প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বাক্‌প্রকরণে স্পষ্টীভূত হয়ে আমাদের বিস্মিত করেছে। ভাষণ-শিল্পের সূক্ষ্ম প্রকরণ ভাবশিল্পের প্রসাদ ও মাধুর্যকে সম্ভাবিত করেছে। এর থেকে বোঝা যায়, কন্‌টেণ্ট ও ফর্মের সমন্বয়-সাধনে কবি-প্রতিভা কী অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হয়েছিল। রবীন্দ্রসৃষ্ট শব্দ-প্রকরণে অনির্বচনীয় জগতের যাদুর স্পর্শ ('ম্যাজিক ইন্‌কাণ্টেসন') লেগে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সংগীত শব্দের মায়াপুরী। মানুষের সুপ্ত-জাগ্রত বাসনা-কামনা ও ইন্দ্রিয় বোধগুলো অতিশায়ী হয়ে রূপ নেয় সেখানে। মর্মগত বাসনার সংস্কার বা 'প্রমুষ্টতত্তাক'-স্মৃতি কিংবা আরও কিছু জটিল বিমিশ্র ভাবরূপ রবীন্দ্রসংগীত থেকে সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত সহযোগে উল্লিখিত হলো।

ইন্দ্রিয়চেতনায় সাধারণ রূপের মধ্যে বিদগ্ধ ভঙ্গি : চিত্রকল্প, উপমালোক ও অনুষঙ্গ

দৃষ্টি : চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে (পূ ২৫৩)

দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা

কাঁপাও ঝড়ের বুকে একি ব্যাকুলতা (বি ৯০)

দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন (পূ ৪৫)

আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে (প্রে ৪৮)

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়

মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে (প্রে ৪৮)

আমি চোখ এই আলোকে মেলবো যবে

তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে (পূ ৭৭)

অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি (প্রে ৫৬)

শ্রুতি : পাতিয়া কান শুনিস নারে দিকে দিকে গগন মাঝে

মরণবীণায় কী সুর বাজে (পূ ৩১৫)

শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন (পূ ৩১৬)

শুনি বনপথে সুর মেলে যায় তব কিঙ্কিণী (প্রে ২৩২)
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে (প্রে ২৩৫)
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে (প্রে ১৩২)
বসন্তগান পাখিরা গায়, বাতাসে তায় সুর ঝরে যায় (প্র ২১৫)

স্পর্শ : শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ডালে (প্রে ২২৪)
বৈশাখের শীর্ণনদী…ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়
(প্রে ২২৮)
মালার পরশ বুকে লাগেনি (প্রে ২৬৭)
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁয়া বাণী (প্রে ২৭৯)
কী মায়া দেয় বুলায়ে (প্রে ৩২৫)
তারি ছোঁয়া লেগেছে ওই কুসুম বনে (বি ১০৫)
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ পরশনে (পূ ২১৯)
আঁধারে মিলিবে তার স্পর্শ (পূ ৬০১)
সোহাগ আমার মালা ক'রে বুকে তোমার দোলাবো (প্রে ৯০)
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে (প্রে ৪৮)

ঘ্রাণ : সে নাম মদির হবে যে বকুল ঘ্রাণে (প্রে ২১৬)
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা (প্রে ২৩০)
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া (প্রে ২৬৭)
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে (প্রে ২৭৮)
শ্রাবণ ঘন অন্ধকারে গন্ধ যেতো অভিসারে (প্র ৮৫)
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারিধারে (প্র ১৩১)
তোমার বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইল পাতা সে (প্র ১৬০)
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে (পূ ২২৩)
ফুলের বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি (পূ ৫২৯)

স্বাদ : কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে (প্রে ২৪৮)
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা নিয়ো হে নিয়ো
হৃদয় বিদারী হয়ে গেল ঢালা পিয়ো হে পিয়ো (প্রে ৮৫)
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও (পূ-প্রা ২৮)
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পুরে (পূ ৯৬)

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান (মায়ার খেলা)

যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে দেয় আপনায় উজাড় করে (পৃ ৩০)

(দুই) ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ-প্রক্রিয়া (সম ও বিষম)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীতে সাধারণ ইন্দ্রিয়-চেতনা বাহ্য ও আন্তর ক্রিয়া-পরম্পরায় বিকশিত। এখানে জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র লীলার রূপ লক্ষণীয়। বিচিত্র মানস ও সংস্কার, সূক্ষ্ম বাসনা, স্মৃতি ও উপলব্ধির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়চেতনার মৌলিক, সম ও বিষম বিন্যাস এবং নিবিড় সন্নিপাত (combination) লক্ষ্য করি বাকৃশিল্পের অসামান্য প্রয়োগ-শৈলীতে। সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টি উদ্‌বোধ ও অবয়ব লাভ করেছে—"বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত থেকে কিছু উদ্ধৃতি নেওয়া গেল। বস্তু, বিবিধ নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক উপাদানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চেতনা, বোধ ও উপলব্ধির সংযোগে সূক্ষ্ম ও স্বতঃউৎসারিত রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে এখানে। ছত্রে ছত্রে শব্দশক্তির সূক্ষ্মলীলা ও শিল্পরূপ প্রকট হয়েছে। দুই বা ততোধিক উপাদানের মিশ্রণ :

(প্রেম পর্যায়ের গান)

তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে (২৩৩)—বস্তুর সঙ্গে স্পর্শ ক্রিয়ার সংযোগ

ছবি মনে আসে আলোকে ও গীতে (২৪৯)—স্পর্শ দৃষ্টি শ্রুতি ও বোধ

অশান্তি আজ হানলো একি দহন জ্বালা (২৭০)—স্পর্শ, স্বাদ ও বোধ

স্বপ্ন মদির নেশা এ উন্মত্ততা (২৭১)—ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ও বাহ্যক্রিয়া

বহে মম শিরে শিরে একি দাহ কি প্রবাহ

চকিতে সর্ব দেহে ছুটে বিদ্যুৎ লতা (২৭১)—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও ফল

একি ব্যাকুলতা এই আকাশে এই বাতাসে যেন উতলা অপ্সরীর
উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান (২৭২)— ঐ

গন্ধে তাহার গোপন মৃদুল সংকেত আছে লীন (২৭৬)—ঘ্রাণ স্পর্শ ও দৃষ্টি

নদীর জলে থাকিয়ে কান পেতে (৩০৬)—স্পর্শ ও শ্রুতি

চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি (৩২৬)—দৃষ্টি শ্রুতি স্বাদ ও মন

মাধবী বনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায় (৩৩২)—
দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ ও স্পর্শ

(প্রকৃতি পর্যায়ের গান)

স্নখে শিহরে সকল বনরাজি

উঠে মোহন বাঁশরি বাজি (৩)— দৃষ্টি স্পর্শ শ্রুতি ও স্বাদ

তারায় কাঁপে রিনিঝিনি যে কিঙ্কিণি

তারি কাঁপন লাগলো কি ওর মুগ্ধ ভালে (৪)—দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, স্বাদ

ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে (৮)—ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ

শিউলি স্নরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে

মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো (১৬২)—দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ

এ রকম ইন্দ্রিয়-চেতনার মিশ্রণের রূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হতে দেখি। কোন কোন গানের প্রত্যেক পংক্তিতে একক উপাদানের বা মিশ্র উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। ঐরকম কয়েকটি বিখ্যাত গানের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করছি :

(প্রকৃতি পর্যায়)

মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নীপ কুঞ্জতলে (১০৪)

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে (১৪১)

ওগো বধূ স্নন্দরী তুমি মধু মঞ্জরী (১৯৯)

একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি (১৯৮)

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (১৯২)

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে (২৫২)

তৃষ্ণার শান্তি স্নন্দর কান্তি তুমি এলে (১১৬)

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি (১১৮)

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো (১২৩)

আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে (১২৪)

ওরে শিরিষ ওরে শিরিষ

মৃদু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস—

তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে (২০৫)

ওলো শেফালি, ওলো শেফালি

আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস্ দীপালি (১৬০)

ইন্দ্রিয়চেতনার সমক্রমিক ও বিষম-মিশ্রণে বিস্ময়কর বাক্প্রকরণ প্রায় প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতে দেখতে পাবো। রচনাগুলিতে ভাব-গৌরবের সঙ্গে

বাক্‌শিল্পের সংযোগ এবং প্রয়োগ-সূক্ষ্মতা গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে। ভাষার রূপ বা প্যাটার্নকে কোন্ সিদ্ধির শীর্ষে কবিগুরু পৌঁছে দিয়েছেন, তা বুঝতে পারলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। যেমন ভাব, ঠিক তেমনই তার ভাষণ-রূপায়ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের সঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ-নির্মিতির কৌশল। এমন ভাষা-কারু-কর্মের তুলনা নেই কোথাও। বিভিন্ন গান থেকে সেরকম কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোঝা যাক্—

দৃষ্টিতে শ্রুতি-ক্রিয়া :

দৃষ্টি ও শ্রুতি-এই প্রধান দুটি জৈব-ক্রিয়ার সম-বিষম সংঘটন ঘটিয়ে কবিগুরু তাঁর কাব্য ও গানের বাণীতে বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গি সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টির আধার চক্ষু, হাসির আধার অধর—অথচ দুটি আধারের ক্রিয়াকে স্থানান্তরিত ক'রে কাব্যে ভাষণ-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে এই প্রক্রিয়ার রূপায়ণ ও বিষম-সংঘট্ট সহজ-সূক্ষ্ম-গভীর বাক্‌শিল্পে লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়ে যাই। নয়নে হাসির ক্রিয়া, আঁখিতে আহ্বান, নয়নে গোপন কথা ইত্যাদি ভাষণে সাধারণ প্রয়োগবিধি অবলম্বিত হলেও কবিগুরুর কলমের স্পর্শে এই শব্দ-সমাবেশগুলি অসামান্য হয়ে উঠেছে। হাসি ও অশ্রুর সংঘট্টও অসামান্য হয়ে উঠতে দেখা যায়—

নয়ন পল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি (প্র ১২৫)
নয়ন কোণে হেসেছিল সে (প্রে ৩৬৭)
তুমি সেকি হেসে গেলে আঁখি কোণে (প্রে২৭৭)
আমার দুই আঁখি ওই সুরে যায় হারিয়ে (প্র ৬৩)
ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি সখি, অধরে নয়নে উঠুক চমকি (প্র ১৯)
নয়ন তোরি ডাকুক তারে শ্রবণ রহুক পথের ধারে (প্রে ২৬৩)
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা (বি ১৩১)
পথ চেয়ে থাকা মোর দৃষ্টি খানি, শুনিতে পাও কি তাহার বাণী
(প্র ১২৮)

শ্রুতিতে দৃষ্টি-ক্রিয়া :

শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়ন পাতে (প্রে ২৬১)
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে (পূ ৪)
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়, নাচের আবীর হাওয়ায় হানে (প্র২০৫)

আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হলো রঙিন তানে (প্র ২০৫)
মৌমাছিরা ধ্বনি ওড়ায় বাতাস পরে (প্র২৪০)
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলি তলে (প্র ১৬৭)

শ্রুতিতে স্পর্শ-ক্রিয়া :

আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে (পূ ৭)
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমার সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে (পূ ৯৮)
মৌমাছিরা ধ্বনি ওড়ায় বাতাস পরে (প্র ২৪০)
কাঁপিল বনের হাওয়া ঝিল্লি ঝংকারে (প্র ১৩১)
ওরে সকল বাতাস সকল আকাশ
আজি ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে উঠে শিহরি (প্র ২৫৩)

স্পর্শে শ্রুতি-ক্রিয়া :

কোমল তোমার অঙ্গুলি ছোঁয়াবাণী (প্রে ২৭৯)
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণ বায়ে (প্রে ৩৩০)
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি (প্রে ৩৩১)
তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে (পূ ৬১)
কার পদ পরশন-আশা, তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা (প্র ২০৬)
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ বীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরি ঝংকার (পূ ১০৮)

দৃষ্টিতে স্পর্শ-ক্রিয়া :

তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখি তারা (পূ ৬২)
জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি (পূ ৪০)
কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ (প্রে ১৪৬)

স্পর্শে দৃষ্টি-ক্রিয়া :

এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হলো রঞ্জিত (পূ ৫ ৬)
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে (পূ ৩৬)
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে (পূ ৬৬
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে (প্রে ৫৬)

ঘ্রাণে স্পর্শ-ক্রিয়া :

ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে (প্র ৮)

আধোঘুমের প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুল মালার গন্ধ (প্র ১৯)

চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে (প্র ১৯৫)

বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় (প্রে ৫৬)

বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া

পরশহারা বরণ মালা গাঁথে আমার প্রিয়া (প্র ১২৪)

স্পর্শে ঘ্রাণ-ক্রিয়া :

মাঝে মাঝে কোন বাতাসে চেনাদিনের গন্ধ আসে (প্র ২৫৯)

ঘ্রাণে শ্রুতি-ক্রিয়া :

বনের প্রান্তে ঐ মালতীলতা

করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা (প্রে ১৭৪)

বিবিধ জটিল ক্রিয়ার মিশ্রণ :

দৃষ্টি, অনুভব, স্বাদ :

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে (প্রে ২৪৮)

কী হেরিলাম হৃদয় মেলে (প্র ১৪৬)

শ্রুতিতে মন : মনে হয় তব চরণের ধ্বনি জানি (প্র ৩৬)

মনে শ্রুতি : প্রথম যুগের বচন শুনি মনে (প্র ৫৬)

কী কথা কয় মনে মনে (প্র ১৪৬)

দৃষ্টি ও শ্রুতি : নয়ন পল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি (প্রে ১৯৫)

স্পর্শে স্বাদ : চরণ চলে ব্যথা চুমি (পূ ২১৮)

স্পর্শ ও দৃষ্টিতে ঘ্রাণ : তাই পরালে মালা সুরের গন্ধ ঢালা (পূ ১)

ঘ্রাণে দৃষ্টি : সংগে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল (প্র ১১৭)

গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সংকেত আছে লীন (প্র ২৭৬)

শ্রুতি ঘ্রাণ দৃষ্টি :

ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে মিলাইলে চঞ্চল মধুকর গুঞ্জন (প্র ১১৬)

শ্রুতি দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শ :

ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—

বৃষ্টিমুখরিত মর্মর ছন্দে, সিক্ত মালতী গন্ধে (প্র ১১৯)

পথ চেয়ে থাকা মোর দৃষ্টিখানি, শুনিতে পাও কি তাহার বাণী

কম্পিত বক্ষের পরশ মেলে, কি সজল সমীরণে (প্র ১২৮)

দৃষ্টি স্পর্শ ঘ্রাণ শ্রুতি স্বাদ :

তোমার বুকের খসা গন্ধআঁচল রইলো পাতা সে,

আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে (প্র ১৬০)

দৃষ্টিতে স্বাদ : কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে

হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব (প্রে ২৪৮)

দৃষ্টি দিয়ে স্বাদ-ক্রিয়ার চমৎকার ভাষণশৈলী মহাকবি কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্ত :

উপান্তবাণীরবনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্য পরিপ্লব-সারসানি।

দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥

রঘুবংশম্ ১৩।৩০

—উপান্তে বেতসবন, সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে চঞ্চলভাবে সাঁতার দিচ্ছে সারসগুলো, এমন পম্পা সলিলকে দূর থেকে তৃষ্ণার্ত নয়ন যেন পান করছে।

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ

প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ। পূর্বমেঘ। ১৬

—কৃষিশস্যে ভরিয়ে দেবে যে মেঘ, সেই মেঘের শ্যামকান্তিকে কটাক্ষপাতে অনভিজ্ঞ জনপদবধূগণ প্রীতিস্নিগ্ধলোচন দিয়ে পান করতে করতে যাচ্ছে।

(তিন) বস্তু প্রকৃতি ও মানব-সত্তা : বিচিত্র রূপ-প্রকরণ

এই সম্পর্ক নির্ণয়ে লক্ষ্য করা যায়—এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অন্যে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। এক প্রকৃতির কাজ অন্যে সক্রিয়, কিংবা প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের পারস্পরিক প্রভাব পরস্পরের উপর। এই ব্যাপারটি অনুধাবন করবার জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুলো থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছি।

(প্রকৃতি পর্যায়ের গান)

বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে (২)

দোদুল তমালেরই বনছায়া, তোমারি নীলবাসে নীল কায়া (৩৪)

যেকথা ছিল তব মনে মনে, চমকে অধরের কোণে কোণে (৩৪)

তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে (৩৮)

বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে, জানায় আমায় ফিরবে না সে (৫৫)

আলোতে আজ স্মৃতির আভাস, বৃষ্টির বিন্দুর (৭৭)
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল (৮১)
শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে (১২)
পথহারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে (১১৫)
কী গান গাবো যে ভেবে না পাই
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই (১২০)
মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে (১২২)
আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে (১২৪)
তারি সোনার কাঁকণ বাজে, আজি প্রভাতকিরণ মাঝে (১৫১)
ঝড় এনেছো এলোচুলে (১৫২)
আকাশে ঐ দেখি কি যে তোমার চোখের চাহনি যে (৭)
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে (৩২)
আঁধার রাতের প্রহরগুলি কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি (৩৩)
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব বাতাসে (৫৪)
নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে (৬৫)
আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে (৬৬)
যেথা নিশীথের জলভরা কণ্ঠে কোন বিরহিনীর বাণী
তোমারে কী যায় বলে (১১১)
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া, পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া (১২৪)
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে (১৫১)
যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী ঢেউএর কোলে কোলে (১৯৩)
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে (২০০)
কার পদপরশন আসা, তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে (২০৬)
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারাপ্রহর আমার বুকের মাঝে (৬৬)

(প্রেম পর্যায়ের গান)

রজনীর শেষে এই যে শেষ কাঁদা/
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা (১৬০)

যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা/
যেন কাহার মোহন বাঁশির মনোমোহন সুরে (১৯৪)

(পূজা পর্যায়ের গান)

নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে, না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে
আমার লুকায় বেদনা অঝরা-অশ্রুনীরে।
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়-গহনে বাজে (৫৬)
সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে (২৫)

(চার) রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারী : ভাবে ভাষায় সুরে

গানের স্থায়ী ও সঞ্চারীর কলিতে ভাব ও সুর-বিন্যাসের সৌন্দর্য প্রতিফলিত। গানের স্থায়ী অংশে সুরের যে সূচনা হয়, পরবর্তী অন্তরা ও আভোগ অংশদুটোতে সাধারণতঃ মধ্য ও তার সপ্তকে সেই সুরের আরোহন ও অবরোহন চলে। সুরের এই মডিউলেশন-এর সব থেকে চমৎকার বিন্যাস ঘটেছে কবিগুরুর গানের সঞ্চারী অংশে। সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের সুর-বিন্যাস সুনিবিড় স্থৈর্যে ও গাম্ভীর্যে সঞ্চারিত হয় সঞ্চারীতে। গানের ভাবগত ও সুরগত সৌন্দর্যের অতুলনীয় উদাহরণ রবীন্দ্রসংগীতেই পাওয়া যায়। কবিগুরু গানের স্থায়ী অংশেও সুরের অভিনব সূচনা ও চমকপ্রদ আরোহন-অবরোহন-ক্রিয়া সংঘটিত করেছেন। স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চার অংশে যেখানে সুরের ও বাণীর অসামান্য আকর্ষণীয় চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়—সে রকম বহু শ্রেষ্ঠগানের তালিকা থেকে কিছু স্থায়ী ও সঞ্চারী উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হলো।

স্বপ্নে আমার মনে হলো, কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়।
অচেতন মনোমাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লি ঝংকারে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানিনা—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে (প্র ১৩১)
আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে

যখন বৃষ্টি নামলো তিমির নিবিড় রাতে।...
আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এলো সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর সাথে, সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে।
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে, ক্ষুব্ধ বনের মন্ত্র রবে গেল হারায়ে (প্র ১০৫)
না-দেখা কোন বীণা বাজে আকাশ মাঝে, না-শোনা কোন রাগরাগিণী শূন্যে ঢালে।
ওর খুশির সাথে কোন খুশির আজ মেলা মেশা,
কোন্ বিস্মাতন গানের নেশায় লাগলো নেশা :(প্র ৪)
কোন্ দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা গোপন মিলন অমৃত-গন্ধ-ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা জনের সাজে। (প্র ৩৬)
মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলীরে।
রক্তে রেখে গেছে ভাষা, স্বপ্নে ছিল যাওয়া আসা
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে, কোন বনে কোন সিন্ধুতীরে (প্র ২৩৭)
কেন রে তুই উন্মনা, নয়নে তোর হিমকণা
কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়—
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল (প্র ১৪৭)
কাঁপন ধরে বাতাসেতে, পাকা ধানের তরাস লাগে শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।
জানি গো আজ হাহা রবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু সাগর কূলে। (প্র১৫২)
এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় (প্রে ১৮)
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে, কান্না-আভাস দেয় মেলে ওই ঘাসে ঘাসে,
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে (প্রে ২৩)
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনখানেই নাইকো একেবারে
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে। (প্রে ৩০)
মম হৃদয় রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা স্বপনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখ দুঃখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী (প্রে ৩৬)
আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ

ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন, সে তোমারে কিছু বলে ? (প্রে ৪৮)
বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এলো সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে (প্রে ৭০)
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি, যা উড়ে, যা উড়ে, যারে একাকী।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি (প্রে ২১১)
তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে
আমার ভাঙলো যা তাই ধন্য হলো চরণ পাতে।
আমি রাখবো গেঁথে তারে রক্তমণির হারে
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে।
তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার, মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে—
ছিন্ন যবে হলো তার, ফেলে গেলে ভূমি পরে। (প্রে ২২১)
তোমার অরূপ মূর্তিখানি ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী গানের তানের সে উন্মাদনে (প্রে ২২২)

(সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শব্দকোষ, সংগীত ও বিবিধ)

মহাকবি কালিদাস : মেঘদূতম্, রঘুবংশম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্
মহাকবি জয়দেব : গীতগোবিন্দম্
মহাকবি রবীন্দ্রনাথ : গীতবিতান (অখণ্ড ১৩৬৭), স্বরবিতান (১-৬১) সংগীতচিন্তা (১৩৭৩), ছন্দ (নবসংস্করণ ১৯৬২), রবীন্দ্ররচনাবলী (১৫ খণ্ড, শতবার্ষিকী), সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, বলাকা, গল্পগুচ্ছ, বিচিত্র প্রবন্ধ, ছিন্নপত্র, শেষের কবিতা, বাংলা ভাষায় পরিচয় ইত্যাদি।
অজিতকুমার চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ, কাব্যপরিক্রমা,
অজিতকুমার ঘোষ : নাটকের কথা, বাংলা নাটকের ইতিহাস
অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্যজিজ্ঞাসা
অতুলপ্রসাদ সেন : গীতিগুঞ্জ, কাকলি (৫ খণ্ড)
অনিলচন্দ্র ঘোষ : ব্যবহারিক শব্দকোষ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জোড়াসাঁকোর ধারে, বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী,
অমিয়কুমার চক্রবর্তী : সাম্প্রতিক
অমলেন্দু বসু : সাহিত্যলোক
অমিয়নাথ সান্যাল : প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা
অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় : মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, ছন্দবিজ্ঞান
অরুণকুমার বসু : রবীন্দ্রবিচিন্তা, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত
অরুণ ভট্টাচার্য : সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রসংগীতের স্বরসংগতি ও সুর-বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় : সমালোচনার কথা, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ
অসিত হালদার রবিতীর্থে (১৩৬৫)
আবু সৈয়দ আইয়ুব : আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, পান্থজনের সখা
আশুতোষ ভট্টাচার্য : লোকসাহিত্য (সংগীত), লোকসংগীত রত্নাকর (৪ খণ্ড), বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২ খণ্ড)

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী : রবীন্দ্রস্মৃতি, রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা, বাংলার বাউল
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা
কানাই সামন্ত : রবীন্দ্র প্রতিভা
কার্তিকচন্দ্র রায় : স্বরবিজ্ঞান
কালিদাস নাগ : সুরের গুরু
কালিদাস রায় : গীতগোবিন্দ (অনুদিত)
কালীমোহন বিদ্যারত্ন : কীর্তন পদাবলী (১৩২৯)
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় : গীতসূত্রসার
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত চন্দ্রিকা (র. ভা. ১৩৭৪)
গোপীনাথ কবিরাজ : সাহিত্যচিন্তা, ভারতীয় সাধনার ধারা, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (২ খণ্ড)
গুণময় মান্না : রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন রেখা, (ভূমিকা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)
গৌরীপ্রসাদ ঘোষ : রবীন্দ্রকাব্যের শিল্প-রূপ, (পরিচায়িকা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)
গীতাপ্রেস : ভজন সংগ্রহ
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিরশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)
জগদীশ ভট্টাচার্য : কবিমানসী, কবিতা শতক
জয়দেব রায় : রবীন্দ্রগীতি, সংগীত পরিক্রমা
জীবনানন্দ দাশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা (নাভানা)
ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্তপদাবলী
দিলীপকুমার রায় : সাঙ্গীতিকী, তীর্থঙ্কর
ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় : বক্তব্য, সুর ও সংগতি, কথা ও সুর
দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বৃহৎ বঙ্গ (১/২ খণ্ড)
দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয়
নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের ভূমিকা, বাঙালীর ইতিহাস
নারায়ণ চৌধুরী : সংগীত পরিক্রমা
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : মেঘদূত পরিচয়
পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্রায়ণ (১/২ খণ্ড)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান (১৯৩৫ বর্ধিত), রাগ ও রূপ (১/২ খণ্ড), সংগীত ও সংস্কৃতি বা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১/২ খণ্ড), নাট্য-সংগীতের রূপায়ণ

প্রবাসজীবন চৌধুরী : সৌন্দর্যদর্শন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য

প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দপরিক্রমা, ছন্দ (সম্পাদিত)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গীতিবিতান কালানুক্রমিক সূচী (১/২ খণ্ড) রবীন্দ্রজীবনী (১/২/৩/৪ খণ্ড)

প্রতিমা দেবী : নৃত্য

প্রণয় কুমার কুণ্ডু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ (১/২), রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা (১/২/৩)

প্রমথনাথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ, হিন্দুসংগীত

প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, রবীন্দ্রসরণী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি-নিকেতন, রবীন্দ্রবিচিত্রা,

প্রিয়ব্রত চৌধুরী : রবীন্দ্রসংগীত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : ভারতকোষ (৪ খণ্ড)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড/সাহিত্য-সংসদ)

স্বামী বিবেকানন্দ : সংগীত কল্পতরু, ভাববার কথা, পত্রাবলী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)

বিনয়েন্দ্র সিংহ : রবীন্দ্রসুভাষিত

বিমলকৃষ্ণ সরকার : কবিতার কথা

বিমল রায় : ভারতীয় সংগীতপ্রসঙ্গ

বিমানবিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, বৈষ্ণবপদাবলী (সঃ)

বিষ্ণু দে : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : সাহিত্য-মীমাংসা

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী : ভারতীয় সংগীতকোষ

বিশ্বনাথ কবিরাজ : সাহিত্যদর্পন (সম্পাদিত)

বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যচর্চা, সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

মোহিতলাল মজুমদার : কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, রবি প্রদক্ষিণ, আধুনিক বাংলাসাহিত্য, সাহিত্যবিতান

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি

রমাকান্ত চক্রবর্তী : বিস্মৃত দর্পণ ১৩৭৮ (নিধুবাবু : গীতরত্ন)

রাজশেখর বসু : চলন্তিকা

রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলার গীতকার, সংগীতসমীক্ষা

রাণী চন্দ : আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ : স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ (১৩৬৩)

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ত্রয়ী, শিল্পলিপি, উপমা কালিদাসস্য, রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ

শার্ঙ্গদেব : সংগীত-রত্নাকর (অনুবাদ-সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীতবিচিত্রা, গ্রামীননৃত্য ও নাট্য

শিবনারায়ণ রায় : সাহিত্যচিন্তা, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও রবীন্দ্রনাথ

শুভ গুহঠাকুরতা : রবীন্দ্রসংগীতের ধারা

শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অলংকার চন্দ্রিকা, কাব্যের রূপ ও রস

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা (১/২ খণ্ড), বাংলাসাহিত্যের বিকাশের ধারা, ইংরাজীসাহিত্যের ইতিহাস

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : বাংলাভাষার ভূমিকা

সরলা দেবী : জীবনের ঝরাপাতা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য : সংগীতে সুন্দর (অনুবাদ), শিল্পতত্ত্ব পরিচয়, নাট্য তত্ত্ব মীমাংসা, শিল্পতত্ত্বের কথা, শিল্পতত্ত্ব (ক্রোচে), ক্রোচের এস্থেটিক

সাহিত্য সংসদ : সংসদ অভিধান

সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি

সুকুমার সেন : বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড/রবীন্দ্রনাথ), ভাষার ইতিবৃত্ত

সুকুমার রায় : বাংলাসংগীতের রূপ

সুবোধ সেনগুপ্ত : সাহিত্যপাঠের ভূমিকা, ধ্বন্যালোক ও লোচন
সুবিনয় রায় : রবীন্দ্রসংগীতসাধনা
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত : কাব্যালোক, কাব্যশ্রী
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কুলায় ও কালপুরুষ
সুনন্দা দত্ত : রবীন্দ্রকাব্যভাষা
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : কাব্যবিচার
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : রাগরূপায়ণ
সোমেন্দ্রনাথ বসু : রবীন্দ্র অভিধান (৪ খণ্ড)
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের গান
হরপ্রসাদ মিত্র : কবিতার বিচিত্রকথা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রশিল্পতত্ত্ব
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য
ক্ষিতিমোহন সেন : বলাকা কাব্যপরিক্রমা
ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি

(রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক ও শতবার্ষিকী সংকলন)

উত্তর সূরী : রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা (সম্পাদক, অরুণ ভট্টাচার্য)
গীতবিতান পত্রিকা শতবার্ষিকী ১৯৪১ (সম্পাদক, প্রভাত গুপ্ত)
রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক গোপাল হালদার ; ন্যাশন্যাল বুক)
রবীন্দ্রনাথ, মনন ও শিল্প (সম্পাদক, সুধীর চক্রবর্তী ; অচলায়তন)
রবীন্দ্রস্মৃতি (সম্পাদক, বিশ্বনাথ দে ; ক্যালকাটা বুক হাউস)
রবীন্দ্রায়ণ ১ম, ২য় (সম্পাদক, পুলিনবিহারী সেন)
রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক ১৯৪৮ (সম্পাদক, অরুণ ভট্টাচার্য)
গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ (সম্পাদক, প্রভাত গুপ্ত)
রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতী শ্রদ্ধাঞ্জলি (সং প্রবোধ সেন)
রবীন্দ্রনাথ ১৯৫১ (সম্পাদক, দেবীপদ ভট্টাচার্য ; ইস্টলাইট বুক)

রবিপ্রদক্ষিণ (সম্পাদক, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

রবীন্দ্রচর্চা (সম্পাদক, হরপ্রসাদ মিত্র ; সুরভি প্রকাশনী)

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ (পঃ বঙ্গ সরকার । বঙ্গীয় প্রকাশক)

একতা ১৩৬৫ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ)

E.A. Greening Lamborn : The rudiments of criticism (1925)
Earnest Rhys : Prelude to Poetry (Collection, 1927)
Encyclopaedia Britanica : Vol. 9-10, Vol. 19-20, Vol. 21-22, Vol. 25-26
Edward Thompson : Tagore, Poet and Dramatist
E. Hanslick : The Beautiful in Music
H. Read : The Meaning of Art
H. Osborne : An Introduction to Aesthetics
I. A. Richards : The Principles of Literary Criticism (1955)
Rabindranath Tagore : The Religion of an Artist, Song Offerings, My Reminiscence, The Boundless Sky
Ronald Peacock : The Art of Drama
Swami Pragnanananda : A Historical Study of Indian Music , The Music of the Nations
Sahitya Academy : Rabindranath Tagore : Centenary
T. S. Eliot : Selected Poems ; Selected Essays ; On Poetry and Poetics ; The Sacred wood, The Voice of poetry (1953)
Walter Pater : Style : Appreciations (1944)
Hudson : An Introduction to the Study of Leterature.

(Journals and Others)

A Tagore Reader : Centenary Vol. (Editor A. Chakravarty)
Viswabharati Quaterly : Centerary Vol. (Editor H. Datta)
Tagore Birth centenary Vol : Calcutta Munisipal Gayette
Homage to Tagore : Centenary Vol. (All India Committee)
Viswa Bharati News etc.
Life of Swami Vibekananda by his East and Western Disciples.

তথ্যপঞ্জী

বাঙলা

ইংরেজী